তিন কুড়ি দশ

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বাধীনতার পথে

১৯৪০-৪৭

অশোক মিত্র



'দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

TIN KURI DASH (Part II)
A Biography by *Asok Mitra*
Dey's Publishing, 13 Bankim Chatterjee Street,
Calcutta 700073

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশন্স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

নু-কে

যাঁর কাছে গত বাহান্ন বছর ধরে
দ্বিতীয় জোড়া চোখ ও কানের জন্য
আমি ঋণী
আর ভিন্নমত পোষণ করলে, নতুন আলো
ফেলতে যিনি কখনও দ্বিধা করেননি।

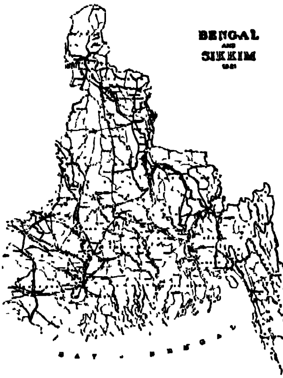
বিষয়সূচি



শিক্ষানবিশী

কৃষ্ণনগর ও বাখরগঞ্জ ১৯৪০-৪১

ভূমিকা



আমাদের পরিবারের সামাজিক স্তরে আমার প্রজন্মে খুব কম লোকেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নেবার কথা ভাবতেন। সে ভার মুখ্যত থাকত তাঁদের পরিবারের গুরুজনদের হাতে। অপত্যস্নেহের কারণেই শুধু নয়, আর্থিক ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেও। যাঁরা নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে নেবার কথা ভাবতেন, তাঁরা ধরেই নিতেন তাঁদের বরাতে কিছুটা নিঃসঙ্গতা আসবে। এম-এ পরীক্ষা দেবার চিন্তা যখন ত্যাগ করলুম তখন শুধু পরীক্ষা না-দেয়া নয়, পরীক্ষায় না-বসার পরিণতি কী হতে পারে তাও ভাবতে হল। মনে মনে ঠিক করলুম বাবার টাকা খরচ করে বিলেতে গিয়ে অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়া উচিত হবে না। যথাসম্ভব বাবার টাকা কম খরচ করে, বাড়িতে বসে তৈরি হয়ে দিল্লীর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়াই উচিত হবে, যদিও দিল্লীর পরীক্ষা লণ্ডনের পরীক্ষার থেকে এক হিসাবে অনেক শক্ত। তার মস্ত কারণ, লণ্ডনের পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর তালিকা থেকে বছরে যেখানে অন্তত প্রথম একশ' পাশ করা ছেলেকে আই-সি-এস-এ ভর্তি করা হত, সেখানে দিল্লী থেকে হত বড় জোর প্রথম পাঁচ বা ছয় জন। বাবা আমার তিনবছর অক্সফোর্ডে পড়ার খরচের টাকা আলাদা করে জমিয়ে রেখেছিলেন, বলেও ছিলেন সেখানে যেতে। কিন্তু সে টাকায় বিলেতে গিয়ে আই-সি-এস পাশ করে ফিরে তাঁর ইচ্ছা অমান্য করে নিজের মতে বিয়ে করার চিন্তা আমার বিবেকে লেগেছিল। কারণ যে বিয়েতে তাঁর মত হবে না জানতুম,

তাঁর টাকা নিয়ে সেই বিয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ তাঁকে ঠকানো। সেটা আমি নৈতিক সততার বিরোধী বলে মনে করলুম। ফলে আমার মানসিক নিঃসঙ্গতা বাড়ল, সেই সঙ্গে সংকল্পের দৃঢ়তাও বাড়ল। বি-এ পড়ার সময়ে মার্ক টোয়েনের 'ফলোইং দি ইকুয়েটর' বইটির একটি প্রথম সংস্করণ কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে পাই। তাতে তাঁর একটা ছবি ছিল। বিরাট, যতদূর চোখ যায়, ধূ ধূ করা শান্ত সমুদ্রের বুকে প্রকাণ্ড জনমানবহীন জাহাজের মাঝখানে একটি ডেক চেয়ারে আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। বিষুবরেখার অসহ্য গরমে আর সমুদ্রের জোলো বাতাসহীন গুমোট সকালে তাঁর গায়ের জামা ঘামে ভিজে গায়ে সেঁটে আছে। জাহাজটি বিষুবরেখা পার হবে। নিচে লেখা—'ভাল ছেলে হয়ে বসে থাকলে, একলা ছাড়া কপালে কিছু জুটবে না'। জানি না জীবনে কখনও ভাল ছেলে হয়ে থেকেছি কিনা, কিন্তু মার্ক টোয়েনের ছবিটি প্রায়ই চোখে ভেসে উঠেছে, যদিও তিনি যে কারণে নিঃসঙ্গ ছিলেন, সে কারণে ঠিক নয়।

বিলেত থেকে ফিরে জাহাজ থেকে নেমে বম্বে থেকে যে ট্রেনে কলকাতায় আসি তাতে আমার ভারি মালপত্র, যা নাকি জাহাজের খোলে ছিল, কেবিনে ছিল না, তা আমার সঙ্গে আসেনি। সেগুলি আসতে কয়েকদিন দেরি হল। এদিকে সঙ্গে বাড়তি কাপড়-চোপড় বেশি আনিনি ; বিশেষত শার্ট। পাটভাঙা শার্ট না পরে ত আর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে পারি না। অথচ পৌঁছনর তিনদিনের মধ্যে দেখা করা কর্তব্য। যুদ্ধের কৃপায় তখন পোশাকের কড়াকড়ি চলে গেছে, অর্থাৎ গাঢ় রঙের পুরো স্যুট না পরে গেলেও চলে। ফ্লানেলের প্যান্ট আর টুইড জ্যাকেট পরলেই চলত। কিন্তু একটি ভাল ইস্ত্রি করা শার্ট তো নিতান্ত প্রয়োজন। জাহাজ থেকে নামার সময়ে সতীর্থ আখতার-উজ-জামানের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে ডাইনিং রুমের ওয়েটারদের বকশিস দিয়েছিলুম। আমার কেবিন স্টুয়ার্ডকে দিই আমার একটি পরা স্যুট। বিয়ের পর, সংসার পাতার সময়ে, সংসারের প্রথম টাকা থেকে আমার স্ত্রী আভার প্রথম কাজ হল জামানের ধার শোধ করা।

আমার টাকা দরকার শুনে বাবা আমাকে একশ' টাকা দিলেন। তখনকার দিনে অনেক টাকা। কিন্তু তাঁর খুব খারাপ লাগল যখন করকরে এগারো টাকা দিয়ে আমি হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন থেকে একটি ট্রুবেনাইজ্‌ড্ কলারওলা শার্ট কিনলুম, এতদিন যে নাকি কলেজ স্ট্রীটের দে-দাশের দোকান থেকে আড়াই টাকায় ভাল পপলিনের শার্ট করিয়ে পরেছে।

চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৯৪০ সালে রাইটার্স বিল্ডিংস্ দেখাত বিস্তৃত, প্রশস্ত, প্রায় রাজকীয়। বারান্দাগুলি প্রশস্ত, প্রায় মার্ক টোয়েনের জাহাজের ডেকের বারান্দার মত। চারিদিক নিস্তব্ধ, ছিমছাম, পরিপাটি। জানলা দরজায় ধুলো নেই, মেঝে ধুয়ে লেপে পরিষ্কার। ঢুকলেই সম্ভ্রম হয়, এক টুকরো কাগজ ফেলতেও বাধে। পিয়ন আর্দালিদের পরণে পরিষ্কার, ধোপদুরস্ত, ইস্ত্রি করা উর্দি, বুকের পিতলের ফলক মাজাঘষা ঝকমকে। ঘরগুলি ছিল বড় বড়। এখনকার মত পায়রার খুপরি নয়। আসবাবপত্র আয়নার মত, মুখ দেখা যায়। বড় বড় উঁচু আর চওড়া জানলা। ১৯৪০ সালে চীফ সেক্রেটারির ঘরে আমি যে সব সুন্দর সুন্দর সুরুচিপূর্ণ দামী আসবাবপত্র দেখি ১৯৫০ সালের পর তার অনেক কিছু আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ১৯৪৯ সাল থেকে যখন প্রায়ই চীফ সেক্রেটারির ঘরে যেতে হত তখন অবশিষ্ট ছিল কেবল ১৯৪০ সালে দেখা চীফ সেক্রেটারির সুন্দর, মহার্ঘ অথচ সাপটা কাজ করা, পালিশ করা মেহগনি কাঠের বিরাট টেবিল, উপরের কাপড়টি বিলিয়ার্ড টেবিলের মত সবুজ বনাতে ঢাকা। তার সঙ্গে ছিল আগেকার যুগের ঘোরানো দাঁড় করানো বইয়ের শেল্‌ফ, আর কয়েকটি ছোটখাট সুদৃশ্য ফাইল রাখার শেল্‌ফ। টেবিলটি এত চওড়া ছিল যে উল্টোদিকে উপবিষ্ট চীফ সেক্রেটারি সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে যখন বকুনি খেতুম তখন টেবিলের বিরাট প্রস্থটি সে বকুনির ধার ভোঁতা করতে সাহায্য করত। কিন্তু ১৯৪৯ সালে দিল্লীতে কাজ করার সময়ে, কলকাতায় এসে চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে কোন কাজে দেখা করতে গিয়ে দেখি সেই অতি সম্ভ্রান্তদর্শন জমকালো টেবিলটিও অন্তর্ধান করেছে। তার স্থলে বিরাজ করছে একটি বেঢপ বড়, কিডনি আকারের একটি বিশ্রী হল্‌দে-ব্রাউন রঙের পালিশ করা কিম্ভূতকিমাকার তথাকথিত টেবিল।

এইচ-পি গুডউইন তখন আণ্ডার সেক্রেটারি। ছিপছিপে অল্পবয়স্ক ইউনিভার্সিটি ডনের মত চেহারা আর হাবভাব। আমাকে চীফ সেক্রেটারির ঘরে নিয়ে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে এযুগের চীফ সেক্রেটারি আগেকার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঘরটিতে অন্তত ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বসতেন। সেটি ছিল বিরাট বড় চৌকো ঘর, উত্তর দিকে বড় বড় উঁচু উঁচু জানলা। মিঃ ব্র্যাণ্ডির খটখটে, চাঁচাছোলা, দোহারা চেহারা, মাঝারি দৈর্ঘ্যের। ধূসর রঙের চোখের তারা, দাঁতের বুরুশের মত ছাঁটা গোঁফ, মিলিটারিদের মত কথা বলার কাটাকাটা ভঙ্গি। টেবিলের ওপাশে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, আমার হাতে হাত মিলিয়ে বসতে বলে বললেন, 'তুমি হলে

তাহলে 'এত'তম লোক যে বাংলা চালাবে?' 'এততম' হল আমি নিয়ে বাংলা প্রদেশে যতজন আই-সি-এস কাজ করছে তাই বোঝালেন। এখনকার সারা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলিয়ে মোটামুটি প্রায় এক হাজার আই-সি-এস তখন উপমহাদেশটি 'চালাতেন' বলা যায়। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ' জন ছিলেন ভারতীয়।

আমার হ্যারিস টুইড জ্যাকেটে তখনও বোধ হয় উইল্‌টুশিয়র বেকন বা স্কচ কিপার্সের গন্ধ লেগে ছিল, যার ফলে তাঁকে, কেতামাফিক চীফ সেক্রেটারিকে 'সার' সম্বোধন না করে, মিঃ ব্ল্যাণ্ডি বলায় তিনি কিছু আপত্তি করলেন না, শুধু প্রায় লক্ষ্য না করার মত একটু উঁচুতে তাঁর ভুরুটা ক্ষণিকের জন্যে উঠে আবার সহাস্যে নেমে গেল। কিছুক্ষণ খোসগল্প, দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে আসার অভিজ্ঞতার গল্প শুনে, উনি আমাকে খুব সংক্ষেপে বললেন, আমি প্রথম কয়েক বছর কী শিখব। বললেন, তিনি শুনতে চান না যে চার বছরের মধ্যে আমি কোন গাড়ি কিনেছি। যেখানেই এই কয় বছর কাজ করি, করতে হবে হয় পায়ে হেঁটে, না হয় সাইকেলে, না হয় ঘোড়ায় চড়ে। তবেই আম ভাল করে কাজ শিখতে পারব এবং দেশের লোককে, তাদের সমস্যা জানতে পারব। গুডউইন বললেন, আমি কৃষ্ণনগরে মিঃ দে'র কাছে কাজ শিখতে যাচ্ছি। ই-এন ব্ল্যাণ্ডি তাঁর প্রশংসা করে বললেন আশা করেন আমি মন দিয়ে কাজ শিখব। বলে তিনি সামনের ফাইল খুলতে শুরু করলেন, অর্থাৎ এবার উঠতে পার। গুডউইন ঘরে ফেরার পথে বললেন চীফ সেক্রেটারিকে 'সার' বলাই নিয়ম। পাঁচ বছরের বেশী অগ্রজদের নামের আগে মিস্টার বলাই ভাল। পাঁচ বছরের কম অগ্রজদের তাঁদের নাম ধরে ডাকলেই চলবে। তার পর ঘরে বসিয়ে আমার কাগজপত্র আর কৃষ্ণনগরে যাবার সরকারি হুকুম আমার হাতে দিলেন।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সেই আমার রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রথম ও একমাত্র যাওয়া বলা যায়। কেবল ১৯৪৪ সালে কয়েকমিনিটের জন্যে মন্ত্রী সুরাবর্দীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ছাড়া। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ ১৯৫২ সালের আগে রাইটার্সের দপ্তরে বসে আমাকে কোন কাজ করতে হয়নি। বৃটিশরা ত্যাগ করার আগে যদি আমাকে রাইটার্সে কাজ করতে হত তাহলে বৃটিশ অগ্রজদের সম্বন্ধে বোধহয় নিজের অজান্তে একটু অহেতুক সমীহ আসত শ্বেতচর্ম সম্বন্ধে, যেমনটি নাকি দেখেছিলুম ১৯৪৪ সালে মন্ত্রী সুরাবর্দীর ঘরে ক্ষণিক থাকার সময়ে। চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ পর্যন্ত সবটাই জেলায় জেলায় কাজ বোধ হয় আমার শিরদাঁড়া খাড়া রাখায় সাহায্য করে।

সুশীল দে

সুশীল দে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পালের দৌহিত্র। তাঁর স্ত্রী, ইন্দিরা, বুলবুল নামেই বেশী খ্যাত, ছিলেন সুপরিচিত ডাক্তার ও শিক্ষাজগৎ এবং অন্যান্য জগতেও সুবিদিত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা। নাজিরবাবু যখন কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে আমাকে নামিয়ে ভাড়া গাড়িতে চড়িয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির গাড়িবারান্দায় নিয়ে নামালেন, তখন দে সাহেব ও তাঁর স্ত্রী বাড়ির পিছনের বাগানে ছিলেন। তাঁরা নাজিরবাবুকে বলে দিয়েছিলেন আমাকে বলতে যে যতদিন আমার জন্যে ঠিক করা বাড়িটি বাস করার মত করে ঝাড়পোঁছ না হয় ততদিন আমি তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকব। আমার আগের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ইকবাল আথার আলি, তখন সেটেলমেণ্ট শিক্ষার জন্যে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর জিনিসপত্র তখনও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে আছে।

দে সাহেব আর মিসেস দে'কে দেখামাত্রই আমি নিশ্চিন্ত হলুম, আমার নতুন জীবন এক সভ্য, আত্মীয়তাপূর্ণ, অনাড়ম্বর, সহজ পরিবেশে শুরু হবে। রাইটার্স বিল্ডিংসে যে ধরনের মাতব্বরি, আড়ষ্ট, কাটকাট, কেতাদুরস্ত ভাব দেখেছি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দিনটি ছিল মঙ্গলবারের বিকেল। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে, অন্ধকার হবার আগেই, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা ভাব এল। দে সাহেব বললেন, কর্কট-ক্রান্তি রেখার উপর অবস্থানের দরুন কৃষ্ণনগরে আর যশোরে অন্য স্থানের থেকে গ্রীষ্মে বেশী গরম আর শীতে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে। তাছাড়া, কৃষ্ণনগর শহরের উত্তরে উত্তর-পশ্চিমে হচ্ছে জলঙ্গী নদী, পশ্চিমে প্রায় আট মাইল দূরে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর আছে ভাগীরথী। তদুপরি ১৯৪০ সালে কৃষ্ণনগরের চতুর্দিকে ছিল বিস্তৃত খোলা প্রান্তর ও বনজঙ্গল। কৃষ্ণনগর রাজবংশের সুনাম, এবং শহরে অনেক বিদগ্ধ, নামজাদা, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র পরিবারের (কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুর শহরকে বলা যায় প্রক্ষিপ্ত বরেন্দ্রভূম) নিবাস সত্ত্বেও, উপরন্তু কৃষ্ণনগর কলেজের জমকালো পরিবেশ সত্ত্বেও কৃষ্ণনগর শহর বর্ধমান শহরের (যেখানে আমি স্কুলজীবনের শেষাংশে মানুষ হয়েছি) তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট ও নাগরিক শোভায় মলিন ছিল।

মিঃ ও মিসেস দে নিচে দক্ষিণের বারান্দায় এসে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমাকে চওড়া বারান্দায় বসালেন। চেয়ার টেবিল পেতে বেয়ারা সেখানে চায়ের সরঞ্জাম আগে থেকেই রেখেছিল। বাবী আর বাচ্চু, তাঁদের দুটি ছেলে, বয়স আট আর ছয়; লনের ধারে তাদের খেলার জায়গা থেকে ছুটে এল। তাদের সহজভাবে কথা বলা, ভাব করার ইচ্ছে দেখেই বুঝলুম তারা বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত আসায়

অভ্যস্ত। স্বামীস্ত্রী অল্পক্ষণের মধ্যে অতিথিকে আপন করায় পটু। ব্যবহারেই বোঝাতেন আপনাকে তাঁরা সত্যিই চান। আপনার সম্বন্ধে জানতে উৎসুক, অথচ হাঁড়ির খবর টেনে বার করার অযথা কৌতূহল নেই। চায়ের সরঞ্জাম নিখুঁত, পরিষ্কার ঝকঝকে। সব থেকে ভাল লাগল এঞ্চোভি টোস্ট দেখে। আশ্চর্য, ঐটেই তো আমার সবথেকে প্রিয় টোস্ট। খাওয়া আর কথার ফাঁকে ফাঁকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি সুরুচি ও সুসঙ্গতির পরিচয়। জানলা দরজার পর্দায়, চেয়ার কুশন, সোফা ঢাকার কাপড়ে, নানা ধরনের রঙে মেলানো ভারতীয় প্রতীকী নক্সার বুননের এমন সুন্দর সমন্বয় আমি আগে কখনও দেখিনি। সব মিলিয়ে সর্বত্র এক স্নিগ্ধ অথচ স্ফূর্তিময়, জমকালো ভাব সারা বাড়ির আবহাওয়ায় একটা বৈশিষ্ট্য এনেছে। আমি জানতুম না প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের যুগে যুক্তপ্রদেশে বিহারে উড়িষ্যায় তাঁতশিল্পের অভিনব ও প্রভূত উন্নতি হয়, বিশেষত ঘর সাজাবার কাপড়ের ব্যাপারে। এ বিষয়ে সব থেকে উৎকর্ষ ও সুরুচির পরিচয় দেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর স্ত্রী মালতী চৌধুরী। কটকে, সম্বলপুরে তিনি যে সব সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখনও সেগুলি দেখাশোনা করেন, তারই অনেক নমুনা আমি মিসেস দে'র বাড়িতে দেখি। ফলে এত আকৃষ্ট হই যে, প্রথম যখন আমার হাতে গোটা চল্লিশ টাকা জমল, তখন রাসবিহারী এভেনিউ-গড়িয়াহাট মোড়ে উড়িষ্যার যে-একটি ছোট্ট দোকান এক মহিলা চালাতেন, তাঁর কাছ থেকে গরদের তৈরী কটকী প্রতীকে বোনা একটি গরদের খাপি শাড়ি আমি আভার জন্য কিনি। বেনারসী, কাঞ্চিপুরম ফেলে বিবাহের পঞ্চাশবছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৯০এর নভেম্বর মাসে আভা ঐ শাড়িটি পরে।

এদেশীয় নেটিভদের সংশ্রব বাঁচিয়ে বৃটিশরা দূরে থাকা পছন্দ করত। সুতরাং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি সচরাচর আসল শহর থেকে বেশ দূরে তৈরি হত। অথচ এমন দূরে নয় যে জরুরী অবস্থায় পড়লে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হওয়া যাবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অন্য নাম ছিল কালেক্টর। দ্বিতীয় পদবীর কাজ ছিল জেলার রাজস্ব আদায় করা। প্রথম পদবীর জোরে তিনি ছিলেন জেলার দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা। তার জোরে যেখানে খুশি হাজির হয়ে শাসন করতে পারতেন। কালেক্টর সাহেব নামটিতে মনে হত নিরীহ ব্যাপার। বোঝা যেতনা তার পিছনে কত ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। দ্বিতীয় নামটি ছোট আর নিরীহ প্রকৃতির বলে ঐ নামটিই সচরাচর ব্যবহার হত। এই সব যুক্তি অনুসারে কৃষ্ণনগরে বৃটিশ আমলের প্রথম যুগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য যে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল সেটি ছিল

বিরাট বাগানওলা প্রকাণ্ড জমির ঠিক মাঝখানে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সুদূর গেট থেকে বিরাট প্রাচীন মেহগনিগাছের দুই সারের মধ্য দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা গেছে প্রাসাদের গাড়ি-বারান্দায়। সে সব বাড়ির তখনকার দিনে নাম ছিল দশ-পরিচারকের বাড়ি অর্থাৎ বাড়িটি তকতকে রাখতে গেলে অন্তত দশজন দাসদাসীর প্রয়োজন হত। উনিশ শতকে একজন জজ প্রায়ই একাধিক জেলার ভারপ্রাপ্ত হতেন। জজ সাহেব ঘুরে ঘুরে এক এক জেলায় কয়েকদিন করে দায়রার কাজ করতেন, তখন সার্কিট হাউসে থাকতেন। কিছুদিন পর পর আসার জন্য নাম ছিল সার্কিট হাউস। প্রথম যুগে কৃষ্ণনগরে জজের বাড়ি হলেও জজ থাকতেন না বলে সেটি কালেক্টরের বাড়ি হল। জজ হতেন পদমর্যাদায় কালেক্টরের থেকে বড়, সুতরাং মাইনেও বেশী পেতেন। জজ না থাকায় কালেক্টরের পক্ষে তাঁর মাইনেয় অতবড় বাড়ি, অত চাকরবাকর রাখা দুঃসাধ্য হল। ফলে মিঃ দে'র একজন উদ্যোগী পূর্বসুরী আরেকটি ছোট বাড়ি বলে কয়ে তৈরি করালেন, এবং পুরনো বাড়িটি পুনরায় জজের বাড়ি হয়ে গেল। নতুন বাড়িটি অনেক ছোট অথচ খুব আরাম করে থাকার মত হল। পরিজনবর্গের খরচও অনেক কমে গেল। একশ' বছর আগে পরিচারকদের মাস মাহিনা ছিল দু' তিন টাকা। চল্লিশ সালে সেই দু' তিন টাকা উঠলো পনেরো থেকে পঁচিশে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভরণ-পোষণের খরচাও অনুপাতে অনেক বাড়ে। নতুন বাড়িটি তাই হল অনেক ছোট, যাকে বলত চার পরিচারকের বাড়ি। মালি অবশ্য আলাদা। বাড়ির ভিতরের ব্যবস্থাও ছিল দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অনেক অনুকূল। এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে হলে সাইকেলের প্রয়োজন হত না। তা সত্ত্বেও একতলায় দুপ্রস্থ অতিথি অভ্যাগত-দের জন্যে দু প্রস্থ ঘর ছিল। সব ঘরই ছিল প্রশস্ত আয়তনের, এমনকি আজ-কালকার তথাকথিত বড়লোকী ফ্ল্যাটের ঘরের থেকেও বড় আয়তনের। প্রত্যেক ঘরেই ছিল বড় বড় জানলা দরজা। বসা, খাওয়া, গল্প করার ঘরগুলি ছিল আলো হাওয়ায় ভর্তি, প্রত্যেকটি থেকেই বাগানের কোন-না-কোন মনোরম অংশ চোখে পড়ত। মেঝেগুলি ছিল বার্ড কোম্পানির লাল পেটেন্ট স্টোনের। মেঝে যাতে সর্বদা আয়নার মত মোছা পালিশ করা থাকে, সে বিষয়ে থাকত মিসেস দে'র শ্যেন দৃষ্টি। ফলে এক টুকরো কাগজও কেউ মেঝেতে ফেলতে সাহস করত না।

বাড়ির দক্ষিণে ছিল সবুজ দূর্বা ঘাসের বড় একটি লন। একটিও মুথা ঘাস দেখা যেত না। তার চারপাশে তিনি ছবির ছক করে সযত্নে সোজা করে লাগিয়ে-ছিলেন সুইট পী আর হলিহক্স। তাদের সমুখে ছিল ছোট বড় ভাগ করা চৌকোনা

জমি, তার মধ্যে কোনটিতে পিংক্‌স্‌, কোনটিতে ফ্লক্স্‌, জিনিয়া, ফক্স্‌গ্লাভ, কর্নফ্লাওয়ার, ক্রিসান্থিমাম। বাগানের হাতার শেষে ছিল বেড়া। তার ওপারে কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপে যাবার সদর সড়ক। হাতার ভিতরে বেড়া আর লনের মধ্যে ছিল সুন্দর একটি থাম ও লিচুর বাগান। তার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পায়েচলা রাস্তা, হাতার বেড়ার গেট পেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে, ওপারে আরেকটি ছোট গেট। তার মধ্যে একটি একতলা বাংলো বাড়ি, নাম 'সুখবাস'। ঐতিহ্যক্রমে বাড়িটি ছিল এক-বছর মেয়াদের অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাসস্থান। নামও ছিল পদের নামে। কতগুলি লিখিত ও মৌখিক বিভাগীয় পরীক্ষা প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পাশ করলে, এবং কতগুলি আবশ্যকীয় দলিল ও কাজ দাখিল করলে তবে অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদোন্নতি পেয়ে হতেন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। মাইনে বাড়ত একশ' টাকা। শুরুর মাইনে সাড়ে চারশ' থেকে বেড়ে হ'ত সাড়ে পাঁচশ'।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির মাঝখানে সুন্দর বাগানটি এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে তার জায়গায় উঠেছে বীভৎস কুৎসিতদর্শন গাড়ির গ্যারাজ ও সরকারি কোয়ার্টার্স। ঘাসভরা লনও আর নেই, ধুলোয় ভর্তি। ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি বহরমপুর থেকে ফেরার পথে আরেকবার চোখের দেখা দেখতে 'সুখবাস' যাই। সমস্ত হাতাটি আর বাড়ি পোড়ো হয়ে গেছে। মধ্যের হলঘরের ছাত ভেঙে ধসে পড়েছে। সারা বাড়িটি মৃণাল সেনের 'খাণ্ডাহার' ছবির বাড়ির মত দেখাচ্ছে। আমরা যেটিকে কাপড়-ছাড়ার ঘর করেছিলুম, সেটিতে এক বৃদ্ধা অতিকষ্টে তোলা উনুনে রান্না করছেন। বাড়ির একমাত্র অধিবাসিনী। শাবানা আজমির মা বলে চালানো যেত, কিন্তু হায়, কোন শাবানা ছিল না।

চা পর্বে ফিরে আসি। চা খাওয়া শেষ হলে মিসেস দে'র আদেশে বেয়ারা আমাকে আমার ঘরটি দেখিয়ে দিল। গরম জলে চান টান করে জামাকাপড় বদলে সাড়ে সাতটা নাগাদ বসার ঘরে ফিরে এসে শুনি বেয়ারা বলছে জেলা জজ—মিঃ বীরেন্দ্রমোহন মিত্র ও তাঁর স্ত্রী ইলাদি এসেছেন। খুব কম স্বামীস্ত্রী জীবনে দেখেছি যাঁরা দেখতে ও মনমেজাজে, ব্যবহারে হুবহু একরকম। দুজনেই মাথায় সমান সমান বেঁটে, শ্যামবর্ণ, গোলগাল, গালে মস্ত টোল পড়া, একই ধরনের হাঁটন, গলার স্বর, পাখির ডাকের মত, কুলকুল করা আমুদে হাসি। দেখামাত্র ভাল না লেগে উপায় নেই। মনে হয় প্রায় কারোরই কোন চিন্তাভাবনা নেই। পরের দিন ছেলে, আর মেয়ে উমাকে দেখলুম, ভাইবোন বসানো বাবা আর মা। ভদ্রলোকের সব ভাই-ই সুপ্রতিষ্ঠিত। ভদ্রমহিলার বাবা মাদ্রাজের আই-সি-এস পি-সি দত্ত,

সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্তর খুড়তুতো ভাই। রমেশ দত্ত, ডিগবি, বীটসন বেল আমার উপাস্য নাম।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই ঢুকে আমার উপস্থিতি এত সহজ ও সরল ভাবে গ্রহণ করলেন যে আমার দিকে একবার খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না মনে হল। এত আপন ভাব ও বিশ্বাস নিতান্ত সরলমতি ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। এখানেও আমার ব্যবহারে ত্রুটি ও অসৌজন্য প্রকাশ পেল। হুইস্কি ঢেলে গ্লাসটি মিঃ মিত্রকে দিতে গিয়ে তাঁকে ইংরেজি কেতায় শুধু 'জাজ্' বলে সম্বোধন করলুম। ওঁদের সঙ্গে আরো দুজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তার মধ্যে একজন অরুণ মুখার্জি, আমার থেকে দু'বছরের সিনিয়র, তখন কুষ্টিয়ায় সবডিভিশনাল অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মিটিং-এ কৃষ্ণনগরে একদিনের জন্যে এসেছেন। আমার কাছ থেকে হুইস্কি নেবার ছলে একান্তে ডেকে চাপা গলায় বললেন, 'হয় মিঃ মিত্র, না হয় জজ সাহেব' বোলো। মিঃ দে'র কাছে আমি উঠেছি বলে এ যাত্রা তাঁরা—অর্থাৎ অরুণ আর মদনমোহন হুজা—সে রাত্রে জজসাহেবের বাড়িতে উঠেছিলেন।

দুজনের মধ্যে আমি শুধু অরুণকেই নামে চিনতুম। প্রেসিডেন্সী কলেজের দুর্ধর্ষ ছাত্র। এক দশক আগে পনেরো বছরের ছেলের লেখা 'গোল্ডেন বুক অভ টাগোরে' ছাপা হয়েছিল বলে তাঁর বিরাট নামডাক। পরীক্ষায় 'কোনদিন দ্বিতীয় হননি'। সন্ধ্যাটা খুব ভাল কাটল, যেন সকলেই সকলকে আজীবন চেনেন। সব থেকে আমার ভাল লাগল মিসেস দে আমাকেই বারবার ডেকে সকলকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে খাবার দেখতে বললেন, যেন তিনি আমাকেই সবথেকে বেশী বিশ্বাস করেন। একবার ভাবলুম আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে উনি কি দেখতে চান আমি কতদূর কী জানি? উত্তরজীবনে অবশ্য দেখেছি আই-সি-এসদের স্ত্রীরা স্বামীদের থেকে এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে চোখ কান অনেক বেশী খোলা রাখেন, বুদ্ধিও বেশী খেলে। এঁদের মধ্যে আবার অনেকে আছেন, যাঁদের হৃদয়টি লোহার মত শক্ত। কিছুতেই ভেজে না। অবশ্য মিসেস দে বা মিসেস মিত্র সে জাতেরই ছিলেন না। তাঁদের স্নেহ, যত্ন, ক্ষমার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনও মুছবে না।

'স্টেশন'

এই দুটি পরিবার, তার সঙ্গে জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হীরালাল সাহা, আই-পি, এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন সংকেত ভাষায় যাকে বলে কৃষ্ণনগর শহরের 'স্টেশন'। তাঁদের কারোকে সম্ভাষণ করতে হলে পদবীর আগে বলতে হত মিস্টার বা মিসেস। মিস্টারদের চিঠি লিখতে গেলে খামে নামের পদবীর পরে লিখতে হত এসকোয়ার (Esq.), তার পরে কী চাকরি করেন তার তিনটে অক্ষর (I. C. S.) বা দুটি অক্ষর (I. P.)। যে যাই এখন বলুন এই তিনটি বা দুটি অক্ষর অর্জন করা তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টের থেকে ছিল অনেক কঠিন। তারই জোরে লেখাপড়ার জগতে এই দুটি পদবীওলা লোকেরা বরাবরই খাতির পেয়ে এসেছেন। ১৯৪৭ সালের পরে নামের পিছনে Esq. লেখা যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমার মনে আছে, শ্রেণীসূচক এই লেজুড়টি হারিয়ে আমার মন কিছুদিন বেশ খারাপ ছিল। 'স্টেশনে'র অন্তর্বর্তীদের মধ্যে অফিসের বাইরে কথা-বার্তায় বয়স বা পদাধিকারের প্রতি সমীহ প্রকাশ করার খুব বেশী প্রয়োজন হত না। এটি ছিল ইংরেজি ঐতিহ্য, এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। দে সাহেব আমার থেকে চাকরিতে দশ, ও জজ সাহেব আমার থেকে সতেরো বছরের বড় ছিলেন। আরেকটি পরিবার ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল জীতেন্দ্রমোহন সেন ও তাঁর স্ত্রী, নাম সুধাদি। সামাজিক সব ব্যাপারে তাঁরাও আমাদের স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই কয় পরিবার যখন একত্র হতেন তখন কোন কথা না-মেপে-জুপে মন খুলে আলাপ করা যেত। কিন্তু এঁদের মধ্যে সরকারি বা বেসরকারি বাইরের লোক কেউ থাকলে একটু বেশী ভদ্রতা করে কথা বলতে হত, কারণ তাঁরা যে আপনার দলের লোক নয়, সেই কথাটা মনে রাখার জন্য। আপনার অধীনে কাজ করেন এমন লোক থাকলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আরো একটু বেশী সৌজন্য প্রকাশ করতে হত। তাঁদের সম্বন্ধে আমরা কখনও বলতুম না আমার নিচে (under) কাজ করেন, রীতি ছিল বলা আমার সঙ্গে (with me) কাজ করেন। এসব সত্ত্বেও, কাজের ক্ষেত্রে যদি কিছু গর্হিত বা তঞ্চকতা হত তাহলে আপনার হঠাৎ ক্ষেপে রাগ ও বিরক্তি দেখাবার অধিকার থাকত। তা না হলে সরকারি কাজে শৃঙ্খলা বা ঋজুতা রাখা সম্ভব হত না। অনুশাসনে ঢিল পড়ত। আমি যখন চাকরিতে যোগ দিতে যাই, যামিনী রায় মশায় আমাকে একটি মজার কথা বলেছিলেন। সেটি যাকে আধুনিক ভাষায় বলে দপ্তরের অনুশাসন বা হিউমান রিলেশনশিপের ব্যাপার। বলেছিলেন, 'বাবা, একজন ইংরেজ এমনিতে

কি ভদ্র, অমায়িক, দয়ামায়ার শরীর, যেন মাছিটি শুদ্ধ মারতে বাধে। কিন্তু, বাবা, হঠাৎ দরকার পড়লে পকেট থেকে পিস্তল বার করে গুড়ুম করে তোমাকে মেরে দিতে পারে।'

এই 'স্টেশন' ও 'নন্-স্টেশন' তার মধ্যে তফাত টানা, সারা ভারতে সর্বত্র সুবিদিত ছিল। কোথাও গিয়ে আপনার দেখা করার আই-সি-এস কার্ডটি যদি পেশ করতেন, তাহলে, যাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি যত উঁচুপদের হোন না কেন, দু' তিন মিনিটের মধ্যে আপনার ডাক পড়তই পড়ত। কয়েক বছরের মধ্যে অবশ্য এই ধরনের খাতির পেয়ে পেয়ে, আপনার মর্যাদাবোধ আপনার অজান্তে আপনার মজ্জায় ঢুকে যেত। তার ফলে আপনার পক্ষে খুব নিচু লোকের কাছে বেশী ভদ্র ও সভ্য ব্যবহার করা সহজ হত, কারণ নিজের উঁচু পদ সম্বন্ধে আপনার সহজাত আস্থা জন্মাত এবং নিজেকে অবিসংবাদিতভাবে বড় জানলে ছোটর কাছে নম্র হওয়া সহজ হয়। যাকে ইংরেজীতে বলে নোবলেস্ ওবলীজ (noblesse oblige)। গত শতকে ১৮৭৪ সালে আই-সি-এস কর্মচারিদের সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে একটি ছোট পুস্তিকা ছাপা হয়। তাতে নির্দেশ ছিল : 'আপনি যদি কারোকে দেখা করার অনুমতি দেন, সে যেই হোক, তিনি ঘরে ঢুকলে আপনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবেন, তাঁকে নমস্কার করবেন, তারপর সমুখের চেয়ারে বসিয়ে নিজে বসবেন। কথা বলে চলে যাবার সময়ে আপনি চেয়ার থেকে উঠে তাঁকে নমস্কার করে ঘর থেকে বিদায় দিয়ে আবার বসবেন'। ১৯২০ সালের পর ইংরেজদের মধ্যে সব অফিসার এই নির্দেশ মানতেন না। এত তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্য হারানোর এও বোধ হয় একটি কারণ।

স্টেশন ও নন্-স্টেশন ছাড়াও বৃটিশরা নিশ্চয় একই স্টেশনের মধ্যে কালো সাদা চামড়ার মধ্যে তফাত করতেন। আমার খুব বরাত ভাল আমার প্রথম বছরে কোন সাদা চামড়া কালেক্টরের কাছে কাজ শিখতে হয়নি। সাদা কালো চামড়ার এই পার্থক্য ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে নিশ্চয় শুরু থেকেই কিছুটা হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দিত। অনেক ভারতীয় আই-সি-এস আই-পি অফিসার এই হীনম্মন্যতার শোধ তুলতেন অধস্তন অন্য সার্ভিসের অফিসারদের অথবা বেসরকারি ভারতীয়দের উপর। বর্ণভেদ, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এমন কি প্রাদেশিক স্তরভেদ অনুসারে আমাদের অধিকাংশ ভারতীয়দের মধ্যেই ছেলেবেলা থেকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে উঁচুনিচু ভেদে আমি যাকে বলি এক ধরনের মোটর হর্ন গলা এসে যায়। অর্থাৎ নিজের বিচারে যে একটু নিচুস্তরের—সে জাত,

পেশা, লেখাপড়া বা প্রদেশ যাই হোক তাদের সঙ্গে আমরা নিজেদের মধ্যে সচরাচর যে স্বরে ও গলায় কথা বলি, তার থেকে ভিন্ন। একটু করুণামিশ্রিত অথবা হুকুমের স্বরে, অথবা তুই তোকারি ব্যবহারে। এটা আমি প্রত্যহ লক্ষ্য করি যোধপুর পার্ক, যেখানে আমি থাকি, তার বাজারে। খুব কম খরিদ্দারই দোকানিকে আপনি সম্বোধন করে কথা বলেন, প্রায় সর্বদাই হুকুমের স্বরে তুই তোকারি করে। বুঝতে পারেন না এই অসাম্য তাঁরা নিজেরা দেখান বলেই দোকানদার রূঢ়-ভাবে উত্তর দেবার সুযোগ পায়। খুব কম বাড়িই জানি যেখানে গুরুজন থেকে শুরু করে অধস্তন ভৃত্য পর্যন্ত সকলকে একই মানবিক শ্রদ্ধায় একই স্বরে এবং টানে সম্বোধন করা ও কথা বলা হয়। শতেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তর-ভেদে শতেক ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও টান, স্পর্ধা বা শ্রদ্ধা বা স্তবের স্বর প্রকাশ পায়। অলক্ষ্যে মানুষের দেহে যেভাবে মেদবৃদ্ধি হয়, তেমনি মনে স্পর্ধাও বাড়ে। আমার খুব ভাগ্য ভাল ছিল যে দে ও মিত্র পরিবারে সকলে সবার সঙ্গে একই স্বরে কথা ও ভদ্র নম্র ব্যবহার করতেন। এই মোটর হর্ন গলা আরো শ্রুতিকটু আর উদ্ধত হয় যখন ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ 'পাকা' সাহেব হবার চেষ্টা করেন। এই ধরনের 'পাকা সাহেবি' গলা আমরা আজকাল অনেক সময়ে এম-বি-এ পাশ করা সদাগরি অফিসে বড় মাঝারি অফিসারদের মধ্যে পাই, যাদের পূর্বসূরীদের আমরা বলতুম 'বক্সওলা'।

শিক্ষানবিশীর কার্যসুচি

পৌঁছনোর পরদিন সকালে, অর্থাৎ ১৩ই নভেম্বর, দে সাহেব আমাকে তাঁর ওপেল গাড়িতে কালেক্টরেটে নিয়ে গেলেন। কালেক্টরেটের সব থেকে বড় কেরানীকে সেরেস্তাদার বলত, এখন বলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—তিনি আমাকে কাজে যোগ দেবার ছাপা পত্র সই করতে দিলেন। এই কাগজ দিয়ে শুরু হল আমার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের জন্য সরকারের আঁচলে গাঁটছড়া বাঁধা। একটা বড় হলঘর, তাতে বারোটির বেশী টেবিল পাতা। ঘরের মাথায় সেরেস্তাদারের টেবিল। তিনি সেখান থেকে হলঘরে যাঁরা কাজ করেন তাদের তদারক করেন। আমি তাঁর কাছে বসলে তিনি প্রতি বিভাগের বড়বাবুকে ডেকে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন, কার কী কাজ, অন্য বিভাগের সঙ্গে কী সম্বন্ধ বললেন, বিশেষত কোন্ বিভাগপরম্পরায় কাগজ তাঁর কাছে বা কালেক্টরের কাছে যায়। তারপরে আমার শিক্ষানবিশীর

সারা বছরের প্রোগ্রামের কথা পাড়লেন। এরপর তিনি প্রতিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসারের সঙ্গে আমাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন।

সেরেস্তাদারের ঘরে ফিরে আমি নিজের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কী ভেবেছি তাঁকে বললুম। প্রতি ডিপার্টমেণ্টে প্রথম দিন তাঁর বিভাগ সম্বন্ধে বড়বাবু আমাকে বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে বলবেন। পরের দিন থেকে আমি এক এক কেরানীর চেয়ারে বসে তাঁর কাজটি সারাদিন করব, সেদিনের মত তিনি কার্যত ছুটি নেবেন। প্রতি কেরানীর কাজ এইভাবে একে একে শেখার পর শেষ দিন আমি বড়বাবুর চেয়ারে বসে তাঁর কাজ করবো। ইচ্ছা হলে তিনি পাশে বসে দেখবেন, নয়তো কার্যসূত্রে কোথাও ঘুরে আসবেন। আমার মনে হয়েছিল এইভাবে কাজ করলে আমি প্রতি কেরানীর সঙ্গে সমপর্যায়ে মিশতে পারব, তাঁদের ব্যবহারে অযথা সম্ভ্রম ও বিড়ম্বনার হাত থেকে নিস্তার পাব। অন্যপক্ষে এই ব্যবস্থায় হাতে-কলমে কাজও নিখুঁতভাবে শিখতে পারব। এই ব্যবস্থা ভালভাবেই চলল, আমারও সব জানা হয়ে গেল।

শিক্ষানবিশী ব্যাপারে এই ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষ্ণনগরে আরেকটি ফন্দি মাথায় খেলে গেল, যা এখনও পর্যন্ত আমি যেখানেই গেছি সর্বদা মেনে চলেছি। পঁয়ত্রিশ বছর চাকরিতে প্রায় বিশ জায়গায় ছাব্বিশটি ভিন্ন ভিন্ন কাজে বদলি হয়েছি, প্রত্যেকটার জন্য একটি মোটা নোটবুক হয়েছিল, যেগুলি এখনও রেখেছি। ফলে, সকলের কাছেই আরেকটু 'আনুগত্য' বা ভালবাসা যাই বলেন, এবং যেটুকু কাজ আশা করা যায়, তার থেকে আরেকটু বেশী পেয়েছি। ফন্দিটি হচ্ছে, যেখানেই যেতুম সেখানে মোটা নোটবইয়ের মত খাতা খুলে যাঁরা যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করতেন—অফিসার থেকে পিয়ন পর্যন্ত, এবং যখন সরকারি গাড়ি হল তখন ড্রাইভার ক্লীনার পর্যন্ত—প্রত্যেকের পরিবারের সকলের সম্বন্ধে নামধাম ও মোটা খবর—যেমন কে কী করছে—জিগ্যেস করে টুকে রাখতুম। কিছুদিন পরে মাঝে মাঝে বইটি খুলে এক-আধজন কর্মচারিকে হঠাৎ জিগ্যেস করতুম তার অমুক নামক ছেলে এখন কী পড়ছে, বা অমুক নামের মেয়ের বিয়ে হয়েছে কিনা, বা তার স্ত্রীর অসুখ করেছিল এখন কেমন আছেন। এক এক সময়ে বহুবছর পরেও জিগ্যেস করেছি, যেমন ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় যখন মুন্সীগঞ্জ থেকে আমি কয়েকজনকে ডাকিয়ে এনে তাঁদের পরিজনদের কথা জিগ্যেস করি, আগে থেকে বই পড়ে নিয়ে। আমি যে তাঁদের পরিবারের সকলকে মনে রেখেছি এর থেকে ব্যক্তিগত অনুরাগের ভাল পরিচয় আর কী হতে পারে? এতে অনেক কাজ হত, হৃদ্যতা বাড়ত।

আরেকটি মতলবও কৃষ্ণনগরে থাকতে মাথায় এল, সেটিও সারাজীবন খাটিয়েছি। সেটি হচ্ছে পুজোর ছুটির পর প্রথম কাজের দিন ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে, মায় পিয়ন, ঝাড়ুদার পর্যন্ত বিজয়ার কোলাকুলি করতুম। বাংলার বাইরে দেওয়ালি পুজোর সময়ে এই কাজটি করতুম। কৃষ্ণনগরে শুরু করেছিলুম, রাষ্ট্রপতিভবনে ১৯৭৫ সালে শেষ হয়। চতুর্থ আরেকটি পন্থা ছিল, প্রতিটি মিটিং-এ যে যা কাজ করেছেন বলেছেন তার সম্বন্ধে স্বল্পে নোট রাখতুম। বইটিকে আমার সহকর্মিরা ভয় করতেন, বলতেন ব্ল্যাক বুক। হয়ত পাঁচ-ছয় মাস পরে একদিন হঠাৎ অফিসারটিকে জিগ্যেস করতুম ঐ কাজটির কী হল? যদি প্রথম দিন বাজে কথা বলে থাকেন, তবে বড় অপ্রস্তুতে পড়তেন, যদি ঠিক বলে থাকেন, তবে খুশি হয়ে আরো নতুন কথা বলতেন।

এসব জনসংযোগের ফন্দি মাথায় আসত না, যদি আমি ইংরেজ কালেক্টরের কাছে জীবন শুরু করতুম। এসব ফন্দি সবই অবশ্য পূতচরিত্র খ্রীষ্টান যাকে বলবেন, খ্রীষ্টীয় বিনয়ের বেশে অহঙ্কার, যা-নাকি অহঙ্কারের থেকেও গুরুতর পাপ। যদি তাও হয়, তবুও ফন্দিগুলির কল্যাণে আমার নিম্নতম সহকর্মিদের সঙ্গে আমার কিছুটা একাত্মতা এসেছিল। এখনও যখন দিল্লীর প্ল্যানিং কমিশন বা অন্য কোন মিনিস্ট্রিতে যাই তখন পিয়ন, ড্রাইভার, জমাদাররা আমার কাছে এসে সস্নেহে কথা বলে, আমার স্ত্রী, মেয়ের খোঁজ নেয়।

সপ্তাহের প্রথম পাঁচদিন অফিসের সময় ছিল এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। শনিবারে এগারোটা থেকে দুটো। আমাদের জীবনের ছন্দের সঙ্গে এবং ১৯৪০ সালে সরকারি কাজের পরিমাণের সঙ্গে এই সময়সূচী খুব মানাত। সে যুগে সামাজিক বা সার্বিক উন্নয়নের বিশেষ কোন প্রোগ্রাম ছিল না, যা নাকি ১৯৫০-এর পর হুড় হুড় করে এল। বাড়িতে ফ্রিজ থাকত না। মিসেস মিত্র আর দে-র বাড়িতে কেরোসিনে-চালানো ফ্রিজ ছিল, তবে তাঁরা একদিনের বেশি বাসি রান্না খুব কমই খেতেন। সাধারণত দিনের কাঁচাবাজার ঐদিন সকালেই হত। যারা স্কুলে অফিসে যেত তারা সকালে দশটায় ভরপেট খেতে বসতেন। সুতরাং স্কুলে বা দপ্তরে দেরির অজুহাতের কারণ থাকত না।

অফিসে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় হাজিরার ব্যাপারে দে সাহেব হৈচৈ করা পছন্দ করতেন না। সকলেই প্রায় এগারোটার আগেই হাজিরা দিতেন। কদাচিৎ কারো সামান্য বিলম্ব হত। সাধারণত ১১টা বেজে পাঁচ মিনিটে সেরেস্তাদারবাবু হাজিরার খাতা সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টরের কাছে পেশ করতেন। অন্যান্য

কালেক্টরদের এবিষয়ে জেদ সম্বন্ধে সেরেস্তাদারবাবু মজার মজার গল্প বলতেন। কতকগুলি গল্প অবশ্য ছাপার অক্ষরে বলার নয়, বলা যায় না পৃথিবীর কোন কোণে কে এখনও একশ পাঁচ বছর বয়সে জীবিত আছেন, যদি হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে তবে মানহানির মকদ্দমা আনতে পারেন। ১৯০৮ সাল নাগাদ এম-এম স্টুয়ার্ট ছিলেন কালেক্টর। কাঁটায় কাঁটায় হাজিরার উপর ছিল কড়া নজর। ঠিক ১০·৫৫ মিনিটে সেরেস্তাদারের টেবিলে তাঁর হত আবির্ভাব, চাইতেন সকলে একে একে তাঁর সমুখে হাজিরা রেজিস্টারে সই করবে। এগারোটা এক মিনিটে তিনি হাজিরার খাতা বগলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যেতেন। একদিন সকালে স্টুয়ার্টের শহরের বাইরে টুরে যাবার কথা। সেদিন কর্মচারিরা একটু ধীরে সুস্থে এগারোটায় একটু হৈচৈ করে আসতে শুরু করলেন। সকলে একটু হৈচৈ করে তার মধ্যে একজন টপ্পার সুরে এই ধুয়াটি ধরলেন, 'যাক বাঁচা গেছে শালা আজ নেই'। হঠাৎ একটা দেয়াল-ঘেঁষা আলমারি নড়ে উঠল, পিছন থেকে এক সাহেব বেরিয়ে এসে আড়-খেমটা সুর ধরে গাইল, 'শালা এসেছে'। বলে হাসিমুখে রেজিস্ট্রি খুলে ধরলেন। সকলে অধোবদনে লেজ গুটিয়ে একে একে সই করল। কেউই কোন ধমক খেল না, তবে উল্টোটাও হতে পারত। হয়ত সাহেব নিজের আড়খেমটা সঙ্গতে খুশি হয়েছিলেন। যেকালে জীবন আরম্ভ করি তখন সকলেরই একটি ঢিলেঢালা আমুদে ভাব ছিল, যদিও কাজে ফাঁকি পড়ত না।

আমার প্রথম সপ্তাহের প্রথম তিনচার দিন কাটল স্টেশনের প্রতিটি পরিবারের উপর 'কল' করা, এবং স্থানীয় ক্লাবে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করা। 'কল' করা দুরকম ছিল। আগে থেকে যদি বলা থাকত, তাহলে বাড়ি গিয়ে দরজার চাপ-রাশির হাতে দুটি ভিজিটের কার্ড দিতে হত, একটি কর্তার জন্যে, একটি গৃহিণীর জন্যে। যদি আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী থাকতেন তবে তাঁর নিজস্ব একটি ভিজিটের কার্ড দিতে হত গৃহিণীর জন্যে। উপরন্তু পরিবারে যদি প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা থাকতেন, আর আপনি যদি অকৃতদার থাকতেন তবে তাঁর উদ্দেশে দিতে হত আপনার আরেকটি কার্ড তবে তার এককোণ একটু কাটা হবে। যদি আগে থেকে বলা না থাকত তাহলে গেটে একটি নট-অ্যাট-হোম বাক্স থাকত, তাতে দুটি অথবা তিনটি কার্ড ফেলে আসতে হত, পরে আপনার নিমন্ত্রণের ডাক আসত। যদি আগে থেকে বলা থাকত, তাহলে কার্ড দিলে বেয়ারা বা চাপরাশি আপনাদের নিয়ে বসার ঘরে বসাত। চায়ের সময়ে গেলে চা পর্ব, সূর্যাস্তের পর গেলে গৃহস্বামীরা হুইস্কি বা অন্য ককটেলে আপ্যায়িত করতেন।

কৃষ্ণনগর ক্লাবে একটিমাত্র শান বাঁধানো টেনিস কোর্ট ছিল আর একটি পুরনো বিলিয়ার্ড টেবিল। ক্লাবের প্রাণপুরুষ ছিলেন কালেক্টরেটের একজন যুবক কেরানী নন্তবাবু। টেনিস খেলা শেখানো থেকে বিলিয়ার্ডের মার্কারের কাজ সবই করতেন। জজ, কালেক্টর ছাড়া শহরের গণ্যমান্য বেসরকারি কয়েকজন ভদ্রলোকও সভ্য ছিলেন। প্রতিদিন সবশুদ্ধ প্রায় তিন সেট খেলা হত।

বিবাহ

১৫ নভেম্বর শুক্রবার রাতে খাবার টেবিলে মিঃ ও মিসেস দে'কে বললাম, আমি পরের দিন কলকাতা যেতে চাই। মঙ্গলবার ফিরে আসব। দুজনেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। দে বললেন, মঙ্গলবার সকালে কলকাতা থেকে আসার ট্রেন ধরতে স্টেশনে ওঁর গাড়ি যাবে। বিলেত থেকে আসার পর আমার ভাবী স্ত্রী আভার সঙ্গে (উৎসর্গের 'নু') আমার কলকাতায় ইতিমধ্যে দু'বার দেখা হয়েছে, এবং বেকবাগানে বিবাহ রেজিস্ট্রার শ্রীশিশিরকুমার দত্ত'র অফিসে আমরা বিবাহের নোটিস দিয়েছি, ২৪শে নভেম্বর বিবাহ হবে বলে। শ্রীবিষ্ণু দে ও তাঁর স্ত্রী প্রণতির সঙ্গে ইতিমধ্যে সব কথাবার্তা হয়। তাঁরা খুব সোৎসাহে বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে বিয়ের আগে আভা তাঁদের বাড়িতে থাকবে এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি তাঁদের ১।১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতেই হবে। পূজার ছুটির পর চট্টগ্রামের খাস্তগীর গার্লস্ স্কুলে ফিরে না গিয়ে আভা বিয়ের আগের এক সপ্তাহ, ১৭ থেকে ২৪ তাঁদের বাড়িতেই থাকবে।

বিবাহ করতে গেলে যত সামান্যই হোক কিছু টাকার অবশ্য প্রয়োজন। সেই সামান্য টাকা জোগাড় করাও একটু শক্ত হল। ইংলণ্ডে যাবার আগে আমি বাবাকে বলেছিলুম ফিরে যদি আসি, তবে নিজের মনোমত বিয়ে করব। বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব তাঁর একেবারেই মনঃপূত হয়নি। ফিরে আসার পর তিনি আমার টাকার অভাবের নিন্দা করে বললেন, শুনেছেন আমি নাকি বেহিসাবি খরচ ও মদ খেয়ে টাকা ওড়াই। বললেন, প্রথমে তিনি এসব কথা মোটে বিশ্বাস করেননি। কার কাছে শুনেছিলেন বুঝতে পারলুম না। আমার হাতে টাকা নেই (ফিরে এলে তিনি আমাকে একশ' টাকা দিলেন বলেছি) দেখে তাঁর সন্দেহ পূর্ণ হয়েছে। না হলে এত টাকা গেল কোথায় ?

যখন আমার জাহাজের মালপত্র এল তখনও তাঁর সন্দেহ গেল না। একটি

ই-এম-জি গ্রামোফোন, তার দুভাগে ভাগ করা প্রকাণ্ড পেপিয়ার-মাসে চোঙা, ইস্পাতের বদলে বাঁশের বাজাবার ছুঁচ এই সব নিয়ে দাম পড়েছিল আশি পাউণ্ড, তার সঙ্গে বেশ কিছু রেকর্ড আর একগাদা বই যার দাম ছিল একশ' কুড়ি পাউণ্ড, তার সঙ্গে নিজের জামাকাপড়, বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি (যা আভার যত্নে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ভালভাবে চলে), তার উপরে ইংল্যাণ্ডে ও অক্স-ফোর্ডের কলেজে থাকা ও ঘোরাফেরা, যার বর্ণনা আমি আত্মকথার প্রথম খণ্ডে দিয়েছি, বন্ধুবান্ধবকে মাঝে মাঝে খাওয়ান, এডিনবরায় দিদি জামাইবাবুকে দেখতে যাওয়া, সেখানে সদ্যোজাত ভাগিনেয়ীর জন্যে উপহার, আমার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙার চিকিৎসা, বারে বারে লণ্ডনে যাতায়াত, অক্সফোর্ড ইউ-নিয়ন ও ভারতীয় মজলিসের চাঁদা, অতদিন কেপ ঘুরে আসার জন্যে জাহাজে খরচ। এ সবই হয়েছে সাকুল্যে সাড়ে চারশ' পাউণ্ডে। এর পরে ছিল অক্সফোর্ডে ও লণ্ডনে মাঝে মাঝে থিয়েটার, সিনেমা দেখা ও শেলডোনিয়ান থিয়েটারে চেম্বার কনসার্ট শোনা, লণ্ডনে গিয়ে টমাস বীচামের লণ্ডন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রার কনসার্ট শোনা, এবং সোহোর স্মিট্‌ রেস্তোরাঁয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ান। এরপরে বদখেয়াল আর মদের জন্য ক'টি পাউণ্ড বা পেনি থাকে ? তার উপরে ছিল ব্লিৎসের সময়ে এয়াররেডে কাজ করার সময়ে সহকর্মিদের একটু-আধটু কফি বা চা খাওয়ানো। পাউণ্ড কি চিউইংগাম না বাব্‌লগাম, চিবোলে বা ফুঁ দিলেই বাড়বে !

বাবার যে শ্লেষটি আমাকে সবথেকে কষ্ট দিল সেটি তখনকার দিনে একটি চালু বক্রোক্তি : আমি না হব ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান, না সিভিল বা ভদ্রসভ্য, না সার্ভিস বা লোকহিতব্রতী। মনে মনে আমি কি নিজেকে অন্য আদর্শে তৈরি করিনি ? যে সত্যটি আমাকে সবথেকে বেশী কষ্ট দেয় সেটি হচ্ছে ভাবী শ্বশুরের সামাজিক খ্যাতিমর্যাদা, অর্থের সম্ভাবনা পায়ে ঠেলে, বাবা জানতেন আমি আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ঘরে বিবাহ করা মনস্থ করেছি। তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে বড়লোক বনেদি বৈবাহিকের কাছে কত অবহেলা পেয়েছেন তাতে কি তাঁর চৈতন্য হয়নি যে বড়লোক কুটুম্ব বিশেষ সুবিধার নয়।

সে যাই হোক, আভার হাতে সামান্য কিছু টাকা, আড়াইশ'র কম, ছিল। সেই টাকা দিয়ে তার জন্যে কিনলুম একটি ভাল খোলের মহীশূর সিল্কের ছাই রঙের কাপড়, তাতে ন' টাকা দামের অতি সুন্দর বেনারসি বর্ডার লাগানো হল। তার সঙ্গে একটি সুন্দর ব্রোকেডের ব্লাউজ। আমার জন্যে একটি কাঁচি ধুতি, এক-

জোড়া লাল বিদ্যাসাগরী চটি। বিয়ের সময়ে বিষ্ণুবাবু তাঁর নিজের একটি সিল্কের পাঞ্জাবি পরতে দিলেন। বাকি টাকা রাখা হল বিবাহ রেজিস্ট্রারের দর্শনী ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্যে। বিষ্ণুবাবু আর প্রণতিদি পুরো এক সপ্তাহ বাড়িতে রাখলেন, উপরন্তু বিবাহ রেজিস্ট্রির পরে সাক্ষীসহ জনাদশেক বন্ধুদের নিমন্ত্রণ খাওয়ালেন। এই এক সপ্তাহ বিষ্ণুবাবুর মা আভাকে যেন নিজের মেয়ের থেকে বেশী যত্ন করেছেন এবং সর্বদা তার জন্যে কী যে করবেন যেন ভেবে পেতেন না। সে যত্নের কথা আজ পঞ্চাশ বছর পরে মনে করলেও আভার চোখে জল আসে, গলা ভারি হয়। রেজিস্ট্রেশনের আগে প্রণতিদি আভাকে তাঁর নিজের গয়না পরিয়ে সাজিয়ে দেন, এবং রেজিস্ট্রির পর বিষ্ণুবাবুর মা আভার হাতে তাঁর নিজের দান সোনার লোহা পরিয়ে দেন। এসবের খরচ তো ফেরত দেবার কথা বলা যায় না, তবে প্রথম মাইনে পেয়ে আভা মনিঅর্ডার করে প্রণতিদিকে কিছু টাকা পাঠায়, যার মধ্যে থাকে বিষ্ণুবাবুর বাড়ির দু'টি লোকের জন্যে কিছু বকশিস। মাইনের যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে তার থেকে আবার যামিনী রায় মশায়কে আমার কেনা ছবির ধারের টাকা পাঠায় (বিলেত যাবার আগে একটি মা-ছেলের ছবি কিনেছিলুম, যেটি আমাদের বসার ঘরে আজও জ্বলজ্বল করছে)।

আমার দিক থেকে অন্য খরচের জন্যে আরো ২৫০ টাকা ধার জোগাড় করলুম। সেই টাকায় আমি চট্টগ্রামে গিয়ে আভার নামে একটি চিঠি চট্টগ্রামের ডাকঘরে পোস্ট করলুম, যাতে চিঠির ভিতরে চট্টগ্রাম লেখা ছাড়াও খামের উপর চট্টগ্রামের পোস্টমার্ক দেখে তাঁর বাবা-মা নিশ্চিন্ত হন যে মেয়ে চট্টগ্রামে ফিরে গেছে। চট্টগ্রাম থেকে আমি সোজা রাণাঘাটে নেমে, রাণাঘাটে সকালে কৃষ্ণনগরের ট্রেনে চড়ে মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণনগর পেঁৗছলুম।

শুক্রবার ২২শে নভেম্বর রাত্রে খাবার সময়ে আবার মিঃ দে'র কাছে শনিবার কলকাতা যাবার অনুমতি চেয়ে বললুম রবিবার সন্ধ্যাবেলা আমার বিয়ে হতে পারে। আমার মুখে 'হতে পারে' শুনে মিঃ দে ও মিসেস দে এত হতভম্ব হয়ে গেলেন যে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তাঁদের মুখে কথা সরল না। পরক্ষণেই অবিশ্বাস ও বিস্ময় সামলে নিয়ে মিসেস দে বললেন উনি ভেবেছিলেন আমি ওঁদের কাছে বছরের শেষ অবধি থেকে নতুন বছরে 'সুখবাসে' উঠে যাব, সেইজন্যে আমার বাড়ি গুছিয়ে দেবার ব্যাপারে উনি অত গা করছিলেন না। এখন তিনি নতুন বৌয়ের জন্যে তাড়া দিয়ে বাড়িটি ঠিক করিয়ে দেবেন। বলাবাহুল্য খবরটি মিঃ ও মিসেস মিত্রকে জানাতে দেরি হল না। তাঁরা দে-দের বাড়িতে যখন এলেন তখন সকলে

খুব আনন্দ করে একটু শেরী টোস্ট করলেন। কনে কি আমার সঙ্গে সোমবার আসবে? 'হয়ত নয়, আমি ঠিক বলতে পারি না।' আবার 'হয়ত' শুনে এক দফা হাসাহাসি আর ঠাট্টা শুরু হল। আমি সত্যিই কি সোমবার ফিরে আসছি? হাঁ আসছি। অতঃপর শনিবার বেলা দেড়টায় কৃষ্ণনগর ছাড়লুম।

শনিবার কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে বিষ্ণুবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি আভা বিষ্ণুবাবুর পরিবারে মিশে গেছে বলা যায়, যেন জন্ম থেকেই ও বাড়ির মানুষ, আর বিষ্ণুবাবুর মায়ের মেয়ে। বিষ্ণুবাবুর দুই ভাই কেশব আর মাধব তখন ও বাড়িতেই থাকতেন। বিষ্ণুবাবুর বড় মেয়ে ইরার বয়স তখন বছর পাঁচেক হবে। বড় হয়ে সুবিখ্যাত ভূগোলবিদ সত্যেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ছোট মেয়ে তারার বয়স তখন বছর দুয়েক, পরে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী অতুল বসুর সুপণ্ডিত ছেলের সঙ্গে বিবাহ হয়। প্রণতিদি এই সময়ে প্রাণ মন দিয়ে কমলা গার্লস স্কুল গড়ে তুলছেন। বাড়ির প্রাণকেন্দ্র ও কর্ত্রী অবশ্য ছিলেন বিষ্ণুবাবুর মা স্বয়ং। যৌবনে নিশ্চয় অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। চাঁচাছোলা নাক চোখ মুখ, একহারা গড়ন, অতি স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রীর সব লক্ষণ তাঁর ক্ষীণ দেহে প্রকট। তাঁর কথা উঠলে আভা এখনও সোৎসাহে বলে মাটিতে বাবু হয়ে বসে তিনি কেমন যত্ন করে সকলের জন্যে সকালে থরে থরে জলখাবার সাজিয়ে দিতেন। তাঁর সমুখে বড় অর্ধচন্দ্রাকারে, জল-তরঙ্গের বাটির মত সাজানো থাকত কারোর জন্যে কফি, কোকো বা চায়ের বাটি, তার তলায় একসার খাবার প্লেট। ডানদিকে থাকত চা, কফি, কোকোর পট ও ফুটন্ত জলের কেটলি। যে যেমন খাবে প্রত্যেককে নিজের হাতে ঢেলে হাতে তুলে দিতেন। আভাকে প্রায়ই নতুন কিছু নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতেন।

রবিবার, ২৪শে নভেম্বর কাটলো, যাঁরা আমার বিয়েতে সাক্ষী থাকবেন তাঁদের মনে করিয়ে দিতে: কবি চঞ্চল চাটুজ্যে, বন্ধু রাধিকা মুখার্জি (বাদু)-কে। বিষ্ণুবাবু হলেন তৃতীয় সাক্ষী। আমার ভাই গুলুকেও আগের রাত্রে বলে রাখি। বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে রেজিস্ট্রার এলেন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। রেজিস্ট্রি হল ১৮৭২ সালের ৩য় আইনে, যেটি ১৯২৩ সালের ৩০ নম্বর আইনে একটু পরিবর্ধিত হয়। বিষ্ণুবাবু, চঞ্চল আর বাদু হলেন সাক্ষী। সই ইত্যাদি শেষ হবার পর রেজিস্ট্রার দুজনের মালা বদল করালেন। দুজনকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি বিদায় নেবার পর বিষ্ণুবাবুর মা আভার বাঁ হাতে তাঁর দান সোনার লোহাটি পরিয়ে দিলেন।

বিষ্ণুবাবুর মা বাড়ির দুটি অত্যন্ত সুপটু পরিচারক দিয়ে জনা চোদ্দ অতিথির জন্যে একটি অতি উপাদেয় ভোজ রাঁধিয়ে রেখেছিলেন। আগে বাড়ি গিয়ে

দুজনে বাবাকে প্রণাম করে আসি এই প্রস্তাব করাতে তাঁরা রাজি হয়ে বললেন, ফিরে এলে খাওয়া হবে। এই একটি অগ্নিপরীক্ষা যা অতিক্রম করতেই হবে। আভা, গুলু আর আমি একটি ট্যাক্সি নিয়ে গেলুম। গ্রোভ লেনে পৌঁছে দেখি আমার ছোটদি খুকি বাড়িতে এসেছে। খুকি হয়ত আন্দাজ করেছিলেন সেদিন আমার বিয়ে হতে পারে, কিন্তু হবি তো হ আমার বড়দিদিও সেদিন এসেছিলেন। তিনি তো একেবারে থ, কারণ ঘুণাক্ষরেও আগে কিছু জানতেন না। বাবা বেড়িয়ে এলেন। আভা আর আমি তাঁকে প্রণাম করলুম। অসম্ভব সংযম, একটুও বিচলিত ভাব বা উষ্মা দেখালেন না, গলা একটুও এদিক ওদিক হল না। বিডন স্ট্রীটে ফিরে যেতে হবে বলে দিদি আগেই খেতে শুরু করেছিলেন। বাবা সকলকে খেতে বসতে বললেন। যখন বললুম বিষ্ণুবাবুর মা খাবার নিয়ে আমাদের জন্যে বসে থাকবেন, তখন বাবা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন, তবে বললেন, যাবার আগে আভা একটু মাছ-ভাত মুখে দিয়ে যাবে, যা নাকি কনে শ্বশুরবাড়ি এলে প্রথমেই খেতে হয়। মাছ-ভাত খাবার পর বাবা আমাদের ড্রাইভার ননীবাবুকে বলে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করিয়ে তাতে করে আমাদের বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন খাবার পর যেন বাড়ি ফিরে আসি।

বিষ্ণুবাবুর বাড়ি ফিরে যথাসম্ভব হাসিখুশি দেখানর চেষ্টা করলুম। দশটার সময়ে গ্রোভ লেনে ফেরার সময়ে অতিথিরা উলুধ্বনি করলেন। বিয়ের প্রথম রাত্রি যেভাবে কাটা উচিত বলে লোকের ধারণা, সেভাবে ঠিক কাটল না। মেঘের ভার মাথার উপর কখন কিভাবে কত ভয়াবহভাবে ভাঙবে সেই আশঙ্কায় দুজনেই আমরা একটু ত্রস্ত, ফলে আত্মহারা আনন্দে পরস্পরকে জানার ইচ্ছায় ছেদ পড়ল। আনন্দের বদলে শঙ্কায় রাত কাটল বলা যায়। আমি বরাবরই কাপুরুষ। ভোর হতে না হতেই আভাকে একলা ম্যাও ধরার জন্যে ফেলে রেখে কৃষ্ণনগরের ট্রেন ধরার জন্যে পালালুম। আশা করলুম, আর যাই হোক আভা গুলুর সাহচর্যে একটু শান্তি পাবে।

ওদিকে মিঃ ও মিসেস দে, মিঃ ও মিসেস মিত্র এবং আরো অনেকে কনে বরণ করার আশায় নানারকম মজার প্ল্যান করে রেখেছিলেন। শুক্রবার নাগাদ আভার কাছ থেকে একটি ছোট চিঠি পেলুম, কৃষ্ণনগরে যথাসত্বর নিয়ে যেতে অনুনয় করে। ইতিমধ্যে আমি বিবাহের কথা লিখে বর্ধমানে শ্বশুরমশায় ও শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীকে চিঠি দিয়েছি, ভবানীপুরে আভার দাদামশায়কেও চিঠি দিয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে অবশ্য চিঠির উত্তর পাইনি।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা গ্রোভ লেনে ফিরে বাবাকে বললুম, দে সাহেব আর মিত্র সাহেবরা সোমবার কৃষ্ণনগরে আমাদের জন্যে কিছু আয়োজন করেছেন। অতএব, সোমবার, ২ ডিসেম্বর সকালের ট্রেনে দু'জনে ফিরে গেলাম কৃষ্ণনগরে। ইতিমধ্যে শনিবার রাত্রে দেখলুম আমার মাতলামি এবং উড়নচণ্ডী স্বভাব সম্বন্ধে আভার বেশ মগজ ধোলাই হয়ে গেছে। সেও রেগে মেগে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে আমার এত টাকা গেল কোথায়। সুতরাং প্রথমরাত্রিবিষয়ে সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যা কিছু পড়েছি বা পাঠ মুখস্থ করেছি সব মাঠে মারা গেল। আপত্তি করার থেকে ভৎর্সিত কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ঠিক করলুম। বরাতক্রমে রবিবার রাত্রে চিঁড়ে একটু ভিজল। সোমবার বিকেলে আমি আমার প্রথম ক'দিন চাকুরির মাইনের টাকা, আর বম্বে থেকে আসার ভাড়া ও খরচ বাবদ আরো কিছু টাকা পেলুম। নিজের বিয়ের উপর সব টাকা খরচ করে কপর্দকহীন আভার হাতে এই ক'টি টাকা পড়াতে আভা একটু আশ্বস্ত হল মনে হল। কৃষ্ণনগরে সেদিন রাত্রে নতুন বৌকে নিয়ে যেরকম হৈচৈ, হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া হল, তাতে আভার ক্ষোভ ঘুচে গেল। আর্থিক অনটন ও দুরবস্থা ভোলার পক্ষে কম-বয়স যতখানি সাহায্য করে অন্য কিছুতে তা সম্ভব হয় না।

ঘর বাঁধা

ইতিমধ্যে মিসেস দে নিজের মত করে ভেবেচিন্তে অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন। 'সুখবাস' খালি ও পরিষ্কার করিয়ে তিনি আথার আলিকে চিঠি লিখে আমাদের জন্যে ত্রিশ টাকায় আথারের একটি বেত ও কাঠের সোফাসেট, একটি কাপড় রাখার আলনা, তিনটি টিপয়, একটি কাঠের নিচু সেণ্টার টেবিল কিনে সাজিয়ে রেখে-ছিলেন। তার সঙ্গে তিনি টেকনিক্যাল স্কুলে বলে দুটি চটের ক্যাম্পখাট বা এক্স-কট কিনে রেখেছিলেন। এক্সকটের একেক দিকের দুটি করে পা এক্স আকারে আড়াআড়ি করে লাগানো। সুতরাং মাঝখানে শুলে চটটি ঝুলে যায়, এবং একসঙ্গে দুজন পাশাপাশি শুলে আরো ঝুলে যায়। উপরন্তু খাটগুলি উঁচু হত বলে স্থিতি-স্থাপকতা থাকত না। দুজনে শুয়ে একটু নড়াচড়া করলে উল্টে গিয়ে পপাতধরণী-তল হবার সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং এই ধরনের বিবাহশয্যা বর-বৌকে ব্রহ্মচর্যের ঋজু পথে রেখে প্লেটোনিক প্রেমের মহান আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার পক্ষে খুবই প্রশস্ত। দেহাশ্রয়ী ইতরবাসনাতাড়িত হয়ে অঙ্গসঞ্চালন করতে গেলে মুহূর্তে

ভূপাতিত হয়ে হাড়গোড় ভাঙার সমূহ সম্ভাবনা। গোদের উপর বিষফোড়ার মত, কৃষ্ণনগরে ডিসেম্বর মাসে পড়ত প্রচণ্ড শীত। লেপ তোষক ছিল না।'ছিল বিলেত থেকে আনা বেলফাস্ট লিনেনের দুটি বিছানার চাদর, একটি লালিম্‌লি কম্বল, একটা গরম ড্রেসিং গাউন ও একটি গরম গ্যাবার্ডিন রেনকোট। মিসেস দে দুটি তোষক করিয়ে দিয়েছিলেন। ঘর-দোর বন্ধ করে সে দুটি পাশাপাশি মেঝেতে বিছিয়ে কম্বল, ড্রেসিং গাউন আর রেনকোট গায়ে দিয়ে শুতুম। ভোরবেলা ভাল ছেলের মত বিছানা তুলে এক্স-কটে বিছানা করে সাজিয়ে ঘর খুলতুম, যেন সারারাত ঐ খাট দুটিতেই শুয়েছি। পাশের বিপ্রদাস পালচৌধুরী টেকনিকাল স্কুলের সঙ্গে আলাপ করে মাসে মাসে অল্প অল্প করে টাকা শোধ করার ব্যবস্থা করে কিছু আসবাব অর্ডার দিলুম, এবং সেই সঙ্গে দুটি তক্তপোষ ভাড়া নিলুম। তক্তপোষ দুটি ঘরে পেতে এক্স-কট দুটি গেস্টরুমে রাখলুম।

মিসেস দে ভেবেচিন্তে রান্নাঘরের জন্যে চারজনের মত হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন, ভাঁড়ার ঘরের জন্যে ভাঁড়ারের যাবতীয় চালডাল, মশলা ইত্যাদি কিনে রেখে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের বড়বাজারে তাঁর নিজের এক গোলদারি দোকানে একটি অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিলেন। ফলে নগদ মূল্য দেবার প্রশ্ন রইল না। সব কিছু স্লিপ কেটে নেয়া যেত। মাসে মাসে শোধ হত। রাণাঘাট স্টেশনে সোরাবজির দোকানের মাখন, জ্যাম, জেলি, রান্নার সস, ভিনিগার, হুইস্কি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য ধারে কেনার ব্যবস্থা করে অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিলেন। প্রথমদিকে যাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয় তার জন্যে সব কাজ করবে এমন একটি পরিচারক, নাম বসন্ত, এবং ঝাড়ুদার ভিখু, নিয়োগ করে দিলেন।

এর পরের দেড় মাসের কিছু বেশী মিঃ ও মিসেস মিত্রের ছুটি উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনাগুলিতে দুপুরে ও রাত্রে নিমন্ত্রণের ফলে আমাদের বাড়িতে খাবার পাট প্রায় রইল না বললেই হয়। 'স্টেশনে'র কয়টি পরিবার এবং তাঁদের বন্ধুরা ফিরিয়ে ফিরিয়ে বেশ কয়েকদফা আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। এরই কল্যাণে আভার অনেক কিছু শেখা হল যা আগের জীবনে জানার কথা ছিল না। আদব-কায়দা, ঘর-দোর সাজানো, চলা-ফেরা, কলকাতার কোন দোকানে কী পাওয়া যায় ইত্যাদি। মধুচন্দ্রিকায় যাবার ত টাকা পয়সা বা ব্যবস্থার সঙ্গতি নেই। সে জন্যে দে সাহেব আমাদের দুজনকে সঙ্গে করে এক-আধ দিনের টুরে নিয়ে যেতেন। একবার আমরা গেলুম শিকারপুর গ্রামে, মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির স্থানীয় ইংরেজ ম্যানেজারের সুন্দর বাগানওলা প্রকাণ্ড একতলা বাংলো বাড়িতে।

কোম্পানির আদি পত্তন হয় পূর্ব উত্তর প্রদেশে, বিহারে ও বঙ্গদেশে নীলচাষ ও রেশম চাষের বিরাট বিরাট জমিদারী ও তৎসংলগ্ন কুঠি ও ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করে। নীল ও রেশম ফ্যাক্টরি উঠে গেলেও ১৯৪১ সালে জমিদারিগুলি তখনও ছিল, বিশেষত উত্তর ভারতে। ইংরেজ ম্যানেজারটি ছিলেন অল্পবয়স্ক। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন, সুতরাং সাম্রাজ্য-মনোভাবের ছোঁয়াচ মনে দাগ ফেলেনি। এই বাড়িতে ম্যানেজারের বাংলো, বাগান, পরিজনদের জন্যে তৈরি বাড়ি, বাগানের হাতায় গাছপালা দেখে বুঝতে পারি চা বাগানের ম্যানেজারদের বাড়ির মডেল কোথা থেকে এসেছিল।

টেকনিকাল স্কুলের গুদামে শুকিয়ে পাকা করার জন্যে যে সব মেহগনি ও সেগুন কাঠ মজুত ছিল সেই কাঠ থেকে প্রিন্সিপাল আমাদের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় ফার্নিচারগুলি করিয়ে দিলেন, যেমন খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল, চেস্ট অভ ড্রয়ার্স, কিছু চেয়ার, ছোট টেবিল। কাঠের দাম, তার উপরে ছাত্রদের কাজের বাবদ বইয়ের হিসাবমত মজুরি, দপ্তরের তদারকি খরচ যোগ করে যে দাম স্থির হত, তাই দিতে হত। এই ধরনের হিসাব এখনও সব ট্রেনিং কেন্দ্রে আছে। ফলে খরিদ্দারের পক্ষে বেশ সস্তা হত। এখনকার দিনে ঐ দামে অত সুন্দর কাঠ ও কাজ, রূপকথার মত শোনায় এবং বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক করে। প্রথমত অত অল্প দাম। দ্বিতীয়ত অত ভাল কাঠ ও পালিশ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের আঁশ যেন সাটিনের মত জৌলুষ দেয়।

জজ সাহেবের ছুটির খবর এল ১৯৪১ সালের প্রথম সপ্তাহে। তাঁদের ল্যাজারাস কোম্পানির তৈরি মেহগনি পালিশ করা খাট পালঙ্ক, বিরাট অতি সুন্দর ট্যাপেস্ট্রি মোড়া সোফা সেট, তার সঙ্গে মানানসই বড় বড় চেয়ার, খাবার ঘরের সাইডবোর্ড, কাপড় ছাড়ার ঘরের আলনা, লেখার টেবল ও চেয়ার, ড্রেসিং টেবল, আদালতের গুদামে না রেখে আমাদের বাড়িতে রেখে গেলেন। তখন আমরা নবাবী কায়দায় ঘর সাজালুম। এই আসবাবপত্র পেয়ে বন্ধুদের এসে থাকার জন্যে ঢালাও নিমন্ত্রণ পাঠালুম। কলকাতা থেকে একের পর এক আত্মীয় ও বন্ধু এলেন। বিষ্ণুবাবু, চঞ্চল; প্রীতিতোষ আর বাচ্চু; আভার দাদামশায়, মা, বোনেরা, বড় দাদা ও ছোট ভাই বিশু; আমার ভাই গুলু; রাধারমণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়; গিরীন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী; সমর, সুলেখা। আরো অনেকে, যাঁদের সম্বন্ধে আমার আত্মকথার প্রথম ভাগে লিখেছি।

গিরীন আর তার স্ত্রীর আসার কথাটা না বললেই নয়। কলকাতা থেকে

যে ট্রেনটি সন্ধ্যায় এসে পৌঁছয় সেটি তারা ধরতে পারেনি। রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা স্থির করলুম ওরা আর আসবে না। ওরা অবশ্য সন্ধ্যার ট্রেন না পেয়ে রাত্তিরের ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগরে পৌঁছয় মাঝরাতের অনেক পরে—'সুখবাসে' পৌঁছয় প্রায় রাত্রি একটায়। এসে নিশ্চয় অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, শেষে হাল ছেড়ে জানুয়ারি মাসে ঐ হিহি শীতে গাড়িবারান্দার চওড়া সিঁড়িতে জামা আর চাদরপত্র, শাল যা ছিল বিছিয়ে ও ঢাকা দিয়ে শুয়েছে। দরজার ধাক্কায় আভার ঘুম ভেঙে গেছল, কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে হাজার ধাক্কাধাক্কিতেও আমাকে ওঠাতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়। তার মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে একটি বীভৎস খুন হয়েছে, ফলে একা একা দরজা খোলার সাহস পায়নি। আমার ঘুমের কথা গিরীনের জানা ছিল, ফলে সকালে ওদের যখন সিঁড়ি থেকে অগাধ ঘুমন্ত অবস্থায় তুললুম তখন সহজেই মাপ করল।

বন্ধুরা এলে শনিবার অপরাহ্ণে অথবা রবিবার নবদ্বীপ ঘুরিয়ে আনতুম। বাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে স্বরূপগঞ্জ ঘাট, সেখান থেকে ফেরি করে ভাগীরথী পেরিয়ে নবদ্বীপে নেমে প্রথম কাজ হল কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির দেখা আর দু' একটি সংস্কৃত টোল। পোড়ামাতলায় তীর্থের চিহ্ন হিসাবে ছোটখাট জিনিস কিনে বাড়ি ফেরা। দ্বিতীয় কি তৃতীয় বার যখন গেলুম তখন স্থানীয় পুলিশ ইনস্পেক্টর—সারা নবদ্বীপ তাঁর নখদর্পণে—আমাদের ললিতাসখীর আশ্রমে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

ঔৎসুক্যভরে গিয়ে দেখি ললিতাসখী বেশ কালো, শক্তসমর্থ একজন পুরুষ, সাধারণ মানের থেকে অনেক লম্বা চওড়া। পায়ে হাতে পুরুষোচিত ঘন কালো লোম। বুক অবশ্য ভাল করে ঢাকা। তিনি, অর্থাৎ ললিতাসখী, সাধনা মার্গে, কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার ঘনিষ্ঠতমা দুটি সখীর একজন, সুতরাং ললিতা অবতারে রমণী। এই কারণে তিনি সর্বাঙ্গ খুব ভাল করে আবৃত করে রাখতেন। রাজস্থানী ছাপা শাড়ি রাজস্থানী ঢঙে পরে তিনি পরপুরুষের সামনে এত বড় ঘোমটা টানতেন যে মুখের কোন অংশ দেখা যেত না। তবে তখনকার রীতি অনুযায়ী কাঁচুলি, ব্লাউজ, শায়া না পরায় তার শক্ত, স্থূল, পেশীবহুল বাহু ও পায়ের মোটা অংশগুলো দেখা যেত। সখীর শাড়ির ভিতরে অবশ্য সখী ছাড়া আর কিছুই থাকত না। দেহে অলঙ্কার ছিল অনেক। মাথায় সোজা সিঁথির কপালের সীমানায় ঝুলত অতি সুন্দর মিহি কাজ করা সোনার বোড়লা। মসৃণ করে কামানো ঘন সবুজ রঙের

দু'গাল ও চিবুকের দু'পাশে ঝুলত দুই কানে পাকাসোনার বড় মাকড়ি। মোটা উঁচু মাংসল নাকের বাঁ দিকে সোনার বিরাট গোল নথ, দুটি বড় মুক্তো দিয়ে নাকে আটকানো। গলায় আঁটসাঁট সোনার কলার। উপরের হাতে সোনার চওড়া বাজুবন্ধ, কব্জিতে চওড়া কঙ্কণ, পায়ে ভারি রুপোর মল। পরে, রাজস্থানে ঘোরার সময়ে বড় ঘরের মেয়েদের, বিশেষত জয়পুরের হাওয়ামহলের রাস্তায় জহুরীদের দোকানে ওরকম গয়না পরা অনেক মহিলা দেখেছি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত বলে সখীর ছিল বিশেষ খ্যাতি, এবং সে খ্যাতি বোধহয় অযথা হয়নি। কিন্তু কথা বলতেন পাতলা জালির মত ওড়না ও ঘোমটার আড়ালে চিকন নারীকণ্ঠে। পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তাঁর ঘোমটা একচুল নড়ত না, পাছে কৃষ্ণপ্রাণ সুনামে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক পড়ে। তবে পরপুরুষের সঙ্গে স্নিগ্ধস্বরে কথোপকথনে তাঁর আপত্তি ছিল না। চতুর্থবার আমি যখন তাঁর দর্শন পেতে যাই তখন তিনি বড় সাইজের মূল্যবান একটি উড়িষ্যার অনন্তশয়নম পট আমাকে উপহার দেন। ১৯৮৩ সালে আমি সেটি কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অভ কালচারে দান করি।

বন্ধু ও সহপাঠী সমর সেন ও তাঁর পনেরো বছরের স্ত্রী সুলেখা বিয়ের পর দিল্লী থেকে ১৯৪১ শুরুতে যখন প্রথম কলকাতায় আসেন তখন সেখান থেকে কৃষ্ণনগরে এসে আমাদের কাছে কয়দিন থাকেন। মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সমরের টনটনে জ্ঞান ও বিপ্লবাত্মক বাস্তববোধ আমার মনে খুব দাগ কাটে। কলেজে তার হাব-ভাব, গতিবিধি আর কবিতা দেখে ও পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল সমর প্রায় তার সমবয়সী ও বিদুষী কোন মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু নতুন বৌ যখন এলেন দেখি খুব হাসিখুশি, সরল, সদ্যযৌবনে উপনীতা একটি কিশোরী বললেই হয়। অধিকাংশ সময় তার কাটত 'সুখবাসে'র হাতায়—বাইরে যেথায় ছাগলছানা চরে বেড়াত তাদের পিছনে ছুটে, ধরে কোলে করায়। কৃষ্ণনগরে দুজনে প্রায় এক সপ্তাহ ছিল, তার মধ্যে একদিন আমরা নবদ্বীপে গেলাম।

ললিতা সখীর সঙ্গে আমার কত খাতির সমর আর সুলেখাকে দেখাবার জন্যে আমরা চারজন তাঁর আশ্রমে গেলাম। এবার শুধু আভা আর সুলেখা সখীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়ে ভিতরে গেল, সখী বাইরে এলেন না। সমর আর আমি দূর থেকে একপলক মাত্র দেখলুম, আভাদের নিয়ে গেলেন। সমরের কাছে আমার আর মুখ থাকে না এমন অবস্থায় একজন আশ্রমিক এসে আমার কানে কানে বললেন আগের দিন সখী রজঃস্বলা হয়েছেন বলে কোন পুরুষের সামনে আসবেন না, বা দূর থেকে কথাও বলবেন না। নিজেদের কী বোকাই না মনে

হল—এই সামান্য সত্যটি আমাদের দুজনের মাথায় একেবারেই উদয় হয়নি বলে ধিক্কার এল। কোন পুরুষ যদি পরমার্থের সন্ধানে প্রকৃতিরূপের তপস্যায় নারীত্বভাব ধারণ করেন, উত্তম কথা। দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন বহু বহু যুগ আগেই তার দার্শনিক ব্যাখ্যা ও যাথার্থ্য সম্বন্ধে অকাট্য বিধান দিয়েছে। কিন্তু স্থূল রক্ত মাংসের শরীরেও সেই দার্শনিক তত্ত্বের স্থূল প্রমাণ কি নিতান্তই আবশ্যিক? আশ্রমিকের কথা শুনে আমরা দুজনেই বিধিমত অপ্রস্তুত ভাব দেখালুম। যখন আশ্রম থেকে বেরোলুম তখন সুলেখা হাসিতে ফেটে পড়তে বাকি রাখল। আমরাও সারা রাস্তা অবিরাম হেসে বাঁচি না। এখনও সেইকথা মনে পড়লে আমাদের একই রকম হাসির গর্‌রা ছোটে।

কলকাতায় আমরা চারজনে যখন এলুম তখন রাধারমণ মিত্র চায়না টাউনের অধুনালুপ্ত বিখ্যাত ন্যানকিং রেস্তোরাঁয় আমাদের বিবাহ উপলক্ষ্যে একটি বিরাট ভোজ দিলেন। যেভাবে ভোজের অর্ডার দিয়েছিলেন, এবং একের পর এক বেছে বেছে সাজিয়েছিলেন তাতে বোঝা গেল তিনি চীনে খাদ্য সম্বন্ধে কত জানেন। নেমন্তন্ন হয়েছিল বিষ্ণুবাবু ও প্রণতিদির, সমর-সুলেখার, চঞ্চল-কামাক্ষীর, আভার আর আমার। বিষ্ণুবাবু তাঁর স্বভাবমত সুলেখাকে একটু ক্ষেপাতে শুরু করলেন। খানিকক্ষণ পরে সুলেখা ফোঁস করে উঠে বলল, 'ও তাহলে আপনিই সেই বিষ্ণুবাবু—যিনি ঘোর গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে ছাতা বগলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের নামে রসালো নিন্দে করেন!' আমরা, পরম বৈষ্ণবরা, তো লজ্জায় অধোবদন হয়ে বেগ্‌নি ও অপ্রস্তুত। মনে মনে অবশ্য পুলকিত!

নতুন স্থানীয় বন্ধুরা

সমর আমার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের পাত্র মার্কেটের বন্ধু দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। দেবী ছিল আমাদের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র। এখন ও কৃষ্ণনগরের অ্যাডভোকেট। দেবীর ছিল সর্ববিষয়ে উৎসাহ, এখনও আছে। এখনও সে আমাকে নতুন নতুন বই পড়তে তাগাদা দেয়। দেবী আর সমর উভয়ে আমার সঙ্গে সুশীল চ্যাটার্জি এবং অমৃতেন্দু মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। দুজনেই আমার থেকে বছর আট দশ বছরের বড়। দুজনেই ছিলেন রাজনৈতিক সংগঠনে পটু, নদীয়া জেলার ভারতের কৃষক ফ্রণ্টে কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হয়ে কাজ করতেন। তখন কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি ছিল।

সুশীল চ্যাটার্জি ছিলেন মাঠে ঘাটে কিষাণদের সংগঠনে ওস্তাদ। অমৃতেন্দু মুখার্জি আন্দামানে অন্তরীণ ছিলেন, তিনিও কৃষক কর্মী ছিলেন তবে আন্দামানে কাটানোর দরুন মার্ক্সিস্ট দর্শনে ও নীতিতে পণ্ডিত ও পার্টির সভ্যদের শিক্ষা-বিষয়ে পটু। দুজনেই কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ পরিবারের লোক। যতদূর মনে পড়ে সুশীলবাবু থাকতেন উকিলপাড়ায়, অমৃতেন্দুবাবু অবশ্য নেদেরপাড়ায়।

অমৃতেন্দুবাবুর ছিল মোটা একজোড়া মিলিটারি গোছের যাকে বল হ্যাণ্ডল্-বার গোঁফ। তার কল্যাণে তাঁর ডাক নাম হয়ে গেল গোঁফবাবু। সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ শুরু হবার পর মার্শাল বুজিয়ানি বলে এক সোভিয়েট সেনানেতা, সেনানায়ক হিসাবে বিশেষ নাম করেন, তাঁর ঐ ধরনের গোঁফের সম্মানে আমরা গোঁফবাবুর নাম রাখলুম মার্শাল বুজিয়ানি। মন্ত্রী হবার পর রাইটার্সে তাঁর ঘরে গিয়ে ঐ নামে ডাকতুম। সুশীলবাবুকে আমি বিশেষ চিনতুম না। গোঁফবাবু আমাকে পছন্দ করতেন, ফলে আমাকে বরাবর কম্যুনিস্ট পার্টির গোপনে প্রচলিত কাগজপত্র দিতেন। তাছাড়া তাঁর কাছ থেকে পেতুম দর্শনা বা পলাশী চিনির কলের শ্রমিক আন্দোলনের খবর, অথবা কুষ্ঠিয়া মোহিনী মিলের। তাহেরপুর, করিমপুর, নাকাশিপাড়া, নবদ্বীপ এবং অন্যত্র কৃষকফ্রণ্টের খবরও পেতুম। ভারতের অন্য প্রদেশেরও পার্টির কার্যকলাপ বিষয়েও কত তাড়াতাড়ি লোক-পরম্পরায় খবর আসে তার প্রমাণ পেয়ে ভাল লাগত : পার্টির তখন খবর চালা-চালির আয়োজন বেশ ভাল ছিল। গোঁফবাবু সাধারণত আমার কাছে মাসে গড়ে একবার আসতেন রাত্রি ন'টার একটু পরে, আমার বাড়ির পিছনের ঘন আমবাগান আর জঙ্গলপথে, সাধারণত কৃষ্ণপক্ষে। উদ্দেশ্য ছিল ঘণ্টা দেড়েক কথা বলা, এবং মাসে মাসে গোটা ত্রিশেক টাকা চাঁদা নিয়ে যাওয়া। ত্রিশ টাকায় তখন দুজন পার্টিসভ্যের ভরণপোষণ হত। আমরা ভাবতুম তিনি পুলিসের চোখ এড়িয়ে আসতেন। অনেক বছর পরে, ১৯৫৫ সালে আমি কিছুদিনের জন্যে বর্ধমান জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করি। সেখানে আই-বি বিভাগের একটি অফিসারের সঙ্গে একদিন কথাবার্তার সময়ে তিনি আমাকে বলেন ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগরে আমাকে দেখেছিলেন। তখন তিনি সদ্য রংরুট হয়ে ওয়াচার হিসাবে আই-বি-তে নিযুক্ত হন। তাঁর কাজের মধ্যে ছিল গোঁফবাবুর গতি-বিধির উপর নজর রাখা। আমাদের বাড়িতে গোঁফবাবু কবে কখন আসতেন তার হিসাব রাখার জন্যে পুরস্কার হিসাবে তিনি একবছরের মধ্যে হাবিলদার পদে প্রোমোশন পান।

জাহাঙ্গীরপুর

সুশীল দে-র দরদী মন, বন্ধু হিসাবে আলাপ করার ক্ষমতা আমার জীবনারম্ভে খুবই শিক্ষার বিষয় হয়। দে একটি কৃষি সমবায়-সমিতি গড়লেন। কৃষ্ণনগরের প্রান্তে জাহাঙ্গীরপুর গ্রামের সরকারি খাস জমিতে এক লপ্তে অনেকখানি মাঠ জমিতে, তাকে ছোট ছোট অংশে না কেটে, আল না দিয়ে, তিনি সাপ্‌টা চাষ করার উদ্দেশে এক সমবায় সমিতি গড়লেন। কয়েকজন নামজাদা কর্মঠ চাষী একত্র করে তাদের দিয়ে সমবায় সমিতি করে সেই সরকারি জমি কিছুদিনের জন্যে ইজারা দিলেন। উদ্দেশ্য একজোড়া বলদ আর হাল ছোট আলবাঁধা জমিতে ঘোরাঘুরি না করে যদি সোজা লম্বা লাইন ধরে অনেকখানি লাঙ্গল দেয় তবে ফসল ভাল হবে। সেইসঙ্গে লম্বা বড় জমিতে বুনন, সেচ, নিড়েন সবই ভাল করে করা যাবে, ফলে ফসলের পরিমাণ বাড়বে।

১৯৪০ সালের কথা যদি কোন পাঠকের স্মরণ থাকে তবেই তিনি বুঝতে পারবেন এই পঞ্চাশ বছরে সারা পৃথিবীতে ত বটেই, এমন কি ভারতবর্ষেও, বলা গেলে কিছুটা পশ্চিমবঙ্গেও, সব দিক দিয়ে চাষের কি বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে। আজ যা জলভাতের মত সহজ, যেমন উন্নত বীজ, কেমিকাল আর গোয়ালের সার, বিজ্ঞানসম্মত সেচ, যন্ত্র দিয়ে নিড়েন, যন্ত্রের লাঙ্গল ও ট্র্যাক্টর, যন্ত্রের বুনন, ফসল কাটার যন্ত্র, বাঁধাই, ঝাড়াই, আঁটি বাঁধা, উন্নত মরাই, সাইকেলে, ট্রাকে করা ফসলরেজিস্ট্রিকরা গঞ্জে পাঠিয়ে বিক্রি, এসব কথা তখনকার দিনে রূপকথার মত শোনাত, এখন যেটা ভারতবর্ষের অন্যত্র নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। উপরন্তু সরকারি ঋণব্যাংক, টাকা পাবার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এইসবের অভাবে উষর জমিতে শুধু শুধু লম্বা লাইন চাষ করলেই যে ফসল বাড়বে না, এটাই আমার মনে হত। ফলে চাষীরা, চাষী হিসাবে খুব পটু হলেও জাহাঙ্গীরপুর ফার্মের কাজে তাদের বিশেষ মন ছিল না। সাহেব এসে এত করে বলছেন, তাই করছি, এই ছিল মনোভাব। তবে কি কারণে এ কাজে তাদের মনপ্রাণ নেই তখন সবটা বুঝিনি। একমাত্র জানতুম, প্রায় নিষ্ফলা মাঠে চাষ করে দু'তিন বছরে ভাল ফসল ফলানো খুব শক্ত। ফলে মাঠটি অযত্নেপালিতই দেখাত। তবু দে সাহেবের উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমি ত বাঙালীর বাচ্চা, বাঙালীর অজ্ঞ অথচ সবজান্তা, অবিশ্বাসী রক্ত শিরায় বইছে, অতএব সবেতেই ঠোঁট ওলটানো। কিন্তু দে সাহেব অটল। ফলে, আর যাইহোক পনেরো দিন অন্তর রবিবারের বিকেলগুলি খুব আনন্দে কাটত। চাষীদের এবং

তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা চষা জমির ধারে ঘাসের উপর গোল হয়ে বসতুম। বিকেলে যখন গাছের ছায়া লম্বা হয়ে শেষে আমাদের উপর পড়ত, তখন আমাদের চা মুড়ি খাওয়া শেষ হত। মাঝে মাঝে মিসেস দে যখন আসতেন তখন চাষীদের বৌরাও এসে যোগ দিত। ফলে হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি আমোদ বেশ হত।

এই ছিল চল্লিশের দশকে আমেরিকানরা যাকে বলত দে সাহেবের তৃণমূলের সঙ্গে সংযোগ। সমাজের আরেকটু উচ্চ স্তরে দে ও মিত্র সাহেবরা অবশ্য আরো সহজভাবে হৈ-হল্লা করতেন। স্থানীয় ক্লাবে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সুধীন্দ্রনাথ মৌলিক, সরকারি উকিল নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, প্রখ্যাত উকিল সতীজীবন চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় ক্লাবের ছিলেন উৎসাহী সভ্য। থিয়েটার করা বাঙালীর দুর্মর নেশা। দে সাহেবেরও ছিল। চিরকুমার সভা মঞ্চস্থ করা স্থির করলেন। দে ও মিত্র সাহেবের বাড়িতে পালা করে মহড়া চলত। এই ব্যাপারে আমার যেটুকু স্মৃতি আছে তা মুখ্যত খাওয়া-দাওয়ার আর চেঁচামেচি করে আড্ডা মারার। মঞ্চে আপন আপন অংশ কী করে ভাল হয় তার থেকে এই আড্ডাতেই উৎসাহ ছিল বেশী। মঞ্চে যা শেষ পর্যন্ত উঠল তাতে আহামরির কিছু ছিল না। তবে মহড়ার ফলে ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। সেই সঙ্গে শহরেরর অন্যান্য ভদ্রলোকদের বাড়িতে যাতায়াত বাড়ল।

এই ভাবে আনাগোনার ফলে কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে ঘুর্ণি পল্লীতে ভাস্কর সম্প্রদায় পালদের সঙ্গে ভাব হল। এঁরা বংশানুক্রমে মাটির ও প্লাস্টার অভ প্যারিসের মূর্তি গড়ার জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আমার কাছে আর এইচ উইলেনস্কির 'দি মিনিং অভ মডার্ন স্কাল্প্‌চার' বলে একটি বই ছিল। সেই বইয়ের দুটি ছবি দেখে একজন তরুণ ভাস্কর একটি হরিণ ও একটি দৌড়বাজের দুটি ভাস্কর্য আমাকে করে দেন। দৌড়বাজটি ছিল বিখ্যাত শিল্পী গোডিয়া বুর্জেস্কার ভাস্কর্যের ছবি। এত সুন্দর কপি আমি খুব কম দেখেছি। অনেকদিন পরে হঠাৎ বদলি হবার সময়ে রাস্তায় ঝাঁকানি লেগে ভেঙে গেল।

মিত্র সাহেবের স্থলে জ্ঞানাঙ্কুর দে বলে একজন প্রবীণ জজ অস্থায়ী হিসাবে এলেন। কিন্তু তিনি বেশীর ভাগ সময়ে কলকাতায় কাটাতেন। 'স্টেশনে'র সঙ্গে প্রায় কোন যোগাযোগ রাখতেন না। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে স্থায়ীভাবে এলেন শৈবালকুমার গুপ্ত, তাঁর স্ত্রী অশোকা, ছেলে পার্থ, কন্যা শকুন্তলা। 'স্টেশন' আবার জমে উঠল।

কানন দেবী

১৯৪১-এর জানুয়ারি পড়তে না পড়তে দে সাহেবের বাড়িতে একের পর এক অতিথি দলে দলে এলেন। প্রথমে এলেন মিসেস দে'র দিদি ও জামাইবাবু প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী। তাঁদের দ্বিতীয় কন্যা রঞ্জনা বছর দশেক পরে ডাকসাইটে সুন্দরী হিসাবে যে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন তার আন্দাজ পাওয়া গেল। তার পর এলেন মিসেস দে'র পিতা ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। অতি সুপুরুষ, একটু ভলটেয়ারি ভাব ও কথাবার্তা। যেমন আলাপচারি, আড্ডাবাজ তেমনি তীক্ষ্ণ মর্মভেদী মন্তব্য। সামান্য কথাও এমন মনোগ্রাহী করে বলতেন পেটে ব্যথা ধরে যেত। দুপুরে খাবার পর ঠিক দশ মিনিট তাঁর ঘুমনো চাইই চাই, তার মধ্যে আবার গোণা-গুণ্‌তি চারটি স্বপ্ন, তার কমও নয় বেশীও নয়। এককালে তিনি ছিলেন সুকুমার রায়ের মণ্ডা ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ফলে মণ্ডা ক্লাবে কী হত তার একটু আন্দাজ পেলুম।

তার পর এলেন আরেক মৈত্র এবং তাঁর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী, দেশবিশ্রুত কানন-বালা (সেই নামেই তখন তাঁর পরিচয় ছিল)। তার আগের মাসে তাঁদের বিবাহে সারা কলকাতা তোলপাড় হয়। গোঁড়া ব্রাহ্মনেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ছেলে অশোক মৈত্রের সঙ্গে তাঁর দিদি, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী শ্রীমতী রানীর মুখের খুব আদল ছিল। কিন্তু তাঁর দিদির তুলনায় অশোকের শরীরে স্থূল মাটির অংশ বেশী ছিল বলে তাড়াতাড়ি আলাপ জমে উঠল। কানন মৈত্র এক হিসাবে অপার্থিব বা পৃথিবীর ঊর্ধ্বে ছিলেন ; প্রত্যেককে তাঁর পায়ে হেঁট করানোর ক্ষমতা ছিল বলা যায়। তাঁকে যে প্রথমবার চাক্ষুষ দেখত আশ্চর্য হয়ে যেত তিনি আসলে কত তন্বী এবং বেঁটে ছিলেন দেখে। অথচ তাঁর দেহসৌষ্ঠব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত নিখুঁত সুসঙ্গত মাপের ছিল এবং তিনি নড়লে চড়লে তাঁর চারদিকে এমন স্নিগ্ধ আগুন-শিখার নড়াচড়া ভাব ছিল যে সিনেমার পর্দায় তাঁকে অনেক বেশী লম্বা দেখাত। তবে এহো বাহ্য। কৃষ্ণনগরে মুহূর্তে তিনি সকলের মন যেভাবে জয় করলেন তা তাঁর রূপ দিয়ে ততটা নয় যতটা তাঁর সহজ অমায়িক বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাবে ও ব্যবহারে, সকলকে আপনার করার ইচ্ছা ও মাধুর্যে। সর্বোপরি সকলে বিস্মিত হল তাঁর মার্জিত ও শিক্ষিত রুচি ও মনের পরিচয় পেয়ে। বাংলা চিত্রজগতে আজও রূপে, গুণে, বৈদগ্ধ্যে ও সঙ্গীতের গলায় তাঁর সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া শক্ত।

পুরো একটি অত্যন্ত মধুর ও স্মরণীয় সপ্তাহ কাটল তাঁর সান্নিধ্যে। প্রথম দুদিন কাটল কৃষ্ণনগরে, বাকি পাঁচদিন হিজলাবটে, শিলাইদহে ও কুষ্টিয়ায়। কানন-

দেবীকে দেখে আমাদের ফিল্ম জগতের তারকা সম্বন্ধে সাধারণ ভীতিপ্রদ ধারণা—সর্বজয়ী, দাম্ভিক, মাটিতে পা পড়ে না ভাব—মুহূর্তে ঘুচে গেল। আমার জীবনে আমি ওঁর মত সুপ্রতিষ্ঠিতা গায়িকা দেখিনি যিনি অনুরোধ মুখ থেকে খসাতে না খসাতেই গলা ছেড়ে অপূর্ব গান ধরতেন। প্রতিটি গানই সুচিত্রা মিত্রের শীর্ষের সময়ের মত নিখুঁত। অবশ্য কাননদেবীর বয়স তখন খুব হবে ত চব্বিশ বা পঁচিশ। 'তুফান মেল' আর 'আমি বনফুল' ছাড়া আর সব গানই রবীন্দ্রনাথের। দলবলে ছিলাম দে'রা দুজন, তার সঙ্গে আরো জনা চারেক, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, মুর্শিদাবাদ নবাবের ছেলে কাজেম আলি মির্জা, অরুণ মুখার্জি আর আমরা দুজনে। প্রথম গেলুম মৈত্রদের হিজলাবট গ্রামে।

যে দু'দিন আমরা হিজলাবটে ছিলুম কাননদেবী যেন নিজেকেও ছাড়িয়ে গেলেন। নিখুঁত কর্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁর স্বামীর বাড়িতে সকলকে যথাসম্ভব আরামে আপ্যায়িত করলেন, যেন তিনি সে বাড়িতে চিরকালই থাকেন। অথচ তিনি সেই বাড়িতে প্রথম পা দিলেন। গ্রামের ছোট বড় সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন তাঁর যত্নে, সেবায়, মিষ্ট ব্যবহারে। তাঁর আগেকার জীবনের পেশা সম্বন্ধ কোন বিরূপ ভাব মনে স্থান পেল না। প্রতিদিন স্বহস্তে একটা না একটা কিছু রাঁধতেন ও ছয় সাত ব্যঞ্জনে সকলকে পাত পেড়ে পরিবেশন করে খেতে দিতেন। উপরন্তু বাড়ির লোকজনকেও নিজের হাতে খাইয়ে তবে নিজে খেতেন। এইসবের মধ্যে আবার সামান্যতম অনুরোধে অপূর্ব গান গেয়ে সকলকে মোহিত করতেন।

শিলাইদহের সকলকিছু পবিত্র স্মৃতি আমার মনে চিরকাল গেঁথে থাকবে। এখানেই ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সবথেকে সার্থক ও মানবিক অভিজ্ঞতা ও বোধপূর্ণ জীবন কাটিয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি লিখেছিলেন। তাছাড়া তিনি চাষী, কৃষি-উন্নয়ন, কৃষির অনুশীলন ও সমবায়ের কাজ আরম্ভ করেন, যা তাঁর মত প্রতিভাবান স্রষ্টা, একমাত্র টলস্টয় ছাড়া, আগে বা পরে কখনও কেউ করেননি। স্মৃতিপটে থাকবে আমার সুদূর সাহাজাদপুরের গ্রামের ছবি, দূরে ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পদ্মার পাড়ে ঝাপসাভাব আঁকা। পদ্মার বুকে লঞ্চ করে আমরা ফিরছিলুম। দুরাশায় আমরা প্রায় পথ হারিয়েছিলুম, মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র কথা। আসলে আমরা তখন সারাঘাটের কাছাকাছি ইতস্তত ঘুরছিলুম।

কুষ্টিয়ায় অরুণ মুখার্জির বাড়িতে এসে সারাদিন ধরে আরেকপ্রস্থ আমোদ-আহ্লাদ, হৈ-হল্লা, খাওয়া-দাওয়া। অশোক মৈত্র ও কানন দেবী গভীর রাতের

এক ট্রেনে কলকাতা ফিরে গেলেন। সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঘুমোতে পেলাম না। অরুণের বড় বসার ঘরে শতরঞ্চি আর চাদর পেতে ছেলেরা একদিকে, মেয়েরা আরেকদিকে শুয়ে গল্প করলেন। ছেলেরা সব অসভ্য গল্প একের পর এক করে গেলেন, তার পুরোধা ছিলেন কাজেম আলি মির্জা। মেয়েরা মটকা মেরে সব গল্পগুলি উপভোগ করছিলেন। সেই প্রথম বুঝতে পারলুম, মেয়েরাও অসভ্য গল্প শুনতে বেশ ভালবাসেন।

১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারিতে মহকুমা ও সার্ক্‌ল ট্রেনিং-এর জন্য আমি কুষ্টিয়ায় গেলুম। প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল এস-ডি-ওর সঙ্গে, তাঁর বাড়ির নিজস্ব অফিসে (খাস কামরায়) অথবা কোর্টের দপ্তরে বসে, তিনি কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলেন, কী ধরনের কাজ কখন নিজের হাতে নেন, অথবা অন্য কোন কর্মচারিকে করতে বলেন, অর্থাৎ কোন্ কাজকে তিনি কতখানি গুরুত্ব কী কারণে দেন তাই শেখা ও লক্ষ্য করা। তাছাড়া, তাঁর সঙ্গে অথবা তাঁর নির্দেশে একাই, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি কীভাবে কোন্ কর্তব্য পালন করেন সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। এক কথায় চার সপ্তাহ ধরে তাঁর কাছে বা তাঁর এলাকায় শিক্ষানবিশী করা। চার সপ্তাহ তাঁর তত্ত্বাবধানে কাটিয়ে, আরো দু'সপ্তাহ থানা ও সার্ক্‌ল ট্রেনিং-এর জন্য কাটাতে হত কোন থানায় যেখানে সার্ক্‌ল অফিসও থাকত। সার্ক্‌ল অফিসারের এলাকা অনেক সময়ে একটি থানা হত, যদি তার আয়তন হত একশ' বর্গমাইলের কাছাকাছি। তার থেকে ছোট হলে একাধিক থানা নিয়ে সার্ক্‌ল হত। সার্ক্‌ল অফিসার হতেন তাঁর এলাকায় এস-ডি-ওর প্রতিনিধি। ট্রেনিং-এর সময়ে আমার থানার ও সার্ক্‌লের সব কাজ শেখার কথা।

সার্ক্‌ল্ অফিসারের কাজ ছিল মোটামুটি এস-ডি-ওকে যা কিছু করতে হয় সবই, তবে ছোট মাপের। কিন্তু থানা ট্রেনিংকালে পুলিশের বড়বাবুর কাজ শেখার ছিল এই একমাত্র সুযোগ। দুর্ঘটনা বা ফৌজদারি অপরাধের নালিশ হলে, কী কী ধাপে কেমন করে তদন্ত করতে হয়, কিভাবে কে অপরাধী তা নির্ণয় করতে হয়, কিভাবে আদালতে কেসের জন্যে মোকদ্দমা সাজাতে হয়, সাক্ষীসাবুদ জড়ো করে তাদের শিখিয়ে তৈরি করতে হয়। সবথেকে বড় কাজ, থানার কোথায় কী হচ্ছে, কার সঙ্গে কার কী সম্বন্ধ, নিজস্ব চর, চেনাশোনা, চৌকিদার, দফাদার

মারফৎ সব খবর রাখা, আইন শৃঙ্খলা ও সরকারের শাসন বজায় রাখা। চৌকিদার-দফাদারদের সেই হিসেবে ছিল দুই ধরনের মনিব। এক মনিব হতেন সার্ক্‌ল্‌ অফিসার। ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত কাজের জন্যে তাদের সকলকে সার্ক্‌ল্‌ অফিসারের কাছে জবাবদিহি করতে হত। অবশ্য তাদের মাথার উপরে থাকতেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যরা। দ্বিতীয় মনিব থানার দারোগা, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য চৌকিদার, দফাদারই ছিল তাঁর চর ও হাতিয়ার। সেই হিসাবে ইউনিয়ন বোর্ডেরও দুইজন উপরওলা ছিলেন : সার্ক্‌ল্‌ অফিসার ও থানার বড় বাবু।

গড়ে কুড়ি থেকে পঁচিশটি ছোটবড় গ্রাম নিয়ে হত একটি ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা। লোকসংখ্যা হত গড়ে দশ হাজার। সার্ক্‌ল্‌ অফিসারের প্রধান কাজ ছিল তাঁর এলাকার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির পরিদর্শন করা, তাদের ট্যাক্সের হারাহার ধার্য, আদায়, খরচের খাত, পরিমাণ ও পারস্পরিক অনুমান নির্ণয় করা, নিয়মিত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। উপরন্তু যে সব খাতে খরচা হত তার অনুপাতে হাতে-কলমে আসল পূর্ত কাজ, রাস্তা তৈরি, মেরামত, স্কুল, ডিস্‌পেন্‌সারি খোঁয়াড়, ফেরি, পুল ইত্যাদি কিভাবে রক্ষা ও বাড়ানো হচ্ছে, তার আদায় ও খরচের কাগজপত্র, তার সঙ্গে বছরে অন্তত একবার প্রতিটি কাজ খুঁটিয়ে পরিদর্শন করে তার গুণাগুণ বিচার করা ও ইউনিয়নবোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা। উপরন্তু ঐ এলাকায় যে সব খাতে সরকারি টাকা খরচ হত, যেমন স্কুল, ডিস্‌পেন্‌সারি, হাসপাতাল, রাস্তা, পুল সেগুলিরও পরিদর্শন করে সরকারি বিভাগের সঙ্গে যোগ রাখা।

ইউনিয়ন বোর্ডের তোলা ট্যাক্সের টাকায় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে চৌকিদার, দফাদারের মাইনে দেয়া হত। ট্যাক্সের দুটি বড় ভাগ ছিল। সবথেকে বেশী ট্যাক্স আসত করযোগ্য প্রতিটি বসত বাড়ি, সরকারি বাড়ি, গুদাম ও ঐ-ধরনের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি থেকে ; অবশ্য চাষের জমি বাদ। অন্য ভাগে যে ট্যাক্স আসত সেগুলি জন্তুজানোয়ারের খোঁয়াড়, পুল, খেয়া ইত্যাদি ব্যবস্থার নীলামের থেকে। সর্বোচ্চ গৃহট্যাক্স বাঁধা ছিল বছরে চুরাশি টাকা। সর্বনিম্ন ট্যাক্স ছিল বছরে ছয় আনা, এখনকার হিসাবে আটত্রিশ পয়সা। ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় সাধারণত শতকরা দশটি সবথেকে গরীব পরিবারের বাড়ির ট্যাক্স মকুব হত। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর যখন মফস্বলে সরকারি নির্দেশে চাল, নুন বিক্রির ব্যবস্থা হল তখন এই শতকরা দশটি বাড়ি সবথেকে কম দামে সবথেকে

পরিমাণে বেশী ধান চাল কিনতে পেত। যে সব বসত বাড়ির ট্যাক্স বেশী ধার্য হত তাদের বাঁধা সরকারি দামে রেশনের পরিমাণ সেই অনুপাতে কম হত। যেমন, যারা সর্বোচ্চ অর্থাৎ চুরাশি টাকা ট্যাক্স দিত, তারা অনেক সময়ে সরকারি দামে রেশন পেতেন না, তাঁদের সব কিছু খোলা বাজারে কিনে খেতে হত।

১৯৪১ সালে মহকুমা শহর কুষ্টিয়া মাঝারি আকারের অতি সুন্দর সাজানো শহর ছিল। শহরের পূর্বপ্রান্তে ছিল ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের ছোট্ট, ছিমছাম একটি স্টেশন। তখন উত্তর ও পূর্ব বাংলার প্রায় সবটাই ইস্টবেঙ্গল ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অধীনে ছিল। রেল স্টেশন ও এস-ডি-ওর বাড়ির মধ্যে ছিল উত্তর দক্ষিণ বরাবর প্রশস্ত খোলা জমি। এস-ডি-ওর বাড়ির পশ্চিমেও ছিল খেলার জমি, তার ওপারে উত্তর দক্ষিণ বরাবর প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তা শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। সবডিভিশনের অধিকাংশ সরকারি দপ্তর ছিল সার করে এস-ডি-ওর বাড়ির বাঁ দিকে, শহরের মেরুদণ্ডস্বরূপ রাস্তার ও রেললাইনের মাঝের জমিতে। এস-ডি-ওর পূর্বমুখী বাড়ির সমুখে খালি জমি, তারপরে রেলওয়ে স্টেশন। প্রধান রাস্তার দুধারে ছিল বড় বড় গাছ, উত্তর দিকে শহরের প্রায় প্রান্তভাগে ছিল প্রখ্যাত মোহিনী মিল, তার গুদাম, মজুরদের বাসের লাইন, দপ্তর ইত্যাদি। তখনকার দিনে সেটিই ছিল সারা বাংলার সবথেকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ সুতা তৈরি ও কাপড় বোনার কল ; মিহি ও উৎকৃষ্ট বুননের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ। তার সঙ্গে সুনাম ছিল মালিকশ্রমিকের সদ্ভাবপূর্ণ সম্পর্কের। শ্রমিকদের বাসস্থানের লাইনগুলিও ছিল ছিমছাম, খোলামেলা। ছিল তাদের নিজস্ব স্কুল, ডিস্পেন্সারি, প্রাথমিক শুশ্রূষাকেন্দ্র, ক্লাব বাড়ি, মাঠ ও অন্যান্য ব্যবস্থা। এস-ডি-ওর বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিমে, সড়কের পশ্চিমে, ছেলে ও মেয়েদের আলাদা স্কুল। এস-ডি-ওর বাড়ির দক্ষিণে ছিল ছেলেদের খেলার মাঠ।

এস-ডি-ওর বাড়ির পশ্চিমে বড় রাস্তার ওপারে একটি বড় পাড়া ছিল। থাকতেন উকিল মোক্তাররা, সরকারি কর্মচারিরা, মোহিনী মিলের পদস্থ কর্তৃপক্ষ, ডাক্তার ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। উকিলরা সাধারণত সম্পত্তিঘটিত এবং মোক্তাররা ফৌজদারি মামলা করতেন। এই পাড়াটি ছিল যাকে বলা যায় শহরের সম্ভ্রান্ত পাড়া। ব্যবসার কেন্দ্রগুলি ও অন্যান্য মামুলি পেশায় লিপ্ত বাঙালী ও ভিন্ন-দেশীয় পরিবাররা শহরের ইতস্তত ছড়িয়ে ছিলেন। মাড়োয়ারি পরিবাররা বসবাস শুরু করেন মুখ্যত পাইকারি অথবা মোহিনী মিলের নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল

সরবরাহের ভার নিয়ে। আমার সময়ে অন্যান্য পাইকারি দ্রব্যাদি ও বেশীমূল্যের শখের জিনিসপত্রের খুচরো ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রায় একচেটিয়া আধিপত্যের পথে।

আমাদের থাকার জন্যে এস-ডি-ও অরুণ মুখার্জি তাঁর বাংলার সমুখে হাতার জমিতে একটি বড় সুইস কটেজ তাঁবু ও পরিচারকদের জন্যে সংলগ্ন ছোট তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিল। বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে আভার সহ-পাঠিনী বাণীর সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়। অরুণের বোনের নাম বাণী ছিল বলে বিবাহের পর আভার বন্ধুর নাম হয় গীতা। অরুণ তখন অকৃতদার। আভা আসবে বলে অরুণ বাণীর বড় দিদিকে মাসখানেকের জন্যে কুষ্টিয়ায় এসে তার বাড়িতে থাকতে রাজি করায়। অর্থাৎ, আমরা যে এক মাস কুষ্টিয়ায় ছিলুম, তিনিও সে মাসটি অরুণের বাড়িতে কাটান। আমরাও তাঁকে বড়দি বলে ডাকতুম। যেমন স্বভাবে স্নেহ ও আত্মীয়তাময়ী, তেমনি দেহশ্রীতেও সুষমাময়ী ছিলেন। উপরন্তু ছিলেন রান্নাবান্নায় সুপটু। সকালবেলার ব্রেকফাস্ট বা জলখাবার হত পূর্ববঙ্গে যাকে বলত ফেনা-ভাত। সকালে ফেনা-ভাত খেলে সারাদিনের অর্ধেকের উপর সময়ে আর কিছু খাবার প্রয়োজন হতনা। ফেনা-ভাতে থাকত ফ্যান-না-ফেলা ভাত, তার সঙ্গে চালের সঙ্গে সেদ্ধ করা সেই সময়ের সহজপ্রাপ্য নানারকম তরকারি, আর যথেষ্ট পরিমাণে সেদ্ধ আস্ত আলু। বড়দির বিশেষত্ব ছিল সেই সব সেদ্ধ তরকারি আর আলু একসাথে অতীব সুস্বাদু করে ঠিকমত নুন, তেল, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাখার কাজে। অথচ সেই মাখার মধ্যেও প্রতিটি আনাজের নিজস্ব স্বাদ বজায় থাকত। সেগুলি ছাড়া মাখন, সেদ্ধ ডিম ও সেদ্ধ ডাল, (প্রায়ই ভাজা মুগের) : তাকে বলত ফেনা-ভাত। একসঙ্গে মেখে তিনি প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে একটি মণ্ড করতেন। ফেনা-ভাত আর মণ্ড যখন মুখে গ্রাস করে পোরা হত তখন স্বর্গীয় হত তার স্বাদ। পুষ্টিকর এবং পেটভরা খাদ্য হিসাবেও হত অপূর্ব।

দিন শুরু হত ব্রেকফাস্টের আসরে। খেতে লাগত পুরো দেড়টি ঘণ্টা। খাবার পর দুই মহিলা বসতেন পান সেজে খেতে এবং আরো আড্ডা দিতে। সে সময়ে আমি অরুণের সঙ্গে যেতুম তার অফিসে। তার পাশে বসে দেখতুম অরুণ কী কী করে, এবং যারা দেখা করতে আসতেন তাঁদের অভাব অভিযোগ বিষয়ে কী ব্যবস্থা করে। এই দ্বিতীয় কাজটি ছিল এস-ডি-ওর প্রধান কর্তব্য। এই ধরনের 'খাস মোলাকাতি', অর্থাৎ নিভৃতে মুখোমুখি বসে আলাপের মাধ্যমে এস-ডি-ও খবর রাখতেন মহকুমার কোথায় কী হচ্ছে, লোকে কী ভাবছে, সরকারের কাজ-

কর্ম কী চোখে দেখছে বা সমালোচনা করছে। উপরন্তু পেতেন একই বিষয়ে বা একই ঘটনা সম্বন্ধে একাধিক মত বা বিভিন্ন বিবরণ। তার কারণ, যখনই মহকুমার কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটত, তখনই সে বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি বা দল এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসতেন। এই উপায়ে একই ঘটনার একাধিক বিবরণ ও বিভিন্ন মত শুনে এস-ডি-ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী তাদের সঙ্গতি বা পরস্পরবিরোধী অসঙ্গতিগুলি ওজন করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতেন, সেইমত ব্যবস্থা নিতেন।

এইসব বিবরণ যখন এত বেশী পরস্পরবিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ হত যে আসল ব্যাপারটি কী হয়ে থাকতে পারে তার হদিশ পাওয়া শক্ত হত, তখন এস-ডি-ওর কর্তব্য হত পরের মুখে ঝাল না খেয়ে যতশীঘ্র সম্ভব নিজে সাইকেল বা ঘোড়ায় চেপে সরজমিনে সরাসরি হাজির হয়ে তদন্ত করে বিচার করা। মাঝপথে স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে আরো খবর পেতেন। যদি কোন গুরুতর ঘটনা বা গোলযোগ ঘটত বা তার সম্ভাবনা দেখা দিত, তখন এস-ডি-ও স্বয়ং ঘটনাস্থলে যত শীঘ্র হাজির হতেন, ততই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হত। ঘটনাস্থলে নিজের বিবেচনা মত সমাধান করে, তাঁর নেয়া ব্যবস্থার সমর্থনে, তার সঙ্গে বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য এবং সবকিছু তথ্য সবিস্তারে লিখে উপরওলাদের কাছে যত তাড়াতাড়ি পাঠানো যেত ততই সবদিক দিয়ে ভাল হত। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক নেতারা, বা স্থানীয় এম-এল-এ প্রভৃতিরা, ঘটনাস্থলে এসে জল ঘোলা করার আগেই এস-ডি-ও এসে তদন্ত শেষ করে তাঁর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ যদি সরকারকে জানাতেন তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি সহজে মিটে যাবার সম্ভাবনা থাকত বেশী। সরজমিনে আসতে যতই এস-ডি-ওর দেরি হত, ততই নানামুনির নানামত ও জটপাকানোর সম্ভাবনা বেশী হত। যত শীঘ্র সম্ভব ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ব্যবস্থা নিলে সরকারের চোখে আপনার সিদ্ধান্তের দাম, তার সঙ্গে আপনার দায়িত্বশীলতা ও অকাট্যতা, বাড়ত। এমন কি পরে যদি প্রমাণও হত যে অত তাড়াতাড়ির ফলে কিছু-কিছু গৌণ ব্যাপার আপনার গোচরে আসেনি তাতেও জনসাধারণ বা সরকারের চোখে আপনার বিচারের মূল্য বিশেষ কমত না। জনসাধারণের ও সরকারের আপনার প্রতি আস্থার অনেকখানি নির্ভর করত, কত তাড়াতাড়ি তাদের চোখ কাণ ও স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে, অন্য কোন স্বার্থজড়িত ব্যক্তি বা দল এসে সমস্যাটি আরো পাকিয়ে তোলার আগেই, আপনি ঘটনাটির নিষ্পত্তি করেছেন। এমন কি পরে যদি প্রকাশ পেত যে আপনি প্রায়

কাজীর বিচার করেছেন, তাও শ্রেয় হত। কারণ জনসাধারণ চায় সরকারের প্রতিনিধির মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ ও চারিত্রিক নেতৃত্বের পরিচয়। পরিণত বিচার নিশ্চয় কাম্য, কিন্তু বৃথা কালক্ষয় না করে দ্রুত বিচার ও সিদ্ধান্ত ততোধিক কাম্য।

অরুণ আড্ডা ভালবাসত। কথা বলতেও তার বিশেষ ভাল লাগত। অবসর বিনোদনের অন্য ব্যবস্থা কুষ্টিয়ায় বিশেষ তো ছিল না। ক্লাব, টেনিস বা বিলিয়ার্ডস্ ছিল না, অতএব শহরের পদস্থ ভদ্রলোকরা প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা এস-ডি-ওর বাড়ি এসে গল্পগুজব করে যেতেন। আগামী মে মাসে বিভাগীয় পরীক্ষার জন্যে, সকালে বই নিয়ে আমি ঘণ্টাখানেক পড়তে বসতুম। কিন্তু অরুণের সেটা যথেষ্ট মনে হত না। অরুণ বলত যদি ফেল করি তাহলে আভার নামে বদনাম হবে, সে আমাকে বখিয়েছে। ফলে অরুণের আদেশ হল প্রতি সন্ধ্যায় তাঁবুতে একা বসে আমাকে অন্তত আরো এক ঘণ্টা পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হবে। মাঝে মধ্যে এক আধ দিন সে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে, আমাকে আড্ডায় যোগ দিতে অনুমতি দিত।

অরুণ ছিল ন্যায়শাস্ত্রে দুর্ধর্ষ তার্কিক। চুলচেরা তর্কে ও বিচারে কখনও ক্লান্তি দেখিনি। ত্রিশের দশকে সেণ্ট টমাস একোয়াইনাসের রচনার খুব চর্চা হয়েছিল। অক্সফোর্ড থেকে আমি তাঁর উপরে যতগুলি জাক মারিতাঁর লেখা বই এনেছিলুম, অরুণ সেগুলি দখল করে। আমার থেকে এবিষয়ে অধিকার অবশ্য তার অনেক বেশী ছিল, সুতরাং আমি আপত্তি করতে পারিনি। শ্রোতা হিসাবে আমার তার আলোচনা খুবই ভাল লাগত। ন্যায়শাস্ত্রে তার সঙ্গে টেক্কা দেবার মত লোক ছিলেন প্রভাত চ্যাটার্জি বলে এক উকিল ভদ্রলোক। আর সকলে একমনে তাঁদের দুজনের তর্ক শুনত। অতিথিদের মধ্যে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক প্রায়ই থাকতেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরের শ্রোতার মত অরুণের বক্তব্যে উঁচু গলায় বাহবা দিয়ে ওঠাই ছিল তাঁর কাজ। একদিন সন্ধ্যাবেলা কি এক তর্ক উঠল যার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকল না। তর্ক শেষে চ্যাটার্জি মশায় ও অন্যসকলে যখন বিদায় নিচ্ছেন, তখন মাড়োয়ারি ভদ্রলোক সোল্লাসে আমাকে নিভৃতে বলার ভান করে—অথচ চ্যাটার্জি এবং অরুণ দুজনেই যাতে শুনতে পায়—বললেন: 'মিত্রসাহেব, আমি এই বাড়িতে কত বছর ধরে নিয়মিত আসছি, কত কত দেশী বিলেতী আই-সি-এস অফিসারের সঙ্গে এতকাল ইণ্টারকোর্স করেছি তার ঠিক নেই। তা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে তর্ক করতে কোনদিন সাহস পাইনি। আর এই সেদিনের ছোকরা, সে কিনা তেল ঢেলে চৌকাঠ পিছলা করে ভিতরে ঘুসতে চায়।'

আলাপ আলোচনার ইংরেজি হিসাবে তাঁর ইংরেজি শব্দটির ব্যবহার ছিল নিশ্চয় অনবদ্য, অন্তত আমি যেটুকু ইংরেজি জানি। সেইসঙ্গে অন্য অর্থেও ভেবে দেখুন কত ব্যঞ্জনাময়।

বেশ শীতের মৌসুমে যদি আপনি কোনদিন সুইস কটেজ তাঁবুতে রাত না কাটিয়ে থাকেন, আপনার বিশ্বাস হবে না কী আরামই লাগতে পারে! তাঁবুর মাটিতে যে পুরু সতরঞ্চি থাকে তার তলায় সারা তাঁবুময় বেশ পুরু একপ্রস্থ খড় পাতা হয়। তার কৃপায় তাঁবুতে স্যাঁতসেঁতে ভাব একেবারে থাকে না। মাথার উপর ছাত হিসাবে থাকে দু'প্রস্থ পুরু ক্যানভাসের আচ্ছাদন। সেই দুইপ্রস্থ পালের মধ্যে যে হাওয়া আটকে থাকে, সেটি মোটা কম্বলে-ঢাকা ছাতের কাজ করে। এই ধরনের তাঁবুর মধ্যে নেয়ারের খাটিয়ায় লেপ বা কম্বলের তলায় বিছানায় শুয়ে নিরিবিলি কাজ বা পড়াশোনা করতে কী আরাম, সে যার ভাগ্যে ঘটেছে তিনিই জানেন। কাজ বা পড়ার থেকে অনেক বেশী আরামের হচ্ছে পড়ার ভান করে লেপের তলায় সোজা হয়ে শুয়ে, বালিশটি মুড়ে উঁচু করে মাথার নিচে দিয়ে, বই খুলে বুকের উপর সোজা করে দাঁড় করিয়ে রেখে, পড়ার নামে ঘুমনো। একটু অভ্যাস করলেই দেখবেন, আপনি অঘোরে ঘুমলেও আপনার হাত থেকে বইটি খসে পড়বে না, সোজা হয়ে থাকবে। লোকে ভাববে আপনি পড়ছেন। বিশেষত আপনার চোখের উপরের পাতাদুটি যদি আমার মত মঙ্গোলীয়দের ধরনে পুরু আর ভারী হয়। ঘুমের মধ্যে কেউ যদি ডাকে, উত্তরে সাড়া দেয়া আয়ত্ত করাও বিশেষ শক্ত নয়। এ ধরনের হাল্‌কা ঘুম ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সব জীবই আয়ত্ত করতে পারে, আপনিও পারবেন; একটু শুধু অনুশীলনের প্রয়োজন। আমার এই ধরনের ঘুমনোর ক্ষমতা আবিষ্কার করতে, বিয়ের পর আভার একমাসের বেশী সময় লেগেছিল, তার আগে আভা ভাবত আমি এত গভীর মনোযোগে পড়ছি যে অন্য কিছু কানে যাচ্ছে না। ফলে ১৯৪১ এর ফেব্রুয়ারিতে যখন নিচে লেখা ঘটনাটি ঘটে, তখন আভাকে আর ঠিক ঠকানো সম্ভব হত না।

খুব শীতের এক সন্ধ্যায় একা তাঁবুতে কম্বলের তলায় পড়ার নাম করে চোখ বুজে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে শুয়ে আছি। পাতাখোলা পরীক্ষার পড়ার বই বুকের উপর সোজা দাঁড় করানো রয়েছে। ইতিমধ্যে অরুণের বাড়িতে রাত্রের খাবার দিয়েছে। বিব্রত হয়ে আভা এসে আমাকে আধঘণ্টা ধরে ঠেলাঠেলি করছে, আমি কিছুতে উঠছি না। হঠাৎ অত-ধাক্কাধাক্কিতে খাপ্পা হয়ে উঠে ঘুমন্ত অবস্থায় আমি আভার সঙ্গে পাল্টা ধাক্কাধাক্কি শুরু করলুম। খেয়াল নেই কতখানি

চেঁচামেচি বা ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছি ; তাঁবুর বাইরে যে পাহারাদার ছিল সে ভেবেছে তাঁবুর ভিতর নিশ্চয় শেয়াল ঢুকেছে, আমরা দুজনে তাকে তাড়া করছি। অরুণ দূর থেকে সোরগোল শুনতে পেয়েছে। তাঁবুর বাইরে কয়েকজন চীৎকার করে ভিতরে ঢুকতে চাইল। সমূহ বিপদ আশঙ্কা করে অনুমতির অপেক্ষা না করে অরুণ ঢুকল, হাতে বিরাট মোটা লাঠি। পিছু পিছু তিনজন ষণ্ডাগণ্ডা প্রহরী। তাঁবুতে ঢুকতে না ঢুকতেই সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। সে কী হাসির হুল্লোড়! রাগ পড়ে আমার হাসিতে যোগ দিতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল।

১৯৪১ সালের আদমসুমারী

দশবছর অন্তর ভারতের লোকগণনার কাজ ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারির শেষে শুরু হল। এই জনগণনায় হিন্দু-মুসলমানদের যে পারস্পরিক সংখ্যা নির্ণয় হয় তারই উপর ভিত্তি করে ছ'বছর পরে ভৌগোলিক সীমারেখা ধরে দেশভাগ হয়। প্রাথমিক ভাগের পর ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে চূড়ান্ত বাঁটোয়ারা হয়। অরুণ আমাকে কুষ্টিয়ার দুটি থানার জনগণনা কাজ পরিদর্শনের ভার দেয়। ১৯৪১ সালের সেন্সাস কমিশনার এম-ডব্লিউ-ডব্লিউ-এম ইয়েট্স্ প্রতিটি মাথাপিছু একটি করে গণনার স্লিপের প্রবর্তন করেন। তাঁর আগের সব সেন্সাসে খানাওয়ারি অর্থাৎ প্রতি পরিবার পিছু একটি করে গণনার কাগজ ব্যবহার হত। মাথাপিছু স্লিপের প্রবর্তক ছিলেন পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দিকপাল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সংখ্যা-তত্ত্ব অনুসারে তিনি স্লিপ নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল সংখ্যাবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে ঠিকমত নমুনা স্লিপ টানতে পারলে, অনেক কম খরচে সারা ভারতের লোকসংখ্যা সঠিক নির্ধারণ করা যাবে। দুঃখের বিষয়, যে সংখ্যাবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে নমুনা স্লিপ টানা উচিত ছিল, ১৯৪১ সালের সেন্সাসের পর সে রীতি অনুযায়ী নমুনা টানা হয়নি, ফলে অন্তিম ফলাফল আশানুরূপ হয়নি।

অন্যপক্ষে আমার বিশ্বাস ১৯৪১ সালে মাথাপিছু একটি করে স্লিপ প্রবর্তনের ফলে এক নিদারুণ অনর্থের সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত জনগণনার ভিত্তি ছিল প্রতি পরিবারের জন্যে একটি পারিবারিক ফর্ম। পারিবারিক ফর্মের ফলে একটিমাত্র ফর্মে সারা পরিবারের কর্তা থেকে শুরু করে বাড়ির কনিষ্ঠতম শিশুর হিসাবে একাদিক্রমে পাওয়া যেত নাম, ধাম, পরস্পরের সম্বন্ধ, লিঙ্গ, বয়স,

সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উপার্জনের সংজ্ঞা ইত্যাদি। ফলে পরিদর্শকের পক্ষে খানাওয়ারি পরচার সঙ্গে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বৃত্তান্ত মিলিয়ে নেয়া সহজ হত ; গণকের পক্ষে যখন খুশি ফালতু নাম ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব হত না। ইচ্ছামত যে কোন বাড়ির লোকসংখ্যা কমানো বা বাড়ানো যেত না।

১৯৪০ সালে যেদিন থেকে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয় সেদিন থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যের ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তি করে মুসলিম লীগ দেশভাগের প্রস্তাবের স্বপক্ষে উঠে পড়ে লাগে। কুষ্টিয়ার মত অঞ্চলগুলি হিন্দুমুসলমান সংখ্যানুপাতের বিতর্কস্থল। কোথায় বিশেষ এক সম্প্রদায় সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু হবে তাই নিয়ে ছিল সংশয়। ১৯৩১ সালের গণনায় হিন্দু ও মুসলমান হারাহারিতে এই অঞ্চল ছিল শতকরা পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুতরাং ১৯৪১ সালের লোকগণনায় সম্প্রদায়বিশেষের শতকরা হার কিভাবে কমানো বাড়ানো যায়, সেই হয়ে উঠল বড় রকমের রাজনৈতিক প্রশ্ন।

কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল মোট সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের আরাধ্য পার্টি সুতরাং তার পক্ষে গণনায় কারচুপিতে আশ্রয় নেবার প্রশ্নই ওঠেনা। অন্যদিকে কংগ্রেসের তুলনায় গৌণ সংগঠন হিসাবে হিন্দুমহাসভার প্রতিপত্তি বিশেষ কিছু ছিলনা বলেই হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের সংখ্যাস্ফীতির সমর্থনে পরোক্ষ আন্দোলন শুরু করল। অন্যপক্ষে যেহেতু দেশ ভাগের উপরই মুসলিম লীগ সর্বস্ব পণ করে, সেহেতু জনগণনায় মুসলিম সংখ্যাস্ফীতির স্বপক্ষে প্রকাশ্যে না হলেও পরোক্ষে পুরোদমে উদ্যোগী হয়।

আগেই বলেছি মাথাপিছু স্লিপের কৃপায় গণনাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত হয়ে পড়ে ; খানাওয়ারি পরচায় পারবারের প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ যে রকম সহজে যাচাই করা সম্ভব হত, ব্যক্তিগত স্লিপে তা সম্ভব হত না। বিশেষ অসুবিধা হত পরিবারে যারা পর্দানশীন বলে দাবি করতেন। উপরন্তু কোন পরিদর্শক বা গণকের পক্ষে কোন পর্দানশীন ব্যক্তিকে স্বচক্ষে দেখতে চাইবার অধিকার ছিলনা, বিশেষত পরিবারের কর্তা বা অন্য কেউ পর্দার অজুহাতে যদি আপত্তি জানাতেন। ফলে মুসলিম পরিবারে মহিলাদের সংখ্যা মিথ্যা করে বাড়ানো খুবই সহজ হত।

এই সব কারণে পরিদর্শক হিসাবে কুষ্টিয়া মহকুমার যে দুটি থানা আমার অধীনে ছিল সেখানে জনগণনার যথার্থতার সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ ছিল। অথচ

প্রতিকারের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ১৯৪১ সেন্সাসের সময়ে তিনজন বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ—শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রবোধ গোবিন্দ চৌধুরী ও যতীন্দ্রমোহন দত্ত—১৯৫১ ও ১৯৩১ সালের গণনার অনুপাতে ১৯৪১ এর গণনার স্ফীতির পরিমাণ নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁদের হিসাবের ধারা এবং স্ফীতির নির্ণীত পরিমাণ আমার ১৯৫১ সালের ১বি ও ১সি খণ্ডে প্রকাশ করি। আমি যখন পরপর ১৯৭৪ ও ৭৫ সালে ঢাকায় যাই তখন বাংলাদেশের সেন্সাস কমিশনারের কাছে জেনে সুখী হই, যে ১৯৪১ সালে বর্তমান বাংলাদেশে লোক গণনার স্ফীতি নির্ণয়ে তাঁরাও ঐ রীতি প্রয়োগ করে ফল পেয়েছেন। ১৯৪১ সালে পরিদর্শক হিসাবে কাজ করার ফলে সেন্সাস সম্বন্ধে আমাব উৎসাহ হয়; যখন ১৯৪৯-৫০ সালে আমাকে সেন্সাসে পাঠাবার প্রস্তাব হয় তখন আমি সে প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করি।

ভেড়ামারায় থানা ট্রেনিং

ভেড়ামারায় থানা ও সার্ক্‌ল্‌ ট্রেনিং এর সময়ে বাংলার গ্রামে জীবনযাত্রা, কাজ ও অবসর, এই তিনের দৈনন্দিন বুনুনি, তার সঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন আর্থিক মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় স্তরের মধ্যে আদানপ্রদানের কী ধরনের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে সব কিছু ঘনিষ্ঠভাবে নিজের চোখে দেখা ও জানার সুযোগ হল। সেই সঙ্গে ধারণা হল বর্ণাশ্রমের জাত আর মার্ক্সীয় দর্শনের আর্থিক শ্রেণী ও মার্ক্স-বর্ণিত সারপ্লাস ভ্যালু বা শোষণের ওতপ্রোত সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ এমন কি প্রায় অবিচ্ছেদ্য। ধারণা হল, পশ্চিমী সমাজজাত, এমন কি তাদের পূর্বযুগের ফিউডাল সমাজজাত শ্রেণীদের মধ্যে দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনযাত্রার বৈষম্যের ফলে, যে দূরত্ব, বিরোধ ও বৈরীভাব গড়ে উঠে বৈপ্লবিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা ও অবশ্যম্ভাবিতার চেতনা সম্ভব হত, আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমপ্রসূত জাতগুলির অন্যোন্যনির্ভরতা ও আবহমান কাল ধরে গেঁথে-যাওয়া হীনম্মন্যতার ফলে সে চেতনা স্পষ্টভাবে গড়ে ওঠা দুষ্কর। আরো দেখলুম, অধিকাংশ সি-পি-আই কর্মী যেহেতু উঁচু বা মাঝারি জাত থেকে আসেন সেহেতু তাঁদের অধিকাংশই সামাজিক আর্থিক সমতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শুধু অচেতন নয়, অন্তরে অন্তরে বিরোধী থাকেন। তাঁরা বড় জোর অনুকম্পা ও দয়া পর্যন্ত যান, কিন্তু সমতা, নৈব নৈব চ। ভেরিয়ার এলউইনের মত ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি-উঁচু-ডিগ্রীওলা,

উচ্চমধ্য শ্রেণীজাত লোকের পক্ষে মধ্যপ্রদেশের আদিম জাতির নিরক্ষর মহিলাকে বিবাহ করে বিবাহজাত সন্তানদের আপন বলে মানুষ করা কী ভাবে সম্ভব হয় তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু আমি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উঁচু-বা মাঝারি জাতের কোন হিন্দুকে, শুধু বাংলা কেন, ভারতের কোথাও কোন আদিম জাতির বা নিতান্ত নিচুজাত, যেমন ডোম, বাগদী, ধাঙড় মহিলার সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করতে দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার বরাবরই মনে হয়েছে এই ধরনের বিবাহ ও জীবনযাত্রা যে-কোন ভারতীয় সাম্যবাদী কর্মীর জীবনে একটি নীতিগত ও মানবিক পরীক্ষা। এরই ফলে সমস্ত একাত্মবোধ আসা সম্ভব।

সে যাই হোক। ভেড়ামারাতেই আমি প্রথম মাঝারি ও নিচু স্তরের সরকারি কর্মচারিদের নানা স্তরের সংসারে—গেজেটেড, ননগেজেটেড, কেরানি, পিয়ন, মায় চৌকিদার, দফাদার পর্যন্ত—কত আয়, কত ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ, আর্থিক অবস্থার উন্নতির বিষয়ে আগ্রহ বা অনাগ্রহ, সন্তান পালন বিষয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান আহরণ করলুম। আরো বুঝলুম, আমি যদি যথোচিত বিনয় ও সত্যিকারের আগ্রহ ও বোঝবার ইচ্ছা হাবেভাবে ব্যবহারে দেখাই, তাহলে হীনতম বাড়িতে বা সংসারেও আমার প্রবেশ অবাধই হবে। একথা যে শুধু বাংলায় প্রযোজ্য তা নয়, ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য। যেটি অবশ্য একান্ত প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যার বাড়িতে ঢুকছেন তাঁকে আপনি হাবেভাবে কথার সুরে ও প্রয়োগে নিজের সমকক্ষ মানুষ মনে করছেন, জন্তু বা চিড়িয়া বলে মনে করছেন না—সেটি বুঝিয়ে দেয়া। এই সত্যটি যদি গৃহস্বামী বা কর্ত্রী বুঝতে পারে, তবে গলগল করে আপনাকে সবই বলবে, সবই দেখাবে। আপনার পোশাক, শিক্ষিত বা বিদেশী চেহারা, ভিন্ন চালচলন কিছুই কোন বাধার সৃষ্টি করবে না।

তখনকার দিন অবশ্য মাগ্‌গি ভাতা বলে কিছু ছিল না। ছিল শুধু কয়েক বছর অন্তর—অনেক সময়ে এমন কি পাঁচ বছর অন্তর—সামান্য কিছু মাহিনা বৃদ্ধি। গেজেটেড অফিসারদের মধ্যে সবথেকে কম মাইনে পেতেন সম্ভবত সাবরেজিস্ট্রার শ্রেণী, যাঁদের কাজ ছিল যাবতীয় দলিল সরকারি দপ্তরে নথিভুক্ত করা। তাঁদের চাকরি শুরু হত মাসে ষাট টাকা মাইনেয়; ষোল বছর কাজের পর সেটি পৌঁছত একশ' পঁয়তাল্লিশ টাকার মাথা ঝিমঝিম করা চূড়ায়। ননগেজেটেড পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টরদের মাইনে কততে শুরু হত, আর কী হারে বাড়ত, ঠিক মনে নেই।

কাজের দায়িত্ব বেশী থাকলেও, গেজেটেড অফিসার নয় বলে মাইনে শুরু হত আরো নিচুতে। লোয়ার ডিভিশন কেরানির মাইনে শুরু হত মাসে পঁয়ত্রিশ টাকায়, পিয়নের এগারো টাকায়, গ্রামের চৌকিদারদের ছয় টাকায়। বাড়িতে আমরা, খাওয়া পরা সারা দিনরাত-থাকা ভৃত্যকে মাইনে দিতুম পনেরো টাকা, দেশী বিলেতী রাঁধিয়ে বাবুর্চিকে পঁচিশ টাকা। এই অঙ্কগুলিকে ত্রিশ দিয়ে গুণ করলে আজকের দিনের মাইনের হারের সমতুল্য হবে। তবে সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ১৯৪১ সালের তুলনায় টাকার দাম অন্তত কুড়ি গুণ কমেছে। স্থতরাং তখনকার দিনের তুলনায় সরকার যে মাইনে খুব কম দিতেন তা নয়। সদাগরী অফিসের থেকে সরকারি অফিসে মাইনে কম হলেও লোকের সরকারি কাজের কাজের প্রতি উৎসাহ মুখ্যত তিনটি জিনিসের লোভে। একটি চাকরি পাকা, কেউ খেতে পারবে না। দুই, অবসরের পর পেন্শন। পেন্শনের অন্তর্নিহিত দর্শন ছিল, কার্যকালে যে মাইনে আপনার পাওয়া উচিত, তার থেকে প্রতি মাসে সরকার কিছু কিছু করে কেটে রেখে, অবসরের পর মাসে মাসে ফেরত দিত। আপনি যত বছর চাকরি করবেন, অবসরের পর নিশ্চয় তত বছর বাঁচবেন না। স্থতরাং যে কয় বছর কম বাঁচলেন সেই কয় বছরের আগে-থেকে-কেটে-রাখা মাইনে সরকারকে আর দিতে হল না। সেটা হল সরকারের লাভ। অনেকে যে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে বলেন, যা মাইনে পাচ্ছি যথেষ্ট পাচ্ছি, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু সরকার তাঁদের কাছ থেকে যে কাজ আদায়ের আশায় মাইনে দিচ্ছেন তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে অধিকাংশ লোকই সরকারের কাছ থেকে সেটি আদায় করে নেয় কাজে ফাঁকি দিয়ে। তৃতীয়, সরকারি অফিসের সর্বস্তরে কর্তৃত্বের দাপট। অধস্তন কর্মচারিদের উপর কর্তৃত্ব ত বটেই, জনসাধারণের প্রতি দুর্ব্যবহার ও হয়রানিতে ফেলার মনোভাব। সদাগরী অফিসের থেকে মাইনে যা কম পাওয়া যায়, এই ত্রিবিধ "উপরি"র গুণে, সরকারি চাকরিতে তার অনেকগুণ ফিরে পাওয়া যায় আত্মগরিমার তৃপ্তিতে। আগের দিনে সরকারি জীবনে আরেকটি চতুর্থ তৃপ্তি ছিল, আজকাল কতখানি আছে বলতে পারি না, সেটি জনসেবার তৃপ্তি।

পাঞ্জাবে ব্যুরো অভ ইকনমিক রিসার্চ বলে একটি সংস্থা ছিল। সেই ব্যুরোর সংগৃহীত পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে ম্যালকম ডার্লিং প্রমুখরা তাঁদের মূল্যবান বইগুলি লেখেন। পাঞ্জাবে তাঁরা যেভাবে নানাস্তরের পরিবারের আয়ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করেন, বাংলায় তা সম্ভব হয়নি। এই প্রদেশে সে

সময়ে কোন খাতে কত আয়ব্যয় সঞ্চয় বা ঋণ হত তার সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি সরকারি কর্মচারিদের পরিবারে সমসাময়িক আয়ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণের হিসাব আমরা একমাত্র পাই এ-এ চ্যাপমানের ১৯৩৫ সালের রিপোর্টে। সে রিপোর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সেক্রেটারিয়েটের দপ্তরে কেরানিদের উপযুক্ত মাইনের হার কী হতে পারে তা নির্ধারণ করা। তাঁরই সুপারিশে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসের আপার ডিভিশন কেরানিদের শুরুর মাইনে ধার্য হল আশি টাকা, লোয়ার ডিভিশন কেরানিদের মাইনে পঁয়ত্রিশ টাকা। সেই মাইনেয় তখন স্বামী স্ত্রী ও পুত্রকন্যার ভরণপোষণ, বাসগৃহ, সন্তানদের লেখা-পড়া, যানবাহন, অবসরবিনোদনের আমোদপ্রমোদ, সামাজিক দায়িত্ব, বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন মিটবে এই আশা করা হত।

আধ শতাব্দীর দূরত্বে অতীত সম্বন্ধে মোহ নিশ্চয় বাড়ে, সব স্মৃতিতে গোলাপী ছোপ পড়ে। লেখার সময়ে সচেতন থাকার চেষ্টা করলেও এ মোহ থেকে নিস্তার নেই, জানি। তা সত্বেও আমার বিশ্বাস তখন সাধারণ সংসারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা ছিল বেশী। বাহুল্যের প্রশ্ন থাকার কথা নয়। তবে মিতব্যয়িতার সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষাও হত। পরিশ্রমশীলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা ছিল অনেক বেশী। তদুপরি ছিল শিক্ষা, ভদ্রতা, ভব্যতা ও শিষ্টাচার। দুঃস্থ অবস্থার কর্মচারি, শিক্ষক, অধ্যাপকদের সকল স্তরে ছিল আত্মসম্মানবোধ, প্রলোভন সংবরণ ও সদালাপে আসক্তি। অস্বীকার করবনা যে তারই সাথে কয়েক স্তরে প্রথাসিদ্ধভাবে, যাকে বলে বকশিস বা পানখাবার পয়সা বলে কিছু নজর দেবার রেয়াজ ছিল। এখনকার দিনে হোটেলে রেস্তরাঁয় খাবার পর বেয়ারাকে টিপ বা বকশিস দেবার মত। আজকালের মত দম দিয়ে ঘুষ আদায় করা নয়। রাজনৈতিক নেতাদের, মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের মধ্যে ঘুষের অভিযোগ আজকাল যেমন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, তার নামগন্ধ ছিল বলে মনে নেই। আগে কারোর বাড়িতে কোন মন্ত্রী এসেছেন শুনলে সম্ভ্রম হত। অনেক মন্ত্রী আছেন, যাঁদের অল্পবয়সে সততা, তত্ত্ব-জ্ঞান, নির্ভীকতা ও পার্টির প্রতি আনুগত্যের জন্য আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, এবং যাঁরা বাড়িতে এলে আমি কৃতার্থবোধ করতুম। কিন্তু আজ তাদের কেউ কেউ যদি কারোর বাড়ির চৌকাঠে ছায়া ফেলেছেন শুনি মনটা যেমন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে, তেমনটি, অন্তত কলকাতায় কয়েক বছর আগে পর্যন্ত, আমার কখনও হয়নি। ১৯৪৩ সালে মন্ত্রী সুরাবর্দীর নামে লোকে দুর্নাম দিত, তিনি নাকি তাঁর সম্প্রদায়ের অনেককে সরবরাহ ব্যবসায়ে নামিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ এ অভিযোগ

করেনি যে তিনি নিজের পকেট ভারি করেছেন। নিজের পকেট ভারি করা ঘৃণার বিষয় ছিল, আজকালকার মত শ্রদ্ধা বা বাহবার বিষয় ছিল না। ১৯৪৬ সালে আই-সি-এস এস-কে ঘোষের ড্যালহৌসি স্কোয়ারে ষ্টিভ্‌ন্‌ হাউস কেনার সংবাদ সারা দেশে ভূমিকম্পের মত ভীতির সঞ্চার করে। ১৯৫৫ সালে আমি কয়েক-মাসের জন্যে দুর্নীতিদমন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি ছিলুম। তখনও গেজেটেড কর্মচারিদের মধ্যে চুরি বা উৎকোচের অভিযোগ হাতে গোনা যেত, বলা যায়।

কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারায় কাজ করার সময়ে আমি বুঝলুম গ্রামাঞ্চলের কাঁচা বা পায়ে চলা রাস্তার পক্ষে বাইসিকেলের মত নির্ভরযোগ্য যানের জুড়ি মেলা ভার। প্রথমে স্থানীয় টাট্টু ঘোড়ার শখ হয়—ঘোড়ায় চড়ে সাহেব যাচ্ছেন ভাবতেই ভাল লাগত। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলুম ও বস্তুটি আমার জন্য নয়। পরীক্ষায় ভাল করে ঘোড়ায়-চড়া পাশ করা, আর দৈনন্দিন জীবনে ভাল করে ঘোড়ায় চড়া দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। যে-কোন ঘোড়াই হোক, কোনদিনই ঘোড়ার পিঠে আমাকে একবস্তা আলুর থেকে ভাল কিছু দেখাত না, সেটা আমার বেশ জ্ঞান ছিল। ছেলেবেলায় মনে আছে বাবা যখন ঘোড়া চড়তেন মনে হত তিনি আর ঘোড়া যেন একাত্ম, অভিন্নদেহ। গ্রামে টাট্টু ঘোড়া নিয়ে আরেক বিপদ ছিল, আগে জানতুম না। তারা কখন যে হেলতে দুলতে চলা ছেড়ে, আচমকা পড়ি মরি করে ছুটতে শুরু করবে, আগে থেকে বলা যায় না। মেঠো রাস্তায় অনেক চোরা খানাখন্দ থাকত, তাতে পা পড়ে গিয়ে টাট্টু ঘোড়া মুহূর্তে ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করত। একদিন একটি টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটি জলার মাঝবরাবর সরু বাঁধের উপর দিয়ে জলাটি পার হচ্ছি। সরু বাঁধটার দু'ধার তীরের মত খোঁচা খোঁচা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাঁধা। জলে নিজের ছায়া দেখে, গর্বে টাট্টুটির বুক হঠাৎ বোধহয় দশ হাত ফুলে গেল; নেপোলিয়নের ঘোড়ার মত বিজয়দর্পে হ্রেষারব করে টাট্টুটি সহসা লাগালো প্রচণ্ড ছুট। ফলে, আমি আচমকা ঝাঁকানি খেয়ে পড়ে গেলুম। ভাগ্য ভাল যে বাঁশের শূল বিদ্ধ হইনি। সেদিনই ঠিক করলুম আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।

ভেড়ামারায় কাজ করার সময়ে বুঝতে পারলুম আমার মত সামাজিক অবস্থার বা সরকারি পদের লোকের পক্ষে সাধারণ নিচুজাতের লোক বা দিনমজুরের সঙ্গে কোন সভায় শুধু মন খুলে নয়, আদৌ কথাবার্তা কইতে পারা কত শক্ত। জন কোম্পানির আমল থেকে গ্রামীণ বাংলা, এমন কি সারা ভারতে (ভারতের সম্বন্ধেও কথাটি খাটে এ সত্য আবিষ্কার করলুম ১৯৬১ সালের ভারতের সেন্সাস

করার সময়ে কয়েক বছর অনবরত সারা ভারত ঘুরে) একটি অনমনীয় নীতির প্রবর্তন হয়, যার আজ পর্যন্তও কোন নড়চড় হয়নি। এই নীতি লঙ্ঘন করা প্রায় অসাধ্য ছিল, করলে লোকে হয় বলত পাগল, না হয় পাদ্রী।

পদস্থ সরকারি কর্মচারি এসেছেন। গ্রামের অবস্থা বলার ও বোঝাবার জন্যে তাঁকে নিয়ে গ্রামে মিটিং হবে। গাছের সার দেয়া মাঠে চেয়ার সতরঞ্চি সাজিয়ে মিটিং বসবে। চেয়ারের সারির মাঝখানে আপনি মাননীয় অফিসার চেয়ারে বসেছেন। আপনার সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে দু'পাশে গণ্যমান্য স্থানীয় ব্যক্তিরা বসেছেন যেমন স্থানীয় এম-এল-এ, স্থানীয় অফিসার, জমিদার, ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট, ডাক্তার প্রভৃতি। আপনার চেয়ারের সারির সমুখে বেশ কিছুটা জমি ছেড়ে মুখোমুখি আরও কয়েকসারি চেয়ার, অথবা সতরঞ্চি। সেখানে গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকরা বসে। সকলেরই পরণে গ্রামের ধোপার কাচা ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি। স্থানীয় পুকুরে কেচে কেচে একটু মেটে রং হয়ে গেছে, ইস্ত্রিও অত নিখুঁত নয়। তারও পরে, প্রায় হাত দশেক জমি ছেড়ে, ঘাসের উপর ঘন সারিতে অর্ধচন্দ্রাকারে উবু হয়ে বসা গ্রামের সাধারণ গরীব, দুঃস্থ, নিচু জাতের চাষী বা কারিগর শ্রেণীর লোক ও দিন মজুর।

যদি আপনি কিছু জিজ্ঞেস করতেন বা জানতে চাইতেন, তাহলে উত্তর দেবার অধিকার ছিল আপনার সমুখে চেয়ারে বা সতরঞ্চিতে বসা ভদ্রলোকদের। তাঁরা সাধারণত বসেন বুকের কাছে বা কোলের উপর দু'হাত আড়াআড়ি করে মুড়ে। আপনার পাশে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের কাজ শুনে যাওয়া, সভাতে তাঁরা বড় জোর বিজ্ঞের মত একটু মুখভঙ্গি বা মুচকি হেসে বসে থাকতেন। সভাভঙ্গের পর হয়ত নিভৃতে আপনাকে দু'একটি কথা নিজের মত করে বলবেন। যদি আপনি কখনও সম্মুখে বসা ভদ্রলোকদের ডিঙিয়ে গলা তুলে অর্ধচন্দ্রাকারে বসা তথাকথিত ছোটলোকদের উদ্দেশে কোন প্রশ্ন করতেন, তাহলে মাঝখানে বসা ভদ্রলোকরা তাঁদের কর্তব্য করতেন। পিছনে কেউ উত্তর দেবার আগেই তাঁদের একজন আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতেন : ওরা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবে না সার, ওদের হয়ে আমি বলছি, ওরা ঠিক কী বলতে চায়। তার পরেই তিনি এবং তাঁর আশেপাশের ভদ্রলোকরা নিজেদের মত করে উত্তর দেবেন, তারপর কথা আর যাতে না বাড়ে তার স্বরে পিছন ফিরে তাকিয়ে বলবেন, কেমন ঠিক বলেছি না ? পিছনে কোন দ্বিরুক্তি নেই, কিন্তু তাদের মুখে স্পষ্ট প্রমাদ বা হতাশার ছাপ পড়ত। এরকম পোশাকি সভায় আপনি তাদের মুখ থেকে তাদের কথাটি গ্রামের

ভদ্রলোকদের সম্মুখে কিছুতেই বার করতে পারতেন না। বর্তমান অবস্থায় আপনি একই পরিস্থিতি পাবেন, কেবল আগেকার ভদ্রলোকদের স্থলে পাবেন আধুনিক 'ক্যাডার'।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে একশ' বছর আগে আমার পূর্বসূরী কী করতেন ঠিক বলতে পারি না। হয়ত লালমুখ সাহেবরা এক ধমক দিলে ভদ্রলোকরা গুটিগুটি চলে যেতেন, 'ছোটলোকদের' 'পাগলা' সাহেবের কাছে ফেলে রেখে। কিন্তু কালো সাহেবরা তো অত সহজে ভদ্রলোকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। সে অবস্থায় তাঁর কিংকর্তব্যম্? যে-সব ভদ্রলোক তাঁর জ্ঞানার্জনের পথে বাধার সৃষ্টি করছেন, তাঁদের তিনি এড়াবেন কী ভাবে? ভেড়ামারা থানার বড়বাবু, সাব-ইন্স্পেক্টর প্রমথবাবুর একটি দোনলা বন্দুক ছিল। ১৯৩১ সালে বর্ধমানে বাবা আমাকে তাঁর বন্দুক দিয়ে কী করে বসা পাখি শিকার করতে হয় শিখিয়ে ছিলেন। কিন্তু স্থাণু প্রাণীকে গুলি করে মারা শিকারীর পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ। অতএব প্রমথবাবু আমাকে নিয়ে যখন ফৌজদারি মামলার তদন্তে যেতেন তখন তাঁকে ধরলুম, কী করে উড়ন্ত পাখি মারতে হয় আমাকে শিখিয়ে দিতে। হাতে বন্দুক নিয়ে পাখি শিকারে ঘোরা কিছুটা গল্‌ফ খেলার কাজ করে। মাঠের পর চষা মাঠ পার হবার ক্লান্তি কিছুটা ঘোচে আপনি যদি পাখির খোঁজে ঘোরেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামের যিনি প্রধান ব্যক্তি তাঁর অনুসন্ধিৎসা এড়ানো দায়: লোকটা সত্যিই শিকারের জন্যে ঘুরছে না আরো কিছু মতলব আছে? যে সব ভদ্রলোক ছোটলোকদের আজীবন নানা-প্রকারে বঞ্চিত করে এসেছেন, তাঁদের মন সর্বদা চোরের মত, অর্থাৎ বোঁচকার দিকে! তাঁদের এড়াবেন কী করে?

একদিন বেশ সকালে ব্রেকফাস্টের পর থানার বড়বাবু আর আমি তাঁর বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সাড়ে ন'টা নাগাদ একটি বড় গ্রামে প্রমথবাবু একটি কেসের তদন্তে আটকা পড়লেন। গ্রামের প্রধানও ভাগ্যক্রমে কেসটির তদন্তে তাঁর সঙ্গে থেকে গেলেন। ঐ ধরনের কেসে কী করে তদন্ত করতে হয় প্রমথবাবুর কাছে আগে শিখেছি। প্রমথবাবু বন্দুক দিয়ে আমাকে শিকারে পাঠিয়ে বললেন একটার মধ্যে ফিরে আসতে। একা একা ঘুরলে আমি যে নিজের বিবেককে ঠকিয়ে গাছে বসে-থাকা পাখিকে মারতুম না তা নয়। তবে এদিনটি সকালে বেশ ঠাণ্ডা ছিল, আমারও সৎ হবার প্রবৃত্তি হল।

মাইল দেড়েক ধানকাটা মাঠ ভেঙে একটি ছোট গ্রামের মুখে এলুম। এত গরীব গ্রাম আগে কখনও দেখিনি, কারণ প্রমথবাবুর সঙ্গে এযাবৎ যত গ্রামে গেছি

সবই ভদ্রলোকের গ্রাম। গ্রামের মুখে পুরুষ যে ক'জন ঘুরছিল, খাকি প্যাণ্টপরা বন্দুক হাতে একজন লোককে গ্রামে ঢুকতে দেখে দারোগা ভেবে ঘাবড়ে গেল। কী কথা বলে শুরু করি ভেবে না পেয়ে ফস করে মুখে এল (কথাটাও ছিল সত্যি); আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিন। ইতিমধ্যে মুখচোখ আর কথার ধরনে তারা আশ্বস্ত হয়েছে আমি দারোগা নই। আমার উত্তরে সব থেকে বয়স্ক দেখতে লোকটি বলে উঠল, 'হুজুর এ গ্রামে আমরা যে সবাই ধাঙ্গড়!' চোখে মুখে তাদের ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। মনে বোধ হয় আশা ছিল তার কথা শুনে আমি চলে যাব। হঠাৎ আমার মনে হল, পাছে আমার জাত যায় এবং আমার জাত নষ্ট করে সে মহাপাতক হয়, সেই ভয়ে লোকটি একথা বলল। মনে মনে বললুম, এই তবে সুযোগ। তার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার সুরে বললুম, 'তাতে কি হয়েছে, আপনারা কি আমাকে কিছু খেতে দেবেন না?'

লোকটির জিভ কাটা আর খুশিতে ভরা আকর্ণ হাসি যদি দেখতেন! মাটিতে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে বল্ল: 'সে কি সাহেব! আমরা ভেবেছিলুম আপনি হয়ত জানেন না।' ইতিমধ্যে কয়েকটি জোয়ান ছেলে গ্রামের ভিতর ছুটে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুটি-তিনটি বয়স্কা মহিলা মুখের উপর মলিন ছেঁড়া কাপড়ের ঘোম্‌টা টেনে এসে, মাটির সরায় দিলেন মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা, আখের গুড়। কাঁসার গেলাসে খাবার জল। মাটির ছোট কলসে হাত পা ধোবার জল। তার পরের দেড় দু'ঘণ্টা যে কীভাবে তাদের মনের কথা শোনায় কেটে গেল কী বলব, যদিও যে কষ্টের কাহিনী ও বিনা চিকিৎসায় ছোট ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর কথা শুনলুম, তাতে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সেই আমার সত্যিকারের গরীব আর নিচু-জাতের জীবনের সঙ্গে প্রথম এবং একক পরিচয়, মানুষ যেভাবে মানুষের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা প্রাণখুলে বলে।

সেদিন আমি নেহাত আচমকা অচেনা গ্রামে অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করার যে-সব ফন্দি শিখলুম, উত্তরজীবনে সারাভারতে যেখানে গেছি সেখানে সে-গুলি প্রয়োগ করে কোনদিন নিরাশ হইনি। প্রথমটি হচ্ছে, যদি অচেনা গ্রামে ঢুকে অভ্যর্থনা আদায় করতে হয়, বিশেষত নিচুজাতের গরীব গ্রাম যদি হয়, তাহলে প্রথমেই বলতে হবে আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দেবেন। এই কথাটিতে গ্রামের লোক এত খুশি হবে, যে তারা যদি ডাকাতও হয় তাহলে ডাকাতি করতেও ভুলে যাবে। বাগ্‌দী, হাড়ি, ডোম, সাঁওতাল গ্রাম তো বটেই, চম্বল উপত্যকার ভয়ানক ডাকাতের গ্রামেও আমি এর ব্যতিক্রম পাইনি। দ্বিতীয় ফন্দি হচ্ছে, যদি

আপনার অভিসন্ধি কী জানার জন্যে পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামের কেষ্টবিষ্টুরা আপনার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়বে না-বলে আপনার সন্দেহ হয়—যে সন্দেহ ভারতের প্রায় সর্বত্রই হবে—তা হলে পাখি মারার ছুতোয় হাতে বন্দুক নিয়ে আসবেন, এবং মাঠে মাঠে চষা জমির আল ভেঙে চলবেন। ধোপদুরস্ত ভদ্রলোকেরা আপনার সঙ্গে বড় জোর প্রথম দেড় দু'মাইল যাবে, সঙ্গ ছাড়বে না। তারপর চষা মাঠ ভেঙে অতখানি হাঁটার অনভ্যাসে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ তাদের বাড়িতে ফেলে-আসা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাবে, আপনার কাছে মাপ চেয়ে ফিরে যাবে। তখন আপনি নিজের ইচ্ছামত যে-কোনো গ্রামে গিয়ে যার সঙ্গে খুশি আলাপ করতে পারবেন। অবশ্য তাই যদি আপনার অভীষ্ট হয়। কারণ, আপনি যদিই বা তাদের কথা বলাতে পারেন, আপনার সঙ্গে ধোপদুরস্ত কাছের গ্রামের চেনা ভদ্রলোক দেখলে সেই যে মুখে তালা এঁটে বসে, আপনাকে অতিরিক্ত ভক্তি সম্ভ্রম দেখাবে, তার থেকে আপনার নিস্তার থাকবে না। পাশের গ্রামের বর্ধিষ্ণু গণ্যমান্য লোকদের তারা যমের মত ভয় পায়, বিশেষত যদি তারা উঁচু জাতের হয়। এই অবস্থা আমি বছর চার পাঁচ আগে পর্যন্ত বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুরে দেখেছি। ইদানিং আর যাইনি। তখন দেখেছি জমিদারদের সম্বন্ধে ভয় চলে গিয়ে এসেছে হালফ্যাশনের জীন্‌স্ পরা হোণ্ডা মোটর-সাইকেল চালানো হঠাৎ-ফেঁপে-ওঠা ক্যাডারদের সম্বন্ধে। তৃতীয় একটি জিনিস আমি ১৯৪১ সালেও লক্ষ করেছি, সেটি হচ্ছে, দীনতম বাড়িতেও আপনি যদি প্যাণ্টশার্ট বা জুতোমোজা পরে যেতেন তাহলে শুধু পোশাক দেখে ঘাবড়ে যাবে এরকম সম্ভাবনা আমি কিছু দেখিনি। দূরত্বের সৃষ্টি করে আপনার পোশাক নয়, করে আপনার তুই তোকারি সম্বোধন আর গলায় মুরুব্বিয়ানার স্বর, যাকে আমি বলি মোটর হর্ন গলা, যার সংকেত হচ্ছে 'তফাত যাও'।

ভেড়ামারার ডাকবাংলায় আমাদের অংশে সন্ধ্যাবেলাকাল বেশ আমোদে আর আড্ডায় কাটত। নিয়মিত আসতেন প্রমথবাবু, স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার, সার্ক্‌ল্ অফিসার, পোস্টমাস্টার, সাবরেজিস্ট্রার, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, স্যানিটারি ইনস্পেকটর—সকলের নাম মনে নেই। খাতাখানিও হারিয়ে গেছে। ভেড়ামারায় থাকার সময়ে আমার মনে হয়েছিল নিকটবর্তী শিলাইদহে গল্পগুচ্ছ রচনার যুগে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর গল্পগুলির মালমশলা বোধহয় এই ভাবেই আহরণ করতেন। এই এক পক্ষকাল ভেড়ামারা থাকাকালে আমি জানলুম সরকারি সংস্থার অপেক্ষা-নিম্নস্তরেও তখনকার দিনে কতখানি শিক্ষা, ভব্যতাপূর্ণ শিষ্টাচার, জ্ঞান,

বোধ ও চিন্তাশীলতা ছিল। সে জায়গায় ১৯৮৬ সালের ঘোরাফেরায় দেখলুম সদালাপের থেকে টাকাপয়সার স্থূলতর আকর্ষণই যেন অগ্রগতি পেয়েছে।

আভা কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের বাবুর্চিকে নিয়ে গেছল। জাতে সে ছিল ডোম, কিন্তু কৃষ্ণনগরের মিশনারিদের কল্যাণে সে কিছুদিন কলকাতার ফারপোয় মশাল্‌চির কাজের সঙ্গে বাবুর্চির কাজও ভাল শিখেছিল। প্রথম প্রথম তার উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধা হত, যেমন উস্টার সস্‌কে বলত আঁইস্টার শাঁস। অ্যাঙ্কোভিকে বলত আঙ্কুবি। নদীয়ার আবগারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী ভেড়ামারায় একদিন পরিদর্শনসূত্রে এসে হাজির। কবি সুভাষ মুখার্জির বাবার বন্ধু হিসাবে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। আভা তাঁকে খেতে বলল। পদ্মার কাছে বলে ভেড়ামারায় খুব ভাল মাছ পাওয়া যেত। গ্রামের মুরগি খোলা উঠানে চরে বেড়াত, এখনকার মত দাঁড়ে পোষা নয় বলে খেতে খুব সুস্বাদু হত। খাবার টেবিলে বসে স্বভাবমত আমি একমনে খেয়ে যাচ্ছি, খেয়াল নেই যে বিকালের রান্না শেষ হবার পর, সিদ্ধেশ্বরবাবু এসে পৌঁছন, সুতরাং আমাদের জন্যে রান্নার থেকেই তাঁর ভাগ বার করতে হবে। আমার এখনও বিশ্বাস আমি এমন কিছু বেশি কোন কালেই খাই না, অথচ পেটুক বলে বদনাম বরাবরই আছে। সেদিন মুরগিটা বেশ রান্না হয়েছিল বলে গল্প করতে করতে একের পর এক টুকরো খেয়েই যাচ্ছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর জন্যে যথেষ্ট আছে কিনা খেয়াল নেই। সিদ্ধেশ্বরবাবুও, বলতে নেই, বেশ খাইয়ে লোক ছিলেন। এদিকে আভা খাওয়া থামিয়ে হাত গুটিয়ে বসে পাতের টুকিটাকি খাবার ভান করছে আর টেবিলের তলায় পা দিয়ে ঘন ঘন আমাকে খোঁচা মারছে। আমি ভাবছি আভা আমার গল্পের তারিফ করছে, অথচ, বিয়ের আগে যাই হোক, বিবাহোত্তর জীবনে স্ত্রীরা যে স্বামীদের কথোপকথনের দ্যুতির তারিফ করে না, সে সত্যটাও আমার মত গর্দভের মাথায় ততদিনে ঢোকেনি। শেষকালে আভা মরিয়া হয়ে বলল, আর মাংস খেয়ো না, তোমার অসুখ করে জানো তো! ইতিমধ্যে মাংসের জামবাটির তলায় সামান্য একটা টুকরো টিমটিম করছে। বলা অনাবশ্যক, ঐটিই আমার পেটুকপনার শেষ কুকীর্তি নয়। কুষ্টিয়া থেকে কৃষ্ণনগরে ফিরে আভা মার্চের শেষে কলকাতায় গেল, যাতে আমি একমনে বিভাগীয় পরীক্ষার পড়া করতে পারি। ইতিমধ্যে অরুণের কৃপায় কুষ্টিয়ার তাঁবুতে শেয়াল ঢোকার গল্প নানা অলঙ্কারমণ্ডিত হয়ে মিসেস দে ও মিসেস সেনের কানে গেছে। আভাকে তাঁরা আশ্বাস দিলেন অশোক যাতে সন্ধ্যাবেলা শুধুই না ঘুমোয় তার উপর চোখ রাখবেন।

নতুন জজ সাহেব মিঃ গুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী ব্যায়ামে বিশ্বাস করতেন। দুজনেই ছিলেন সুদর্শন, ব্যায়ামের ফলে শক্তি ও স্বাস্থ্যবান। গুপ্তসাহেবকে লোক বলত জাতীয়তাবাদী আই-সি-এস। অফিসের সময় ছাড়া, সর্বদা খাদির ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। স্ত্রী অশোকাদিও খাদি পরতেন। জজিয়তি কাজ মিঃ গুপ্ত মিত্র সাহেবের থেকে দ্বিগুণ ক্ষিপ্রবেগে করতেন। ঠিক পাঁচটার সময়ে কলম নামিয়ে কোট ত্যাগ করতেন। জজ হিসাবে নামও ছিল। ঠিক সওয়া পাঁচটায় স্বামী স্ত্রী দুজনেই টেনিস-কোর্টে হাজির হতেন, নন্তবাবুর সঙ্গে একসেট করে সিংগ্‌ল্‌স্‌ খেলতেন। তার ঠিক পরেই দুজনে নানাধরনের ছুটোছুটি করে একটির পর একটি খেলা খেলতেন। আর কিছু না হল তো স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিতেন। এইভাবে প্রায় সাতটা পর্যন্ত কী খেলি, কী খেলি করে বাড়ি গিয়ে ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে গুপ্তসাহেব তাঁর বাড়ির পড়ার ঘরে ছেলে পার্থ ও মেয়ে শকুন্তলাকে পড়াতে বসতেন। অশোকাদি যখন লোককে খেতে বলতেন, খাবার টেবিল দেখে তারিফ না করে উপায় ছিল না। খাবারের প্রতিটি পদ সযত্নে বাছা, ততোধিক সযত্নে রাঁধা। চিনেমাটির থালা প্লেট, রুপোর কাঁটা চামচ, কাঁচের গ্লাস সব কিছু ঝকঝক করছে। যে খানসামা খাবার দেখাত, তার পরনে ধোপদুরস্ত উর্দি, বুকে পালিশ করা গুপ্তসাহেবের মনোগ্রামকরা পিতলের ব্যাজ। কোমরে কোমরবন্ধ। দে ও মিত্র সাহেবদের তুলনায় গুপ্ত সাহেবদের ব্যবহারে আত্মীয়তাভাব সামান্য একটু কম থাকত, কিন্তু স্নেহ ও সহৃদয়তা কিছু কম ছিল না।

দে সাহেব রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা মঞ্চস্থ করার পর শহরের অধিবাসীরা তাঁর কাছে আরো প্রত্যাশা করলেন। ফলে দে সাহেব নিজে একটি লম্বা নাটক লিখে মঞ্চস্থ করা ঠিক করলেন। নাম হল, পঙ্কের নকশা। নাটকের বিষয় হল জেলার শহরের সামাজিক জীবন। মধ্যমণি অবশ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁকে কেন্দ্র করে শহরের জীবন চলত। নাটকটি মুখ্যত হাস্যকৌতুক, কিন্তু নাটকের মহড়ায় কিছু কমতি পড়ল না। প্রতি রিহার্সালে আগের নাটকের মত খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা, হৈ হল্লা। জুনের তৃতীয় 'সপ্তাহে এল দে' সাহেবদের বদলির পালা। আবার চলল একের পর এক বিদায়ভোজের পার্টি। শুধু কৃষ্ণনগরে নয়, রাণাঘাটে, কুষ্টিয়ায়, মেহেরপুরে। তাতেই বোঝা গেল দে সাহেবের পরিবারকে সকলে কত ভালবাসতেন। সুশীল দে'র স্থলে ওঁর থেকে দুবছরের জুনিয়র এক আই-সি-এস এলেন, নাম এফ-এ করিম। ছিলেন অবাঙালী, অত্যন্ত ভদ্রস্বভাব হলেও দে সাহেবের মত জনপ্রিয়তা বা মিশুকস্বভাব তাঁর ছিল না।

জার্মানি : অধ্যাপক সত্যেন বসু

দে সাহেবের বিদায় আর করিম সাহেবের আগমনের ফাঁকে সারা বিশ্ব ওলটপালট করে দেবার মত এক আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটল। ২২শে জুন ১৯৪১ সালে নিতান্ত আচমকা নাৎসী জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়ার উপর বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ শুরু করল। নাৎসী আক্রমণ যখন শুরু হল তখন দে সাহেব চলে গেছেন। রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে দে সাহেবের সঙ্গে আমি মোটামুটি একমত পোষণ করতুম। আমার মনে হত দশ বছর আই-সি-এসএ থাকা সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক মূল্যবোধ মোটামুটি ঠিকই আছে।

বেশীদিন জেলার কর্তৃত্বপদে থাকলে বুদ্ধিশুদ্ধি একটু ভোঁতা হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। মগজে একটু গ্রাম্যভাব ঢোকে। বিভাগীয় পরীক্ষার পর শিক্ষানবিশীর চাপ পড়ায় ঘন ঘন কলকাতায় যাওয়া হয় না, তাছাড়া দুজনে একসঙ্গে গেলে খরচ বাড়ে। সুতরাং কলকাতার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপের সুযোগ নেই। এদিকে গোঁফবাবুর পাত্তা নেই। অকস্মাৎ আক্রমণে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ধ্যানধারণা কিছুকালের জন্য বিপর্যস্ত হল, পার্টির মূল পর্যন্ত ওলটপালট হবার দাখিল, উপরন্তু পার্টি তখনও বে-আইনি। জজ শৈবাল গুপ্ত, কালেক্টর এফ-এ করিমের সঙ্গে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্যে মনে কোন উৎসাহ পেলুম না। শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এ বিষয়ে উদ্বেগ কমই দেখলুম। তাদের কাছে এই বিশ্বসংকট বোধহয় অন্য জগতের সমস্যা বলে মনে হত। এই রকম সময়ে কলকাতা থেকে দূরে কোন জেলায় থাকলে হঠাৎ এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা মানুষকে অভিভূত করে, একই দুশ্চিন্তার ভাগীদার হিসাবে কথা বলার লোক পাওয়া শক্ত হয়। তখন মনে হয় নিজের দেশ সম্বন্ধে জানার মূল্য এবং উপার্জনের মাশুল বড় বেশী দিতে হচ্ছে, তার থেকে কলকাতায় থাকলে ভাল হত। অথচ একাধারে অর্থোপার্জন, অন্যধারে নিজের দেশ জানা কত প্রয়োজন ও উত্তেজনার বস্তু তা তো কুষ্টিয়ায়, বিশেষত ভেড়ামারার গ্রামে গ্রামে দেখেছি। সার্ভিসে থেকে, অথচ কিছুটা তার বাইরে, অর্থাৎ সচেতনভাবে তার সবকিছু মূল্যবোধ গ্রহণে অস্বীকার করলে, আপনি এক হিসাবে অন্তেবাসী বা নিঃসঙ্গ হতে বাধ্য, অংশ হয়েও তার অংশ নয়, থেকেও নেই। কলকাতাতেও ছাত্রাবস্থার বন্ধুবান্ধবের সংসর্গেও প্রায় একই অবস্থা, তাদের কাছেও আমি কিছুটা জাতে তফাত, সজ্ঞানে তারা সে তফাত মনে না রাখার চেষ্টা করলেও। ফলে তাঁদের কাছেও সময়ে সময়ে আমার মনে হত এবং এখনও হয় আমি যেন ভিতরের লোক নই, বাইরের লোক।

কিছুটা বাইরের লোক বলে গর্বও হত, কারণ তখন, এবং এখনও পশ্চিমবঙ্গের ও ভারতের শহর ও গ্রাম জীবনের বিষয়ে আমি যতটা জানি, যতটা মনে মনে বিষাদ, ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ .এখনও হয়, গজদন্তমিনারবাসী কলকাতার লোকেদের, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে, ততখানি নিশ্চয় হয় না। তাছাড়া আমাদের মধ্যবিত্তদের একদিকে সমবেদনা ও বোধশক্তিও যত বেশী, অন্যদিকে ভাবের ঘরে চুরি করে, গোটামাছ গিলে-খেয়ে নির্লিপ্ত, অপাপবিদ্ধ বিড়ালতপস্বী সেজে বসে থাকার ক্ষমতাও কিছু কম নয়। এই সব কারণে এক ধরনের উপকণ্ঠবাসী বোধের ভারে কষ্ট পেতে হয়। এই সত্যটি মেনে নিতে কষ্ট হত, এখনও হয়, কারণ আমি সত্যিই সর্বদা সবকিছুর সঙ্গে জড়িত হতে আগ্রহী ও চেষ্টিত ছিলুম। এর ফলে যে ত্রিশঙ্কু-ভাব আসে তার থেকে নিস্তার পাওয়া শক্ত।

এপ্রিল থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত গেল পরীক্ষার পড়া তৈরি, পরীক্ষা দেয়া ও প্রথামত ফৌজদারি ও দায়রা মামলার নথির প্রতিটি অংশের আইনের ব্যাখ্যা তৈরি করতে। হিন্দুস্থানী মৌখিক পরীক্ষার সময়ে এক সংকটাবস্থা গেল। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের যে সভ্যটি পরীক্ষক মণ্ডলীর সভাপতিত্ব করছিলেন, তাঁকে সাহায্য করার জন্য আরো দুজন উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর মধ্যে একজন ছিলেন খাকি পোশাক পরা, কিন্তু কাঁধে পদবাচক কিছু ছিল না। ফলে মনে হয়েছিল সাধারণ কনস্টেব্‌ল্। তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানী উর্দুর তরফে। আরেকজন উপদেষ্টা ছিলেন, মাথায় প্রকাণ্ড টিকি, দেখে মনে হল ব্রাহ্মণ, তিনি ছিলেন পরীক্ষার সংস্কৃতের তরফে। আমার ধারণা হল দ্বিতীয় উপদেষ্টার কাজ হল হিন্দির বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে লিঙ্গ ও বচন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করা। দু'একমিনিট কথার পরে আমার ধারণা হল কনস্টেব্‌ল্‌টি আমার ভুলত্রুটি উপেক্ষা করার জন্যে যত ইচ্ছুক, পণ্ডিতটি আমার প্রতিটি ভুল ধরে হ্রেষারব করতে তার থেকে বেশী বদ্ধপরিকর। ফলে আমার উত্তরে বিরক্ত হয়ে পণ্ডিত যতই সজোরে টিকি দুলিয়ে মাথা নাড়েন, ততই আমি কাতর মুখে কনস্টেব্‌লের দিকে তাকাই আর তিনি মাঝে মাঝে আশ্বাস দিয়ে পণ্ডিতজিকে বলেন, 'ঠিক আছে, ওঁর হিন্দী বলার টান খুব ভাল, ঠিক আছে।' মৌখিক পরীক্ষা যখন শেষ হল তখন ভয়-হল শুধুমাত্র হিন্দী কথা বলার টানে পণ্ডিতমশায়ের চিঁড়ে ভিজল না, গাড্ডু খেতে হবে। শেষ পর্যন্ত কনস্টেব্‌লের কৃপায় মনে হয় সব ঠিক হল, পাশ করলুম। কনস্টেব্‌ল্‌টি কে খোঁজ করায় যখন শুনলুম তিনি কলকাতা

পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, খোন্দকার ফজলে সোভান, আই-পি, তখন আই-পিদের সম্বন্ধে প্রভূত শ্রদ্ধা হল। অগাস্ট মাসে সরকারের আদেশ বার হল: পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়েছে সেদিন থেকে আমার মাইনে একশ' টাকা করে বেড়েছে। যে-মাসগুলি গত হয়েছে তার বাবদে বৃদ্ধির টাকা পেয়ে বিলেত যাবার আগে ছবি কেনা বাবদ এবং বিলেতে থাকার সময়ে ছোড়দির কাছে যে ঋণ হয়েছিল সে সব শোধ করা হল।

এই সময়ে আমরা আমাদের বিবাহ উপলক্ষ্যে সবথেকে মূল্যবান উপহার পেলুম। সেটি এল যামিনী রায়ের কাছ থেকে। কাঠের উপর তেলরঙে আঁকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনচতুর্থাংশ ফেরানো মুখ। শম্ভু সাহার একটি ফোটোগ্রাফকে ভিত্তি করে আঁকা। চোখদুটি সুদূরে নিবদ্ধ, মুখের ভাব গভীর চিন্তা ও বেদনায় ভরা। মন্দিরের চূড়ার মত উঁচু গোল কপালে এক অদ্ভুত সিঁদুরে রঙের প্রলেপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কার প্রতীক হিসাবে জ্বলজ্বল করছে।

জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলল একটানা ট্রেজারি ট্রেনিং ও অন্যান্য বিভাগের কাজ শেখা। এরই মধ্যে আমি দুটি জায়গায় ঘুরে এলুম। প্রথমটি বহরমপুর শহরে রেশমগুটির চাষ ও উন্নতির পরিকল্পনাগুলি দেখতে। সেখানে ছিল একটি রেশমশিল্প উন্নয়ন গবেষণাক্ষেত্র। দ্বিতীয় সফর হয় ঢাকায়, সেখানে এক সপ্তাহ কাটাই ঢাকার কেন্দ্রীয় কৃষিফার্মে। মুর্শিদাবাদে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হয়নি, তবে তসর ও রেশমগুটির চাষ ও সুতা তৈরির আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানতে পারলুম। এর সুবাদে আমি পরের নভেম্বরে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে যাই, সেখানে রেশমের তাঁতশিল্পের বিষয়ে শিখতে।

ঢাকার সফর দুটি কারণে আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয়। এক, ইংরেজিতে ক্র্যাঙ্ক বা খেয়ালী যাকে বলে, সেরকম একটি ব্যক্তি দেখলুম। তিনি ফার্মের ডিরেক্টর, নাম মিঃ কারবেরি। দুই, আমি পুরো এক সপ্তাহ পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রমনার বাড়িতে তাঁর পরিবারে অতিথি হয়ে কাটালুম। বিষ্ণুবাবু তাঁকে আগে থাকতে আমার যাবার কথা লিখেছিলেন। সত্যেনবাবু তার উত্তরে আমাকে তাঁর কাছে উঠতে লেখেন।

আখতার-উজ-জামান তার কর্মস্থল থেকে আর আমি নদীয়া থেকে ঢাকায় গিয়ে একসঙ্গে একসপ্তাহ কাটাই। কারবেরি সাহেবকে একপলক দেখেই বুঝলুম ঠিক লোক পেয়েছি। কখনও চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতেন না। আগন্তুকের চোখ এড়িয়ে সুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একঘেয়ে সুরে একমনে বলে;

গেলেন, তাঁর ফার্মে কী সব কাজ হচ্ছে। আসলে তিনি ছিলেন কৃষি-এঞ্জিনিয়ার, চাষবাস বা মাটির গুণাগুণ সম্বন্ধে, সেচ, সার, বীজ, ফলন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সারা সপ্তাহের প্রায় সবটাই চাষের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি তিনি নিজে উদ্ভাবন করেছেন তাই দেখিয়ে কাটিয়ে দিলেন। একটি যন্ত্র হল চাষের আগে জমাট তালতাল মাটি কী করে ভাঙতে হয় তার কল, চাষীরা সাধারণত যা পিটুনি কাঠ দিয়ে হাতে পিটিয়ে ভাঙে। কিন্তু এটি হল রাস্তাতৈরি রোলার আকারে প্রকাণ্ড চওড়া নিরেট ভারি একটি রোলার। তার সারা গায়ে আট ইঞ্চি তফাতে তফাতে ছ'ইঞ্চি উঁচু উঁচু লোহার শূল। ওজন অন্তত দুই তিন টন হবে। সে শুধু পাঞ্জাবের বিশালকায় জোড়া সহীওয়াল বলদই অতি কষ্টে টানতে পারে। বাংলার চাষের বলদ তো দেখেই ভয়ে লেজ তুলে পালাবে। কিন্তু সে প্রশ্নে কারবেরির বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আরেকটি যন্ত্র হল কারবেরি যার নাম দিয়েছিলেন কুল্টিপ্যাকার। এটি আরেক পর্বতপ্রমাণ যন্ত্র। প্রথম বৃষ্টির পর মাঠ যখন ভিজে যায় তখন বলদ দিয়ে প্রথম লাঙ্গলের পর ধানের চারা রুইবার আগে গ্রামের চাষী মই চালিয়ে যেভাবে জমি কাদা করে, সেই কাদা করা যন্ত্র। কারবেরি সংক্ষেপে বলতেন কুল্টি। এই কুল্টি ছিল তাঁর মাটিভাঙা কলের থেকেও ভারি। একে টানা এমন কি একজোড়া সহীওয়াল বলদেরও কর্ম নয়। কারবেরি অবশ্য ও দুটি যন্ত্রের কাজ দেখানর কথা মুখেও আনলেন না। প্রতিদিন আমরা কারবেরির সঙ্গে ঘণ্টা দুই আড়াই কাটাতুম। বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ ভ্যাপসা গরমে মাঠের কাজে ইতি করে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাংলার বারান্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসতুম। চেয়ারে বসিয়ে প্রতিদিনই তরতর করে বলে যেতেন 'কি খাবে? বিয়ার কফি, চা, লেমনেড, লিম্বুপানি?' আমরা উত্তর দেবার আগেই বলতেন, 'লিম্বুপানি তো? বেশ বেশ, লিম্বুপানি।' ছ'দিন এইভাবে কাটার পর তিনি আমাদের সাদরে বিদায় দিলেন। গরমের দুপুরে রোদে পুড়ে এসে কোনদিনই ঠাণ্ডা বিয়ারের প্রথম স্বর্গীয় স্বাদ আমাদের কপালে জুটল না।

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে প্রথম সত্যেন বসু মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সে বিষয়ে আমার আত্মকথার প্রথম খণ্ডে লিখেছি। তাঁর কিংবদন্তী-খ্যাতিতে আমরা এমনিতেই নত হয়ে থাকতুম। আমাদের মজা লাগত তিনি বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে দুপুরে এসে যখন জিজ্ঞেস করতেন: আজ কার রেকর্ড বাজাবে? সব সঙ্গীতেই তাঁর অনুরাগ ছিল, বিশেষত জন সিবাস্টিয়ান বাখের। বিষ্ণুবাবু গ্রামোফোনে দম দিয়ে যখন রেকর্ড চড়াচ্ছেন, তার মধ্যেই সত্যেনবাবু মেঝেতে

আগে শিশুকে কী করে মায়ের দুধ ছাড়িয়ে অন্য খাদ্য ধরাতে হয় সে বিষয়ে তিনি আভার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

প্রোফেসর মেঘনাদ সাহাকে খেপাতে খুব ভালবাসতেন। প্রোফেসর সাহা সর্বদাই এমন গভীর সব সমস্যার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, ভারতবর্ষের উন্নতি-বিষয়ক পরিকল্পনায় এত ব্যাপৃত থাকতেন, যে আমার মাস্টারমশায় সুশোভন সরকারের এলগিন রোডের বাড়িতে ডাঃ সাহার মেয়েকে বাবার সম্বন্ধে 'মহারথী' আখ্যা ব্যবহার করতে শুনেছি। সত্যেনবাবু ও মেঘনাদ সাহা একসময়ে দুজনেই রাজ্য-সভার সভ্য ছিলেন। সত্যেনবাবু বেশীরভাগ সময় কাটাতেন ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে গবেষণা বিষয়ে আলোচনা করে। মাঝে মাঝে যখন পার্লামেন্টের সেণ্ট্রাল হলে এসে বসতেন তখন প্রায়ই প্রোফেসর সাহাকে খেপাবার জন্যে তাঁকে পুরনো 'লাইফ' বা 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ'-এর কিছু কিছু ছবি বা লেখা দেখতে বলতেন। প্রোফেসর সাহার কাছে এসব অসহ্য ছেলেমানুষি মনে হত।

প্রায় শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তার কিছু আগে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ ছেড়ে বাড়িতে ফিরে এসেছেন। বোঝাই গেল কাজটা তাঁর আদৌ ভাল লাগেনি, ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। সত্যি বলতে, তিনি যে-কোন ধরনের কর্তৃত্বের কাজ বিশেষ অপছন্দ করতেন। যদি কেউ তাকে কর্তৃত্বের কাজে ঠেলত তার প্রতিও তাঁর আসত অবিশ্বাস। ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কেন বিশ্বভারতী ছেড়ে চলে এলেন। বললেন, "জানো অশোক, আর পারছিলুম না। একজন ভদ্রলোক ছিলেন, জানতুম খুব সুবিধার নয়। হবি তো হ, প্রায়ই আমার কাছে বিল সই করাবার ছুতোয় আসত। ওকে এড়ানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দূর থেকে আসছে দেখলেই আমি হাতের বইতে ডুবে আছি এমন ভাব দেখাতুম, সমুখে ঝুঁকে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজতুম (খুব মোটা কাঁচের চশমা পরতেন)। কিছুক্ষণ পরে একটু মুখ তুলে দেখি, ওমা, কোথায় ভাবছি চলে গেছে, না আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে এসেছে। তাকে যেন দেখিনি এই ভান করে চিৎ হয়ে শুয়ে বইটা বুকে দাঁড় করিয়ে পড়তে শুরু করেছি, আড়চোখে দেখি গুটিগুটি আরো কিছুটা এগিয়েছে, আমার গায়ের কাছে ছায়া পড়েছে। কী করি, উল্টে, বুকে বালিশ চেপে, তার দিকে চেয়ে উঁচু গলায় বলতে বাধ্য হলুম, আমি সত্যিই ব্যস্ত, অন্য এক সময়ে যেন আসে। পরে, নিজেকে তার অবস্থায় ফেলে ভাবতে কষ্ট হত, বেচারী বিল সই করাতে এসেছিল বই তো নয়, পাওনাদাররা নিশ্চয় তার পিছন

পিছন আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। অন্তপক্ষে আমি ভাবতুম, আমাদের দেশের সে সৌভাগ্য কি আবার হবে, সত্যেনবাবুর মত লোক আর জন্মাবে ?

লাট হার্বার্টের সফর

১৯৪১ সালেও, অর্থাৎ স্বাধীনতার মাত্র ছ'বছর আগেও, জেলার সদর শহরে লাটের আগমন মনে রাখার মত ঘটনা হত। করিম আসার কিছু পরেই খবর এল অগাস্টের শেষে লাট জন-এ হার্বার্ট সস্ত্রীক কৃষ্ণনগরে আসছেন। ব্রেবোর্ন কাজ করতে করতে ১৯৩৯ সালে মারা যান, হার্বার্ট তাঁর স্থলে ঐ বছর নভেম্বরে লাটপদে অভিষিক্ত হন। ১৯৪০ সালের গোড়া থেকেই যেসব ব্যাপার ঘটতে লাগল তাতে অনেকের সন্দেহ হল ভারতে বৃটেন তার মহান উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গভর্নর জেনরল লিন্‌লিথগো'র যোগ্য একজন সহকারী-লাট নিযুক্ত করেছেন। ব্রেবোর্ন লাট থাকাকালে সুনাম অর্জন করেছিলেন। হার্বার্ট আসার পর মনে হল ব্রেবোর্ন যে সর্বনাশটি করতে বসেছিলেন, বৃটিশ সরকার হার্বার্টকে পাঠিয়ে তা রোধ করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ এর এপ্রিলে এল্‌-এস এমেরির সেক্রেটারী অভ স্টেট পদে নিয়োগ। আমার আই-সি-এস চাকরির কভেনাণ্টে বা চুক্তিতে বৃটিশ সরকারের তরফে এল্‌-এস্‌ এমেরির সই আছে বলে বরাবরই আমার খারাপ লেগেছে।

হার্বার্টের কাজে প্রথম থেকেই বেশ বোঝা গেল তিনি ছড়িয়ে জাল ফেলবেন এবং ডিফেন্স অভ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট বা ভারত রক্ষা আইন জবরদস্তভাবে প্রয়োগ করবেন। এই কাজ তিনি রাজনীতিনির্বিশেষে যতগুলি রাজনৈতিক কর্মী পেলেন তাদের সামান্যতম ছুতোয় গোয়েন্দাবিভাগ ও শাসনযন্ত্রের সাহায্যে জেলে পুরতে শুরু করলেন। এই মহৎ অভিযানে যদি ফজলুল হক মন্ত্রিসভা তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করেন ভাল, না করেন তো বয়ে গেল, তিনি নিজেই সব কিছু করবেন। শুধু গ্রেপ্তার বা প্রদেশ থেকে বহিষ্কার নয়, তিনি সব সংবাদপত্রের—যথা মাতৃভূমি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী, দুনিয়া, ন্যাশনাল উইকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন এবং যত প্রখ্যাত সম্পাদক ছিলেন—যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জানকীজীবন ঘোষ, মাখনলাল সেন, নির্মলচন্দ্র ব্যানার্জি, সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী—সকলকে ভারতরক্ষা আইনের বলে দণ্ডনীয় তালিকাভুক্ত করলেন।

চাকরি জীবন শুরুর প্রথম কয়েক মাসে, কৃষ্ণনগরের 'স্টেশনে' মাথায়-তোলা সম্মান পেয়ে, কলকাতার বন্ধুবান্ধব, গোঁফবাবু ও ভেড়ামারার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, আমার মাথা বোধহয় একটু মোটা হচ্ছিল। হঠাৎ ১৯৪১ সালের ১৪ এপ্রিলে যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে আক্কেল ফিরে এল। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় শেষ যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের অশীতিতম জন্মতিথির তিন সপ্তাহ আগে তাঁর জন্মদিনের বাণী প্রকাশ করলেন। সে বাণী সারা পৃথিবীতে অনুরণন আনল। ১৯৪০এর ৭ অগাস্ট এমেরি ও লিন্‌লিথগো যে বিদ্বেষ ও অপমানসূচক ভাষায় ভারতের ন্যায্য দাবি পদদলিত করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন, তাকে উপলক্ষ্য করে তিনি ভারতে বৃটিশ শাসনের বীভৎস চরিত্রের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন। ১৯৪০ সালের গোড়াতেই কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বেধড়ক গ্রেপ্তারযজ্ঞ চালিয়ে সকলকে জেলে পোরা শুরু করলেন, এবং যা একের পর এক চলতেই থাকল, ফলে, সারা দেশে যে হতাশা ও মরিয়াবোধ এল, সে বিষয়ে জন্মদিনের বাণীতে তাঁর ক্ষোভ ফেটে পড়ল। এই সন্ধিক্ষণে আলোকচিত্রকার শম্ভু সাহা রবীন্দ্রনাথের যে ফোটোটি তোলেন, তারই অবলম্বনে আঁকা যামিনী রায়ের ছবিটি আমরা যামিনীবাবুর কাছ থেকে উপহার পাই। ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথের রোগ ও বার্ধক্যক্লিষ্ট মুখ, মাথার উপরে ওড়া উস্কো-খুস্‌কো ধবধবে সাদা চুল দেখে মনে হয় যেন তুষার-পর্বতবাসী সুদূরদৃষ্টিবদ্ধ উদ্বিগ্নমুখ এক ঈগল পাখি।

লাটের জন্য সার্কিট হাউসটির আদ্যোপান্ত সংস্কার হল। নতুন করে সারা বাড়িতে রঙ হল। কলকাতার ল্যাজারাসের বাড়ি থেকে করিম সাহেব দুটি অতি-কায় লম্বা একজোড়া খাট বায়না দিলেন। ১৯৮৪ সালেও সে দুটি সার্কিট হাউসে ছিল। হার্বার্ট ও তাঁর স্ত্রী এত লম্বা ছিলেন যে তাঁদের আসার দ্বিতীয় দিনে তাঁদের সঙ্গে দুজনে লাঞ্চ খেতে গিয়ে, তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যাণ্ডশেক করার সময়ে মুখ এত উঁচু করতে হল, মনে হল ঘাড়ের হাড় মট করে ওঠে আর কি!

যুদ্ধের দরুন, পোশাক পরার বিষয়ে আগে যে কড়াক্কড়ি ছিল তা কিছুটা শিথিল করা হয়, সেবিষয়ে শুরুতেই লিখেছি। যুদ্ধের আগে জেলায় লাট এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাট-এওয়ে বা মর্নিং ড্রেস পরতে হত। সেটি হত সাধারণত ধূসর রঙের পোশাক, কোটটি সমুখে কোমরের কাছ থেকে দুদিকে পিছন দিকে পেঙ্গুইনের পাখার মত চলে গেছে। আগের যুগে লাট আসার আগে পোশাক নিয়ে 'স্টেশনে' কি ধরনের ধড়ফড়ানি হত তার একটি মজার গল্প সুশীল দে'র কাছে শুনি। নদীয়ায় আসার বছর দুয়েক আগে তিনি অন্য এক জেলায়

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। লর্ড ব্রেবোর্ন তখন লাট, সে-জেলায় যাবেন। 'স্টেশনের' অফিসাররা দুশ্চিন্তায় পাগল। প্রায় প্রত্যেকেরই প্রোবেশনের শেষে লণ্ডনে যেসব পোশাক করিয়েছিলেন, সেগুলি ইতিমধ্যে ছোট হয়ে গেছে, পরা যায় না। এক সন্ধ্যাবেলায় এক সহকর্মীর বাড়িতে এই নিয়ে খুব উত্তেজনা চলছে। গৃহকর্তা কিন্তু নির্লিপ্ত, তাঁর যেন কোন সমস্যাই নেই। তাঁকে অন্য সকলে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন উনি কলকাতার হার্মান কোম্পানিতে স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের জামাকাপড় অর্ডার দিয়েছিলেন, সব কিছু এসে গেছে, কোন সমস্যাই তাই নেই। দে তাঁকে ধমকে বললেন, স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ আবার কি, তোমার মাপ তো তারা জানে না? না জানলে কি হবে, চমৎকার ফিট করেছে, গৃহস্বামী বললেন। বলে দোতলায় গিয়ে কোটপ্যাণ্ট পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললেন, দেখছ না, পারফেক্ট্ ফিট। জ্যাকেটটিতে ভদ্রলোকের মত আরো দু'জন অনায়াসে ঢুকে যেতে পারত, হাতের আস্তিন হাতের বুড়ো আঙুলের নিচে নেমে গেছে, তিনটি আঙুল নামমাত্র দেখা যাচ্ছে।

দে'র দ্বিতীয় গল্পটি সত্যি, না স্বপ্নে প্রাপ্ত এখনও আমি বুঝতে পারলুম না। ঠিক হল লর্ড ব্রেবোর্নের সঙ্গে স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের পরিচয় করিয়ে দেবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং, এবং গৃহস্বামীর উপর ভার পড়ল সেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে লেডী ব্রেবোর্নের পরিচয় করিয়ে দেবার। গৃহস্বামীর একজন অধস্তন অফিসার, যিনি এসব ব্যাপার জীবনে কয়েকবার দেখেছেন, তিনি গৃহস্বামীকে বলেছিলেন, হাতে একটি লিস্ট রাখতে, কি জানি উত্তেজনার সময়ে মানুষ নাম ভুলে যেতে পারে বা উল্টোপাল্টা হতে পারে। বলা তো যায় না। গৃহস্বামী কথাটি উড়িয়ে দিলেন। তিনি তো শহরের সকলকেই ভাল করে জানেন, ভুলের অবকাশ কোথায়? লেডী ব্রেবোর্নের সঙ্গে ভদ্রলোক অতি সচ্ছন্দে সারকরা ভদ্রলোকদের আলাপ করিয়ে এগিয়ে চললেন। সারের অষ্টম কি নবম ভদ্রলোকের সমুখে লেডী ব্রেবোর্ন দাঁড়াতে, উনি বললেন, "খান বাহাদুর 'ক'।" যে ভদ্রলোকের সমুখে দাঁড়িয়ে, তাঁর ছিল লম্বা দাড়ি, পরণে গলাবন্ধ আচকান। সমুখের ভদ্রলোক কাতরভাবে বললেন "ইওর এক্সেলেন্সি, আমি রায়বাহাদুর 'খ'।" ভদ্রলোক স্বভাবতই মরিয়া হয়ে গেছেন, জীবনে এই বোধ হয় শেষবার তাঁর লাটপত্নীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ, তায় আবার সত্যিকারের লর্ড পরিবারের মেমসাহেব! এখানে পরিচয়ের গোলমাল হলে তো সারাজীবন বৃথায় গেল। দে বললেন, আমাদের ভদ্রলোক বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি রায়বাহাদুর 'খ' হতে পারেন না, আমি জানি

আপরি খান বাহাদুর 'ক'।" কথা কাটাকাটি ঘনিয়ে ওঠার আগেই লেডী ব্রেবোর্ন সমস্যার সমাধান করে দিলেন। সম্মতিসূচক ঈষৎ ঘাড় নেড়ে, ঘনিষ্ঠতাসূচক একটু চোখ টিপে, মুচকি হেসে করমর্দন করে ফিসফিস করে আমাদের ভদ্রলোককে বললেন, "আসুন এবার পরের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করি।" যাই বলুন, সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজ পরিবারে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ভদ্রতাবোধের তারিফ করতেই হয়।

লাট হার্বার্টের লাঞ্চ ছিল ইয়ান মরিস যাকে, কোথায় যেন বলেছেন সাম্রাজ্যের একান্ত প্রাণবায়ু: চোখধাঁধানো আড়ম্বর ও ঘটাপটার অনবদ্য দৃষ্টান্ত, ভিতরে শাঁস নেই, খোলসই সর্বস্ব। রুপোর যাবতীয় সরঞ্জাম ও খাবার অস্ত্রশস্ত্র: নুন, মরিচ আর মাস্টার্ডের পাত্রের ক্রুয়েট থেকে মাছ, মাংসের কাঁটাচামচ, সুরুয়া, পুডিংএর চামচ, সবই ম্যাপিন এণ্ড ওয়েব বাড়ির আসল রুপোর তৈরি। যেমন প্রচণ্ড ভারি তেমনি মারাত্মক রকমের ধারালো আর ছুঁচলো। কেবল কাঁচের গ্লাসগুলি ক্রিস্টাল নয়, কিন্তু পোর্সেলিনের যাবতীয় বাসন সবই মিণ্টন মার্কা উৎকৃষ্ট চীনে মাটির; স্যুপপ্লেটগুলি পুরনো স্লেটহ্যাট আকারের। সেই হিসাবে লাঞ্চ ছিল টাই-ফয়েড রুগীর প্রথম পথ্যের মত। দুই-হাতা স্যুপ। ছোট্ট এক ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া সিকি ইঞ্চি মোটা একটি ভেটকি মাছ ফ্রাইয়ের টুকরো। মাছের প্লেটের এক প্রান্তে ছোট্ট এক ফোঁটা টার্টার সস্। তারপর এল বিরাট ঝকঝকে প্লেটের উপর উপোসী মুরগির আধখানা একটি ডানা। পুডিং নেই। সেভরি হিসাবে এল একটি ছোট্ট চৌকো টোস্ট, তার উপরে ছ'টি রাজ্‌মার দানা (বেক্‌ড্‌ বীন)। শেষে এল বড় বেশী ফুটনো কড়া কফি। আমি হলফ করে বলতে পারি এসবই যুদ্ধের অজুহাতে লোকদেখানো ব্যয়সংকোচের আড়ম্বর। লাটের শোবার ঘরে নিশ্চয় জালের আলমারি ভর্তি ছিল আলাদা রান্না করা খাবার আর উৎকৃষ্ট ব্ল্যাকম্যাজিক চকোলেট।

এ ছাড়া জাঁকজমকের অন্যান্য নিদর্শনও ছিল। লম্বা টেবিলের মাঝখানে লাট বসলেন, তাঁর দু'পাশে একদিকে জজ গিন্নী অন্যদিকে কালেক্টর গিন্নী। টেবিলে তাঁর মুখোমুখি বসলেন লাটগিন্নী, দুপাশে জজ ও কালেক্টর। টেবিলের একপ্রান্ত (লাটের ডানদিকে) লাটের সেক্রেটারী এম-ও কার্টার, অন্যপ্রান্তে তাঁর এ-ডি-সি (নাম মনে নেই)। টেবিলে প্রতি দু'জনের পিছনে খাড়া থামের মত দাঁড়িয়ে একজন ওয়েটার, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। পরনে লাল আর সোনালি জরির জমকালো পোশাক। বুকে ঝকমকে পালিশকরা তকমা। কনুই পর্যন্ত সাদা স্যাটিনের দস্তানা। ডাইনে বাঁয়ে বসা অতিথিদের প্লেটের উপর শ্যেনদৃষ্টি বদ্ধ।

লাট ও লাটগিন্নীর নিজস্ব দু'জন ওয়েটার ছিল। প্রতিটি কোর্স শেষ করে আপনি প্লেটের উপর কাঁটাছুরি একত্রে রেখে আপনার দুই হাত সরিয়ে নেবার আগেই, পিছনের ওয়েটারটি বাঁ দিক থেকে বাজপাখির মত ছোঁ মেরে কাঁটা ছুরিসমেত প্লেটটি তুলে নিয়ে যেত।

আমি ভাবিনি, কার্টারও নিজেকে মস্ত বলে ভাববেন। পূর্বসূরীদের বিশেষ কারোকে তো তার আগে দেখিনি, তবে বই পড়ে মনে হয়েছিল যাঁরা জীবনে সেট্‌লমেণ্টের কাজ করেছেন তাঁরা আরো স্বাভাবিক ব্যবহার করবেন। ভেবেছিলুম —সেট্‌লমেণ্টের কাজে যাঁরা দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের ব্যবহারে পাকা সাহেবিয়ানা হয়ত থাকবে না। বীটসন বেল-এর কথাই ধরা যাক। এই শতকের প্রথম দশকে তিনি তাঁর অমর কীর্তি, বাখরগঞ্জ জেলার সেট্‌লমেণ্ট ও তার রিপোর্ট রচনা করেন। কিংবদন্তী আছে তিনি চাষা-ভূসো লোকেরা কীভাবে থাকে জানার জন্যে গ্রামের লোকের অজান্তে চাষীদের খড়ের পালুইয়ের উপর শুয়ে রাত কাটাতেন। তাঁর নামের প্রথম অক্ষর দুটি ছিল এন্‌-ডি। কাজের ছুতোয় গ্রামে ঘোরার সময়ে তিনি মাঝে মাঝে প্রাথমিক স্কুলে ঢুকে পড়তেন। পকেটে থাকত খুব ছোট লাল নীল সাদা চিনির গুলি। সেগুলি আস্তে আস্তে বার করে মাথাপিছু একটি করে দিয়ে বলতেন, বল তো আমার নাম কি? ছেলেরা কী করে জানবে? একটু মজা করে মুখভঙ্গি করে বলতেন, এন্‌-ডি বীটসন বেল: নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা। এন্‌-ডি হচ্ছে নন্দ-দুলাল; বীটসন হচ্ছে বাজায়; বেল হচ্ছে ঘণ্টা। বাচ্চারা খিলখিল করে হেসে উঠত। এই কথা বলার পর, বেল সাহেবের সম্মানে পণ্ডিতমশায়ও সেদিনের মত ইস্কুলের ছুটি দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিতেন।

অন্যদিকে কার্টার সাহেব হলেন, গম্ভীর, হাসতে জানেন না। ঠোঁটের উপর দাঁতবুরুশ গোঁফ। প্রথম মহাযুদ্ধে মিলিটারি ক্রস পদক পেয়েছিলেন, কথাও তাই মিলিটারিদের মত কাটাকাটা। তাসত্ত্বেও অত গম্ভীর আর বীরপুরুষ না দেখালেও পারতেন। কয়েক বছর পরে, ১৯৪৮ সালে, মালদা জেলায় গিয়ে যখন তাঁর মালদা জেলার সেট্‌লমেণ্ট রিপোর্ট পড়ি তখন বুঝলুম কেন তিনি অত গম্ভীর। প্রথম যুদ্ধের পর ১৯২১ সাল থেকেই ব্রিটিশ অফিসারদের বেশ পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে বুঝলুম। বীটসন বেলের রিপোর্ট একটি অনুসন্ধিৎসু সহমর্মী পণ্ডিতের কীর্তি, সে-তুলনায় কার্টারের রিপোর্ট সংখ্যাতথ্যের সমষ্টির বেশী কিছু বলা যায় না।

লাটগিন্নী বেশ দয়ার শরীর, রানীর ভাব নিয়ে বসে রইলেন। তাঁর স্বামীকেও

দেখে মনে হল তিনি জানাতে চান যা দেখছি তার থেকেও তিনি অনেক বড়। পাঞ্চ্ পত্রিকার মূর্তিমান জন বুল বলে যাতে মনে হয়। হার্বার্টকে দেখে মনে হল মনপ্রাণ দিয়ে তিনি ভারতরক্ষার্থে বদ্ধপরিকর। ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তিনি শক্তিক্ষয় করতে নারাজ। এই ভাবটি প্রকাশ পেল সেদিন অপরাহ্ণে সাধারণ জনসভায় তাঁর ভাষণে। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে, নদী নালা রক্ষা সেচ সবকিছুর উল্লেখ করলেন। অডেনের লাইনের কথা মনে পড়ে গেল: 'গর্বিত নাকের বাঁধ, অহঙ্কারে কুঞ্চিত নাসারন্ধ্র; দেবভাব বিকীরণই একমাত্র কার্য।'

বাঁকুড়া

১৯৩৬ সালে যামিনী রায়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই, বিষ্ণুপুর আর পাঁচমুড়া যাবার অভিলাষ হয়: যামিনী রায় প্রায়ই বলতেন, কালীঘাটের পট বা পটুয়াশিল্পীর লোকচিত্র তাঁর সৃজনশক্তির উৎস ছিল না, ছিল বিষ্ণুপুরী মন্দিরের গায়ের টেরাকটা মূর্তি, দশাবতার খেলার তাস, তালপাতার পুঁথির মলাটের চিত্রিত পাটা, পাঁচমুড়ার মূর্তি। এরপর, কৃষ্ণনগরে গিয়ে আমার নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হয় হস্তশিল্পে, তাঁতের কাপড়ে, বাঙালীর জীবনে নিত্যব্যবহার্য মাটি, ধাতু, পিতল কাঁসা কাঠের বাসনে ও দৈনন্দিন গৃহসজ্জায়। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত তসর, গরদ, আর শাঁখের অলঙ্কারের কথাও জানা ছিল। বহরমপুরে কয়েকদিনের জন্যে গিয়ে এসব বিষয়ে উৎসাহ বাড়ে। করিমের কাছে নভেম্বর মাসে বাঁকুড়া যাবার অনুমতি পেলুম। নদীয়ার সমবায় বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রারের কাছে আমি যখন কাজ শিখছি তখন তিনি বাঁকুড়ায় লিখে আমার বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে সফরের ব্যবস্থা করলেন। নভেম্বরের এক সকালে বাঁকুড়ায় পৌঁছলুম, বেশ শীত। সমবায় বিভাগের এক অফিসার স্টেশনে ছিলেন, আমাকে সার্কিট হাউসে নিয়ে গেলেন। সেখানে বাক্সপত্র রেখে তাঁর সঙ্গে পাঁচমুড়া রওনা হলুম। তিনি আগে থেকে ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছিলেন।

এর আগে কখনো কারিগরদের গ্রাম দেখিনি। পাঁচমুড়া গ্রামময় তখন শুধু কুমোররাই বাস করত। গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় যাবতীয় বাসনপত্র তো তৈরি হতই, তার সঙ্গে হত হাজার রকম পূজার মূর্তি ও উপকরণ। বিরাট বিরাট মনসার 'মেড়' থেকে শুরু করে পূজার অর্ঘ্য হিসাবে বেশ বড় সাইজ থেকে খুব ছোট সাইজের

জীবজন্তু, মুখ্যত হাতি, ঘোড়া আর বাঘ। মনসার মেড় ছিল বেশ জটিল ভাস্কর্য-নিহিত স্থাপত্যের কাজ। দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের মত বিরাট অর্ধচন্দ্রাকারে মাটির তৈরি। জটিলভাবে ভাস্কর্যে ভরা বেশ চওড়া পটি দিয়ে চালচিত্র বা মেড়টি করা। পটির মধ্যে একের পর এক ভাস্কর্যের সারি উঠে গেছে। সব মূর্তিগুলিই সুডৌল ভাস্কর্য, চরিত্রগুলি মনসামঙ্গল পুরাণের। মধ্যিখানে আছে বিরাট উপুড় করা ঘট, সেটি মোড়কে ধরে আছে। ঘটের সঙ্গে চালচিত্রটি খুব কৌশলে নানা শাখাপ্রশাখা ও খুঁটি দিয়ে আটকানো। এমন একটি মেড় ব্যাসে প্রায় আট নয় ফুট এবং উচ্চতায়ও ততখানি হত। ঘটের চারদিক মাটির সুডৌল সাপ জড়িয়ে আছে। প্রতিটি ফিগর অতি নিখুঁতভাবে মাটিতে তৈরি, মুখ্যত ছবি বা কাঁটা বিঁধিয়ে (ইন্‌সাইজড্), না হয় বোতামের মত মাটির তাল সেঁটে (পেলেটেড) অলঙ্কৃত। মূর্তি থেকে শুরু করে সবকিছুই খুব জ্যামিতিক বা স্টাইলাইজড্ আকারে নির্মিত। আকারে ও পারস্পরিক মাপ জোপে প্রত্যেক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের অঙ্কের মাপে সম্বন্ধ আছে। শত শত বছর ধরে দরিদ্র সংসারের জন্য তৈরি বলে প্রতিটি জিনিস অনাবশ্যক অলঙ্কার ও বাহুল্যবর্জিত, অর্থাৎ যথাসম্ভব কম মাল-মসলায় ও খরচে তৈরি, কোন জ্যাবড়াভাব নেই, অথচ ব্যবহারের পক্ষে, ধোয়ার পক্ষে একান্ত চাঁচাছোলা, ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন ও আরামদারক। সেঁকা বা পোড়ানো কাজেরও তুলনা সেই। ঐ ধরনের অতুলনীয় পোড়ানো বা সেঁকা পরে দেখেছি জাপানে কিয়োটো শহরে বিশ্ববিখ্যাত জাপানী মৃৎপাত্রশিল্পী কাওয়াই কাঞ্জিরোর বাড়িতে এবং তাঁর কুমোরপাড়ায়। কুড়ি পঁচিশ বছর পরে যখন পাঁচমুড়ার ঘোড়া কেন্দ্রীয় কটেজ এম্পোরিয়ামের প্রতীক চিহ্ন হল এবং মাটির জিনিসপত্র ধনীদের বসার ঘরের সজ্জা হয়ে দাঁড়াল, তখন থেকে এল নানা বাহুল্যময় অলঙ্কার, জ্যাবড়া কাজ, ও চাঁচাছোলা পারিপাট্যের অভাব।

পাঁচমুড়া থেকে ফেরার পথে বিষ্ণুপুরের টেরাকটা মন্দির দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছলুম, বিশেত জোড়বাংলা মন্দিরের ভিতরের দেয়ালগুলির উপর অজস্র ভঙ্গি ও মুদ্রায় খোদিত নাচের ইটগুলি দেখে। মূর্তিগুলি দেখে প্রতীতি হল বিষ্ণুপুরের মন্দিরের প্রতি যামিনী রায়ের ঋণস্বীকার কত সত্য। ১৯৫৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত দিল্লীতে থাকাকালে আমি প্রায়ই সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষকে বলেছি, বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরাণা যেমন একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত ঐতিহ্য, সেখানে নৃত্যকলারও নিশ্চয় একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য ছিল যার প্রমাণ পাই জোড়বাংলার টেরাকটায়। এই ঐতিহ্য সম্ভবত ওড়িশী ঐতিহ্যের সঙ্গে সহোদরা-সম্বন্ধে জড়িত, এবং ওড়িশী ঐতিহ্য যেমন

গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে সঞ্জীবিত হয়ে সমৃদ্ধরূপ ধারণ করেছে, অনুরূপ অনুশীলনে বিষ্ণুপুরী ঐতিহ্যও সঞ্জীবিত হতে পারে। আসলে আমাদের যুগে ওড়িশী ধারা ত কোণারক, পুরী, ভুবনেশ্বরের মন্দিররাজির গাত্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে নিবেদিতপ্রাণ পণ্ডিত, গায়ক ও নর্তকনর্তকীদের আপ্রাণ আগ্রহে ও পরিশ্রমে। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে সে আগ্রহের বিন্দুমাত্র আজও দেখা গেল না।

সন্ধ্যাবেলা সার্কিট হাউসে ফিরে জজসাহেব অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়িতে গেলুম তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। বিষ্ণুবাবু তাঁকে আমার যাবার কথা লিখে রেখেছিলেন। আই-সি-এস চাকরিতে তখন অন্নদাশঙ্কর বোধহয় একমাত্র প্রথিতযশা লেখক। তাঁর স্ত্রীর—বাংলা নাম 'লীলা',—অনুবাদক হিসাবে তখনই বেশ নাম হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে আমাকে আপনজনের মত সাদরে বসার ঘরে নিয়ে বসালেন, এবং সদ্য আগত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যেন সাপ দেখার মত আঁৎকে উঠলেন: "নতুন অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট! কৈ, আমি ত জানতুম না এখানে একজন আছেন।" উদ্বিগ্ন উক্তির পিছনে ছোট্ট ইতিহাস আছে, পরে জানলুম। সেই বছরেরই প্রথমদিকে বা তার একটু আগে, জেলা জজের স্ত্রী আচমকা পিস্তলের গুলি খেয়ে মারা যান। গল্প রটেছিল তিনি নাকি সেখানকার অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি কোনসময়ে স্নিগ্ধভাব পোষণ করতেন।

ভয় মানুষকে ভড়কিয়ে দেয়, তা না হলে আমার দিকে ভাল করে এক পলক তাকালেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতেন ভয়ের কোন কারণ নেই। তাঁর বিচক্ষণা, সুদর্শনা, স্থিতধী স্ত্রীর এখনও সারা ভারতে সমাজসেবী হিসাবে বিশেষ সুনাম। স্বামী এবিষয়ে ঘরে বাইরে তাঁকে সর্বদা সাহায্য করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় যে মফঃস্বল 'স্টেশনে' হৃদয়ঘটিত ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা থাকত খুবই কম। তার প্রধান কারণ, ঐ মুষ্টিমেয় কয়টি পরিবারে কোন কিছু অজানা থাকা অসম্ভব। সেই কারণে কিছু ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকত খুব কম। সকলেই ভাল হয়ে থাকতে বাধ্য হত। বড় জোর হত সম্বন্ধ করে বিয়ে, অথবা একপক্ষের গুরুজনদের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত প্রেম নিবেদন।

নভেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরে শিক্ষানবিশীর একবছর প্রায় পূর্ণ হয়ে এল। আমার উপরে আদেশ এল সেট্‌লমেণ্ট শিক্ষার জন্য তৈরি হতে। ৩০ নভেম্বর রাত্রে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে চড়ে বরিশাল জেলার ঝালকাঠিতে গিয়ে সেট্‌ল্‌মেণ্ট

ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে হবে। সস্ত্রীক গেলে তার ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করবেন। ঝালকাঠিতে ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হবে ২ ডিসেম্বর।

কৃষ্ণনগর বাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না, যদি আমি একটি অভূতপূর্ব নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা না বলি। সেটি হয় নবদ্বীপে। আরো দুটি স্থানীয় উৎসবের কথাও বলতে হয়, যা শুধু তখনকার দিনে নদীয়া জেলাতেই হত।

অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা আগে বলি। ছেলেবেলায়, মার খুড়তুতো দাদা, রাঙ্গামামার (এঁর কথা আমার স্মৃতিকথার প্রথমভাগে বিশদ করে লিখেছি) শ্যামানন্দ রোডের বাড়িতে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের গলায় কীর্তন প্রায়ই শুনতুম। যুবাবয়সে বেশ কয়েকবার দিলীপকুমার রায়ের কীর্তন শোনার সৌভাগ্য হয়, আর রাধারাণী দেবীর। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উৎসবে নবদ্বীপে যে কীর্তন শুনেছি তা আজও আমার কানে বেজে আছে। ওরকম কীর্তন তার আগে বা পরে শুনেছি বলে মনে হয় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ১৯৬৫ সালে মণিপুর রাজের নিজস্ব মন্দির-প্রাঙ্গণে হোলির দিন সকালে যে কীর্তন শুনি তার উল্লেখ করতেই হয়। ১৯৭৭ সালে সুপ্রসিদ্ধা নয়নাদেবীর দিল্লীর বাড়িতে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ হরেকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক তরুণ আমেরিকানের গাওয়া কীর্তন শুনি, তখন হঠাৎ আমার মত নাস্তিকের দেহে এত ভাবের শিহরণ কেন এল বলা শক্ত; কিন্তু ক্বচিৎ হঠাৎ এমন মুহূর্ত আসে যেমন শুনেছি জয়দেবের কেন্দুলিতে এক বৃদ্ধ বাউলের কাছে। একতারা ডান হাতে তুলে গলা থেকে এমন স্বর বার করবেন তাতে এমন আকুলতা থাকবে বা কীর্তনীয়া অমৃতধারার মত এমন আখর দেবেন, যাতে আপনার অজান্তে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে, চোখ দিয়ে জল ঠিকরে পড়বে। ঠিক যেমন হয়, বাখের সেণ্ট ম্যাথু'জ প্যাশনের সেই রিসাইটেটিভে যেখানে উচ্চারিত হয়: 'নবম ঘটিকার সময়ে যীশু সশব্দে কেঁদে উঠলেন'। আমি জানি না নবদ্বীপে সেই অতি শুদ্ধ কীর্তনের ঐতিহ্য এখনও বজায় আছে কিনা। পঞ্চাশ বছর গত হয়েছে, যদি অবলুপ্তপ্রায় হয়ে থাকে, বলতে হবে বাঙ্গালীর এক মহান ঐতিহ্য গেল।

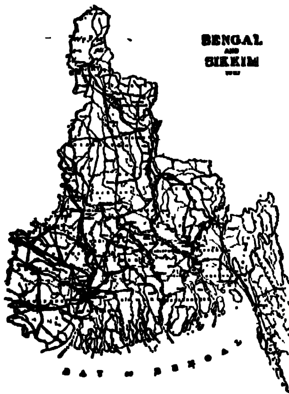
যে দুটি উৎসবের উল্লেখ করেছি তার মধ্যে জগদ্ধাত্রী পূজা হচ্ছে কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট ঐতিহ্য। জগদ্ধাত্রীর বিরাট প্রতিমা ঘুর্ণির শিল্পীরা আশ্চর্য দক্ষতা ও ভক্তির সঙ্গে গড়তেন। প্রতিমার গায়ে যে অলঙ্কার তৈরি হত তার মত নিখুঁত সর্বাঙ্গময় নয়নাভিরাম শোলার অলঙ্কার আর দেখিনি বললেই হয়। দ্বিতীয় উৎসব হত শান্তিপুরে। ১৯৩১ সালে সিমলা পাহাড়ে কেন্দ্রীয় বিধান সভায় আমি শান্তিপুরের

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের বক্তৃতা শুনি। ১৯৪১ সালে তিনি শান্তিপুরে তাঁর বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে রাসযাত্রার শোভা দেখতে কৃষ্ণনগরের অফিসারদের সযত্নে নিমন্ত্রণ করেন। শান্তিপুরের রাসযাত্রার বিশেষত্ব ছিল, রাইরাজারূপিণী রাধিকা রাজবেশে সজ্জিত ও চন্দনচর্চিতা হয়ে রথের সিংহাসনে বসতেন। সেই রথ সারা শহর পরিক্রমা করত। রথটি রাখা হত ঠিক রাধাকৃষ্ণের রথের পিছনে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রতিবছর অনূঢ়া কন্যাদের মধ্যে সব থেকে রূপসীকে রাইরাজা মনোনীত করতেন। রাইরাজা শোভাযাত্রার পর সে কন্যার জন্যে সুপাত্র মিলতে দেরি হত না।

সুশীলকুমার দে, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও ইলাদি, জীতেন্দ্রমোহন সেন ও সুধাদি, শৈবালকুমার গুপ্ত মহাশয়দের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে কৃষ্ণনগরে এক বছর শিক্ষানবিশীর এই বিবরণ শেষ করি।

বাখরগঞ্জ

ঝালকাটিতে যুগ্ম ক্যাম্প



শিক্ষানবিশীর শেষ দুই মাসের প্রথম মাসটি কাটে বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলার ঝালকাটিতে, সব বিভাগের অফিসারদের যুগ্ম ক্যাম্পে। দ্বিতীয় মাসটি কাটে ঐ জেলারই গৌরনদী গ্রামে। ১৯৪১-এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'সুখবাসে'র পাট উঠিয়ে যা কিছু রেখে যাবার আসবাব, আমার গ্রামোফোন, রেকর্ড আর বইপত্র ছিল সেগুলি কাঠের ক্রেটে পুরে প্রিন্সিপাল সেনের বাড়ির একটি খালি ঘরে গুদামজাত করি। জজ গুপ্ত ও অশোকাদি, প্রিন্সিপাল সেন ও সুধাদি, প্রোফেসর তালুকদার ও তাঁর স্ত্রী সস্নেহে পালা করে আমাদের কয়দিন ধরে দুপুরে আর রাতে খাওয়ালেন। আমার খুব ভাল লাগল যখন কালেক্টরেটের সেরেস্তাদারবাবু ও অন্যান্য কেরাণীরা একদিন বিকালে যত্ন

করে চা খাওয়ালেন। নভেম্বরের দু'একদিন বাকি থাকতে কৃষ্ণনগর থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা গেলুম, ৩০ নভেম্বর রাতে শিয়ালদহে খুলনার ট্রেন ধরার জন্যে।

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে খুলনা, খুলনা থেকে পরের দিন সকালে ভোরে স্টীমারে চড়ে ঝালকাটি যাত্রা, বিকেলে ঝালকাটি পৌঁছনো, ঝালকাটিতে একমাস যুগ্ম ক্যাম্প, সব কিছুতেই যে এলাহি নবাবী বন্দোবস্ত দেখলুম, তাতে বুঝলুম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকরা এদেশে কী পরিমাণ কর্তৃত্ব ও সেবা ভোগ করেছেন, আর তার ফলে তাঁদের নৈতিক চরিত্রে, স্বভাবে ও ব্যবহারে কতখানি ঔদ্ধত্য ও বিকার আসা সম্ভব হত। নিজে যতদিন এই ধরনের কর্তৃত্ব ও সেবাযত্ন পেয়েছিলুম ততদিন আমার ভাল লাগেনি বা আমার মন বিদ্রোহ করেছিল এধরনের মিথ্যাভাষণ বা ফাজলামি আমি নিশ্চয় করব না। তবে সেই সঙ্গে আমি বুঝতে পারলুম আমার পূর্বসূরীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাঁরা তাঁদের চাকরি জীবনে সততা, জনসেবা, ভদ্রতা, ন্যায়বিচার ও নির্ভীকতার মূল্যমান বজায় রেখে দেশের জীবনের নানা বিষয়ে অমূল্য সব বই রেখে গেছেন, তাঁরা এই ধরনের আঠার মত চটচটে, মধুর মত মিষ্টি, অপ্রতিহত প্রভুত্বের মধ্যে থেকেও কত সংযত ও আত্মসচেতন ছিলেন যার ফলে তাঁরা নৈতিক অবনতি বা চারিত্রিক বিনাশ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন। মনে পড়ত আমার অধ্যাপক হামফ্রি হাউসকে যামিনী রায়ের সতর্কবাণী। একদিন যামিনীবাবু আমাকে বললেন: "পরশুদিন হামফ্রি হাউস এসেছিল, বাবা। জিগ্যেস করলুম, 'এদেশে কতদিন থাকবে ভেবেছো?' বললে, 'আমার খুব ভাল লাগছে, জীবনটা কাটিয়ে দেব ভাবছি।' 'আমি বললুম কি জানো? বললুম দেখ, তোমাদের নিজেদের দেশে তোমরা এত ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত, সৎ ও আদর্শবাদী যে তোমাদের আদর্শ সকলেই মাথা পেতে স্বীকার করে। কিন্তু, সুয়েজ খাল পেরিয়ে, তোমাদের দেশ থেকে যারা এদেশে পাঁচ বছরের বেশী থাকে তাদের কুষ্ঠরোগ হয়, সুতরাং পাঁচ বছরের বেশী থেকোনা।" হামফ্রি হাউস এদেশে পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগেই দেশে ফিরে গেছলেন। হাউসের সাসেক্সের বাড়িতে আমি অক্সফোর্ড থেকে দুদিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের কাছে থাকি। তিনি বললেন, 'অশোক ভাগ্যে আমরা আর থাকিনি, থাকলে কিছুটা অমানুষ হয়ে যেতুম।'

৩০ নভেম্বর সন্ধ্যায় শিয়ালদহে এসে দেখি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, ঝকঝকে পরিষ্কার, জানলাগুলিতে রঙিন কাগজের পতাকা আর চেন লাগানো। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মটি সুন্দরভাবে রাখা হত। ঐ

সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার সেদেশের মধ্যে দিয়ে শিয়ালদহ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিলেন। তখন থেকে প্ল্যাটফর্মটির ও স্টেশনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। যাঁরা পঞ্চাশের দশকে 'ছিন্নমূল' ফিল্মটি দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন কেন!

আমাদের ছোট দু' বার্থের প্রথম শ্রেণীর কামরায় দেখি বিছানা পাতা। ধবধবে চাদর, নতুন কম্বল। তখন রেলওয়ের কেটারার ছিল সোরাবজি কোম্পানি। তার ওয়েটাররা খাবার আগে গলাভেজানো এপেরিটিড নিয়ে এল: স্কচ, ড্রাই মার্টিনি, গিমলেট, ভারমুথ আর শেরি, যে যেমন চান। পরে, ট্রেন ছাড়ার আগে সোরাবজি থেকে এল পাঁচ পদের ডিনার, রাত্রে সাপার। ডিনারের পর এল কফি বা ওভালটিন, সঙ্গে এল দু' তিন রকমের লিকিওর ও কোনিয়াক। ভোরে এল ভোরের চা, এবং খুলনায় পৌঁছনর আগে ব্রেকফাস্টে এল পরিজ, ডিম (সুন্দর স্ক্র্যাম্‌ব্‌ল করা), ভাজা সসেজ ও কিডনি, কফি আর ফল।

কলকাতা থেকে সুন্দরবন, খুলনা, বরিশাল ঘুরে ঢাকা পর্যন্ত আর-এস-এন (রিভার অ্যাণ্ড স্টীম নেভিগেশন) কোম্পানি অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের স্টীমার চালাত। আই-জি-এস-এন (ইণ্ডিয়ান জেনরল স্টীম নেভিগেশন) কোম্পানি গোয়ালন্দ-ঢাকা, গোয়ালন্দ-চাঁদপুর পর্যন্ত বড় বড় স্টীমার চালাত। বড় বড় স্টীমারগুলির সুন্দর সুন্দর নাম হত: অস্ট্রিচ, কিউই, ইমু, পেলিকান ইত্যাদি। স্টীমারে লাঞ্চ ছিল সাড়ে বারোটায়: ক্রীম অভ চিকেন স্যুপ, ভেট্‌কি ফ্রাই, আই-জি-এস-এনের বিখ্যাত কান্ট্রি ক্যাপটেন চিকেন কারি আর ঘন মুসুর ডাল, ক্যারামেল কাস্টার্ড। আমার প্রায়ই মনে হয় সারা ভারতবর্ষময় বৃটিশ আমলে যতগুলি ডাকবাংলা, সার্কিট হাউস, লম্বাপাল্লার ট্রেন বা স্টীমার ছিল বা চলত সেগুলিতে ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কত লক্ষ লক্ষ চিকেন কারি আর ক্যারামেল কাস্টার্ড যে পরিবেশন করা হয়েছে তার হিসাব যদি কেউ রাখত। আশ্চর্য, এর থেকে স্বাস্থ্যকর আর সুপাচ্য খাদ্যও আর হতে পারে না! বিকেল সাড়ে চারটের সময়ে ঝালকাটি স্টেশনে স্টীমার লাগার আগে এল অপরাহ্নের চা: স্যাণ্ডউইচ, কেক আর চা। ওয়েটাররা সবই অতি সুষ্ঠু, পরিষ্কার, কেতাদুরস্তভাবে প্রতিবার যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশন করল। যতবার ট্রেনে আর স্টীমারে খাবার দিল তার জন্যে আমাদের মাথাপিছু লাগল বোধহয় মোট সাড়ে সাত টাকা। মদ্য-জাতীয় পানীয় অবশ্য আলাদা, প্রতিটি পানীয়ের বড় মাপেরটির দাম ছিল বকশিস নিয়ে মোট আট থেকে দশ আনা।

ঝালকাটির যুগ্ম ক্যাম্পটিও আমার জীবনে বিলীয়মান বৃটিশ ঐশ্বর্যের সূর্যাস্তের সোনার মত স্মরণে আছে। ঝালকাটির ছেলেদের স্কুলের বিরাট খেলার মাঠটি কর্তৃপক্ষ চেয়ে নিয়েছিলেন আমাদের ক্যাম্পের জন্য। দখল করেছিলেন বলাটাই বোধহয় ঠিক হবে। খেলার মাঠের প্যাভিলিয়নটি হল সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসের ক্যাম্প অফিস। মাঠের মধ্যস্থল থেকে অন্যদিকে পড়ল আই-সি-এস ও আই-পি শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের আলাদা তাঁবু। তাঁবুর ছাউনির একদিকে বিরাট পালখাটানো খোলা তাঁবু। সেখানে সর্বভারতীয় সার্ভিসের অফিসাররা ও তাঁদের স্ত্রীরা খেতেন, বসতেন, আড্ডা দিতেন ; মেস তাঁবু বলত। মেস তাঁবুর সংলগ্ন ছিল বাবুর্চিখানা, মশালচিখানা, ভাঁড়ার ঘর ও পানীয় রাখার বন্দোবস্ত। সব মিলিয়ে এই উপ-নিবেশটির নাম হল ইম্পিরিয়াল ক্যাম্প।

এই ক্যাম্পজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হল মেস তাঁবু আর দিনে তিনবার আহার : ব্রেকফার্স্ট লাঞ্চ ও ডিনার। প্রতিদিন খাবার কী হবে তার মেনু নির্বাচন নিয়ে আগের দিন রাত্রের খাবার পর বসত বিরাট আলোচনা। সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার এ-ডব্লিউ হ্যাচবার্নওয়েল ছিলেন খাদ্যরসিক। তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক করতেন কী কী মেনু হবে। স্কটল্যাণ্ডের লোক ছিলেন বলে খুব কৃপণ স্বভাব ছিল। বাজার দর সম্বন্ধে ছিল টনটনে জ্ঞান। একদিন বাজারের ঠিকাদার মাঝারি ধরনের মুরগির দাম বলেছে চার আনা। হ্যাচ (আমরা ঐ নামেই তাঁর উল্লেখ করতুম) বললেন : কি বলছেন কণ্ট্রাক্টরবাবু, ছোট, বড় প্রকাণ্ড মুরগী কোনটাই তিন আনার বেশী নয়, আর আপনি মাঝারির দাম বলছেন চার ! (ভাল বাংলা বলতেন)। স্কটিশদের কৃপণতা সম্বন্ধে মজার-মজার গল্প আছে। একটা বলি। একজন স্কটিশ ভদ্রলোক গল্‌ফের ছোকরা ভাড়া করে সারা সকাল তিন ঘণ্টা ধরে খুব গল্‌ফ্‌ খেললেন। গল্‌ফের থলি ও বাড়তি লাঠি ও বল যে বইত তাকে বলত ক্যাডি। মহা খুশি হয়ে ক্যাডিকে তার তিন ঘণ্টা মজুরির সঙ্গে তিন পেনি বকশিস দিলেন। ক্যাডি ছোকরা বকশিসের বহর দেখে ভীষণ চটে গেছে। বলল, সার, আমি গণৎকারও বটে, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আপনার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বলতে পারি তার জন্যে আপনাকে বাড়তি বকশিস দিতে হবে না, এতেই হবে। ভদ্রলোক তো মহাখুশি, বিনা পয়সায় ভাগ্যগণনা ! বললেন, হ্যাঁ বল। ছোকরা বলল : 'বর্তমান বলি, আপনি ব্যাচিলর (অকৃতদার)।' ভদ্রলোক মহাখুশি, বললেন, ঠিক মিলে গেছে। 'আপনি ভবিষ্যতেও ব্যাচিলর থাকবেন ?' ভদ্রলোক আরো খুশি। 'এবার ভূতটা বলি, আপনার বাবাও ছিলেন ব্যাচিলর', বলেই

ভদ্রলোক হৃদয়ঙ্গম করার আগেই ভোঁ দৌড়। আগেই বলেছি কৃষ্ণনগরে আমরা ভাল বাবুর্চি পেয়েছিলুম, তাকে আমরা ক্যাম্পে নিয়ে গেছলুম। ক্যাম্পে এসে সব-রকমের উপকরণ চাওয়ামাত্র পাওয়াতে তার রান্নার হাত আরো খুলে গেল।

ডিরেক্টর অভ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ ছিলেন রায়বাহাদুর নেপালচন্দ্র সেন। আগেই বলেছি তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন এবং খুব ভাল ঠিকুজি করতেন এবং দেখতে পারতেন, আমি জন্মালে আমার ঠিকুজি করেও দেখেছিলেন। তিনি এলেন আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্প চালু করতে। দেখে ভাল লাগল, তিনি যদিও প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের লোক ছিলেন, তবু সর্বভারতীয় সার্ভিসের অফিসারদের সঙ্গে আচারে ব্যবহারে সমান সমান ভাব দেখাতেন। কোনরকম মাথা নিচু করার ভঙ্গি করতেন না। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি অল্প কথায় জমি, জরিপ ও ভূমিস্বত্ব নথিবদ্ধ করার প্রতিটি ধাপ পরিষ্কারভাবে পরপর বুঝিয়ে বললেন। প্রথমে করলেন সব-কিছুর তত্ত্ব ব্যাখ্যা, তারপরে সব অঙ্গগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ। তারপর এল জরিপ ও নথি ঠিকমত অনুধাবন করতে শিখলে তাদের থেকে বাংলার গ্রামের সামাজিক-অর্থনৈতিক পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার একটি পূর্ণ চিত্র কী করে পাওয়া যায়। বাবা নেপালবাবুর প্রশংসা কেন এত করতেন এই ব্যাখ্যা শুনে বুঝলুম। ১৯৪৪-৪৫ সালে কার্শিয়াঙে কাজ করার সময়ে ১৯২৪ সালে বাবার লেখা ডুয়ার্সের সার্ভে ও সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টটি যখন পড়ি তখন মনে হয়েছিল বাবার কাছে এই ধরনের ব্যাখ্যা শুনলে আমার কত উপকার হত।

নেপাল সেন ছিলেন যেমন তীক্ষ্ণধী, তেমনি বাংলায় যাকে বলে মাই ডিয়ার লোক, এবং কথার পিঠে তৎক্ষণাৎ কথা বলতে অদ্বিতীয়। ঝালকাটিতে একজন ভাল কানুনগো ছিলেন আমার থেকে বেশ কিছু বড়। একদিন তিনি নেপাল সেনের কাছে তাঁর পঞ্চম সন্তান জন্মের সুখবর দিতে এলেন। সেন শুনে চটে গিয়ে তাঁর অবিমৃশ্যকারিতার জন্যে তাকে খুব বকাবকি করলেন। কানুনগোটি অতি বিব্রতভাবে অজুহাত দিল, 'সার, ভগবানের হাত, আমি কি করতে পারি।' 'যদি ভগবানের হাতকে সামলাতে না পারো তবে সেটি তো কুচ করে কেটে ফেলতে পারো, সেটিতো অন্তত তোমার হাতে!' কানুনগোটি পালিয়ে গেল। অন্য এক সময়ে সেন নিজের দোষে নিজের অপমান ডেকে আনার কথা বললেন। তরুণ অ্যাসিস্টাণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার হিসাবে তিনি তাঁর ডিরেক্টর অভ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্-এর কাছে ছুটে গিয়ে সুখবরটি দিলেন, তাঁর তিনশ' টাকা মাইনের উপর দু'বছর পরে মাসে পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। ডিরেক্টর তখন মাইনে পেতেন দু'হাজার

টাকা। প্রতি বছর বৃদ্ধি হচ্ছিল ১২৫ টাকা করে। তিনি সেনের কথা শুনে মুখ খুলে শূন্যের দিকে চেয়ে বললেন : সরকার সর্বত্র এত করে মাইনে বাড়ানোর টাকা কোথা থেকে পায়, তিনি ভেবে পান না।

জয়েণ্ট ক্যাম্প শুরু হল জরিপ ও জমিস্বত্ব নথিভুক্ত করার প্রতিটি ধাপ বিশদ-ভাবে বর্ণনা করে। হ্যাচবার্নওয়েলের বক্তৃতায় আমি একটু নিরাশ হলুম। রান্না-খাওয়ায় যত উৎসাহ, ন্যায্য কাজে তত্টা দখল নয়। অন্যপক্ষে অরুণ মুখার্জি তখন কুষ্ঠিয়া থেকে এসে চার্জ অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছেন, তাঁর বক্তৃতায় বেশ সুন্দর, পরিপাটি একটি ছক পেলুম।

আমরা শিখলুম কী করে প্লেন টেবিল পাততে হয়, থিয়োডোলাইট লাগাতে হয়, গাণ্টার চেন দিয়ে মাপতে হয়, ম্যাপের কাগজে দুটি কো-অর্ডিনেট ছকতে হয়। সেই সঙ্গে কাগজের উপর গ্রামের জমির বিশিষ্ট কোন আয়তনের এক একটি বড় চৌকোণা খণ্ড বেছে মানচিত্র করা শুরু করতে হয়, যার চতুর্দিকে সহজে চেনার মত ভৌগোলিক চিহ্নগুলি আঁকা থাকবে। যথা বড় বট গাছ বা পুরনো মন্দির, রাস্তার চৌমাথা, বা পুরনো বড় কুয়া। তারমধ্যে ছোট ছোট জমির চৌহদ্দি লিখিতভাবে বসিয়ে সারা কাগজটি ভরাতে হবে। এই বড় চৌখুপীকে জরিপে ভাষায় বলত 'মোরব্বা'। ছোট ছোট জমির চৌহদ্দি বসানো হত এই বড় চৌহদ্দির জমির উপর এদিক ওদিক গাণ্টার চেন চালিয়ে, প্রতিটি জমির মাপ নিয়ে ছোট জমিগুলির মাপ ও চৌহদ্দিগুলি কাগজে বসিয়ে। প্রতিটি ছোট জমিকে বলত 'দাগ'। মাপ হত একটি বিশেষ 'স্কেলে' : যেমন জরিপের কাগজে ১৬ ইঞ্চি লম্বাকে বোঝাত এক মাইল ইত্যাদি। এই হল সংক্ষেপে জরিপের নিয়ম। জমি স্বত্বের নথি তৈরি হত প্রতি দাগের জমিতে আসলে কার স্বত্ব কার দখলে, কে আসলে চাষ করে, কী স্বত্বে ও শর্তে সেই চাষ হয়। আমি জরিপে যত সুবিধা করতে পেরেছিলুম, তার থেকে জমি-স্বত্বের নথিতে ছিল আমার বেশী উৎসাহ। উপর থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে, অর্থাৎ সরকারি জমির রাজস্ব কে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত কে চাষ করে, ফসল কার মরাইতে তোলে, কার ঘরে কতখানি তোলে তার হিসাব বার করা। জমিতে আসলে কে চাষ করে, ফসল ফলায়, তার থেকে উপরের দিকে উঠে উঠে শেষে কে রাজস্ব দেয় অন্যদিক থেকে সে হিসাবও করতে হয়। এই দুটি ধারার মধ্যে যে বৈষম্য থাকে তাকে আবার মেলাতে হয়। কারণ, দুটির প্রতিটি ধারাতেই মধ্য-শরিকদের নাম ও স্বত্ব লুকোবার অভিলাষ থাকে প্রবল। দুদিক থেকে ফিরে ফিরতি কাজ করলেই আসল সত্যটি কিছু বার হত।

জরিপের লোককে বলত আমিন। নথির খসড়া, খতিয়ান ও সেগুলি জমির সঙ্গে যাচাই করার অধিকারীকে বলত কানুনগো। ১৯৪১ সালের ঝালকাঠিতে চাষ জমিতে স্বত্ব, মধ্যস্বত্ব, অধীনস্বত্ব, কর্ষা, কোলবর্ষা, কোল-কোলকর্ষা ইত্যাদি অনেক জটিল স্তর থাকত। এই শতকের প্রথম দিকে বীটসন বেল যখন বরিশাল জেলার সেটল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলেন তখন তিনি একই জমির প্রায় চৌষট্টিটি মধ্য ও নিম্ন স্তর পেয়েছিলেন। উপরন্তু একই লোক একই জমিবিলির নথিপত্রে স্বত্ব, উপস্বত্ব, মধ্যস্বত্ব, নিম্নস্বত্ব নানা স্তরে ঘুরে ফিরে একাধিকবার আসতেন। তেমনি একই জমির টুকরো নানা স্বত্বের দলিলে সব মিলিয়ে খুব জটিল স্নেক্স্ এণ্ড ল্যাডার্সের খেলার মত উপর নিচে ওঠা নামা করত। সব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যেত কী কৌশলে জমিদাররা গ্রামের উঁচু ও নিচু জাতির হিন্দু মুসলমান, উপজাতি-দের নিজেদের সামাজিক ও আর্থিক অধীনতায় বা তাঁবে রাখতেন।

খানাপুরির পর আসত বুঝারত। একই জমির স্বত্বের মালিকদের ডেকে সমস্ত নথিগুলি পর্যায়ক্রমে যাচাই করা হত। তার নাম বুঝারত। এই যাচাইয়ে ধরা পড়ত কোন ভুল-চুক বা কোন স্বত্বের মালিক নথি থেকে বাদ পড়েছে কিনা। যাঁচ। এটি হচ্ছে সেট্‌ল্‌মেণ্টে সব থেকে জটিল জরিপ ও নথির কাজ ছিল, আমার মতে, 'দিয়ারা'র নদীর ভাঙ্গনে যে সব জমি নদীগর্ভে গিয়েছে অর্থাৎ শিকস্তি হয়েছে, এবং কালের কৃপায় বেশ কিছু বছর পরে নদীগর্ভ থেকে জেগে উঠে চর বা পুরনো জমির সংলগ্ন, বা পয়স্থি হয়েছে, তার ভৌগোলিক অবস্থান ও পূর্বস্বত্ব নির্ধারণ করে, বর্তমান কালের উত্তরাধিকারীর নথি পর্যন্ত আসা। তাই দিয়ারা ব্যবস্থার প্রথম ধাপ ছিল জমি নদীগর্ভে যাবার আগে এবং পরে কিরকম ভৌগোলিক অবস্থায় আছে সঠিকভাবে নিরূপণ করা, তারপর তাদের পূর্বের স্বত্বাধিকারীরা কে কে ছিলেন তা নির্ণয় করা। এ বড় শক্ত, জটিল ও কালক্ষয়কারী কাজ। আমার চার মাস শিক্ষানবিশী পূর্ণ হয়নি বলে আমি এ কাজ আদৌ শিখিনি। আসলে এ কাজ ভালভাবে শিখতে হলে আমার বিশ্বাস একাধারে জেস্যুইট যাজকদের মত চুলচেরা তর্ক ও বিচার করার মত ক্ষুরধার বুদ্ধি, অন্যদিকে তাঞ্জোর মিরাশদারদের মত তীক্ষ্ণ ও গভীর সাংসারিক চতুরতা ; তৃতীয়ত, বাঙালি কানুনগোর সুগভীর অভিজ্ঞতা, তিনেরই একসঙ্গে প্রয়োজন।

প্রায় দু'মাসের সেট্‌ল্‌মেণ্ট জীবন থেকে একটি অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবন ধরে বিশেষ কাজে লেগেছে। যদি কোন জটিল ও কঠিন কাজে মনপ্রাণ ঢেলে অধ্যবসায় সহকারে কাজ করার লোকের প্রয়োজন হয় তবে খোঁজ করতে হবে

আগে যাঁরা আমিন বা কানুনগোর কাজ করেছেন তাঁদের। এত অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, দক্ষতা, এক কথায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জন্যে এত আগ্রহ, খুব দুর্লভ। ভাগ্যক্রমে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস কাজে এবং পরে ১৯৬১ সালের সর্বভারতীয় সেন্সাসে আমি সেট্‌ল্‌মেণ্টে কাজ করা অনেক কর্মীকে সহকারী হিসাবে খুঁজে পেতে যোগাড় করি।

ত্রিশে ডিসেম্বর ঝালকাটিতে যুগ্ম ক্যাম্প ভেঙে গেল। বিজয় আচার্য তখন ছিলেন বরিশালের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর স্ত্রী নীলিমা। তাঁদের সঙ্গে আমরা বড়দিনের দেড় দিন ও নতুন বছরের দেড় দিন কাটাই। বিজয়ের মা, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের স্ত্রী, তখন ওঁদের সঙ্গে ছিলেন। বিক্রমপুরের মেয়ে। যদিও সারাজীবন কলকাতায় কাটে, তবুও যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর উচ্চারণে ছিল কট্টর বিক্রমপুরী টান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

আই-সি-এস মি: 'ক' এর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের গল্প শুনে আমাদের হাসিতে পেট ফাটার দাখিল হত। ১৯৩৭ সাল নাগাদ 'ক' মেদিনীপুর জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। সরকারের আশা ছিল তিনি তাঁর বুদ্ধি, সমবেদনা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সেই দশকে ও তার আগে মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হয়, তা শান্ত করতে পারবেন। তাঁর আগে একের পর এক কয়েকজন বৃটিশ কালেক্টর ও অফিসার সন্ত্রাসবাদীদের গুলি খেয়ে প্রাণ হারান। 'ক' এসে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসপন্থীদের হৃদয় জয় করেন, এমনকি কয়েকজন নামজাদা সন্ত্রাসবাদী পরিবারেরও। তিনি বড় বড় জমিদারদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করেন। যেমন নাড়াজোল, ঝাড়গ্রাম, তমলুক ইত্যাদি। অন্যদিকে জেলাশাসক হিসাবেও তিনি বেশ দৃঢ় ছিলেন।

১৯৩৮ সালে বিজয় তমলুকের এস্‌-ডি-ও হয়ে যান। কিছু পরেই তাঁর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 'ক' তমলুক সফরে আসেন। একটি উদ্দেশ্য ছিল ছোকরা এস-ডি-ওকে কিভাবে মহকুমার লোকের হৃদয় জয় করতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ দেবেন। মহিষাদলের গর্গ পরিবারের কর্তা তাঁকে স্টেশনে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বিজয় তাঁর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বিজয়ের মা বললেন, পৌনে একটার সময়ে 'ক' বিজয়ের বাড়িতে এলেন, ভারিক্কি স্বরে বিজয়কে নানা ধরনের উপদেশ দিতে দিতে। বিজয়ের মাকে দেখে তিনি ব্যবহারে দূরত্ব রেখে সবিনয়ে

নমস্কার করলেন, কিন্তু কথাবার্তায় আগ্রহ দেখালেন না। বিজয়ের সঙ্গেই ঊর্ধ্বতন অফিসার হিসাবে ইংরেজিতে কথা বলে চললেন। বিজয়ের মা টেবিলের একপ্রান্তে বসে 'ক' আর বিজয়ের পাতে প্রয়োজন মত পরিবেশন করে চললেন। হঠাৎ তাঁদের দুজনের আলাপে বাধা দিয়ে বিজয়ের মা তাঁর খাঁটি বিক্রমপুরী টানে 'ক' কে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার দেশ বুঝি বিক্রমপুর ?' 'ক' চমকে উঠে ধরা গলায় বললেন, 'হাঁ, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন ?' ভদ্রমহিলা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনার ইংরাজির টানেই বুঝছি।' 'ক' এই কথা শুনে যেন চুপসে গেলেন। মুখে যখন কথা ফিরে পেলেন তখন বাংলায় শুরু করলেন।

অরুণকুমার মুখার্জি ও বিজয় আচার্য কয়েক বছর আগে মারা যান। বিজয়ের স্ত্রী নীলিমা মারা গেলেন ১৯৯১ সালের মে মাসে। তাঁদের তিনজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অংশ শেষ করি।

গৌরনদীতে ভাঙ্গা ক্যাম্প

গ্রীষ্মের ছুটির পর আমাদের যুগে ছেলেমেয়েরা যেমন ব্যাজারমুখ করে স্কুলে যেত—আজকাল তারা কী করে ঠিক জানি না—তেমনই ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি জামান, আভা আর আমি দুপুরের আহারের পরে গৌরনদীর পথে রওনা হলুম। বেলা চারটের সময়ে গৌরনদী পৌঁছলুম। বাংলার জীবন ও ইতিহাসে নানা পেশা, জীবিকা, চাকরি, রাজনৈতিক সংগ্রামে, পাণ্ডিত্যে, সামাজিক জীবনের ইতিহাসে যাঁরা বিশেষ নাম রেখে গেছেন তাঁদের অনেকেরই গৌরনদী ও পার্শ্বস্থ গৈলা গ্রামে আদি নিবাস ছিল। দুটি গ্রামই বর্ধিষ্ণু ও সংস্কৃতিতে অগ্রণী ছিল।

গৌরনদী গ্রামে আমি জীবনে সব থেকে অন্যায় ও অভদ্র আচরণ করি। এর জন্য অবশ্য আমি আর জামান দু'জনেই সমান দায়ী, বরং আমার মনে হয় জামান না থাকলে আমি বোধ হয় ততটা বেয়াদপি করতুম না। কিন্তু দু'জনেই যদিও একই শাস্তি পেয়েছি তবু যেহেতু আমার জন্যই ঘটনাটি মুখ্যত ঘটে, সেজন্য বাড়তি দায়িত্ব আমাকে নিতেই হয়। গৌরনদীর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাকবাংলায় আগে থেকে আমরা থাকার অনুমতি চেয়ে লিখিতপড়িত ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম। পৌঁছে দেখি জেলা বোর্ডের দুটি অফিসার আমাদের জন্য বরাদ্দ দুটি ঘরই দখল করে আছেন। আইনত ডাকবাংলার ঘরের উপর দাবি তাঁদেরই সব থেকে বেশী. অতএব তাঁরা কিছু অন্যায় করেননি। সম্ভবত দুজনের কেউই মনে করেননি যে

বছরের প্রথম দিনে—এবং তখন সেটি ছুটির দিন হত—আমরা কাজপাগল হয়ে ছুটে আসব। বিশেষত যখন প্রথা ছিল আগের দিন সারারাত হৈ হল্লা করে কাটানো। অফিসার দুটি ভদ্রতা করে পরের দিন দুটি ঘরই ছেড়ে দেবেন বললেন, তবে ঐ রাত্রে তাঁরা একটি ঘর নিজেদের জন্য রাখতে চাইলেন। এ প্রস্তাবে খুব বেশী অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের জেদ চেপে গেল, আমাদের অধিকার ছাড়ব কেন? এই অধিকারের লড়াই-এর পিছনে অবশ্য চাকরির গরমও ছিল। ফলে আমরা ভদ্রতা, সভ্যতা, বংশগত শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাঁদের ঘর খালি করতে বাধ্য করলুম। তাঁরা চলে গেলেন। আমরা সদর্পে দুজন দুই ঘর দখল করলুম। ভুলে গেলুম যে মাথা ফুলে গিয়ে আমি হয়ত আর সিভিল থাকব না।

দিন বেশ তাড়াতাড়ি কাটল। অফিসাররা সদরে গিয়ে নালিশ করায় জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসারের কাছে অনুযোগ জানালেন। আমরা যদি ইংরেজ হতুম, তাহলে ব্যাপারটা হয়ত এতদূর গড়াত না, ইংরেজ সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দু'পক্ষকে ডেকে মিষ্টি কথায় মিটিয়ে দিতেন: আমি জানি ১৯৪৩ সালে এই ধরনের একটি ঘটনায় দায়ী হয়ে নারায়ণগঞ্জের এস-ডি-ওকে কোন হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি। কিন্তু পরে যখনই বিষয়টি সম্বন্ধে ভেবেছি তখনই মনকে বুঝিয়েছি, যা হয়েছিল ভালর জন্যই হয়েছিল, তার কারণ জীবনে দ্বিতীয়বার এ ভুল করিনি। এ-ডব্লিউ হ্যাচবার্নওয়েল মৃদু ভর্ৎসনা করে আমাকে আর জামানকে একটি করে চিঠি লিখলেন, আমরা যেন জেলাবোর্ডের চেয়ার-ম্যানকে লিখি তাঁর দুটি অফিসারকে আমাদের ক্ষমাপ্রার্থনা জানিয়ে। আমরা হয়ত তাই করতুম, যদি না হ্যাচবার্নওয়েল উপর-পড়া হয়ে তিনদিনের দিন—অর্থাৎ যেদিন তাঁর চিঠিটি এসে পৌঁছল, সেদিনই—নিজে গৌরনদী বাংলায় বিকালে হাজির হয়ে আভার সমুখে আমাদের উপর বকাবকি না করতেন। এ অবস্থায় অবশ্য জামানের মেজাজ খারাপ হওয়া ন্যায্য, আমার নয়। ফলে আমরা তাঁর উপর মেজাজ দেখিয়ে তাঁকে ফেরৎ দিলুম।

মার্চ মাসে যখন আমি মুন্সীগঞ্জে, তখন আমার কাছে চীফ সেক্রেটারীর একটি কড়া আদেশ এল, চিঠি পাবামাত্র আমি যেন জেলাবোর্ডের অফিসার দুটি আর হ্যাচবার্নওয়েলের কাছে বিনাশর্তে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখি এবং সেইসঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনার কথা যেন চীফ সেক্রেটারিকেও জানাই। তা যদি না করি তাহলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমি সেইমত লিখলুম। এর এক মাস পরে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে-এল লিউয়েলিনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম যে

ঘটনাটির বিষয়ে আমার চাকরির খাতায় একটি বিরূপ মন্তব্য নথিবদ্ধ করা হয়েছে। সেই ছোট চিঠিতে লিউয়েলিন নরমভাষায় আরো লিখলেন, তিনি আশা করেন যে ভবিষ্যতে আমার কাজ দিয়ে আমি এই বিরুদ্ধ মন্তব্যটিকে নাকচ করাবার চেষ্টা করব। আরো লিখলেন, একজন আই-সি-এস অফিসার হয়ে আমি যেন নিজের হকের থেকে পরের হক রক্ষা করতে সর্বদা বেশী সচেষ্ট হই এবং আমি যেন এমন কিছু না বলি বা করি যার জন্য জনসাধারণের চোখে আমাকে খেলো বা নিচু হতে হয়।

এই ঘটনাটি ছাড়া গৌরনদীতে আমাদের একমাস বেশ শান্তিতে কাজ শিখে কাটে। একই জমিতে কতরকম স্বত্ব, উপস্বত্ব হতে পারে সে জটিল ধাঁধার উদ্ধার করতে গিয়ে চোখের সমুখে এমন এক পরভুক জগতের অলিগলি খুলে গেল যার কথা শুনেছি বা পড়েছি মাত্র, কিন্তু নিজের চোখে দেখব মনে করিনি। সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টে এসব বিষয়ে পড়া এক জিনিস আর প্রত্যক্ষ সবকিছু দেখা ও জানা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বহু যুগ ধরে কত সব অদ্ভুত ছোট ছোট বন্ধন—শৃঙ্খল বলাই বেশী ঠিক হবে—জীবনের প্রতি ধাপে ও পাকে বাংলার জীবনে শোষণব্যবস্থার প্রাসাদকে অভ্রভেদী করে তুলেছে, গৌরনদীতে নিজের হাতে খসড়া খতিয়ান লেখা না শিখলে কখনই মনে অত ভালভাবে গেঁথে যেত না।

গৌরনদীতে এই চার সপ্তাহ ধরে আমরা আমিন ও কানুনগোদের চেষ্টায় এবং নিজেরা যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করে শিখলুম, কী করে আমাদের সমাজের স্তরের পর স্তরে, ভণ্ডামি, দুমুখো কথা আর কাজ, লোকের ক্ষতি করার প্রবণতা ও ক্ষমতা, দেশের চৈতন্যের গভীরে আশ্রয় নিয়েছে, বিশেষত আমাদের কৃষিনির্ভর গ্রামসমাজে। এইসঙ্গে বুঝলুম এই চরিত্রবিকারের পিছনে আমাদের সরকারী কাঠামোয় ছোটবড় আমলা ফয়লাদের ঘাঁতঘোঁত বুঝে, সময়সুবিধামত, কলকাঠি নাড়ার সুযোগ কত সর্বব্যাপী। বিশেষত যদি সেইসব সুযোগ রাজনৈতিক ক্ষমতার সেবায় নিযুক্ত হয়। একদিকে চৌথালা, অন্যদিকে লালুপ্রসাদ, আরেকদিকে জঙ্গল সাঁওতাল কি একদিনে হয়!

দৃষ্টান্ত হিসাবে সামান্য এক আধটি কথা বলি। জামান আর আমার সমুখে, যে সব গ্রামবাসী তাঁদের স্বত্ব নথিভুক্ত করাতে আসতেন, তাঁরা এমন ভাব দেখাতেন যে আমাদের আমিন বা কানুনগো নিতান্ত নিম্নস্তরের কর্মচারী। এটা যে নিতান্ত লোকদেখানো নাটক সে গ্রামবাসীরাও জানতেন, আমিন কানুনগোও জানতেন। দিনের শেষে যখন আমরা ডাকবাংলায় ফিরে যেতুম তখন আমিন

কানুনগোই হতেন গ্রামের একচ্ছত্র রাজা। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁরা যে সমীহ ও সম্মান পেতেন তার থেকে আমরা অনেক গুণ কম পেতুম। তার কারণ, গ্রামবাসীর জীবনমরণের কাঠি ছিল তাঁদের হাতে, এক কলমের খোঁচায় তাদের সব স্বত্ব, উপস্বত্ব ওলটপালট করে দিতে পারতেন, সেই ক্ষতি রদ করতে তাদের প্রাণান্ত হতে পারত। এক মুহূর্তে একান্ত দাসোচিত ব্যবহারের বদলে দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তার মত ব্যবহার করা তাঁদের পক্ষে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক ও সহজ ছিল।

একদিন সকালে জরিপের প্লেন টেবিলের চারদিকে আমরা কাজ করছি, আর গ্রামের লোকরা সকৌতূহলে দাঁড়িয়ে দেখছে, এমন সময়ে গ্রামের একজন লোক সন্ত্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দফাদার সাহেব!' গলার স্বরে যেমন সম্ভ্রম তেমন ভয়। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি দূরে সামান্য একটু ধুলোর রেখা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ সামান্য ধুলোর রেখা ফুলে একটা ধুলোর মেঘের আকার ধারণ করল, পরমুহূর্তে দেখি তার আগে একজন টাট্টু ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে আসছে। পাঠকের মনে থাকতে পারে, দশ বারোজন চৌকিদারের মাথায় হত একজন করে দফাদার। গ্রামের লোকগুলি বলল দফাদারটি ঐ অঞ্চলের বিশেষ বিত্তবান ব্যক্তি, আমাদের সকলকে প্রায় কিনে নিতে পারে। ষাট একরের উপর সবথেকে উর্বর খাস জমি, প্রতি বছরে নিজের হাতে কম পক্ষে তিনটি ফসল হয়। তাছাড়া ভাগে অন্য জমিও আছে। ছেলেরা মহকুমা অফিসে বেশ ভাল সরকারি কাজ করে। দফাদার হিসাবে মাসে যে চোদ্দ টাকা পায় তাতে তার কোন প্রয়োজনই মেটার কথা নয়, নিজেই হয়ত ঐ মাইনেতে ডজন ডজন লোক নিত্য খাটায়। তবে কেন দফাদারের কাজ করছে? টাকার জন্য নয়, দফাদারের কাজে কর্তৃপক্ষের কাছে যে দরবার করার সুযোগ তার আছে, তাই থেকে সে পায় গ্রামের লোকের জীবনমরণ চালনা করার শক্তি, সেই শক্তির জন্যেই সে ঐ মাইনেতে ঐ সামান্য পদে কাজ করছে। গ্রামের মুরুব্বি হতে গেলে যত দিক থেকে যত ক্ষমতা আহরণ করা যায় ততই ভাল।

১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে দুজনেই হঠাৎ একসঙ্গে একটি করে তার পেলুম, পত্রপাঠ নতুন পদে যোগ দেবার আদেশ। জামানকে এস-ডি-ও হয়ে যেতে হবে বীরভূমের রামপুরহাটে, আমাকে মুন্সীগঞ্জে। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে, যত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছতে হবে। ৩০ জানুয়ারি কাজ শেষ করে পাততাড়ি গোটালুম। সার্ভের গুরুদের কাছে, স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছে, গ্রামবাসীর কাছে বিদায় নিয়ে সেদিন, অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা বরিশাল শহরে ফিরে

গেলুম। বরিশালে অরুণ মুখার্জি ও বিজয় আচার্য দু'জনেই আমাকে এস-ডি-ও হিসাবে কোর্টে কী কাজ করতে হবে তার একটু তালিম দিয়ে দিলেন। যথা, কী করে জেনরল ফাইল করতে হয়। জেনরল ফাইল হচ্ছে—যেসব অপরাধের জন্য পুলিশের কাছে নালিশ চলে না, নিজের থেকেই এস-ডি-ওর কাছে সরাসরি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে হবে। জেনরল ফাইলের কেসে যার বিরুদ্ধে নালিশ তার উপর নিজের খরচায় আদালতের সমন জারি করিয়ে প্রতিবাদী হিসাবে আদালতে হাজির করাতে হয়। ইতিমধ্যে, গৌরনদীতে আমাদের দুরাচারের সংবাদ ফলাও করে প্রচার হবার ফলে বিজয় ও অরুণ সেই সুযোগে আমাকে সদাচার ও সদালাপ সম্বন্ধে ভাল করে তালিম দিতেও ছাড়ল না। ৩ ফেব্রুয়ারি আমরা অরুণের সঙ্গে মুন্সীগঞ্জ-ঢাকার স্টীমারে চড়লুম। অরুণ বিয়ে করার জন্য ঢাকায় গেল, আমি গেলুম শিক্ষানবিশীর শেষে একা এক মহকুমার সমস্ত ভার নিতে। মনে হল সরকার যেন আমাকে সাঁতার শেখার জন্যে হাত পা বেঁধে মাঝদরিয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

১৯৪১ সাল

১৯৪১ সালে সারা বছর আমার ছোট্ট ব্যক্তিগত জগতে যা ঘটেছিল এতক্ষণ তার বিবরণ দিলুম। ওদিকে জগতে ও ভারতে সর্বত্র সংকট ঘনিয়ে আসছিল। ভারতে বৃটিশ শাসন, ইওরোপে নাৎসী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের আর্ত চিৎকার আর মানুষের উপর দুর্মর বিশ্বাসের কথা আগেই লিখেছি। সত্যি কথা বলতে, বৃটিশ সরকারের অধীনে ভারতে তখন যাঁরাই কাজ করছিলেন তাঁদের মনে ও বিবেকে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠিত ভাষণ নিশ্চয় গভীর বিষাদ আনে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে গভর্নর জেনরল লিন্‌লিথগোর সঙ্গে বিশদ আলোচনার পর গান্ধীজি কাগজে যে বিবৃতি দেন, ইংলাণ্ড থেকে কলকাতায় ফেরার পর আমি সে বিষয়ে জানতে পাই। ৩ অক্টোবর তাঁর বিবৃতিতে গান্ধীজি বলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে :

> "বৃটিশ রাজনীতিবিদরা ঠিক কাজটি করা যে সময়ে সহজ ছিল তখন সেটি করলেন না। বৃটিশরা যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীয় বীরত্ব দেখাচ্ছেন। কিন্তু নীতির জগতে সামান্য ঝুঁকি নেবার সাহসও তাঁদের নেই। বৃটিশ রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যের আদৌ কোন স্থান আছে কিনা সেবিষয়ে আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়।"

তার দু'দিন পরে তিনি এমন কয়েকটি কথা ব্যবহার করলেন, যার ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে তিনিই একমাত্র লোক, এমন-কি নেহরুও নয়, যিনি ইংরেজদের শুধুমাত্র রাজযোগ্য ভদ্রব্যবহারে ভোলার নয়—যে ভদ্রব্যবহার মাতব্বরিরই নামান্তরমাত্র এবং যা মুখোশ হিসাবে প'রে ইংরেজরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করে। ৫ অক্টোবর লিন্‌লিথগোর সঙ্গে আলোচনার ওপর তিনি তৃতীয় একটি বিবৃতি দিলেন :

"আপনার সঙ্গে দেখা করার আগেই তিনি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, (যদিও) অবশ্য উনি এমনভাবে কথা বলেন যাতে তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ ধারণা আপনার না হয়। দুই ভদ্রলোক (আলোচনার মধ্যে দিয়ে) যে একমত হতে পারেন বা কোন চুক্তিতে আসতে পারেন একথা তিনি বিশ্বাস করেন না।"

বিবৃতির শুরুতেই গান্ধীজি বললেন :

"বৃটিশ সরকারের জগতে এমন এক মাপজোপকরা দূরত্বের শীতলতা থাকে যার থেকেই তাদের শক্তি আসে, যা তাদের পারিপার্শ্বিক ও আসল কথা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন থাকতে সাহায্য করে। কোন বিব্রতকর তর্কের মধ্যে ঢুকতে চায় না, ভদ্রভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করে। নিজেরা বরাবর অনমনীয় মনোভাব নিয়ে থাকবে, কি ভাবছে সেই নিয়ে আপনি আপনার মত জল্পনাকল্পনা করতে পারেন। সে যাই হোক, আমি কিন্তু হার মানব না।"

পরে, যখন মাউন্টব্যাটেন তাঁর রাজকীয় বদান্যভাব ও ভদ্রতার আতিশয্যের মুখোশ পরে পণ্ডিতজিকে ডিগবাজি খাওয়াচ্ছেন তখন আমার প্রায়ই গান্ধীজির এই কথাগুলি মনে পড়ত এবং ভাবতুম, পণ্ডিতজি তো বিলেতে মানুষ, কিন্তু ইংরেজদের চরিত্রে এই মিছরির ছুরি ভাবটা কি তিনি ঠিকমত মনে রাখেন! আমার স্পষ্ট মনে আছে, গান্ধীজির এই বিবৃতির সময়ে আমি আমার তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী ব্ল্যাণ্ডির সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন এই কথাগুলি আমার মনে তপ্ত শেলের মত বিঁধেছিল।

গান্ধীজির উক্তির প্রায় একমাস পরে, অর্থাৎ ১৯৪০-এর নভেম্বরে, গোরখপুরের যে কোর্টে তাঁর বিচার হচ্ছিল সে-কোর্টের জজকে নেহরু বলেছিলেন যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে বৃটেনের অধিকাংশ লোকের মনে তাদের সাম্রাজ্য ব্যাপারে একান্ত ক্লান্তি এসেছে, তারা সত্যিকারের এক নতুন যুগের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। তখন আমার মনে হয়েছিল, সত্যিই কি তাই? হ্যাঁ, চিরকালই যেমন হয়,

তেমনি, মুষ্টিমেয় কিছু লোক নিশ্চয়ই ক্লান্ত ও লজ্জিত এবং তাঁদের কল্যাণেই চিরকাল ইংলণ্ডের এত মাহাত্ম্য, এত সম্মান। কিন্তু, অধিকাংশ লোক? আশির দশকেও তো দেখি, 'রাজ' সম্বন্ধে তাদের নেহরুকথিত ক্লান্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের লড়াই নিয়ে লাফালাফি, লণ্ডনে ও সারা দেশময় বিজয় উল্লাস ও শোভাযাত্রা (যদিও ফকল্যাণ্ডে মুখোমুখি লড়াই করে জেতে গুর্খারা, বীর ইংরেজসেনা নয়), হারানো 'রাজ' নিয়ে ত্রিশ বছর ধরে ন্যক্কারজনক কান্নাকাটি, তার সঙ্গে আমাদের দেশের 'শতরঞ্চ কি খিলাড়ি' ও কলকাতা ৩০০ উৎসবে বামফ্রণ্ট সরকারের ইংরেজ সরকার নিয়ে মাতামাতির কথা ভাবলে, নেহরুর আকুতি ও ওকালতির থেকে ইংরেজ-চরিত্রে গান্ধীজি-উক্ত বিদ্বেষ আর সমবেদনার অভাব অনেক বেশী যথার্থ বলে আমার বরাবর মনে হয়েছে।

১৯৪১ সালের গোড়াতেই এমন এক ঘটনা ঘটল যার ফলে সকলে চমকে গেল। বিরাট এক নাটক হল। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে সরকার সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহান্তরীণ করে রাখে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাস পড়তে ছয়দিন অনশনব্রত অবলম্বন করার ফলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের বিষম অবনতি হয়। ২৭ জানুয়ারি তাঁর বাড়িতে হঠাৎ তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। পরের দিন, অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি সমস্ত সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে সে খবরটি ফেটে পড়ল। সুভাষচন্দ্রের ইওরোপে পৌঁছবার সংবাদ পাবার পর প্রকাশ পেল যে তিনি এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ১৬ জানুয়ারি পালিয়ে যান। বলাবাহুল্য ভারতীয় ও বৃটিশ গোয়েন্দাগিরির এত বড় পরাজয়ের সংবাদে সকলে বিশেষ উৎফুল্ল হয়; ভাবখানা ছিল, এত মাতামাতির শাস্তি কি হবে পরে ভাবা যাবে, এখন তো মাতামাতি করে নিই।

১৯৪১ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে ভারতের সাতটি বড় বড় কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে এমেরি আচমকা ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে কংগ্রেস শাসন বাতিল করে গভর্নরের শাসন চাপিয়ে দিলেন। ফলে, গান্ধীজি বলতে বাধ্য হলেন, হঠাৎ কিছু দৈব ঘটনা ঘটে যাবে, এমন কোন দুরাশা তাঁর আর নেই। আগেই বলেছি প্রায় তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৪ এপ্রিলের বাণীতে বৃটিশ শাসনের এমন নিন্দা করেন যার প্রতিধ্বনি সারা পৃথিবীময় শোনা গেল। ৪ জুন, যখন সকলেই জানে তিনি মৃত্যুপথযাত্রা থেকে বোধহয় আর ফিরবেন না, তখনও রবীন্দ্রনাথ এম-পি শ্রীমতী র‍্যাথবোনের বক্তৃতার তীব্র নিন্দা করেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন:

"পশ্চিমী সংস্কৃতি ঐতিহ্যে যা কিছু ভাল তার বেশ কিছু পরিচয় আমরা নিশ্চয় বৃটিশ মানস ও চিন্তার মাধ্যমে পেয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি আরো বলব যে এই পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আমার দেশবাসী যা পেয়েছে, যেটুকু শিক্ষা করেছে, তা সম্ভব হয়েছে বৃটিশদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের অনুরূপ বা তার থেকেও ভাল পরিচয় ও শিক্ষা অন্য যে কোন ইওরোপীয় ভাষার মাধ্যমে হতে পারত।"

জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে ২২ জুন, স্টালিন লাইন ভেদ ক'রে স্মলেনস্ক অধিকার করে ১৬ জুলাই, ইউক্রেনের গভীরে প্রবেশ করে ২৭ জুলাই। রবীন্দ্রনাথ মারা যান ৭ অগাস্ট, ২২ শ্রাবণ। শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এবং সম্ভবত গান্ধী ছাড়া, আমি অন্তত আর কোন ভারতীয়র কথা জানি না, যাঁর সম্বন্ধে, আমার মতে, লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর 'কোডিচে আটলান্টিকে'র এই উক্তিটি, অত সম্যকভাবে খাটে: "যখন আমি শিখছিলুম কী করে বাঁচতে হয়, ঠিক তখনই আমি শিখছিলুম কী করে মরতে হয়।"

১১ অগাস্ট ১৯৪১-এ রুজেভেল্ট ও চার্চিল 'আটলান্টিক চার্টার ফর লিবার্টি' সই করে বিশ্বময় ঘোষণা করেন। ১৪ অগাস্ট বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে ফজলুল হক এই ঘোষণায় বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করে স্বাগত জানান। সেই মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলার আইনসভাটি চালু ছিল, তার সঙ্গে বলা যায় যার নিজস্ব মন বলে কিছু ছিল। এই উল্লাসপ্রকাশে হার্বার্ট ও লিন্‌লিথগো, আমার বিশ্বাস, রুষ্ট হন। পাছে এই চার্টার ভারতের হৃদয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার আশা উদ্রেক করে, তা অচিরে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ৯ সেপ্টেম্বর চার্চিল হাউস অভ কমন্‌সে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, যে ভারত যাতে বৃটিশ কমনওয়েল্‌থে পূর্ণ ও স্বাধীন অংশীদার হতে পারে সেই কল্পে ১৯৪০-এর অগাস্টে তিনি যে ঘোষণা করেছেন বৃটেন সেটিকে এখনও চূড়ান্ত অভিপ্রায় বলে মনে করেন।

এমেরি, লিন্‌লিথগো ও হার্বার্ট সম্বন্ধে আমার যে বিতৃষ্ণা ছিল তার জন্যে তাঁদের কার্যকলাপ কতটা দায়ী এবং আমার নিজের মন কতটা দায়ী আমার পক্ষে গুণে গুণে নজির দেওয়া শক্ত। এটুকু আমি স্বীকার করব লিন্‌লিথগো সে সময়ে জিন্নার সঙ্গে, এবং হার্বার্ট একই সময়ে বাংলার মুসলিম লীগের সঙ্গে যেভাবে মাখামাখি করছিলেন তাতে আমার বিরূপতা বাড়ে। যেদিন, অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর, হাউস অভ কমন্‌সে চার্চিল তাঁর বক্তৃতা দেন, সেদিন ফজলুল হক সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সভ্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে লিয়াকৎ আলি খাঁকে এক পত্র

লেখেন। শুধু সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নয়, তার কার্যকরী কমিটি, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল থেকেও ইস্তফা দেন। ইস্তফাপত্রে তিনি এই কারণ দর্শালেন : প্রেসিডেন্টের হাতে যেসব অন্যায্য ও অসঙ্গত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করা হয়েছে তারই প্রতিবাদ হিসাবে তাঁর এই পত্র।

যেদিন, অর্থাৎ ১৯৪১-এর ১ ডিসেম্বর আমরা স্টীমারে ঝালকাটি চলেছি, সেদিন সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেরলো যে ফজলুল হক-মন্ত্রিসভা ইস্তফা পেশ করেছে। ৩ ডিসেম্বর ফজলুল হক, বলা যেতে পারে, তাঁর গৃহসংস্কার করলেন অর্থাৎ, তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্‌লিতে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা হলেন। ফলে, ৪ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিন, এইচ-এস সুরাবর্দি, ঢাকার নবাববাহাদুর, ও তমিজুদ্দিন খাঁ একটি বিবৃতি দিলেন, তাঁরা হক-মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, এবং কেন দিয়েছেন তার কারণও দর্শালেন। ১২ ডিসেম্বর ভারতরক্ষা আইনবলে শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলেন, তিনি জাপানের সঙ্গে দেশদ্রোহী সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী। ঐদিনই প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা হিসাবে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও ঢাকার নবাববাহাদুর দুটি বড় বিভাগের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন। ঠিক পরের দিনই—আমার মনে ধারণা হল জিন্না ফজলুল হকের কাজের বদ্‌লা নিলেন—জিন্না মুসলিম লীগ কাউন্সিল ও কার্যকরী সমিতি থেকে ফজলুল হককে বরখাস্ত করলেন। সেই সঙ্গে আরো আদেশ দিলেন যে ফজলুল ভবিষ্যতে কখনও মুসলিম লীগের সভ্য হতে পারবেন না। ১৯৪২-এর ২০ জানুয়ারি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বাংলার অর্থমন্ত্রী করা হল।

অ্যাংলো-সোভিয়েট চুক্তির ফলে ১৯৪১-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি-ফ্যাশিস্ট কনফারেন্স আন্তর্জাতিক অ্যান্টি-ফ্যাশিস্ট পিপ্‌ল্‌স্ ফ্রন্টের শাখা পদ গ্রহণ করে। একই সময়ে ভারত-সোভিয়েট সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সূচনা হিসাবে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। রাশিয়ার রাজদূত হিসাবে ঘোষিত ম্যাক্সিম লিটভিনফ ও তাঁর স্ত্রী নতুন কার্যভার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন যাবার পথে ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা ঘুরে যান।

ইওরোপে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। নাৎসীরা ১৯ সেপ্টেম্বর কিয়েভ দখল করে। আমেরিকা ও বৃটেন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলে এবং তার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়াকে রীতিমতভাবে অস্ত্রশস্ত্র দেবার কাজে তৎপর হয়। ১৯৪১-এর ১৬ অক্টোবর জার্মানরা মস্কোর ষাট মাইলের মধ্যে এসে পড়ে। সবগুলি সোভিয়েট দপ্তরকে

কুইবিশেভে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৬ অক্টোবর ওডেসার পতন হল, ২৪ অক্টোবর খারকভ পড়ল। সিবাস্টোপোলের অবরোধ—যার নাম পরে হল স্টালিনগ্রাড—শুরু হল ২৪ অক্টোবর। উত্তরে লেনিনগ্রাড জার্মানদের রুখে অটল রইল। তার কিছুদিন পরে ২৯ নভেম্বর রাশিয়ানরা মস্কো সেক্টরে প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। উত্তর আফ্রিকা থেকেও সুখবর আসতে শুরু করল।

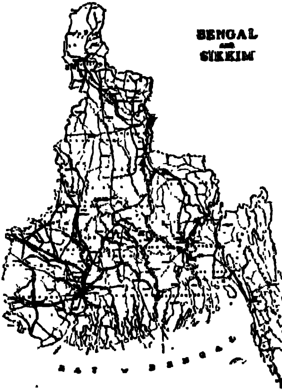
ইতিমধ্যে স্বপ্নের অতীত এক অঘটন ঘটল। ৭ ডিসেম্বর একদিন জাপান পার্ল হার্বার, হাওয়াই, বৃটিশ মালয়ে একসঙ্গে বোমাবর্ষণ করে, অর্থাৎ একই দিনের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক পরিক্রমা জুড়ে। ৮ ডিসেম্বর বৃটেন ও আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৬ ডিসেম্বর জাপান আত্ম-বিসর্জনকারী কামিকাজে রীতিতে প্লেনে আক্রমণ করে সিঙ্গাপুর বন্দরের কাছে দুটি তথাকথিত অজেয় বৃটিশ নৌজাহাজ এইচ-এম-এস প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ ও এইচ-এম-এস রিপাল্‌স্ ডুবিয়ে দেয়। হংকং জাপানের কাছে ২৫ ডিসেম্বর আত্ম-সমর্পণ করে।

ঝালকাটিতে যে সময়ে আমি ইম্পিরিয়াল ক্যাম্পে খানাপিনার সঙ্গে খসড়া-খতিয়ান নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি আর হ্যাচবার্নওয়েলের সঙ্গে ঝগড়া করছি, তখন, অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি, জাপান মালয়ের কুয়ালালামপুর দখল করে। বর্মা আক্রমণ করে ১৯ জানুয়ারি। জাপানের কাছে সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করে ১৪ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ আমি মুন্সীগঞ্জে পৌঁছবার দশদিন পরে। ইতিমধ্যে বর্মা থেকে উদ্বাস্তুরা স্থলপথে ভারতাভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। তখন বুঝতে পারিনি, এখন সবকিছু স্মরণ করলে বুঝতে পারি, সারা জগতে তখন যে বিপর্যয় ঘটছিল তার অনুপাতে আমার জগৎ কত ছোট্ট, নিতান্ত নগণ্য আর অলীক ছিল।

১৯৪২-এর ৫ ফেব্রুয়ারি আমি যখন মুন্সীগঞ্জের এস-ডি-ও হিসাবে ভার নিলুম, তখন আমার বয়স সদ্য পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

দুঃস্বপ্নের দুটি বছর : মুন্সীগঞ্জ ১৯৪২-৪৪

প্রথম পরিচয়



মুন্সীগঞ্জ ঘাট দেখে হতাশ হলুম। বিক্রমপুরের নামে যে মহিমাময় ঐতিহ্য মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তার উপযুক্ত তোরণ মোটেই নয়। লক্ষ্যা আর ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমের প্রায় দু-মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরীর পশ্চিম পাড়ে, বালির চড়ায় আমাদের ছোট স্টীমারটি একটি পুরনো মরচেপড়া গাধাবোটের গায়ে লাগল। জেটি বা ডক বলতে কিছু ছিল না। স্টীমারের খালাসিরা ইস্পাতের কেব্‌ল্ আর তার সঙ্গে মোটা মোটা শণের দড়ি গাধাবোটে ছুঁড়ে দিল। এগুলির গোল ফাঁস গাধাবোটের লোকরা ক্ষিপ্রহাতে লুফে নিয়ে গাধাবোটের গায়ে মোটা বেঁটে লোহার খোঁটার উপর দিয়ে পরিয়ে নামিয়ে দিল। সেইসঙ্গে স্টীমারটি ইস্পাতের কেব্‌ল্গুলি যে উইঞ্চের সঙ্গে লাগানো থাকে সেই উইঞ্চটি চালিয়ে দিল। আস্তে আস্তে উইঞ্চ কেব্‌ল্টি ঘুরিয়ে গুটিয়ে নেবার ফলে স্টীমারটি গাধাবোটের গায়ে সেঁটে গেল এবং খালাসিরা মোটামোটা শণের দড়ি টেনে স্টীমারটিকে গাধাবোটের সঙ্গে খুব ভাল করে সমুখে পিছনে সমান করে তার গায়ে লাগিয়ে বাঁধল। তা সত্ত্বেও যেখানে যাত্রী পারাপার হবে সেখানে কিছু ফাঁক রইল, যার মধ্যে দিয়ে নদীর জল দ্বিগুণ তোড়ে ঘূর্ণি সৃষ্টি করে ছুটে যেতে দেখা যায়। জলের তোড় দেখলে ভয় করে। স্টীমারের খালাসিরা চওড়া কাঠের সিঁড়ির মত একটি লম্বা পাটাতন ভিতরদিক থেকে এনে পারাপারের খোলা জায়গায় গাধাবোটের উপর চালিয়ে দিল। পাটাতনটিতে সিঁড়ির মত অনেকগুলি আড়া কাঠ সেতারের ঘাটের মত আড়াআড়ি বসানো আছে যাতে নামার সময়ে পা হড়কে না যায়। এই টানা সাঁকোটি দুধারে সমানভাবে বসিয়ে তার চারকোণে চারজন লোক দাঁড়িয়ে দুটি লম্বা লম্বা বাঁশ সাঁকোর দুই পাশে কোমরের উচ্চতায় ধরে থাকল। সে বাঁশদুটি ধরুনি বা রেলিং-এর কাজ করে।

সেই বাঁশ ধরে যাত্রীরা সাবধানে স্টীমার থেকে গাধাবোটে নামে, যাতে সাঁকোর পাশ দিয়ে জলে না পড়ে যায়। আগে বোম্বেটে জলদস্যুদের যুগে যাকে বলত 'ওয়াকিং দি প্ল্যাংক' অর্থাৎ সরু তক্তা পার হবার পরীক্ষার ছলে জলে ঠেলে দিয়ে মারা। যারা আজন্ম কলকাতা শহরে মানুষ তাদের পক্ষে এই প্রথায় প্রথমবার ঘাটে ওঠাও এক অগ্নিপরীক্ষা বলে মনে হল।

এস-ডি-ওর পরের অফিসার (তাঁকে সেকণ্ড অফিসার বলত), এস-ডি-ওর নিজস্ব স্টেনোগ্রাফার হুসেন (তিনি গোপনীয় কাগজপত্রও রাখতেন) এবং মহকুমা বা জেলার সবকিছু বন্দোবস্তের কর্মকর্তা নাজিরবাবু আমাদের নিতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল এস-ডি-ওর নিজস্ব চাপরাশি এবং আরো কয়েকজন পিয়ন, জিনিসপত্রের ভার নেবে, সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নামিয়ে বাড়ি পৌঁছে সেগুলি তুলে গুছিয়ে রাখবে। চাপরাশি বলে যাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি পাঁচফুট আন্দাজ লম্বা একটি বৃদ্ধ লোক। সাদা আচকান পরা, বুকে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়ি একটি লাল পেটি লাগানো, কোমরেও একটি বিবর্ণ লাল কোমরবন্ধ। বুকে পিতলের কাজকরা এস-ডি-ওর তকমা। দেখলেই মনে হয় অবসরের বয়স অর্থাৎ পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। সারা মুখ ভর্তি, বুক অবধি নামা, ঘন সাদা দাড়ি গোঁফ, মুখে সৌম্য স্নিগ্ধ ভাব। মাথায় সযত্নে বাঁধা একটি বিরাট সাদা পাগড়ি। তার মধ্যে দিয়ে উঠেছে জরির কাজ করা লাল-রঙের একটি তেকোণা 'কুল্লা'। তার কৃপায় ছোট মানুষটির উচ্চতা ইঞ্চি চারেক বেশী লাগছে। হুসেন তাকে আমার কাছে এনে বল্‌ল, এস-ডি-ওর চাপরাশি, আবদুস সামাদ মিঞা। তারিখটি হল ৪ ফেব্রুয়ারি, সময় বিকেল ৪ টে।

মন খারাপের আরো কারণ ছিল। ঘাটে নেমে দেখি এমন এক ইঞ্চিও জায়গা নেই যার উপর একটি মোটরগাড়ি রাখা যায়, গাড়ি চালানো দূরের কথা। এই যদি মহকুমার সদর শহরের অবস্থা হয়, তাহলে আমি যে আশা করে এসেছি, অর্থাৎ প্রতিটি গ্রাম, জনপদ নিজের হাতের রেখার মত করে জানব, তা কী করে সম্ভব হবে? একটি অবশ্য আশার জিনিস নজরে পড়ল। স্থানীয় লোকদের দেখে মনে হল বেশ স্বাস্থ্য আর স্ফূর্তিবান। অন্তত মুখচোখের ভাব ও চাউনি দেখে এবং গলার জোর শুনে তাই মনে হল। কৃষ্ণনগরের মত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ধুঁকছে না, বা কুঁড়েমির ভক্ত বলে মনে হল না। নদীয়া জেলার লোকদের মত গরীবও মনে হল না। মনে মনে আশা করলুম এদের সঙ্গে বনবে আর ভাল লাগবে, আমার দিক থেকে চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়।

গাধাবোট থেকে নেমে একটি সরু নালা পেরিয়ে রাস্তায় উঠলুম। বাঁ পাশে সরু খাল শহর পর্যন্ত গেছে, তাতে একটি নৌকা আমাদের জন্যে ঠিক করা আছে। যদি আমরা নৌকা করে যেতে চাই, এবং আমরা যাই বা না যাই, তাতে করে সঙ্গের মাল ও পরিজনরা যাবে। কাঁচা উঁচু রাস্তার উপর দেখি যেটি সবথেকে চকচকে রিকশা সেটি শহরের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো আছে। অবশ্য, উঠে দেখলুম এটিতেও তিনটি স্প্রিং সীটের রেক্সিন ফুঁড়ে একটু বেরিয়ে আছে, একটু অসাবধানে বসলে কাপড় ছিঁড়তে পারে। আমাদের নিয়ে শহরে শুভযাত্রা শুরু করল। আমরা রিকশায় বসে, রিকশা চলছে, আর সামাদ সমুখে পা চালিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে হাত চালিয়ে রাস্তার লোককে সরে যেতে বলছে : 'একটু সরেন, এস-ডি-ও সাহেব আসতাছেন।' গলার স্বর নরম, কোমল অনুনয়েরই মত বলা যায়, কিন্তু বেশ কর্তৃত্বভাব আছে। বিব্রত ও বিরক্ত হয়ে রাস্তা পরিস্কার করার এই রীতি বন্ধ করতে গিয়ে দেখলুম, এ না করলে মুন্সী-গঞ্জের ভীড়ে এক পাও এগোনো যায় না। রাস্তা যেন ফুরোয় না, যদিও সামাদকে আসলে মোট পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশী আস্তে ছোটার গতিতে এরকম চেঁচাতে আর হাত চালাতে হয়নি। শেষে আমরা একটা লম্বা চারকোণা পুকুরের দক্ষিণপুব কোণে পৌঁছলুম। পুকুরটির উত্তর পাড়ে দৈর্ঘ্যবরাবর কয়েকটি ছোট ছোট সরকারি বাড়ি। পুবদিকটা ঘুরে আমরা দক্ষিণপুব কোণে একটি মাথা পর্যন্ত উঁচু পাঁচিলের ভিতরে গেট দিয়ে ঢুকলুম। পাঁচিলের ভিতরে একটি চত্বর এবং আরেকটি পুকুর—ডোবা বললেই ঠিক হয়। ডোবার অপরদিকে প্রকাণ্ড লোহার গেটওলা একটি বাড়ি। দেখেই বোঝা যায় জেলখানা, সমুখে বন্দুক হাতে সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে, পুকুরের দক্ষিণপুব দিক দিয়ে একটি প্রকাণ্ড চওড়া জমকালো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। অন্তত পনেরো ফুট চওড়া হবে। সিঁড়ি উপরে গেছে, দু' স্তরে ভাগ করা। প্রতিটি স্তরে পঁচিশটির উপর উঁচু উঁচু ধাপ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখি অত উঁচুতে প্রকাণ্ড একটি শানবাঁধানো গোল চত্বর, যার ব্যাস হবে অন্তত একশ' ফুট। এই চত্বরের সমস্তটা কোমর পর্যন্ত উঁচু করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এই উঠোনের মাঝখানে এস-ডি-ওর বাংলা। আদিতে ছিল এটি ইদ্রাকপুর দুর্গ। আন্দাজ ১৬৬০ সালে দিল্লীসম্রাটের সেনাপতি মীরজুমলা লাল বেলেপাথর দিয়ে এই জলদুর্গটি গড়েছিলেন। দুর্গটির পাঁচটি সুন্দর বড় বড় গোল্ক করে গড়া বুরুজ ছিল, দেখেই বোঝা যায় বেশ শক্ত অথচ সূক্ষ্ম কাজ। যখন তৈরি হয়েছিল তখন ধলেশ্বরী নদী দুর্গের ঠিক গা ঘেঁষে বইত। ধলেশ্বরী

দিয়ে যেসব নৌকা বহুমূল্য ঢাকাই মসলিনের কাপড় বঙ্গোপসাগর ধরে মুসলিপট্টমে যেত পারস্যোপসাগরে রপ্তানির জন্যে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুর্গটি তৈরি হয়। ১৯৪২ সালে আমি যখন যাই তখন ধলেশ্বরী দুর্গ থেকে অন্তত মাইলখানেকের বেশী পুবদিকে সরে গেছে। ১৯৭৫ সালে গিয়ে দেখি ১৯৪২ থেকেও আরো খানিকটা পুবদিকে সরে গেছে। একে বিক্রমপুর, তায় বাসের জন্য একজন অতিবিখ্যাত সেনাপতির তৈরি জলদুর্গ, দুইয়ে মিলে আত্মগরিমা বেশ বেড়ে গেল। তার সঙ্গে ধরুন, বিক্রমপুরের সাক্ষরতা ও লেখাপড়ার জন্য নামডাক। উপরন্তু মামলাবাজির জন্য নামডাক। কথাই ছিল, বিক্রমপুরের সাধারণ চাষীও বগলে একখণ্ড বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সটীক সংস্করণ নিয়ে ঘুরত। এসব মিলিয়ে এস-ডি-ওর গরিমাবোধ রাজকীয় আকারে স্ফীত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কি থাকবে! সে যাইহোক, ১৯৪২ সালে এস-ডি-ওর বাংলার মাঝখানে ছিল দুটি বড় বড় ঘর, তাদের দু'পাশে ছিল একটি করে লম্বালম্বি ঘর। বাংলার অন্য দু'পাশে অর্থাৎ বাংলার দৈর্ঘ্যের মাঝবরাবর দুপাশে ছিল দুটি ঢাকা বারান্দা। চারকোণে ছিল চারটি ছোট চৌকো ঘর। ঢুকতে সামনের বারান্দার ডানকোণে ছোট ঘরে ছিল এস-ডি-ওর বাংলার অফিস ঘর। একে বলত বাংলার খাসকামরা। ঢুকতে বড় বসার ঘরের বাঁ পাশে ছিল খাবার ঘর। পিছনে আরেকটি ছোট দালানে ছিল বাবুর্চিখানা, প্যান্ট্রি বা ভাঁড়ার ঘর, আর বাড়ির লোকজনদের থাকার জন্য দুটি ঘর।

ইদ্রাকপুর ফোর্টে যখন পৌঁছলুম, সন্ধ্যা হতে তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকি। সামাদ মিঞা, হুসেন ও নাজিরবাবু বাড়িটি আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। বাড়ি ঘুরে যখন সমুখের চাতালে জমকালো সিঁড়ির সমুখে এলুম তখন দেখি কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের স্বাগত জানাতে এসেছেন। তার মধ্যে একজন ভদ্রলোকের ছিল সহজ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুভাব। লম্বা, রোগা, বছর পঞ্চাশ বয়স। হুসেন পরিচয় করিয়ে দিল, রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ দে, ভাগ্যকুল রাজাদের বাঁধা উকিল। ওঁর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হতে না হতেই রায়সাহেব খাঁটি বিক্রমপুরী টানে এবং ভাষায় বলে উঠলেন, "কম বয়সে এস-ডি-ও হইয়া যিনিই আসেন তাঁরই প্রথম সন্তান হয় এই ইদ্রাকপুর গড়ে। মিঃ জাস্টিস রক্ষবরার হইয়াছিল, মিঃ সুকুমার বসুরও। আপনিও বাদ যাইবেন না। আপনারও পোলা হইবো।" আমি যে বাদ যাব না, তা সামনের নভেম্বরেই প্রমাণ হল।

চার্জ নেয়া

তখনকার দিনে মহকুমার চার্জ নিতে গেলে প্রথম কাজই ছিল সাব-ট্রেজারিতে—বিশেষত যে মহকুমায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না—গচ্ছিত সরকারি টাকা, জুডিশিয়াল, রেভেনিউ ও পোস্টাল স্ট্যাম্প গুণে মিলিয়ে নেয়া। তাছাড়া যদি সোনারুপো থাকত, অথবা অন্যকিছু ধনরত্ন বা গচ্ছিত ধন, সেগুলিও গুণতে হত। শেষোক্তগুলি অবশ্য থাকত আলাদা আলাদা শীলমোহর করা ব্যাগে। সাব-ট্রেজারি বা ট্রেজারি থাকত একটি সম্পূর্ণ পৃথক সুরক্ষিত ইঁটের বাড়িতে, যার জন্য আলাদা করে পাহারার উত্তম ব্যবস্থা সম্ভব হত। সাব-ট্রেজারির কাজ হত সপ্তাহে বিশেষ বিশেষ বারে, কিংবা হঠাৎ কোন বিশেষ কারণে। সদাসর্বদার জন্যে দায়ী থাকতেন এস-ডি-ওর একজন অধস্তন অফিসার। তাঁকে বলা হত সাব-ট্রেজারি অফিসার, তবে এস-ডি-ওই মুখ্যত দায়ী থাকতেন। এসব সত্ত্বেও সাব-ট্রেজারি থেকে তহবিল তছরুপ একেবারে হত না তা নয়। সুতরাং এস-ডি-ওকে প্রতিমাসের শেষ দিনে সাব-ট্রেজারির তহবিল মিলিয়ে দেখতে হত। নতুন এস-ডি-ও এলে তাঁকেও সাব-ট্রেজারির সবকিছু খুঁটিয়ে গুণে খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হত।

এই প্রথম চার্জ নিচ্ছি, অতএব যথাসম্ভব সতর্ক হয়ে সবকিছু মন দিয়ে গোণা শুরু করলুম। একে গোণা অভ্যাস নেই, তার উপরে এই ধরনের কাজ আমি কোনদিনই গুছিয়ে করতে পারি না—ভাগ্যিস কোনদিনই টাকা-পয়সার আতিশয্যের বিড়ম্বনা হয়নি—ফলে সাব-ট্রেজারি গুণতে অনেক সময় লেগে গেল। অভ্যস্ত খাজাঞ্চি যে সময়ের মধ্যে মোটামোটা পাঁচ-ছয় তাড়া নোট গুণে শেষ করবেন, সে-সময়ে আমি হয়তো বড়জোর আধখানা তাড়া গুণতে গিয়ে ঘেমে যাচ্ছি। সকলেই অবশ্য সহিষ্ণুতা দেখিয়ে ভব্যতার সঙ্গে অপেক্ষা করলেন। সকাল দশটায় শুরু করে বেলা সাড়ে তিনটেয় যখন গোণার কাজ শেষ করলুম, তখন অরুণের সঙ্গে গীতার বিয়েতে ঢাকায় উপস্থিত থাকার আশা আভা ছেড়ে দিয়েছে। ঢাকায় যাবার স্টীমার ততক্ষণে সব চলে গিয়েছে।

অজ্ঞানতার কৃপায় দুর্ভাবনা বা অশান্তি কম হয়। আজও আভা বা আমি যদি ডুবজলে পড়ে যাই তাহলে ঘটি-বাটির মত টুপ করে ডুবে যাব, একেবারেই সাঁতার জানি না। তবে সে বয়সে দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা বস্তুটি কমই ছিল, অকাল-মৃত্যুর কথা সহজে মনে আসত না। ঢাকায় যাবার ট্রেনটি নারায়ণগঞ্জ থেকে ছ'টার সময়ে ছাড়ে। অতএব সামাদ দেড় ঘণ্টার মধ্যে নৌকাপথে মুন্সীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জে যাবার জন্যে একটি চারদাঁড়ির ডিঙ্গিনৌকা ভাড়া করল। ডিঙ্গি-

নৌকা ছোট, উল্টে যাবার ভয় থাকে। সামাদ বলল, তাড়া না থাকলে গহনার নৌকা বা ঘাসিনৌকা ভাড়া করত যাতে ভয় থাকত না। মুন্সীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জে নদীপথে যেতে গেলে যেখানে লক্ষ্যা ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশেছে সেই কলাগাছিয়ায়, যার পশ্চিমে মীরকাদিম ঘাট, সেখানে বড় বড় ঢেউ হয়। সেখানে আমাদের ডিঙ্গিনৌকা মোচার খোলার মত নাচছিল। সে সময়ে আমরা সামাদকে বললুম, আমাদের দুজনের কেউই সাঁতার জানি না। সামাদ মনে মনে এত ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল যে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে যখন দেখে গাড়ি ছাড়তে দেরী আছে তখন প্ল্যাটফর্মের কোণে আরেকবার সে নমাজ পড়ে বোধহয় আমাদের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করল। তারপর থেকে, আমার বিশ্বাস, বহু সংকটের সময়ে সামাদের নমাজই আমাদের বাঁচিয়েছে। একদিকে সামাদের নমাজ, অন্য-দিকে দ্বিতীয় চাপরাশি জলিলের বিশেষ হুঁশিয়ারি। জলিলের কথা পরে বলছি।

ঢাকায় পৌঁছে অধ্যাপক সত্যেন বসুর বাড়িতে আগে থেকে না বলে গিয়ে উঠলুম। তাঁরা আমাদের দেখে খুব খুশি, থাকা-শোবার সব ব্যবস্থা তখনই হয়ে গেল। অরুণের বিবাহে ওয়াড়ি, জিন্দাবাহার, টিকাটুলি প্রভৃতি পুরনো ঢাকার অনেক পাড়ার ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ হল। আমরা দুজনে খাঁটি ঘটি হওয়া সত্ত্বেও ডিঙ্গিনৌকা করে ধলেশ্বরী-লক্ষ্যা পার হয়েছি, উপরন্তু ঢাকা শহরের নাম-ডাকওলা বাঙ্গাল পরিবারদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে শুনে, যখন ফিরে এলুম, তখন মুন্সীগঞ্জের বাসিন্দাদের মনে আমাদের সম্বন্ধে ধারণা একটু উঁচু হয়ে গেল মনে হল। ঘটি বলে নিতান্ত নস্যাৎ করে দেবার মত তাহলে নয়!

মুন্সীগঞ্জ মহকুমা

গত আধ শতাব্দী ধরে দুই বাংলার কত কি পরিবর্তন হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব পঞ্চাশ বছর আগের বিক্রমপুর আর বিক্রমপুরবাসীর কথা বলতে গিয়ে মনে হয় আমার ভাগ্য ভাল যে বিক্রমপুরে আমার প্রথম বয়সের কর্মজীবন শুরু হয়। বিক্রমপুরের স্থলে যদি আমি কুমিল্লা, বরিশাল বা সিলেটেও জীবন শুরু করতুম তাহলে সে স্থানগুলিও প্রায় সমপর্যায়ে পড়তে পারত। সে জেলাগুলিতে বিদ্যা, দেশপ্রেম, সংস্কৃতির উপযুক্ত যাবতীয় জাগতিক সংগঠন ও মানবিক উদ্যমের কিছু কমতি ছিল না। তবে এসব ছাড়াও বিক্রমপুরে আরো কিছু বেশী ছিল, সেটি হচ্ছে বহু শতাব্দীর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, অতীশ দীপঙ্করের যুগ পর্যন্ত যাকে টেনে নিয়ে

যাওয়া যায়। বজ্রযোগিনী, জৈনসার, মীরকাদিম, ইদ্রাকপুর নামগুলি কিংবদন্তী ও ইতিহাসের সুগন্ধে ভরা।

প্রথমেই ধরা যাক মুন্সীগঞ্জের প্রায় সার্বভৌম সাক্ষরতা ও অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যে কমপক্ষে কয়েক বছরের শিক্ষাদীক্ষা। তারপর আসত চারদিকে যা কিছু ঘটছে সে বিষয়ে সোৎসুক জ্ঞান, কিসের থেকে কী ঘটতে পারে সে বিষয়ে মোটামুটি ধারণা, এবং তার ফলে জাগ্রত, জিজ্ঞাসু মন। প্রত্যেকেই নিজের মত করে দেখতে ও ভাবতে চাইত। ছেলে, বুড়ো যেই হোক কোন কিছু আলোচনা-প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে প্রথমেই বলবে, 'আমার একটা আপত্য আছে'। অর্থাৎ আমার মতটা একটু ভিন্ন : আস্তিন গুটিয়ে নতুন কোন মত প্রকাশ করার সূচনা। তার থেকে কিছু না কিছু ভিন্ন সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবেই। 'ঘটি'দের ঘাড় নেড়ে মেনে নেবার প্রবৃত্তি থেকে যে এ মনোভাব কত তফাৎ, তাতে আমি প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেতুম। আমার মনে হত 'ঘটি'দের রোগক্লিষ্ট শরীর, রক্তাল্পতা, শারীরিক স্ফূর্তির অভাবই তাদের বিনাতর্কে কোন কিছু মেনে নেবার পথে এগিয়ে দিত। অবশ্য স্রেফ কুতর্কে, অথবা কী কারণে নতুন কিছু করা সম্ভব নয়, তার বিশদ ব্যাখ্যায় 'ঘটি'দের পটুত্ব ও আগ্রহ কোনদিন কিছু কম যায়নি। যদি বিক্রমপুরে না এসে আমি শ্রীরামপুর, তমলুক বা আসানসোলে জীবন শুরু করতুম, তাহলে আমার চরিত্র ও বোধের উন্মেষের পক্ষে কী অমূল্য সুযোগ যে হারাতুম, তা জীবনে জানতেও পারতুম না।

বিক্রমপুরেই প্রথম বুঝলুম, সামান্য সাক্ষরতা আর তার সঙ্গে যদি প্রথম চার বছরের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা থাকে—সে যত খারাপ স্কুলই হোক না কেন—তাহলে নিরক্ষর ব্যক্তির তুলনায় একজনের মন ও বোধশক্তি কতখানি বদলে যেতে ও উন্নত হতে পারে। আমি বুঝতে পারি, নিরক্ষর আর সাক্ষর লোকের মধ্যে যে তফাৎ তা জন্মান্ধ ও চক্ষুষ্মান লোকের মধ্যে তফাতের সমান। পরে যখন পড়ি, বিজলীকরণ পরিকল্পনা থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার ব্যাপারে পরিসংখ্যানবিদ স্ট্রুমিলিন লেনিনকে কী কী সার্থক যুক্তি দেখিয়ে রাজি করান, তখন বুঝতে পারি সারা দেশকে প্রথমেই সাক্ষর করে তোলা, প্রগতির পক্ষে, কত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়ত, সাক্ষরতা ও শিক্ষার সঙ্গে এল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা ও উৎসাহ। কট্টর জাতীয়তাবাদী নেতারাও, স্কুলের উন্নতিকল্পে স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটিতে এস-ডি-ওকে সভাপতিপদে বরণ

করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁরা জানতেন এস-ডি-ওর নাম থাকলে সরকারের অর্থসাহায্যের পথ সুগম হবে, এবং তাঁর উপস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি কম হবে। অধিকাংশ স্কুলই চলত, মুখ্যত, বেসরকারি দানে ও বদান্যতায় এবং এই ব্যাপারে জমিদার ও ব্যবসায়ী উভয়েই এগিয়ে আসতেন।

অনুমান ১৮৩০ সালে জমিদার কাশীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রাম কালীপাড়ায় প্রথম ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য পরিবারও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন। শ্রীনগরের লালাবাবুরা (বসু পরিবার), নোয়াপাড়ার চৌধুরীরা, মালখানগরের বসুরা, তারপাশার রায় মহাশয়রা, লৌহজঙ্গের পাল-চৌধুরীরা, বহরের বসুরায়চৌধুরীরা, বাঘড়ার রায়মাঝিরা উনিশ শতকের মাঝামাঝি দশকগুলিতে ইংরেজিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মুন্সীগঞ্জের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও হরগঙ্গা কলেজ (আউটশাহীর আশুতোষ গাঙ্গুলির বদান্যতায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়) একশ' বছরের প্রচেষ্টার মুকুটমণি হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল এই শতকের ত্রিশের দশকে।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৩৪৪টি মৌজা বা গ্রামের অধিকাংশতেই হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। মাধ্যমিক বা উচ্চ ইংরাজি স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা যদিও কম হত, প্রাইমারি স্কুল-গুলিতে দুই সম্প্রদায়ের হারাহার প্রায় সমান হত। ছেচল্লিশটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রায় ত্রিশটির কার্যকরী সমিতির আমি সভাপতি ছিলুম। অর্থাৎ গড় হিসাবে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৩০০ বর্গমাইল আয়তনে প্রতি ছ' বর্গমাইলে একটি করে হাই-স্কুল ছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল প্রায় দু' বর্গমাইল পিছু একটি। এই সুন্দর ব্যবস্থার একটি অভাবের অবশ্য উল্লেখ করতে হয়। মেয়েদের সাক্ষরতা বা শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। মুসলমান ও তপশীলী জাতদের মধ্যে মেয়েদের সাক্ষরতার হার যথেষ্ট কম ছিল, উঁচুবর্ণের হিন্দু মেয়েদের হার থেকেও অনেক কম।

আমার মূল্যমানে এই কারণগুলি ছিল সর্বশীর্ষে। দ্বিতীয় মূল্যমান প্রথমটির কারণগুলি থেকেই আসে। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত কলকাতায়, গরীবলোকদের বর্ণাশ্রমে নিচুজাতের ও কমবয়স্ক লোকদের সঙ্গে কথাবার্তায় তাদের হেয় করে 'তুই' বা 'তুমি' সম্বোধন শুনতে ও নিজে করতে অভ্যস্ত ছিলুম। কখনও বিশেষ করে মনে হয়নি এই ধরনের তুই-তোকারিতে দেশের সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যবোধ ছেলেবেলা থেকে মানুষের রক্তে বসে যায়, বয়স হলে সেই

বৈষম্যবোধ দৃঢ় করতে সাহায্য করে, এবং তার সঙ্গে থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে স্তরে হেয়ভাব ও জাতসর্বস্ব অহঙ্কার। আবালবৃদ্ধবনিতানির্বিশেষে, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক স্তরনির্বিশেষে 'তুই' বা 'তুমি' বর্জন করে সর্বদা 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহার করা, আমি বিক্রমপুরে যাবার পর স্থানীয় মুসলমানদের কাছ থেকে প্রথম শিখলুম। আমার মনে হয় একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, একসঙ্গে নমাজ পড়ার অধিকার থেকেই সাধারণ কথোপকথনে এই সম্ভ্রমাত্মক 'আপনি'র ব্যবহার চালু হয়েছিল।

বিক্রমপুরে তৃতীয় শিক্ষা হল পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে। ব্যাপারটি আমার সবথেকে চোখে পড়ল যখন ১৯৪২-এর গ্রীষ্ম ও বর্ষার তিন মাসে—যখন চাল-ডালের দাম ধাপে ধাপে বাড়তে শুরু ক'রে ১৯৪৩ সালের ঐ সময়ে আকাশচুম্বী হয়—তখন বিক্রমপুরের বহুলোক চালডাল না পেয়ে শরীর ভাল রাখত মুখ্যত মুন্সীগঞ্জের গ্রামের আম, কাঁঠাল, কলা খেয়ে, আর তার সঙ্গে মালদা থেকে সস্তাদরে আমদানি করা ফজলি আম আর সিলেট ও আসাম থেকে আমদানি আনারস খেয়ে। পুষ্টির প্রমাণ পেলুম স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের দৌড়ঝাঁপ ও খেলাধূলা দেখে এবং পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় সাধারণ কথাবার্তা বলার তেজ দেখে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে লোকে মিন মিন করে কথা বলত, বিক্রমপুরে সে তুলনায় গাঁক গাঁক করত। বিক্রমপুরী কথার টানের সঙ্গে নিজের মত সজোরে ব্যক্ত করার রীতি আমার মনে এখনও এমন গেঁথে আছে, যে যে-কোন আলোচনা-সভায়, এমন-কি ঘরোয়া আড্ডায় নিজের মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করার সময়ে আমার মুখ থেকে আমার অজান্তেই বিক্রমপুরী টান বেরিয়ে আসে।

চতুর্থত, আমার একান্ত নিজের কাজে লাগার মত একটি শিক্ষা হল। লেখা-পড়া, উদ্যম ও পুষ্টির কৃপায় বিক্রমপুরবাসীর কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধি চারদিকে এমন ক্ষিপ্রগতিতে খেলত যে, আপনি যা বলবেন, তৎক্ষণাৎ শ্রোতারা তার অন্তত দশরকম মানে করে বসত। ফলে, আমার শিক্ষা হল যে, সব থেকে নিরাপদ প্রথা হচ্ছে কোনরকম কিছু না রেখে ঢেকে, বা চালাকির চেষ্টা না করে, আমি যা বলব বা করব মনে করছি তা সোজাসুজি বলা। অন্যপক্ষে কোন কিছু গোপন রাখতে হলে সোজাসুজি বলব না বা জানি না বলা। অনাদিকাল থেকে যে সমাজের রেয়াজ হচ্ছে আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া, মিথ্যা স্তোক দেয়া, বা যেটা মনে মনে সংকল্প তার উল্টোটি বলা, সেখানে সোজাসুজি হাঁ, না, বললে শ্রোতারা সেই হাঁ, বা না, কিছুতেই মনে মেনে নেবে না, তারা চিরাচরিত স্বভাববশে ভাববে এই সরল উত্তরের পিছনে নিশ্চয় গভীর অন্তকিছু আছে, সোজা কথা সোজাভাবে

বলার মত বোকা কেউ কি আছে? তাদের ঠকাতে গেলে আপনাকে এত মিথ্যা কথা বলতে হবে, যে শেষে একাধিক ব্যক্তিকে যা যা বলেছেন সেগুলি আপনি মনে রেখে পরস্পরের সঙ্গে মেলাতে পারবেন না, ফলে, লোকের চোখে আপনার কথার দাম কমে যাবে। তার থেকে বরং সোজা কথা বললে তাদের বিশ্বাস হবে না, কিন্তু পরে সেইমত কাজ করলে তাদের চোখে আপনার মূল্য বাড়বে।

শেষ যে বিষয়ে বিক্রমপুর সকলকে ছাড়িয়ে যায় তা হল মহকুমার রাস্তাঘাটের আদিম অবস্থা, এর কথা প্রথমেই বলেছি। অল্পবয়স্ক লোকের পক্ষে, বিশেষত যে নিজেকে মহকুমার সেবায় ব্রতী বলে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চায়, তার পক্ষে খারাপ রাস্তাঘাট একটি মস্ত পরীক্ষা বা চ্যালেঞ্জ। আমার কুড়ি বছর আগে, অর্থাৎ ১৯২০-২২ সালে জেমস্ পেডি বলে একজন আইরিশ ভদ্রলোক এস-ডি-ও ছিলেন। ত্রিশের দশকে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারান। তবে মুন্সীগঞ্জে যখন ছিলেন তখন সাধারণ লোক তাঁকে দেবতা বলে মানত। মহকুমার কোথাও কিছু ঘটলে, কি করে তিনি খবর পেতেন লোকে বুঝতে পারত না, স্থানীয় দারোগা পৌঁছবার আগে, তিনি প্রায়ই, যত দুর্গমই হোক না কেন, সাইকেল চড়ে হাজির হতেন। লোকমুখে তাঁর সাইকেল চালানোর একটি রেকর্ড ছিল—একদিনে ৮৮ মাইল। সেই রেকর্ডটি আমার কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল, কারণ আর কিছুই নয়, যেহেতু আমার আগে আরেকজন করেছেন। চ্যালেঞ্জটি কী ধরনের তা পাঠক একটু পরেই আমার লেখা মুন্সীগঞ্জের ভৌগোলিক বিবরণ পরে বুঝতে পারবেন। ১৯৪৪ সালে যখন মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে গেলুম, তখন আমার একদিনের সাইকেলের রেকর্ড হল ৯৩ মাইল।

মহকুমাটি আমি কত ভাল করে চিনেছিলুম তার প্রমাণ পেলুম ১৯৫৪ সালের মে মাসে আমি যখন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সের ডাকোটা সার্ভিসে কলকাতা থেকে ত্রিপুরার আগরতলায় যাই, মাটির থেকে পাঁচ থেকে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে উড়ে। ভাগ্যকুলের মোড়ে প্লেনটি কোণাকুণি উড়ে ঢুকে মীরকাদিমের উপর দিয়ে মহকুমা থেকে বেরলো। ভাগ্যকুল বংশের বাড়িগুলি হল আমার প্রথম নিশানা। তারপর বাঁয়ে শ্রীনগর, ষোলঘর রেখে আমি প্রায় প্রতিটি গ্রামই চিনতে পারলুম—খিতিরপাড়া, লৌহজঙ্গ, টঙ্গিবাড়ি, সোনারং, বজ্রযোগিনী, মালখানগর, আবদুল্লাপুর। দূরে ডানদিকে ইদ্রাকপুর ফোর্ট দেখে হাত নাড়লুম। বিদেশীরা যেমন অনেক সময়ে একটি অঞ্চল সেখানকার অধিবাসীদের থেকে ভাল করে

জানতে শেখে, আমারও বিশ্বাস আমি এখনও যে-কোন বিক্রমপুরীর থেকে বিক্রমপুর সম্বন্ধে ভাল করে বলতে পারি। বলতে দ্বিধা নেই বিক্রমপুরের মত ভাল করে আমি দিল্লী বা কলকাতা শহরও জানি না। অনায়াসে নিজেকে বিক্রমপুরী বলে চালিয়ে দিতে পারি।

ইতিহাসের মতে অতীতে বিক্রমপুর ছিল পদ্মার দুইধারে দু'ভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগটি এখনও বিক্রমপুর বলে খ্যাত। দক্ষিণ বিক্রমপুর আমার সময়ে মুখ্যত ফরিদপুরের মাদারিপুর বলে খ্যাত ছিল। বিক্রমপুরের চরিত্র সেখানেও কিছু আছে। মাদারিপুরের কয়েকটি গ্রামের নাম করলে বিক্রমপুরীরাও কিছুটা গর্ববোধ করবেন : পালং, জপ্সা, নারিয়া, ধামরাইল। উত্তর, অর্থাৎ আমার সময়ের বিক্রমপুর মহকুমা ছিল একটি আঁকাবাঁকা অসম চতুষ্কোণ, পুব-পশ্চিমে বেশী লম্বা। উত্তরের সীমারেখা ছিল ধলেশ্বরী নদী। মহকুমার আকারটি ভাস্কর হেন্‌রি মূরের হেলানো নারীভাস্কর্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। দেহ ঈষৎ পিছনদিকে হেলানো, হাঁটুদুটি মুড়ে উঁচু করে মাটিতে বসা, পা দুটি ঈষৎ ফাঁক ও সমুখে ছড়ানো। যে মেঝেতে বসা সেটি পদ্মা নদী।

ঐতিহাসিক বিক্রমপুরের ভূগোল ও কিছু কিছু নাম করার লোভ সংবরণ করা শক্ত। এখনও কিছু লোক বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে জীবিত আছেন যাঁদের পারিপার্শ্বিক গ্রামের নাম মনে আছে, কিন্তু সমগ্র বিক্রমপুরের ভৌগোলিক ছবি মনে আছে এমন এক বোধহয় ডাঃ মন্মথনাথ নন্দীই হবেন। মহকুমার ছিল পাঁচটি থানা, সবগুলি মোটামুটি এক আয়তনের, অর্থাৎ প্রতিটি প্রায় ষাট বর্গমাইল। মুন্সীগঞ্জ থানা ছিল একবারে পূর্বপ্রান্তে, তার সীমারেখা ছিল ধলেশ্বরী, দক্ষিণ-পূর্বে কুমিল্লার চাঁদপুরের আগে মেঘনা-পদ্মার মোহানা। পুব থেকে পশ্চিমে গেলে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা লম্বা ভাগে আসে টঙ্গিবাড়ি, লৌহজঙ্গ আর শ্রীনগর থানা। উত্তরে মাথা, পশ্চিমপূর্বে আড়াআড়ি রাখা, সিরাজদিঘা থানা মহকুমাকে হেনরি মূরের ভাস্কর্যের আকৃতি দেয়—বিশেষত মুখ, বুক, মোড়া-জোড়া হাঁটু ও দুটি পা। আরেকটি ছোট্ট থানা ছিল ধলেশ্বরী-মেঘনা নদীর পূর্বপারে। নাম ছিল গজারিয়া। ডাকাতিতে থানাটির বদনাম ছিল। একটি গ্রামের নাম শুনলেই পরিচয় পাবেন : গলাকোপা বন্দুরা, মানে গলাকোপা কাটারি বা দা'। মহকুমাটি ছিল লম্বায় মোটামুটি পঁচিশ মাইল, চওড়ায় বারো মাইল, মোট আয়তন ৩০০ বর্গমাইল। গড়ে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ছিল তিন হাজার, অর্থাৎ সারা মহকুমার লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল নয় লাখ। হেন্‌রি

মূরের ভাস্কর্যের আকৃতি অনুসারে সবথেকে বেশী প্রস্থ ছিল পঁচিশ মাইল, সবথেকে কম দশ।

সিরাজদীখা ছাড়া আর সব থানার সীমারেখা ছিল উত্তর-দক্ষিণে একটি করে খাল। প্রতিটি ধলেশ্বরীর প্রশাখা বা আঙুল, ধলেশ্বরী থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে পদ্মার জল ছুঁয়েছে। মীরকাদিম-মুন্সীগঞ্জ খালটি পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের লুপ্তরেখা থেকে বেরিয়ে দীঘিরপাড় রাজাবাড়িতে পদ্মায় পড়েছে। আমার সময়ে রাজাবাড়ি পদ্মার গর্ভে লোপ পেয়েছে। দীঘিরপারও যাবার মুখে। এই খালের দু'পাড়ে প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির মধ্যে ছিল মহাকাল, ঘাসিরপুকুরপার, বাহেরক-কামারখাড়া, মূলচর, দীঘিরপার। রাজাবাড়ি ছিল পাতক্ষিরের জন্য প্রসিদ্ধ, বড় বগিথালা ভরে গোল মোটা ক্ষির ঢেলে দিত, ঠাণ্ডা হলে মোটা শক্ত চাকি হত।

তালতলাঘাট-টঙ্গিবাড়ি খাল বহরে নেমে পদ্মার সঙ্গে মেশে। খালটির দুপাশে ছিল অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রাম: আবদুল্লাপুর, উত্তর বেত্‌কা, কাইচাইল, আউটশাহী, সোনারং, টঙ্গিবাড়ি, পুরাপাড়া, আরিয়ল-বালিগাঁও, নুরপুর-ভরাকর, হাসাইল-বানরি, তেলিরবাগ, বহর। খালের পশ্চিমপারে ছিল মালখানগর, মধ্যপাড়া, জৈনসার, খিতিরপাড়া, পয়সা, গাওদিয়া।

শ্রীনগর-তারাতিয়া-লৌহজঙ্গ (তারপাশা) খালের দুপাশে কয়েকটি নামজাদা গ্রাম ছিল। আমার সময়ে আদি লৌহজঙ্গ পদ্মাগর্ভে চলে গেছে, স্টীমার স্টেশনের নাম ছিল তারপাশা। সেখান থেকে তারপাশা খাল গেছে হলদিয়া হয়ে উত্তরে শ্রীনগর। পুবে ছিল দীঘলি, বেজগাঁও, হলদিয়া, নগরভোগ, পাটাভোগ। পশ্চিমে ছিল তেওটিয়া-ব্রাহ্মণগাঁও, কনকসার, কুমারভোগ, মেদিনীমণ্ডল, কাজির পাগ্‌লা, যশলদিয়া, মাইঝপাড়া-রাঢ়িখাল, সামসিদ্ধি। কুকুটিয়া কোন পারে ছিল মনে নেই। মুন্সীগঞ্জের নিজস্ব একটি স্বকীয়তা ছিল, প্রায়ই দুটি পাশাপাশি গ্রাম জুড়ে একটি জোড়া-গ্রাম হত, যেমন আরিয়ল-বালিগাঁও, তেওটিয়া-ব্রাহ্মণগাঁও, বাহেরক-কামারখাড়া। যে সব গ্রামের নাম করলুম, সেগুলি এখনও যাদুমন্ত্রের মত আমার কানে বাজে।

উত্তরে আরেকটি খাল ছিল, উত্তরবাহী হয়ে ধলেশ্বরীতে পড়েছে: দুপাশের গ্রামের নাম ছিল ধানকুনিয়া, কোরহাটি, কনকসার, হাসাড়া। আরো বিস্তর ছোটখাট খাল ছিল, নাম মনে নেই। কারণ, আমি খুব কমই নৌকা করে ঘুরেছি। সবই প্রায় সাইকেলে। শ্রীনগর থানার উত্তরে ছিল শেখরনগর, বাড়ৈখালি। তার উত্তরে আরিয়ল বিল।

রাস্তা বললে রাস্তা নামের অপমান করা হয়। প্রায় সবই ভাঙা। একটি-মাত্র লম্বা ভাঙা রাস্তা ছিল যা বর্ষার দুটি মাস ছাড়া মোটামুটি সাইকেলে সবটাই চলা যেত। রাস্তাটি ছিল মুন্সীগঞ্জ-মীরকাদিম-আবদুল্লাপুর-তালতলা-ইছাপুর-সিংপাড়া-বেলতলি-আটপাড়া-শ্রীনগর গ্রামের মধ্যে দিয়ে। সবশুদ্ধ পঁচিশ মাইলের বেশী ছিল না। এই রাস্তাটি পর্যন্ত এত ভাঙা, গরুরগাড়ি চলার ফলে এত গভীর খাঁজ-কাটা, পুলগুলি এত নড়বড়ে, যে কোন মোটরগাড়ি চলত না। সারা মহকুমার সর্বগ্র অসংখ্য পায়ে-হাঁটা ও সাইকেল-চলা মাটির রাস্তা ছিল: যথা, পঞ্চসার-রামপাল-জৈনসার-বজ্রযোগিনী-কাটাখালি-আলিশা দরওয়াজা। শীতের শেষে এবং বসন্তকালের মাস-দুয়েক ছাড়া বাসাইল,. কুচিয়ামোড়া, রাজনগর, শেখরনগর, বাড়ৈখালি, কেয়টখালি গ্রামে যাওয়া যেত না। সিরাজদীঘার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ছিল প্রকাণ্ড আরিয়ল বিল। বর্ষাকালে সেটি একটি বিরাট বদ্ধ সাগরের রূপ ও আকার ধারণ করত, ঠিক মৈমনসিং জেলার কিশোরগঞ্জের হাওরের মত (সাগরকে হাওর উচ্চারণ করত)। বর্ষায় ঝড়ের সময়ে বদ্ধজলে বঙ্গোপসাগরের মত বড় বড় ঢেউ উঠত, ঝড় থেমে গেলেও ঢেউয়ের তোলপাড় থামতে চাইত না। আরিয়ল বিলের কৈ মাছ ছিল যেমন বড়, তেমনি রান্নার পর হত মাখনের মত নরম ও সুস্বাদু।

মহকুমার সর্বত্র এত কাটাকুটি, আঁকিবুকি, কাঁচা পায়ে-চলা রাস্তা ছিল যে বর্ষাকালের কয়েকমাস ছাড়া বছরের প্রায় নয় মাস সর্বত্র পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে যাওয়া যেত। কিন্তু সারা দেশে এত অসংখ্য ছোটবড় খাল ছিল যে সাঁতার-না-জানা লোকের পক্ষে সাইকেল চালানো বিপজ্জনক ছিল। গড়ে আধমাইল অন্তর পায়ে-চলা রাস্তায় খালের উপর থাকত একটি করে একতক্তার সাঁকো। দুপাশ থেকে প্রায় খাড়াভাবে ছয় কি সাত ফুট উঠে যেত দুটি তক্তা খালের সাঁকো পর্যন্ত। সেই তক্তায় দশ বারো ইঞ্চি অন্তর থাকত একটি আড়া বা ঘাট, এস্রাজের ঘাটের মত, যাতে 'আরোহণ-অবরোহনে'র সময়ে পা পিছলে হাড়গোড় না ভাঙে। সাঁকোর প্রস্থ সাধারণত হত দশ ইঞ্চি। যদি বেশ চওড়া খাল হত, তাহলে চার পাঁচটি বা ততোধিক বেশী তক্তা কিছুদূর অন্তর যেত আর শণের দড়ি দিয়ে লম্বালম্বি করে বেঁধে সাঁকো হত। সাঁকোর একধারে উপরে উঠতে ও নিচে নামতে এবং সাঁকোর দৈর্ঘ্য ধরে কোমরের উচ্চতাবরাবর একটি তলতা বাঁশের ধরুনি লাগানো থাকত। যদিও ধরুনি বলত, তবু এটি কোন মানুষ ভারসাম্য হারালে, তার ভার মোটেই সহ্য করতে পারত না, এটি শুধু মনে সান্ত্বনা,

অথবা সাহস আমার জন্যই মুখ্যত থাকত। ধরুনিটি ছুঁয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টার থেকে বেশী কিছু হত না। যদি দৈবাৎ ভারসাম্য হারিয়ে পা হড়কে আপনি পুল থেকে, কাপড়-জামা জুতো-মোজা সব কিছু পরে, কুড়ি পঁচিশ ফুট নিচে ডুবজলের বেশী জলে পড়ে যেতেন, উপরন্তু সাঁতার না জানতেন, তাহলে আপনাকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করার কেউ সঙ্গে না থাকলে মৃত্যু অবধারিত।

আসা যাওয়া, ধরুন, চোদ্দ মাইল রাস্তায় আপনাকে এই ধরনের পুল গড়ে কমপক্ষে কুড়িটি পার হতে হত। যেদিন আমি সর্বোচ্চ পাড়ি, অর্থাৎ ৯৩ মাইল, সাইকেল করি, সেদিন আমি ১৪০/১৪৫টি পুল পার হই। এই পুল পার হওয়া সামাদের পক্ষে একটি সমস্যার সৃষ্টি করল। সাইকেল ঘাড়ে করে সাঁকো ওঠা ও পার হবার সময়ে যদি হঠাৎ আমি পড়ে যেতুম তাহলে আমার পিছন পিছন ঝাঁপ দিয়ে সামাদের পক্ষে আমাকে উদ্ধার করা শক্ত হত। সুতরাং, কয়েকদিনের মধ্যে সামাদ ঠিক করল সে সেইসব স্থানই যাবে—যেমন মীরকাদিম, তালতলা, আবদুল্লাপুর, মালখানগর, বজ্রযোগিনী বা রামপাল—যেখানে রাস্তায় ঐ ধরনের পুল নেই। কিন্তু যেখানে ঘনঘন পুল পার হতে হবে সেখানে সামাদের বদলে জলিল যেত। জলিল ছিল সামাদের উল্টো। বয়স ছিল অল্প, দেহে ছিল যথেষ্ট শক্তি, খুব লম্বা, হাসিখুশি মেজাজ, আর গমগমে গলার স্বর। যদি কখনও পা ফস্কে পুল থেকে জলে পড়তুম, তাহলে এটা নিশ্চিত যে জলিল মাছরাঙার মত সঙ্গে সঙ্গে জলে লাফিয়ে ছোঁ করে আমার কলার ধরে জলের উপর তুলবে। বার্ধক্যের ফলে সামাদ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এমন-কি নিজের সাইকেল কাঁধে করে তার পক্ষে সাঁকো চড়া-নামা ও পার হওয়া কষ্টকর হত। সামাদ ছিল ছোট্টখাট্টো মানুষ, স্বভাব ও ব্যবহার নরম, শান্ত অথচ কর্তৃত্বময়। তাকে দেখেই লোকে বুঝত এস-ডি-ও কাছেপিঠে কোথাও আছেন।

জলিল আর সামাদ দুজনে মিলে, আগেই বলেছি, ছাব্বিশ মাস ধরে মুন্সীগঞ্জে আমার রক্ষাকবচ ছিল। যেদিন ভোরে টুরে বেরোতুম, তার আগের রাত্রে জলিল বা সামাদ আমাদের বাড়িতে এসে শুত। ভোরে আমি তৈরি হয়ে বেরোবার অনেক আগে আমার পিঠের থলিতে জলের বোতল, দুপুরবেলার খাবারশুদ্ধ খাবারের কৌটো, একজোড়া মোজা, একজোড়া জুতো ভরে দিয়ে সাইকেল নিয়ে সেই বিরাট সিঁড়ির ছাপান্নটি ধাপ নেমে ভোর পাঁচটা থেকে অপেক্ষা করত, আমি যতক্ষণ না নেমে তার কাছ থেকে জামা-খাবারের ঝুলি বা রুকস্যাক নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে, আমার সাইকেল তার হাত থেকে নিয়ে রওনা হই।

আমি সাইকেল চড়লে সেও তার সাইকেলে, পিঠে নিজের ঝুলি নিয়ে চড়ত। সৌভাগ্যক্রমে, যতদিন বাংলার জেলায় জেলায় কাজ করেছি, ততদিন আমার আর্দালিরা আমার রক্ষাকবচের কাজ করেছে। এই কারণে তাদের স্মৃতি ও সখ্যতা আমার জীবনে আজও এত মূল্যবান।

স্থানীয় বাসিন্দাগণ

নতুন এস-ডি-ওর সঙ্গে যাদেরই কাজ থাকার সম্ভাবনা তারা জানতে চায়—লোকটি কিরকম। মুন্সীগঞ্জে প্রথম পনেরো দিনে প্রায় চারশ' লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাঁদের কেউ কেউ একাই আসতেন, অধিকাংশই আসতেন দুজন বা তিনজনের দল করে। নামের স্লিপ বা ভিজিটিং কার্ড ছেড়ে দিয়ে আমি একটি ফুলস্ক্যাপ লাইনটানা বাঁধানো খাতা তৈরি করালুম। তাতে থাকত তারিখ, নাম, ঠিকানা, কি কাজ। ফলে মাসের পর মাস একটি কালক্রমিক তালিকা তৈরি হত, যে কোন ব্যাপারে পরে কাজে লাগত। সমাজে কার স্থান কত নিচে বা উঁচুতে, অস্বীকার করে যে যেমন ক্রমে নাম লিখিয়েছে সেইক্রমে দেখা করতে ডাকা হত। ওরই মধ্যে সামাদ কখনও কখনও বলে দিত কাকে আগে ডাকতে হবে। মহকুমার অধিকাংশ লোকের, বিশেষত যাঁরা প্রায়ই আসতেন, নাড়ি-নক্ষত্র ছিল সামাদের জানা। লোকের চেহারা, নাম সম্বন্ধে আমার স্মৃতিশক্তির কথা না বলাই ভাল। ফলে, যেখানেই গেছি এই ধরনের রেজিস্টার তৈরি করার ফলে প্রথম তিনমাসের মধ্যে মহকুমা বা জেলায় কে কোথাকার, কেমন লোক, আস্তে আস্তে মনে গেঁথে যেত। কোন নতুন জায়গায় গেলে অন্তত তিনমাস লাগে সেই মহকুমা বা জেলা সম্বন্ধে মনে মনে একটু দখল আনতে; তার সঙ্গে ক্রমাগত সযত্নে মানচিত্রের ছক করে ঘোরাও দরকার হয়। এইভাবে আস্তে আস্তে মহকুমার বা জেলার একটি মানবিক ও চারিত্রিক মানচিত্র ও ভূগোল মানসচক্ষে তৈরি হয়।

সবধরনের লোক দেখা করতে আসতেন। শহরের উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ডাক্তার তো বটেই, বহুদূর থেকে লোক আসত, বিশেষত যখন লোকমুখে শুনত যে সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ। মুখ্য জমিদার, বড় ব্যবসাদার, আড়তদার, স্কুলকলেজ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা, হেডমাস্টার, রাজনৈতিক নেতা বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিরা। অবশেষে আসত অতি সাধারণ লোকেরা, এমন-কি চাষীভুষিরা বা স্ত্রীলোকরা। আমার বিশেষ ভাল লাগত যখন বয়স্ক কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট কর্মীরা,

যাঁরা কৃষক, ছাত্র বা সাংস্কৃতিক সংগঠনে কাজ করতেন তাঁরা আসতেন। কম্যুনিস্ট নেতাদের আর লুকিয়ে দেখা করতে আসতে হত না। কারণ, ইতিমধ্যে জনযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এবং ভাইসরয়ের কাউন্সিলের গৃহসভ্য রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল এবং সি-পি-আইয়ের পি-সি যোশীর মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান ও বোঝাপড়া হয়ে গেছে। হরগঙ্গা কলেজের অধ্যাপক ও স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভ্যদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে।

এত লোক যে দেখা করতে আসত, শুধু আমি কি চিজ তার জন্যে নিশ্চয় নয়। বোধহয় আরেকটি কারণ ছিল। আমার আগের এস-ডি-ওর আগে ছিলেন ওয়াজির আলি, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের জামাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার বিষয়ে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। গোলমেলে কিছু ব্যাপারের ইঙ্গিত পেলেই তিনি সকলকে ডেকে সমানহাতে ভেবেচিন্তে সমস্যার সমাধান করতেন। অনেক হাঙ্গামার সমাধান আবার তিনি নিজের মত করে অভিনব প্রয়াসে মিটিয়ে দিতেন। সবথেকে বড় কথা, তিনি মহকুমার বাছা বাছা দুষ্টলোকদের শায়েস্তা করেছিলেন। ওঁর আর আমার মাঝে কয়েকমাস এস-ডি-ও ছিলেন চার্ল্‌স্ গর্ডন বলে এক ইংরেজ। সেটি ১৯৪১ সাল। বিক্রমপুরের বুদ্ধিমান লোকে তখনই সম্ভবত আন্দাজ করে নিয়েছে ইংরেজদের আর বেশী দিন নেই, ফলে ১৯২০-২২ সালে জেম্‌স্ পেডির কাছে যা আশা করা যেত, গর্ডনের কাছে সে সহানুভূতি প্রত্যাশা করা অন্যায় হবে। ফলে, আবার যখন একজন বাঙালি এল, তার সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে লোকে আগ্রহান্বিত হল, যদিও তারা জানত নতুন ব্যক্তি ওয়াজির আলির মত দরদী বা প্রধানমন্ত্রীর জামাইয়ের মত অত প্রতিপত্তিশালী হবে না।

যদিও ওয়াজির আলির সঙ্গে আমার আলাপ হয় মুন্সীগঞ্জ ছাড়ার পর, তা সত্বেও তাঁর সম্বন্ধে মুন্সীগঞ্জে যেটুকু জানতে পারি তাতে তাঁর প্রতি আমার বেশ সম্ভ্রম হয়। ফলে, আমি তাঁর দু'একটি অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করা ঠিক করলুম। একটি উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

মুন্সীগঞ্জে যাবার অল্পদিন পরেই সকালে আমার বাড়ির খাসকামরায় বসার জন্য তৈরি হচ্ছি এমন সময়ে শুনি সামাদ নিচু গলায় কয়েকটি মহিলাকে বলছে লাইন করে দাঁড়িয়ে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে। কাদের এসব কথা বলছে জানার জন্য উৎসুক হয়ে বেরিয়ে এসে দেখি মধ্যবয়সী অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাইরের সিঁড়ির দু' পাশে সার করে দাঁড়াচ্ছে। সকলেরই পরনে শতছিন্ন শাড়ি, দেখেই বোঝা যায় অসহায়, গরীব। প্রায় পঞ্চাশজন স্ত্রীলোক দু' সারি করে দাঁড়িয়ে। এমনতর

অবস্থায় সামাদই গতি। তাকে খাসকামরায় ডেকে নিয়ে ফিসফাস করে কথা বলে সবকিছু জানতে পারলুম, এবং এ অবস্থায় ওয়াজির আলি সাহেব হলে কী করতেন, পরামর্শ করে জেনে নিলুম। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্ত্রীলোকগুলির উদ্দেশে বললুম, যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন ঘরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। লোকদেখানো মিনিট পাঁচ-দশ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমার ব্যক্তিগত স্টেনো হুসেনকে বললুম, থানার বড়বাবুকে ডেকে পাঠাতে। থানার বড়বাবু আসামাত্র আমি তাঁকে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নামধাম, স্বামীর নাম ইত্যাদি লিখে নিতে বলে আদেশ দিলুম, এইসব স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোকদের স্বামীদের পুলিশ দিয়ে তলব করে তাদের এবং তাদের স্ত্রীদের তিনসপ্তাহ পরে আবার আমার ইদ্রাকপুরের বাড়িতে আসতে।

বোঝা গেল বড়বাবু এক্ষেত্রে আমার কী ইচ্ছা সে বিষয়ে আন্দাজ করেছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে ধার্য দিনের সকালে সামাদ বাড়িতে ঢুকে আমার কাছে এসে বলল, সিঁড়িতে ইতিমধ্যে দু'ধারে দু'টি লাইন পড়ে গেছে। একদিকে স্ত্রীলোকরা লাইন করে দাঁড়িয়ে, অন্যদিকে স্বামীরা যে যার স্ত্রীর সমুখে দাঁড়িয়ে গেছে। রণস্থলে যুযুধমান দুই দল প্রস্তুত। সদ্য ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি করা পোশাকে থানার বড়বাবু এসে খটাস্ শব্দে দুইপায়ের বুটের গোড়ালি একত্র করে, প্রকাণ্ড এক স্যালুট করে বললেন, আমার হুকুমমত সকলে এসেছে। দুই পক্ষের সকলে বাইরে অপেক্ষা করছে। সামাদ এসে আমার ডানদিকে দাঁড়াল, জলিল বাঁ-দিকে। তারাই তো এস-ডি-ওর প্রতীক। হুসেন বড়বাবুর সমুখে। জলিলের বাঁ হাতের তালুতে একটি চট সেলাইয়ের বড় গুণছুঁচ। স্বামীদের দিকে একপলক তাকিয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। প্রত্যেকে ছ' ফুটের বেশী লম্বা, যেমন বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি বিরাট লম্বা দাড়ি। প্রত্যেকেরই ঘাড়ের উপর মহেঞ্জোদারোর মত বিরাট শক্তিশালী মাথা। প্রত্যেকেই পদ্মা-মেঘনার চরে বিস্তীর্ণ জমির মালিক, বিত্তবান। খাওয়া-পরার অভাব নেই। আমার মত ছোট বেঁটে লোককে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে তুলে অনায়াসে ইদ্রাকপুর দুর্গের প্যারা-পেট ডিঙিয়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিতে পারে। এই অবস্থায় আমাকে গম্ভীর হয়ে সংকল্পে অটলভাব না দেখালে চলে না, কিছুমাত্র ভয় বা দ্বিধার ভাব প্রকাশ পেলেই সব গেল। পাথরের মত শক্ত বিকারহীন মুখ করে (সত্যিই কতখানি নির্ভীক দেখাচ্ছিল আমার সন্দেহ ছিল) প্রথম লোকটিকে তার সমুখে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সে তার স্ত্রী কিনা এবং ঘরে ফেরত

নেবে কিনা। বললুম মহিলাটি আমার কাছে নালিশ করেছে তার স্বামী তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। উত্তরে লোকটি বলল, হাঁ, আমার বিবি ছিল, এখন আর নেই. নিজের থেকে আমাকে ছেড়ে গেছে, সুতরাং আর ফেরত নেবে না। সে তার বিবিকে পরিত্যাগও করেনি, তালাকও দেয়নি। আবার যথাসাধ্য কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করলুম, বিবিকে ফেরত নেবে কিনা। সমান কঠোর কণ্ঠে উত্তর এল, না, নিমু না। আমি যাকে বলে সম্রাটের মত ধীরে জলিলের দিকে শরীর ফিরিয়ে ডাকলুম, জলিল! জলিল বাঁ হাতের তালু, যার মধ্যে গুণছুঁচটি ছিল, সেটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি আবার হুকুমের সুরে বললুম, ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখি। লোকটি হাত সোজা করে বুড়ো আঙুলটি বাড়িয়ে দিল। আমি মাথা হেলিয়ে ছোট্ট ইসারা করায়, হুসেন বুড়ো আঙুলটি ধরল, আমি গুণছুঁচটি নিয়ে বুড়ো আঙুলের নখের মধ্যে একটু ঢুকিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকালুম। নেবে কিনা বল? বজ্রকণ্ঠে উত্তর হল, না, নিমু না। এর-পর আরো জোরে ছুঁচটি বেশ কিছুটা ঢোকালুম। এখন নেবে কিনা? আগের থেকে একটু ক্ষীণ কণ্ঠে আবার উত্তর, না! বিরাট দাড়িওলা মুখে অবশ্য যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই। আরো জোরে, নখের ভিতর প্রায় আধ ইঞ্চিটাক যখন ছুঁচ ঢুকে গেছে তখন আবার প্রশ্ন, এখন নেবে কিনা? লোকটির মুখে কোন বিকার নেই, যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। হেঁড়ে গলায় আওয়াজ এল, নিমু। দ্বিতীয়, তৃতীয় লোকের উপর অনুরূপ চিকিৎসার পর আর প্রয়োজন হল না। পঞ্চাশ জোড়া মিঞা-বিবি একসঙ্গে বড়বাবুর থানার কাগজে মুচলেকার নিদর্শনে জোড়া জোড়া টিপসই দিয়ে চলে গেল। খবরটি ছড়াতে দেরি হল না, আর এক ওয়াজির আলি এসেছে। এরপর আর এধরনের নালিশ আসেনি।

১৯৭৯ সালে ওয়াশিংটনে আমার মেয়ে জয়তীর বাড়িতে তার বন্ধুদের কাছে গল্পটি করছি; কিছু পরে, জয়তী এই বর্বর চিকিৎসার বিবরণ আর শুনতে পারল না, আমাকে খুব বকে উঠল, আমার এরকম বেআইনি কাজ করার অধিকার নেই বলে। আমার তখন খেয়াল হল, হয়তো আধুনিক জগতে এই ধরনের বিচারের স্থান নেই। মনে মনে স্বীকার করলুম জয়তী আমাকে আইনভাঙার জন্যে অভিযুক্ত করে ঠিকই করেছিল, কিন্তু আইনই কি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোক ও তাদের ছেলে-মেয়েদের জীবন নষ্ট করছিল না? অবশ্য তখন খোমেনির মৌলিকতাবাদের প্রকোপে ঈরাণের শা' পালিয়ে গেছেন, তবুও মনে মনে আইনের বিচার স্বাভাবিক ভালমন্দ বিচার যে নষ্ট করছে এ সিদ্ধান্ত আমি এখনও ঠেলে ফেলতে পারি না।

এধরনের কাজির বিচার ইংলণ্ডেও উনিশ শতকের শেষ অবধি চলেছিল বলেই ইংলণ্ডে এই শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোন ছিঁচকে চুরি হত না, এই কার্যকারণ সম্পর্কটি নিশ্চয় খুব মিথ্যা নয়। মোড়ের আড়ালে পুলিশ লুকিয়ে আছে, অন্যায় করলেই খপ করে এসে হাজতে পুরবে, এর ভয়ই না আমাকে অনেক কিছু দুর্মতি থেকে বিরত রাখে? শেক্‌স্‌পিয়ারের মত ওয়াজির আলি সাহেবের নিশ্চয় মনে হত যে অন্তত এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতের আইন একটি গর্দভ, এবং তাঁর পক্ষে আঠারো শতকের ইংলণ্ডের 'মরাল ফিলজফার'গণ-কথিত 'স্বাভাবিক আইন' পালন করা ছাড়া উপায় নেই। যাইহোক এই ধরনের 'স্বাভাবিক আইনে'র প্রয়োগ আমি অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে করিনি, এই বাঁচোয়া।

কাজে যোগ দেবার পর প্রথম ক'দিন গেল দুর্গের পাঁচিলের বাইরে যে বড় লম্বা পুকুরটি ছিল তার পাড়ে যে-সব অফিসাররা থাকতেন তাঁদের বাড়ি গিয়ে আলাপ করতে। আমার সেকণ্ড অফিসারের পরে ছিলেন মুন্সীগঞ্জের সার্ক্‌ল্‌ অফিসার, আবুল খয়ের। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। প্রথম মুনসেফ ছিলেন সুধীরচন্দ্র দত্তগুপ্ত। তাঁর স্ত্রী বেলাদি আভাকে নানা বিষয়ে শেখাতেন। দ্বিতীয় মুনসেফ ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ পাণ্ডা। তাঁদের স্থানে ১৯৪৩ সালে এলেন যথাক্রমে হরিচরণ ঘোষ ও সুবোধচন্দ্র তালুকদার। তাঁদের স্নেহে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হয়েছি। হরগঙ্গা কলেজের দু'জন ইংরেজি অধ্যাপকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। একজন, প্রিয়তোষ বাগচি, তিনি এই পাড়ায় থাকতেন। অন্যজন ছিলেন অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, তিনি থাকতেন অন্য পাড়ায়, পরে তিনি কলকাতার বিজয়গড় কলেজে বিশেষ সুনাম করেন ও রাজনীতিতে ঢোকেন। কিন্তু মুন্সীগঞ্জ শহরে যাঁদের সঙ্গে আমাদের সবথেকে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় তাঁদের একজন ছিলেন ডাক্তার, শৈলেন্দ্রনাথ দাশ, অন্যজন ছিলেন মুন্সীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, অশ্রুকণা দাশ, কলকাতার গড়পার রোডের মুক্তিদারঞ্জন রায়ের কন্যা। আমরা যতদিন না দিল্লী যাই (১৯৫৮ সালে) ততদিন অশ্রুদি ছিলেন আমাদের পরিবারের নিতান্ত শুভার্থী। দেশভাগের কিছু পরে তিনি কলকাতার মেডিকাল কলেজে মেয়েদের স্বর্ণময়ী হস্টেলের পরিচালিকা ছিলেন। বরাবর একান্ত বন্ধু ছিলেন। বছর দুয়েক আগে তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে মারা যান।

যে দুজন আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেন এবং যাঁদের কাছে আমি সর্ববিষয়ে বিশেষ পরামর্শ চাইতুম, বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে তার ইঙ্গিত পেতুম, বিশেষত ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে কী করলে লোকের সবথেকে

উপকার হবে সে সম্বন্ধে সৎপরামর্শ পেতুম, এবং যাঁরা নিজেরা অক্লান্তকর্মী ছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন ডাঃ মন্মথনাথ নন্দী। ভাগ্যকুল রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনগর হাসপাতালের কর্তা। অন্যজন ছিলেন আর্নল্ড ম্যাকার্টিচ, হলদিয়ার পাটের ব্যবসায়ী, তাঁর সঙ্গে ডাঃ নন্দী আলাপ করিয়ে দেন। একে তো ভাল ডাক্তার ও সার্জন হিসাবে ডাঃ নন্দী ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার্হ ছিলেন। অন্যদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যদের সঙ্গে ছিলেন ঘনিষ্ঠ। আবার কংগ্রেস মহলেও ছিল তাঁর সমান প্রতিপত্তি। চিকিৎসায় হাতযশের দরুণ মুসলমানদের মধ্যেও ছিল তাঁর বিশেষ সম্মান এবং সেই হিসাবে মুসলিম লীগে। দুর্ভিক্ষের সময়ে এবং পরে তাঁরই সাহায্যে আমি দ্রুত ফুড ও রিলিফ কমিটিগুলি দাঁড় করাতে সমর্থ হই। ১৯৪২ সালে ডাঃ নন্দীর বয়স বোধহয় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। এখনও জলপাইগুড়িতে তাঁর বিশেষ সুনাম। তাঁর ছেলে ভাস্কর নন্দী এবং পুত্রবধূ বাসন্তী রমণের সঙ্গে ১৯৮৪ সালে সন্তোষ রাণা আমায় আলাপ করিয়ে দেন।

কলকাতার এক প্রাচীন আর্মেনিয়ান বংশে আর্নল্ডের জন্ম হয়। আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয় তখন তাঁর বয়স হবে প্রায় আটচল্লিশ। লৌহজঙ্গ থানার যত কিছু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান বা কার্যসূচি ছিল, সবেতে ছিলেন তিনি অগ্রণী। একটি স্থানীয় মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করেন এবং বহরগ্রামের পাশে ডহরিগ্রামে বাড়ি তৈরি করেন। মুন্সীগঞ্জে যত বাড়ি দেখেছি তার মধ্যে এটি মনে রাখার মত। নিজস্ব পাটের ব্যবসা তো যথেষ্ট বড় ছিলই, উপরন্তু চাষের জমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবসাও ছিল। প্রত্যেকটিতে, বিশেষত নিজের বাড়ির খুঁটিনাটি বিষয়ে, তাঁর নজর ছিল। ঐ একমাত্র বাড়ি যেখানে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক পায়খানা ছিল। তাঁর বাড়ির গোয়ালের মত গরু রাখার জায়গা আমি ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখিনি। যতদুর মনে আছে ছ'টি শাহীওয়াল গরু ও একটি ষাঁড় ছিল। এক একটি গরু দিনে বোধহয় ছ'টি দিশী গরুর থেকে বেশী দুধ দিত। সে কথা থাক। যে ব্যাপারে আমার চমক লাগে তা হচ্ছে প্রতিদিন ভোরে ও বিকেলে গোয়ালটি পরিষ্কার করে ধুয়ে তকতকে করা হত, কোথাও কোন ময়লা বা গোবরের গন্ধ থাকত না। উপরন্তু সন্ধ্যা হবার আগেই গরুগুলির উপর বিলেতি নেটের বড় বড় মশারি টাঙিয়ে দেয়া হত, যাতে তাদের মশা না কামড়ায়। ঐ একমাত্র লোক যাঁর বাংলাতে রাত্রি কাটাতে বা যাঁর আতিথেয়তা নিতে আমার কোনদিন সংকোচ হয়নি। তার কারণ তিনি আমার কাছে কোনদিন কিছু চাননি, বা আমার নাম ভাঙিয়ে অন্যের কাছে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেননি।

আমি জানতুম অনেকেরই এ ঘনিষ্ঠতা পছন্দ হত না, কারণ ডাঃ নন্দী, ডাঃ দাশ এবং অশ্রুদি ছাড়া আর কারোর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমার মনে ওঁর সঙ্গে মিশতে কোন বাধা না থাকার আরো একটি কারণ ছিল' যে-কোন হাঙ্গামা বা স্থানীয় বিবাদে তাঁর কাছ থেকেই আমি সঠিক নিরপেক্ষ বিবরণ ও মতামত পেতুম। ওঁকে নিয়ে আমার জীবনে একটি বড় খেদ আজীবন থেকে গেল। ১৯৪৭-এর অগাস্টে দেশভাগের পর উনি লৌহজঙ্গ থেকে আমাকে একটি চিঠি লিখে জানান উনি শীঘ্র কলকাতায় আসছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে দেশভাগের আগে ও পরে স্থানীয় পাটের ব্যাপারীরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য টাকা শোধ করেনি, ফলে তিনি একটু অর্থকষ্টে পড়েছেন, আমি যদি তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা কিছুদিনের জন্যে ধার দিই। আমি যখন আমার কাহিনীর সে পর্য্যায়ে আসব পাঠক বুঝতে পারবেন, পাঁচ হাজার কেন পাঁচশ' টাকা দেবার ক্ষমতাও তখন আমার নেই, (কারণ যেটুকু টাকা আমি জমাতে পেরেছিলুম তার প্রায় সবটাই আমার চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেছে) ফলে আমার অপারগতা তাঁকে লিখে জানাই। তিনি আমার চিঠি কীভাবে নিয়েছিলেন আমার জানার উপায় নেই, কারণ, তিনি তার কিছুদিন পরেই মারা যান। তাঁর দুঃসময়ে কিছু করতে পারিনি, এ ক্ষোভ আমার যাবার নয়।

মুন্সীগঞ্জে আরো লোকের কথা যথাসময়ে আসবে। কিন্তু এইখানে একটি মজার ঘটনা না বলে পারছি না। বাহেরক-কামারখাড়া গ্রামের মিত্র-পরিবারের জনহিতৈষী জমিদারবংশ বলে সুনাম ছিল। কৃষ্ণনগরে থাকার সময়ে আমার বাবা একটি ছোট নোটবইতে আভাকে কিছু মূল্যবান উপদেশ লিখে দেন। তারমধ্যে একটি ছিল যে, আমার অনুপস্থিতিতে আভা যেন কারোর কাছ থেকে কোন উপহার না নেয়, এবং আমি উপস্থিত থাকলেও সে যেন সর্বদা মনে রাখে আমি কোনসময়ে কারোর কাছ থেকে কখনও কুড়ি টাকা মূল্যের বেশী কোন কিছু উপঢৌকন না নিই। মুন্সীগঞ্জ যাবার কিছুদিন পরে বাহেরক-কামারখাড়ার মিত্রবংশের কর্তা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসেন, এবং সঙ্গে তাঁর বাড়ির পুকুরের সের দশেক ওজনের একটি মাছ আনেন। আমি তখন মুন্সীগঞ্জের বাইরে টুরে গেছি, রাত্রে ফেরার কথা। ভদ্রলোক মুন্সীগঞ্জ ডাকবাংলায় এসে আমি বাড়িতে নেই শুনে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করবেন ঠিক করে লোক মারফৎ মাছটি পাঠিয়ে দেন। আভা মাছটি ফিরিয়ে দেয়। সন্ধ্যাবেলা যখন আমি ফিরেছি তখন ভদ্রলোক মাছটি নিজে সঙ্গে করে দেখা করতে এলেন।

এদিকে আভা মাছ ফিরিয়ে দিয়েছে, কথাটি মুখে মুখে চাউড় হয়ে গেছে। আমি যথারীতি তাঁকে সাদরে বসিয়ে মাছটি রেখে দিলুম। ভদ্রলোক বিদায় নিলে, দারোগাবাবুকে একটি চিরকুট পাঠালুম, একজন মেছুনি তার বঁটি নিয়ে যেন আসে। রাত্রে বঁটি নিয়ে মেছুনি এলে সেই মাছ কেটে যতগুলি অফিসার, বন্ধু, অশ্রুদি, থানার বড়বাবু ছিলেন তাঁদের কিছু কিছু করে মাছ পাঠানো হল। সকলে মিলে মিত্রমহাশয়ের পাঠানো মাছ বিশেষ তৃপ্তি করে খেলুম।

সংসার চালানো বিষয়ে বেলাদি ও অশ্রুদি আভাকে কীভাবে মানুষ করেছিলেন একটু বলি। ছাত্রাবস্থায় মার অসুখের সময়ে আমি মায়ের কথামত রোজ ভাঁড়ার বার করে দিতুম। তার ফলে মাসে মাথাপিছু কত চাল, ডাল, নুন, তেল, চিনি, ইত্যাদি খরচ হতে পারে সে বিষয়ে আন্দাজ হয়ে গেছল। কৃষ্ণনগরে থাকতে যে পরিমাণ চাল, ডাল, তেল বা চিনি খরচ হত তা অত্যন্ত বেশী মনে হওয়ায় আমি আভাকে কয়েকবার বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছি। আভা সর্বদাই বলত নিজের চোখে না দেখলে কেউ জিনিস সরাচ্ছে সে কথা সে মানতে পারবে না। প্রথম কয়েক মাস এইভাবে চলার পর আভা যখন নিজের চোখে একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা জানালা দিয়ে দেখল যে আমাদের খাবার দেবার আগে বাবুর্চি তার ছোট ছেলের মাথায় দুতিনটি ডেকচি আর বড় বাটি ঝাড়নে বেঁধে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে, তখন থেকে আভা ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে নিজের হাতে রোজ ভাঁড়ার বার করা শুরু করল। তার আগে তার মাকে লিখে মাসে কোন জিনিস কত খরচ হতে পারে সে সম্বন্ধে জেনে নিল। সে যাই হোক, কৃষ্ণনগর থেকে আমরা বাবুলাল বলে বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে আসি। কৃষ্ণনগরের বাবুর্চি তার আগেই বিদায় নিয়েছে। কৃষ্ণনগরে জিনিসপত্রের যা দাম ছিল বাবুলাল মুন্সীগঞ্জে তার প্রায় অর্ধেক কি এক-তৃতীয়াংশ দরে আনত। ফলে, আভা আনন্দে আটখানা হয়ে একদিন বেলাদিকে বলল। বেলাদি যখন উল্টে আভাকে বললেন বাবুলাল যে দরে জিনিসপত্র আনে বাজারে তার আসল দর প্রায় সিকিভাগ, তখন আভার বিশ্বাস হতে চায় না, যতদিন না আভাকে রাজি করালুম, জলিল বা বাড়ির মালী রহিমকে দিয়ে অন্তত একদিন বাজার আনাতে। জলিল এসে যে সব দরের কথা বলল তাতে আভা তো হতভম্ব। তখনকার দিনে গোয়ালাদের মনে একটি সংস্কার ছিল যে দুধে জল মেশালে গরুর দুধ শুকিয়ে যায়। অতএব দুধে কখনও জল থাকত না। সেই খাঁটি দুধ ছিল টাকায় দশ থেকে এগারো সের, বাবুলাল আনত টাকায় চার সের। সবথেকে খাঁটি গাওয়া ঘি দশ আনা সের (ষোল

আনায় এক টাকা)। সবথেকে ভাল পাকা রুইমাছ চার আনা সের, বর্ষাকালে একটা গোটা ইলিশ ওজনে প্রায় দেড় সের, দাম নিত খুব বেশী তো দু' বা তিন আনা (এখনকার পনেরো থেকে কুড়ি পয়সা)। দেড় পয়সায় চারটি ডিম। চারটি বড় বড় গলদা চিংড়ি—এক একটি রান্না করা চিংড়ি একটি প্রমাণ সাইজের প্লেট ভরিয়ে দেবে—দাম নিত বড়জোর এক টাকা। শীতকালে ঐ এক টাকাতেই ছ'টি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরিয়ল বিলের কৈ মাছ পাওয়া যেত। প্রমাণ প্লেটে রাখতে গেলে মাঝামাঝি দু'টুকরো করে কেটে পাশাপাশি রাখতে হত। ফলের ব্যাপারে এক ডজন রামপালের অগ্নীশ্বর কলার (খোসার রঙ ছিল আগুনের জিভের মত লাল) দাম ছিল দুই থেকে তিন আনা। প্রত্যেকটি কলা হত প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা আর দেড় ইঞ্চি মত মোটা। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আম আর আনারস্ তো প্রায় এমনিই পাওয়া যেত। সবথেকে ভাল বড় আম, সিলেটের সবথেকে ভাল জলডুবি আনারস ছিল দু'পয়সায় একটি। মুখে দিলে মাখনের মত মিলিয়ে যেত।

পাঠক এখন বুঝতে পারবেন তখন যদি কোন মজুর দিনে এক টাকার মত রোজগার করত, তার পক্ষে চারজনের পরিবারকে তিনবেলা পেট ভরিয়ে খাইয়ে শরীর পুষ্ট রাখতে কোন অসুবিধা হত না। পরিষ্কার ভাল, ঝাড়া চাল ছিল আড়াই টাকা তিন টাকায় একমণ, অর্থাৎ দশটাকার কমে এক কুইণ্টাল। এই দাম ছিল ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই চালের নাম ছিল বালাম, যে ধরনের নৌকায় বরিশাল জেলা থেকে এই চাল আসত তার নাম থেকে চালের নামকরণ হয়েছিল। বর্মা চাল—লোকে বলত পেগু—মীরকাদিম ও হলদিয়ার গঞ্জে বিক্রি হত আড়াই মণ পিছু প্রায় ছ' টাকায় কিন্তু, ফেব্রুয়ারি মাসেই, যখন জাপানীরা দ্রুত বর্মা অধিকারের পথে, পেগু চালের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তবে, খাওয়া দাওয়া ও দাম সম্বন্ধে এই সমস্ত মন-কেমন-করা কথা এখন যাক। গণ্যমান্য লোকজনের কথা বলি।

সুশীল দে'র খাসকামরায় স্থানীয় এম-এল-এ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক নেতাকে আমি আসতে দেখিনি। খেয়াল হয়নি যে রাজ্যে তখন কংগ্রেস দল সরকারের বিপক্ষে ছিল এবং সি-পি-আই ছিল অবৈধ, সেইজন্যে রাজনৈতিক দলের সভ্যদের কালেক্টরের কাছে আসার প্রশ্ন ছিল না। নতুন ফজলুল হক সরকারে অনেক দলই ছিল, সি-পি-আই বৈধ হয়, এবং কংগ্রেসী নেতারাও নানা লোকহিতকর কাজে লিপ্ত ছিলেন। এম-এল-এ ছিলেন আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী। ছোট্টখাট্টো মানুষ, নাক চোখ হাত পা মিলিয়ে কিছুটা পাখির

মত শরীর : পাজামা আর সরু লম্বা আচকানে আরো পাখির মত দেখাত। দেখে মনে হত অস্বস্তিতে ভুগছেন, থেকে থেকে কাঁধদুটি একটু নড়ে উঠত, যেন জামাটি গায়ে ঠিক বসেনি। পরে বুঝলুম, সম্ভবত এই কারণে, যে আগে তিনি ফজলুল হকের দলে ছিলেন, সম্প্রতি ফজলুল হক মুসলিম লীগ ছেড়ে দেয়ায়, তিনি মুসলিম লীগে থেকে গিয়ে বিপক্ষে চলে গেছেন, ফলে সরকারী মহলে কিছুটা প্রতিপত্তি হারিয়েছেন বলে তাঁর মনে একটু অস্বস্তি, অন্তত আগেকার নিশ্চিন্তভাব নেই। নিজের বিবেক ও ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না। ওঁর সামনে সামাদ একটু ছাড়াছাড়া ভাবে থাকত। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল পাছে মনে করি যে সামাদ তলে তলে গোপন খবর বিপক্ষদলের এম-এল-এ বিক্রমপুরীকে দিচ্ছে, এই ভয়ে হয়তো সামাদ আমার সামনে দূরত্ব রাখছে। সামাদের এই ব্যবহারের কারণ প্রকাশ পেল ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে। একদিন সকালে সামাদ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে, সেই বুড়ো আঙুলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাকে বলল, বিক্রমপুরী সাহেবের নিজের গ্রামেও শুধুমাত্র তাঁর উপর দুর্ভিক্ষত্রাণের সব চালডাল বিলির ভার না দিয়ে কমিটির উপর দিলে বোধহয় লোকে বেশী নিশ্চিন্ত হয়। সামাদ যখনই এই ধরনের আচরণ ও দ্বিধা নিয়ে কথা বলত তখনই বুঝতুম যার সম্বন্ধে বলছে, তার বিষয়ে একটু চোখকাণ খোলা রাখাই ভাল।

অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারাও শীঘ্রই এলেন। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ'র ছেলে অমূল্য ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের শিষ্য। কথাবার্তা খুবই ভদ্র, একটু প্রচ্ছন্ন ঝাঁজ আছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, আরিয়ল বিল মৎসজীবী ইউনিয়ন গড়েছিলেন। আমার পূর্বসূরী গর্ডন তাঁর প্রতি একটু রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন, সেটি তাঁর মনে কাঁটার মত বিঁধত। ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যত্র কোথায় কী ঘটছে সব খবর রাখতেন। শেখরনগর পুলিশকে বলার পর তাঁর ইউনিয়নের কিছু সমস্যা যখন মিটে গেল তখন আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার বেশ সহজ হল। দুজন প্রধান কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ও জিতেন্দ্রনাথ কুশারি—মহকুমার কিছু কিছু স্থানীয় সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে আসতেন। তাছাড়া ছিলেন স্থানীয় উকিল জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তিনিও কংগ্রেসে ছিলেন। তাঁর ছেলে পরিমল মিত্র ছিলেন কম্যুনিস্ট, সমাজসেবায় ছিল বিশেষ নিষ্ঠা ও সততা। শুনেছি উনি পরে উত্তরবঙ্গে কাজ করতেন, মহকুমা ছাড়ার পর কোনদিন আর দেখা হয়নি। সোনারঙে একজন প্রবীণা মহিলা কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, ঢাকার আশালতা সেনের সঙ্গে তাঁর

ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল, তাঁর নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না, সম্পর্কে কম্যুনিস্ট নেতা সত্যেন সেনের আত্মীয়া ছিলেন।

সবকাজে এগিয়ে আসতেন ছাত্র ও কিষাণ ফ্রন্টের কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যরা। সব নাম আমার মনে নেই, কিন্তু সেই সময়কার ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁদের কাণে কিছু কিছু নাম পরিচিত লাগবে : কুমারভোগের জিতেন ঘোষ; সোনারং-টঙ্গিবাড়ি-আউটশাহী অঞ্চলের জ্ঞান চক্রবর্তী, অনিল মুখার্জি, সত্যেন সেন, রমেশ দাশগুপ্ত, হাসাডার শান্তিরঞ্জন সোম। অনিল মুখার্জি আর সত্যেন সেন ছিলেন তাত্ত্বিক। সত্যেন সেন ভাল লেখক ছিলেন। কিছুদিন আগে ঢাকা থেকে কয়েক খণ্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। সরস দরদী লেখা। অন্যরা ছিলেন কর্মী। মুসলিম লীগের ছাত্রসংস্থা ও স্টুডেণ্ট্‌স্ ফেডারেশনের কর্মী, কলেজের ছাত্র, শামসুদ্দিন আহমদ আমার পরিবারে খুব ঘনিষ্ঠ হয়, ঠিক বাড়ির ছেলের মত। পরিষ্কার স্বচ্ছ চাহনি, আন্তরিক ব্যবহার ও স্ফূর্তিবাজ ছিল।

নবীন কবি ও লেখক, সোমেন চন্দ, ১৯৪২-এর ৮ মার্চ, ঢাকায় কম্যুনিস্টদের একটি শোভাযাত্রায় কম্যুনিস্ট বিরোধীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। তাঁর ছোটগল্প "ইঁদুর" আমার মতে একটি অসাধারণ রচনা। ইংরেজিতে আমি তার যে অনুবাদ করি তা ১৯৪৩-এর অগাস্টে *US—A People's Symposium* বলে সংকলনে ছাপা হয়। ফ্যাশিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের তরফে হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি দ্বারা সম্পাদিত হয়ে ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ উপলক্ষ্যে ঢাকার ফ্রেণ্ড্‌স্ অভ দি সোভিয়েট ইউনিয়নের অনেক নবীন লেখক ও কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ছিলেন উদীয়মান কবি ও প্রবন্ধকার। তিনি এখনও খুব ভাল লেখেন এবং 'সাহিত্য চিন্তা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। নানা সংস্থা থেকে সম্প্রতি সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারও পেয়েছেন।

মুন্সীগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আমি প্রধান প্রধান হাটবাজার গঞ্জগুলি ঘুরে দেখলুম, কারণ তখন চালের দাম অল্প অল্প করে বাড়ছে। পেগু চালের আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। বরিশাল থেকে বালাম চালের আমদানিতে হঠাৎ খুব মন্দা পড়েছে। তবুও, তখনও যে পরিমাণ লেনদেনের কথা শুনলুম ও প্রমাণ হিসাবে গুদাম

দেখলুম তাতে নদীয়ার তুলনায় মুন্সীগঞ্জের ব্যবসায়ের পরিমাণ দেখে চমৎকৃত হলুম। নদীয়া জেলার কোন পাইকারি কেন্দ্রে আমি চল্লিশ ফুট লম্বা, ত্রিশ ফুট চওড়ার বেশী বড় গুদাম দেখেছিলুম বলে মনে পড়ে না ; কোন গুদামেই যে-কোন সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী মাল থাকত কিনা সন্দেহ। সেই অনুপাতে, মুন্সীগঞ্জের পাইকারি ব্যবসার গঞ্জগুলি দেখে অবাক হলুম।

মীরকাদিমের প্রধান ব্যবসা ছিল খাদ্যশস্যে। অন্তত ত্রিশটি বিরাট বিরাট গুদাম ছিল যার কোনটিরই মাপ আশি ফুট লম্বা, চল্লিশ ফুট চওড়া আর কুড়ি ফুট উঁচুর কম ছিল না। তাছাড়া ওর থেকে ছোট মাপের, যেমন নদীয়া জেলার মাপের তো অজস্র ছিল। বড় গুদামগুলিতে একসঙ্গে বহু লাখ টাকার মাল ধরত। মীরকাদিমের পাশের গ্রাম আবদুল্লাপুরে ছিল যত বড় বড় তেলি ও সাহা-বণিক ব্যবসায়ীদের বসতভিটা। খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য সামগ্রী তো থাকতই —যথা তেল, নুন, চিনি, যাবতীয় মশলা, গুড়, কেরোসিন তেল ইত্যাদি। আবদুল্লাপুর ছিল কাপড়ের পাইকারি বাজার, মীরকাদিমের সঙ্গে মূল্যমানের ব্যবসায় পাল্লা দিতে পারত। এছাড়া তালতলা, ভাগ্যকুল, হলদিয়া, সিরাজদীঘা ছিল কাঠ ও পাটের বড় বড় গঞ্জ। সিরাজদীঘা, গোয়ালিমান্দ্রা, খরিয়া, ভাওয়ার ছিল শালবল্লা, গজারি আর মুলিবাঁশের পাইকারি ব্যবসার গঞ্জ। বাড়ৈখালি, রাজানগর, গাওদিয়া, ভোগদিয়া, কলমা ও আরিয়ল ছিল তৈরি নৌকা বিক্রির আঞ্চলিক ঘাঁটি। তার মধ্যে রাজানগর আর ভোগদিয়া ধানের গঞ্জ হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যাবার পর কোন খাদ্যশস্যের গঞ্জেই গুদাম-ভর্তি মাল দেখিনি, বরং খালিই দেখেছি। কারণ, সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসেই পেগু ও দক্ষিণ জেলাগুলি থেকে ধানচাল আসা শুরু হত, ১৯৪২ সালের গোড়াতেই তার চলাচল বন্ধ হয়। বরং খালি গুদামের ফলে আকাল দেখা দিতে শুরু করেছে। দেউলভোগ ছিল গৃহপালিত জন্তুর হাট হিসাবে বিখ্যাত।

মুন্সীগঞ্জে যদি না যেতুম তাহলে বাংলার কোন ছোট মহকুমায় এত মাল ও লগ্নির ব্যবসা যে সম্ভব হতে পারে তা বিশ্বাস হত না। বলা যেতে পারে, সারা ভারত থেকেই যাবতীয় প্রয়োজনীয় মাল আমদানি হত। মুন্সীগঞ্জ থেকে সেইসব মাল পূর্বভারতের নানাস্থানে, বিশেষত বাংলার উত্তরপূর্ব জেলাগুলিতে ও আসামে, ত্রিপুরা ও মণিপুরে, নাগাল্যাণ্ডে এবং এখনকার মেঘালয়ে ও অরুণাচলে যেত। ফলে প্রতিটি স্থানে আগাম বিক্রি, দরদস্তুর, টাকা পয়সার বিনিময়, বিল ডিস্-কাউন্টিং-এর এলাহি ব্যবস্থা ছিল।

তার থেকেও যা আমাকে বেশী অবাক করে তা হল সমস্ত ব্যবসাই ছিল স্থানীয় বাঙালি বণিকদের হাতে। পুরুষানুক্রমে বিক্রমপুরের ব্যবসা ও লগ্নি কারবার গড়ে উঠেছিল একাধারে ঝুঁকি নেবার প্রবণতা, অন্যধারে সাবধানতা, ভিক্টোরিয়ান মিতব্যয়িতা, বাজেখরচ বর্জন এবং রক্ষিত মালের সযত্ন ও সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণে। তার মানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী পুঙ্খানুপুঙ্খ লেনদেনের বিশদ সংবাদের আদানপ্রদান ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। নিত্য সর্বত্র যাওয়া-আসা করার নায়েব গোমস্তা তো ছিলই, ডাক-তার বিনিময়ের ব্যবস্থা, তার সঙ্গে ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট ও ওভারড্রাফ্‌ট, হুণ্ডিরও বিস্তৃত ব্যবস্থা ছিল। মিতব্যয়িতা ও পরিচালনার তদারকি ও খরচা কমানোতে তাঁরা রাজস্থানী ব্যবসায়ীদেরও হারিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে সারা মুন্সীগঞ্জে আমার সময়ে একজনও রাজস্থানীকে খুচরো ব্যবসায়ে পর্যন্ত দেখিনি।

মিতব্যয়িতা

একথা বোধহয় ঠিক, যে যত গরীব ঘর হবে আপেক্ষিক অপচয় তত বেশী হবে, এবং যত ধনী ঘর হবে ততই আপেক্ষিক অপচয় কম হবে। গরীব ঘরেই অযত্ন থাকে বলে আক্ষুটে স্বভাব আমি বেশী দেখেছি। তার মস্ত কারণ আমার মতে ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব এবং তজ্জনিত একই জিনিসের ক্রমাগত ব্যবহার ততটা নয়, যতটা দায়ী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও সঞ্চয় সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ। অর্থাৎ অধিকাংশ গরীব পরিবারের জীবনদর্শন হল, যেহেতু ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎহীন, সুতরাং যত্ন অনাবশ্যক, এমন-কি নিরর্থক, সে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর জীবনই হোক বা যে কোন মহার্ঘ বস্তুই হোক।

বিক্রমপুরের সবথেকে ধনী পরিবারে আমি যা মিতব্যয়িতা দেখেছি, সে বিষয়ে কিছু না বললেই নয়। মুন্সীগঞ্জে যাবার মাস দুয়েকের মধ্যে ভাগ্যকুলের বড় তরফের কুমার প্রমথনাথ রায় আমাদের তাঁদের ভদ্রাসন ভাগ্যকুলে যেতে নিমন্ত্রণ করে, তাঁদের উকিল রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ দে'র হাতে পত্র পাঠালেন। রায়সাহেব বললেন, কুমার প্রমথর খুব ইচ্ছা তাঁদের শরিকী বিবাদের আমি মীমাংসা করে দিই। কুমার প্রমথ তাঁদের নিজস্ব লঞ্চ পাঠিয়ে দেবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখাতে তিনি লঞ্চ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। লঞ্চটি খুব বেগে

চলে। মুন্সীগঞ্জ থেকে বেলা বারোটা-একটায় ছেড়ে ভাগ্যকুলে আমরা ছ'টা নাগাদ পৌঁছলুম। রায়সাহেব দেবেন দে আমাদের সঙ্গে গেলেন।

লঞ্চে উঠে উনি কথাচ্ছলে আমাকে ওঁর প্রণীত এককপি 'ভাগ্যকুল পরিবারের ইতিহাস' দিলেন। এটি ইংরেজিতে, বাংলাটি পরে দেন। আমি বইটির তরতরে পরিষ্কার ইংরেজিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, বইটি কেউ সম্পাদনা করে দিয়েছে কিনা। বললেন, না। বিস্ময় প্রকাশের আগে তিনি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'আমি যে ভাবে কথা কই, আর যে ভাবে লিখ্‌ছি, তার থনে কইছেন, না?' আমি একটু আমতা আমতা করাতে, বললেন, 'তবে কই, শোনেন! আপনাগো কাছে আমি প্রায়ই মিঃ জাস্টিস ও মিসেস রক্সবরার কথা কইছি। তেনারা দুজনাই আমারে স্নেহ করতেন, প্রায়ই সকালে ব্রেকফাস্টে যাইতে কইতেন, নিজেরা খাইতেন, আমারে চা খাওয়াইতেন। মহকুমার কোথায় কী ঘটছে, আমারে কইতে হইত। তারপর, শোনেন স্যার, দেখি কি যখনই আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে যেমন সাহেবগো কাছে ইংরাজি শিখছি তাই কই, তখনই দেখি মিসেস রক্সবরা কেমন যেন আনমনা হইয়া যান। আর যখনই ভাঙা ভাঙা ইংরাজি কইতাম তখনই তাঁর মুখে খুশি খুশি ভাব, আর অনেক প্রশ্ন। একদিন তো সোজা কইয়াই ফেলাইলেন, "দেবেনবাবু, আপনার মুখে ফার্স্ট ক্লাস ব্রোক্‌ন্‌ ইংলিশ (ভাঙা ভাঙা ইংরাজি) শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।" আসল কথা কি জানেন, স্যার, ইংরেজরা চায় না যে আমরা তাদের মত ভাল ইংরাজি কই বা লিখি। তাদের ভয় হয় এই বুঝি ঘাড়ে হাত দিবার চায়। আর আপনি ফার্স্ট-ক্লাশ ব্রোক্‌ন্‌ ইংলিশ কইলে তাদের দূরত্ব বজায় থাকে, তাদের সম্মানবাড়ে! সেইদিন হইতে কলেজে শেখা ভাল ইংরাজি কওয়া ছাইড়্যা দিলাম। সেদিন হইতে আর কোন গোল হয় নাই!' এই বলে এমন সুন্দর মুচকি হাসলেন, আমরা গড়িয়ে পড়লুম।

রাত্রে খাবার জন্য লঞ্চ থেকে আমাদের নিয়ে যেতে কুমার রমেন্দ্র (কুমার প্রমথর মেজ ভাই) আর কুমার প্রমথ'র বড় ছেলে এলেন। পরের আড়াই দিন দুপুরে, চায়ে ও রাত্রের আহারে পাঁচ শরিকের বাড়িতে পালা করে নিমন্ত্রণ হল। অনেক রাত্রে শুতে আসতুম লঞ্চে, পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে লঞ্চ থেকে যেতুম কোন না কোন আগে-থেকে-নির্ধারিত বাড়িতে। প্রত্যেক রাত্রেই বেশ ঘটা করে খেতে দিত। আভা অন্দর-মহলে মহিলাদের সঙ্গে খেত। আমরা ছ'সাত জন পুরুষ পংক্তিভোজে মাটিতে পাতা আসনে বসে খেতুম। প্রত্যেকের সমুখে একটি

নিচু জলচৌকির উপর থাকত আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের রুপোর বগি থালা, থালার চারদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো থাকত ডজন খানেক পদ্মকাটা রুপোর বাটি, প্রত্যেকটিতে একটি করে পদ। সব পদ ভাল করে খাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার, অন্যদিকে, কোন একটি পদ খাবেন না বলাও অভদ্রতা, একটু করে ছুঁতেই হত। সুতরাং থালার উপর একটি রুপোর চামচে থাকত। প্রত্যেক বাটি থেকে একটু করে তুলে নিতুম, যাতে বাটিটি এঁটো না হয়, বাকিটি বাড়ির লোকজনকে দিতে পারা যায়। এমন-কি পাতে যে নুন দেয়া হত, সেটিও নষ্ট হত না, যেটুকু খরচ হত না, সেটুকু পাত্রে ঢেলে রাখা হত।

বলা বাহুল্য, শরিকী বিবাদের কোন ফয়সালা হল না। সে ধরনের অভিমান ও জেদের বিবাদ ফয়শালা হবার নয়। সেটি ছুতো, আসলে ইচ্ছা এস-ডি-ওকে ভাগ্যকুলে একবার আনা। তৃতীয় দিন দুপুরবেলা খাবার পর লঞ্চে ওঠার আগে কুমার প্রমথ নিভৃতে তাঁর নিজের সমস্যা ও চিন্তা-ভাবনার কথা বলতে লাগলেন। তার আগে পাঠকদের অবগতির জন্য একটু বলি। ১৯৫০ সালে সেন্সাসের কাজে আমি যখন কলকাতায় বাস করতে যাই তখন জানতে পারলুম পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণ থেকে এলগিন রোড পর্যন্ত অনেকগুলি বাগানওলা বড় বড় বাড়ি ভাগ্যকুল বাবুদের সম্পত্তি। কলকাতায় নানা প্রতিষ্ঠানে ভাগ্যকুল পরিবারের বড় বড় দান ছিল। যথা, মেডিক্যাল কলেজের একটি বড় ওয়ার্ড, যেটি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ থেকে দেখা যায়, সেটি কুমার প্রমথর দান, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও কুমার প্রমথর কাঁচা টাকা ছিল অঢেল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যবসা ছিল, তাছাড়া ছিল পদ্মা-মেঘনায় মাল চলাচলের জন্যে একটি স্টীমার কোম্পানি। বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়লে, লগ্নির টাকায় হাত না দিয়ে, তিন চার কোটি টাকা বার করা তাঁর পক্ষে কোন ব্যাপারই ছিল না। ভেবে দেখুন তখনকার দিনের টাকা, আজকের নয়।

বুঝলুম তাঁর সবথেকে বড় চিন্তা হল তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে। তিনি গত হলে তাঁর বড় ছেলে সবকিছু ঠিকমত চালাতে পারবে কিনা তাই নিয়ে তাঁর ভাবনা। 'মিঃ মিত্র, এত বেহিসাবী খরচে, কি বলব! আজ নয়, ছেলেবেলায় স্কুল থেকে। হেয়ার স্কুলে বাড়ির সকলে আমরা বরাবর পড়েছি। আমাদের বাড়ির চলিত প্রথা হচ্ছে রোজ স্কুলে যাবার সময়ে টিফিনের নাম করে ছেলের হাতে দু'আনা (আজকাল বারো পয়সা) দেয়া। আমরা সবাই—রমেনও—সে-দু'আনা খরচ না করে, জমিয়ে, ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনতুম। কিন্তু এই ছোকরা এত আমাকে হতাশ করল, কী বলব। বিশ্বাস করবেন, ক্লাস সেভেন-এ যখন উঠল,

তিন বছরে প্রতিদিনের দু'আনাটি জমিয়ে জমিয়ে সে একটা র‍্যালে সাইকেল কিনে ফেলল, ভাবতে পারেন, এমন খরুচে স্বভাব !'

এর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, রাজস্থানীরা মুন্সীগঞ্জে কেন কল্কে পায়নি, খুঁটি গাড়তে পারেনি। অনেক পরে কোথায় যেন পড়লুম ইংলণ্ডের রানী, তাঁর পদ ছাড়াও, নাকি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ধনীলোক, মহিলা-ধনী হিসাবে সর্বপ্রথম তো বটেই। তারপর পড়লুম, তাঁর মত মানী ও ধনীলোকও বাকিংহ্যাম প্যালেসে রাত্রে শোবার আগে ঘরে ঘরে ঘুরে আলোর সুইচ বন্ধ করে দেন। তখন আমার কুমার প্রমথ'র কথা মনে পড়ে গেল। ইংলণ্ডের রানীর বৈভবের সঙ্গে অবশ্য কুমার প্রমথর ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না, তাঁরা দুজনেই যে একই ছাঁচে গড়া বোঝা গেল। তা না হলে কি ধনদৌলত হয় !

সরজমিনের মানুষ

পণ্ডিত নেহরুর সময়ে স্বরেন্দ্রকুমার দে কম্যুনিস্ট ডেভেলপমেণ্টের প্রথম মন্ত্রী হিসাবে পঞ্চায়েতি রাজ প্রবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করলেন এটি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনা, তার আগে পঞ্চায়েতি রাজ বলে কিছু ছিল না। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট ঢাক পিটিয়ে বললেন তাঁরাই এই প্রথম আসল পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এবং তার পরেও যে ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা প্রচলিত ছিল তার কথা দু'পক্ষের কারোরই একবার মনে উদয় হল না। আসলে পূর্বপ্রচলিত প্রথা বা রীতি লোকের মন থেকে, নানাবিধ মিথ্যা প্রচারের সাহায্যে, একেবারে মুছে দেয়াই হল আধুনিক রাজনীতির একটি প্রধান অস্ত্র। ইউনিয়ন বোর্ডে অবশ্য নারীপুরুষ নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার ছিল না, কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড ম্যান্থুয়ালে কিছু সদর্থক নিয়মপদ্ধতি আইন হিসাবে নথিবদ্ধ ছিল যা বজায় রাখলে পঞ্চায়েতদের কার্যরীতি ও ব্যবহারে অনেক বেশী সততা, সমদর্শিতা ও নিঃস্বার্থ সেবা আসত, জনসাধারণের অর্থ নয়ছয় হত না, বিশেষ বিশেষ পদাধিকারীদের পকেটে যেত না। যে অর্থব্যয় হয় তার পরিমাপে ভোগ্যফল অনেক বেশী ফলত। ইউনিয়ন বোর্ডের তরফে যে সব ট্যাক্স আদায়ের অধিকার ছিল, সেগুলি আরো পরিস্রুত করলে কতকগুলি পূর্তকাজে খরচের বাধ্যবাধকতা থাকত। সেই সঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক স্তরের আনুপাতিক সহযোগিতা পাওয়া যেত।

১৯৫২ সালে কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্টের প্রথম উচ্ছ্বাসে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের নেতৃত্বে যখন কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত গ্রামসেবকদের প্রস্তাব ও নিয়োগকে আমরা অভূতপূর্ব উদ্ভাবনা বলে নাচানাচি করলুম, তখন ভুলে গেলুম তার কয়েক বছর আগে চল্লিশের দশকে কৃষি বিভাগের ডিরেকটর এবং পরে সেই দপ্তরের সেক্রেটারি নিয়াজ মহম্মদ খান ঠিক এই উদ্দেশ্যেই জুট রেগুলেশন বিভাগের ছাঁটাই কর্মীদের পুনরায় নতুন শিক্ষা দিয়ে ঠিক এই ধরনের ফলিত কৃষিবিদ্যার গ্রামসেবক তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা আরো ভুলে যাই—এবং এ বিষয়ে প্রত্যেক সরকার ১৯৫৬ সাল থেকে কোন উচ্চবাচ্য করেন না—সেটি হচ্ছে এল-এম-এফ ও এল-এম-এস ডাক্তারদের অবদান। পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত আগেকার যুগের পাস করা এল-এম-এফ, এল-এম-এস ডাক্তাররাই বাংলার শহর ও গ্রামকে তাঁদের চিকিৎসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেন। সেই সঙ্গে স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টর, যাঁরা জেলা বোর্ডের অধীনে কাজ করতেন, তাঁরা পরিবেশ দূষণ ও সংক্রামক রোগ প্রতিকারে কতখানি সাহায্য করতেন এখনকার দিনে উন্নতির কুহকে পড়ে আমরা ভুলে গেছি। স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টরদের কৃপায় কলেরা, আমাশয়, বসন্ত ইত্যাদি ছড়াতে পারত না। হাটেবাজারে, বিশেষত উৎসব, মেলায় নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ও অন্যান্য প্রতিষেধক ছড়ানো হত। আজকাল এম-বি-বি-এস ডাক্তাররা গ্রামে গিয়ে বসবাস করে চিকিৎসা করতে সহজে রাজি হন না, সেইজন্য পঞ্চাশের দশকে যে বিরাট অর্থ ও শ্রমব্যয়ে সারাভারতে ব্যাপকভাবে চিকিৎসালয়-তথা-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলি আজ এম-বি-বি-এস পাস ডাক্তারের অভাবে প্রায় অচল, পরিচর্যার অভাবে বিলোপের পথে। সত্তরের দশকে আমি নিউট্রিশন সোসাইটি অভ ইণ্ডিয়ার সভাপতি ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলাম। তখন আমি অনেকগুলি অঞ্চলে পরিসংখ্যানমূলক গবেষণা করে দেখি ১৯৪০-৪৫ দশকার্ধে গ্রামবাংলার হাজার করা জনসংখ্যা পিছু যত ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার, শল্যচিকিৎসক গ্রামে বসবাস করে চিকিৎসা করতেন, ১৯৭০-৭৫ দশকার্ধে তার অর্ধেকেরও কম ছিল এবং তাঁরা অধিকাংশই শহরের অধিবাসী। অথচ ১৯৪০-৪৫ সালে ডিপ্লোমাধারীদের অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করতেন। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুখসুবিধা এর থেকেই অনুমেয়। ঠিক একই কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বি-এড পাসকরা শিক্ষকরা যে গ্রামে পড়াবেন তাঁরা সে গ্রামের বাসিন্দাও নন, গ্রামেও থাকতে

নারাজ, উপরন্তু, সেই কারণে তাঁদের ছাত্র ও তাদের পিতামাতা অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগও থাকে না। উত্তম ব্যবস্থা বর্জন করে সর্বোত্তম ব্যবস্থার আলেয়ার পিছনে ছুটে আমরা একূল ওকূল দুকূল হারিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছি।

কিন্তু গত ত্রিশ বছরে সবথেকে দুর্ভাগ্যময় অবনতি যা হয়েছে সেটি হচ্ছে পূর্বে সর্বোচ্চ স্তর থেকে স্তরে স্তরে তৃণমূল পর্যন্ত যে নিয়মিত তদারক, অনুশাসন ও পরিদর্শনের কাঠামো ছিল তা এখন প্রায় বিলোপের পথে। বৃটিশরা প্রশাসনে তদারক, অনুশাসন ও পরিদর্শনের যে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে গেছল, তা এখন সরকারী কাজে অবলুপ্ত হয়েছে বলা যায়। সে প্রথা এখন একমাত্র বোধহয় মালিকী শিল্প বা ব্যবস্থা সংস্থানেই আছে। নিয়মিত তদারক, পরিদর্শন তো বটেই, উপরন্তু যে-কোন সময়ে আচমকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকলে, কোন ব্যবস্থাই দুরস্ত থাকতে পারে না। চোখের আড়ালে উপরওলা আছে, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে, এ ভয় না থাকলে কাজে ঢিল পড়া অবশ্যম্ভাবী। আরেকটি শর্তেরও প্রয়োজন আছে। উচ্চতম কর্মচারির অবিসংবাদিত অধিকার থাকা উচিত সর্বস্তর ডিঙিয়ে যে কোন স্তরে, তৃণমূল পর্যন্ত কোন কর্মীকে শাস্তি বা পুরস্কার দেবার। সরজমিনে হাজির হয়ে পরিদর্শন ও সংশোধন করার অধিকার না থাকলে কোনকিছু সুষ্ঠুভাবে চলে না।

আরেকটি নিয়ম ছিল যা আজকাল জীপ ও সরকারি মোটরগাড়ির কল্যাণে একেবারে লোপ পেয়েছে। সেটি হচ্ছে থানা স্তরের অফিসার থেকে শুরু করে উচ্চতম অফিসার পর্যন্ত প্রত্যেককে মাসের মধ্যে অন্তত কয়েক রাত্রি এলাকার অভ্যন্তরে রাত্রিবাস করতে হবে, এবং রাত্রিবাস করে স্থানীয় দপ্তর বা স্থানীয় সরকারি কাজ পরিদর্শন করতে হবে। এই নিয়মের নিহিত দর্শন ও উদ্দেশ্য ছিল যে আপনি যদি কোন গ্রামে রাত্রিবাস না করেন, তাহলে সেই গ্রামের এবং তার পারি-পার্শ্বিকের যাবতীয় সুখসুবিধা, অব্যবস্থা বা অভাবের কথা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন না, স্বকর্ণে শুনতে পাবেন না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে না, যা সুপ্রশাসনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। বিশেষত, এই ব্যবস্থা ছাড়া গ্রামের সবথেকে গরীব ও দুঃস্থদের অভাব অভিযোগের খুঁটিনাটি জানা এবং তার সুরাহা করা সম্ভব নয়। রাত্রিবাস নিয়মের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। লোকে মন খুলে কথা বলে তখনই যখন সে জানতে পারে আপনার সমবেদনা বা অনুকম্পা আছে কি নেই। এই জানার জন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন, যা জীপে বা মোটরে ঘুরলে আদৌ সম্ভব নয়।

কিসের জন্য গ্রামে রাত্রিবাস প্রয়োজন হত এবং আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও হবে—বিশেষত আজকের রাজনৈতিক দল বা কর্মীদের অত্যাচার থেকে সাধারণ দুঃস্থ ও গরীব গ্রামবাসীকে রক্ষা করতে হলে—সে বিষয়ে আমি ভেড়ামারায় ধাঙড় গ্রামের উল্লেখ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছি। যখনই কোন নতুন জায়গায় যেতুম, স্থানীয় ভদ্রলোকরা ছাড়া, নিচুজাতের অধিবাসীরা কিছুতেই সরাসরি দেখা করতে সাহস করত না। এমন-কি ডাকবাংলাতেও প্রথম রাত্রে নয়। তারা প্রথম দিন বা রাত্রে চাপরাশির কাছে বুঝে নিত আমি কি ধরনের লোক, তাদের কথা শুনতে রাজি, না দেখা করতে এলে খেপে যাব। দূর থেকে আমার হাবভাব লক্ষ্য করত। যদি মনে করত আমি লোকটি হয়তো খুব খারাপ নয়, তা হলে দ্বিতীয় রাত্রে বা পরের দিন ভোরে নিরিবিলি গুটিগুটি দু'একজন এসে দেখা করে তাদের অসুবিধা বা অভিযোগের কথা বলত, স্থানীয় ভদ্রলোকদের তাদের এতই ভয়। আজকের দিনে আগের কালের ভদ্রলোকের স্থান নিয়েছে বর্তমানকালের 'ক্যাডার'। এই ছিল সরজমিনে হাজির মানুষের তত্ত্ব। একদিকে এর ফলে আপনার আত্মগরিমা হয়তো তৃপ্ত হত, নিজেকে কেউকেটা মনে হত, অথবা গরীবের মা-বাপ বলে আত্মপ্রসাদ আসত, ফলে মাথা ফুলে যাবার আশঙ্কা থাকত। অন্যদিকে, আপনি যদি আরেক দিক দিয়ে দেখেন, তাহলে আপনার মনে হয়তো আসত বিনয়, আত্মনিবেদন, সমাজে যারা সবদিক দিয়ে পতিত তাদের আপনজন করার আগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, সারা দেশে এই ধরনের আত্মনিবেদনের এখনও প্রয়োজন আছে। যদি অবশ্য প্রতি ব্যাপারে আপনি 'এমন ঘটনা তো কতই ঘটে' বলে সবকিছু দায়িত্ব মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে না চান।

দু'একটি বৈশিষ্ট্য

মুন্সীগঞ্জের অধিবাসীদের মামলাবাজ স্বভাবের কথা আগেই বলেছি। প্রতিদিন ভোরে সকালের স্টীমার আসার আগে মুন্সীগঞ্জ ঘাটে একদল লোক জড়ো হত। যেই স্টীমার থেকে লোক নামত, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সেদিনের দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে কার কী কেস আছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেসব কেসের ও সাক্ষীসাবুদের নামধাম জেনে নিত। তারপরে একেকজনকে ধরে বলত, আমাকে সাক্ষী নিন। থতমত খেয়ে আগন্তুক যদি বলত, তোমাকে কি করে সাক্ষী নেব, তুমি কেসের কী জানো? তখন লোকটি হুমকি দিয়ে বলত, না নেবেন ঠিক আছে,

আমি আপনার বিপক্ষের সাক্ষী হব, ভালই তো। তখন বাধ্য হয়ে অনেক সময়ে প্রথম পার্টি তাকে সাক্ষী মানত, এবং সাক্ষীর খরচ-খরচা গুনে দিত। এইসব ঝুটো সাক্ষীদের বলত টাউট।

আরেক ধরনের দুষ্টু লোক ছিল, তারা লেখাপড়া জানা। দিনের শেষে মামলা মোকদ্দমা সেরে ফেরার সময়ে স্টীমারে ওঠার আগে পোস্ট অফিস থেকে তিন চারটি পোস্টকার্ড কিনে সেগুলিতে চিঠি লিখে ডাকে দিত। একটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা জজকে, আরেকটি বিভাগীয় মন্ত্রীকে, তৃতীয়টি রাজস্ব বোর্ডের সভ্যকে, মুন্‌সিফ বা হাকিমের বিরুদ্ধে মনগড়া নালিশ করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মন্ত্রী না হয় বোঝা গেল, রাজস্ব বোর্ডের সভ্য কেন? কারণ, রাজস্ব মেম্বর নাকি মাইনের আদেশ মঞ্জুর করেন, তিনি মাইনে বন্ধ করার মালিক। এইসব চিঠি লিখে, রোজকার করা টাকায় বাজারে সংসারের জন্যে কিছু সওদা করে ফিরতি স্টীমারে উঠতে পারলে সারা দিনটি বেশ মধুরেণ সমাপয়েৎ হত। অন্যের বিরুদ্ধে হলে হাসির ব্যাপার, তবে আপনার বিরুদ্ধে না হলেই ভাল। যদি কোপ আপনার উপর পড়ত তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কি মিথ্যা নালিশ হত বলা শক্ত: অবৈধ প্রণয় বা পরস্ত্রীগমন থেকে শুরু করে সরকারী তহবিল তছরুপ পর্যন্ত। এসব নালিশ যে প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষবশে হত তা সব সময়ে নয়, নিছক তামাসা করাই হয়তো উদ্দেশ্য হত। তামাসার কী ধরন ভেবে দেখুন! আবার অন্যদিকে চিন্তা করুন, কিছু একটা নষ্টামি করার কী উৎসাহ! তারিফ না করে উপায় নেই!!

যেসব কথা লিখলুম—যথা ট্যুর করা, মফঃস্বলে রাত কাটানো, ইন্‌স্পেক্‌শন, প্রতিকারের ব্যবস্থা, স্থানীয় সমস্যা সমাধানে লিপ্ত হওয়া: দু'বছর আগে যে লোক সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে তার পক্ষে এসব যেন ভিন্ন জগতের ব্যাপার। বিশেষত যে সময়ে সারা জগৎ যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও তোলপাড় হচ্ছে, চারদিকে মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলছে, সে সময়ে এইসব বিষয়ে মাথাব্যথা তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তা সত্ত্বেও আপনি সান্ত্বনা পেতেন এই ভেবে যে কর্তব্যে অবহেলা করা উচিত হবে না, তাতে যদি আপনার প্লেটো বা মার্ক্স বা শেকস্‌পিয়র পড়ায় বাধা পড়ে তাও স্বীকার। নিজেকে হামবড়া না ভেবে, স্থানীয় সমস্যাগুলির পায়ে আত্মনিবেদন করার মূল্য আছে। তবে উল্টোটা হলেই বিপদ!

যে কাজটি আমার বিশেষ খারাপ লাগত সেটি হচ্ছে ফৌজদারি সোপর্দ আইনের ১০৯।১১০।১১১ ধারার মামলা; প্রকাশ্যে যাদের কোন রোজকার নেই,

পরের উপর বাটপারি করে খায়, আইনে তাদের দণ্ড দেয়া। অর্থাৎ, আজকালকার কথায় যাদের শহরে বা গ্রামে আমরা বলি মস্তান, সে যেমন গোষ্ঠীরই হোক। আজকালকার মস্তানদের বিরুদ্ধে চেষ্টা করলেই প্রমাণ পাওয়া সম্ভব, সুতরাং আইনের এই তিনধারার ব্যাপক প্রয়োগ হলে ভাল হত। কিন্তু তখনকার কালে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হত, তাদের সম্বন্ধে লোকমুখে সন্দেহসূচক অভিযোগ ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশেষ পাওয়া যেত না। অবশ্য তখনকার দিনে এই ধারা-প্রয়োগে মানবতাবোধ হয়তো বেশী প্রকাশ পেত; আজকাল হামেশা হেবিয়াস কর্পাস অগ্রাহ্য করে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা, এমন-কি হাজতে বা জেলে তার উপরে অকথ্য অত্যাচার করে, সময়ে সময়ে পালাবার চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করে, মেরে ফেলা, তখন চিন্তা করা যেত না। এই ধারাগুলির মামলা বড় বড় নদীর কূলবর্তী গ্রামগুলিতেই বেশী হত, যেখানে নদীর ভাঙনে বা নদীর বুকে চর ওঠায় জমি নিয়ে বিবাদ হত। এই জমি দখল ব্যাপারে দুই বিবাদী পক্ষ মস্তানদের সাহায্য নিতেন। কাজ যখন ফুরিয়ে যেত, মস্তানরা বেকার হয়ে গ্রামে ছিনতাই, ছিঁচকে চুরি, সিঁদকাটা, রাহাজানি করত। সে অবস্থায় পুলিশ, এমন-কি জমির মামলার দুই পক্ষ, যারা তাদের পূর্বে মস্তান রেখেছিল, তাদের কাজ হত পরস্পর এবং পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মামলা করতে সাহায্য করা। সাজা হলে তাদের উপর আদেশ হত প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজিরা দিতে হবে, এবং গ্রামের চৌকিদার নিত্য তাদের উপর নজরবন্দী করে রাখবে। সমাজে তাদের বলত ১১০ ধারার আসামী।

এই ধরনের কেসের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন-কি কয়েক মাস ধরে প্রস্তুতি চলত, অবশেষে কেস সাজানোর কাজ পাকা হত, এস-ডি-ও সরজমিনে মোকদ্দমা করতে যেতেন, লোকমুখের সাক্ষীর সংখ্যা এত বেশী হত যে, যেহেতু এগুলি হত পুলিশের মামলা, সুতরাং সরকারি খরচায় তাদের সদরে সাক্ষী দিতে আনা পোষাত না, উপরন্তু, গ্রামে সকলে মিলে সাক্ষ্য দিতে গ্রামবাসীদেরও প্রাণে সাহস বেশী আসত। সাধারণত একদিনেই মোকদ্দমাটি শেষ হত। কেস শুরু হত পুলিশের অভিযোগ দিয়ে, প্রমাণ বিশেষ কিছু থাকত না, অজস্র কিংবদন্তী সাক্ষ্যের প্রধান অভিযোগ হত: 'অমুক আসামী একটা চুর, হারমাইদ, কোন কাম, কাজ, বাঁধা রোজকার নাই, খাওয়নের অবস্থা নাই।' এই উক্তির সঙ্গে দু'একটি লোকমুখে শোনা ছিঁচকে চুরি, ছিনতাই, ছাগল বা কাপড় চুরির অভিযোগ সাধারণত থাকত। যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার নিজস্ব লোকসান হয়ে থাকতে

পারে, নাও পারে, কিন্তু সে লোকমুখে শুনেছে যে অভিযুক্ত লোকের পক্ষে ঐ ধরনের কাজ সম্ভব। পঞ্চাশ-ষাটজন লোকের এই ধরনের সাক্ষ্যে আসামী দণ্ডনীয় হত। কিছুটা ইওরোপে মধ্যযুগে ক্যাথলিকদের ইনকুইজিশনের মত, বা আরো পরের যুগের ডাইনি পোড়ানোর মত। এই ধরনের বিচার প্রহসন শেষ হত বিশেষ জাঁকজমকে। সারাদিন ধরে মামলা চলছে, ওদিকে মামলার মঞ্চের থেকে দূরে আড়ালে চলছে বিরাট ভোজের আয়োজন। আসত প্রায় আড়াই মণ পাকা মাছ, গোটা কুড়ি-পঁচিশ কচি পাঁঠা। সাক্ষী, পুলিশ, গ্রামবাসী মিলিয়ে খেত প্রায় দু'শ' আড়াইশ' লোক। আসামী নিজে ও তার পরিবারের লোকেরাও ভাগ পেত না, তা নয়।

এইসবের চারদিকে ঘুরত আমার মুন্সীগঞ্জের ছোট্ট জগৎ। কলেজে পড়ার সময়ে যে অর্থে পড়েছি আইন নীতিগতভাবে সর্বত্র একই অর্থে প্রযোজ্য, অবিভাজ্য, পবিত্র, সে নথীবদ্ধ আদর্শ থাকত কিছুটা তাকে তোলা। প্রশাসক হিসাবে যখন হাতেকলমে শিক্ষা শুরু হল তখন দেখি প্রতি পদেই নীতিগত আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে করতে হয় রফা। রাজনীতি কথাটা যতই কানে বাজুক, এই রফার মধ্যে রাজনীতি বেশ ঢুকত। সে রাজনীতি হতে পারে গ্রামের স্তর, দলগত রাজনীতির স্তরে, এমন-কি পারিবারিক, অর্থাৎ মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্রের স্তরেও। আইনকে যে অন্ধ গাধা বলা হয় তার সবটা ঠিক নয়, তবে গান্ধীজি এও বলেছিলেন যে আইনের বলে দীনতম লোকের স্বার্থও রক্ষা করা যায়। সবই প্রায় নির্ভর করে আইন যার হাতে তার মতিগতির উপর।

জাপানের অগ্রগতি : পশ্চিম প্রান্ত

১৯৪২-এর ১০ মার্চ জাপানীরা রেঙ্গুন দখল করে। সে সময়ের মধ্যে বর্মা থেকে কিছু কিছু উদ্বাস্তু মুন্সীগঞ্জে এসে পৌঁছেছেন। তার আগে, ২ মার্চ, বর্মা উদ্বাস্তুদের বিষয়ে কী ব্যবস্থা করতে হবে সে সম্বন্ধে সরকার বিশেষ নির্দেশাবলী জারি করেছেন। এই নির্দেশাবলী কার্যত কীভাবে পায়ে ঠেলা হয়েছে সে সম্বন্ধে সরকারের বিরুদ্ধে ১৮ মার্চ জওহরলাল নেহরু এক জ্বালাময়ী বিবৃতি দেন। শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভারত সরকার যে কদর্য, বিসদৃশ, মানবতা-বিরোধী বৈষম্য প্রয়োগ করেন, নেহরু তার বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় বলেন।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নতুন দিল্লী থেকে একটি সরকারি বিবৃতিতে বলা

হল যে বর্মা থেকে চল্লিশ হাজার ভারতীয় উদ্বাস্তু ভারতে এসে পৌঁছেছে। প্রথম যে দল এলেন তাঁরা নিজেদের যানবাহন ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন আকিয়াব ও কক্সবাজারের পথে। তাঁদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। বরং তাঁরা সঙ্গে করে তাঁদের টাকাকড়ি, সংসারের জিনিসপত্র, এমন-কি বর্মা সেগুনের উৎকৃষ্ট আসবাবপত্রও কিছু সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন। তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা দেখে মুন্সীগঞ্জ বাজারের দোকানদাররা তাদের পুরনো স্থানীয় খরিদ্দারদের মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বলত: 'যা দাম কই না দিবার পারেন, জিনিস ছুঁইবেন না, বাবু, রাইখ্যা দেন। আপনারে যা কইছি তার ডবল দামে ড্যাম্‌চিবাবুরা লইয়া যাইব।' ড্যাম্‌চিবাবু মানে যে-সব বর্মা উদ্বাস্তুরা দোকানীর বলা দাম শুনে বলে উঠতেন, 'ড্যাম চীপ', অসম্ভব সস্তা। কিছুটা আজকের দিনে আমেরিকা থেকে ছুটিতে আসা ডলারবাবুদের মত, আর কি।

যাঁরা স্থলপথে যাত্রা করে দুর্গম রাস্তায় পার্বত্য জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে এলেন তাঁদের আসতে এপ্রিলের শেষ, মে মাস গড়িয়ে গেল। বিপদের পরিমাণ কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান হল যখন আভার বন্ধু অমিয়া ঘোষ তাঁর বৃদ্ধ দাদামশাইকে নিয়ে মুন্সীগঞ্জে পৌঁছলেন। আভা ও অমিয়া দুজনে একসঙ্গে বি-টি পড়েছিলেন। উদ্বাস্তু অবস্থা কত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক হতে পারে তা তাঁদের দেখেই সেই প্রথম জানলুম। ভাগ্যক্রমে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে অমিয়া একটি কাজ পেলেন। ৩১ মার্চের মধ্যে জাপানীরা মান্দালয় দখল করে। বৃটিশরা চিণ্ডুইন উপত্যকা দিয়ে উঠে ভারতে ফিরে আসে, সেইসঙ্গে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের হাতে হারায়। ৩১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিনের ছুটিতে কলকাতায় যখন যাই তখন দেখি বিষাদ ও আতঙ্ক নেমে এসেছে। কলকাতার বহু পরিবার জিনিসপত্র ঘরবাড়ি বন্ধ অথবা বিক্রি করে বিহার বা মধ্যপ্রদেশে আশ্রয় নেয়।

ওদিকে ইওরোপের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। ১৯৪২-এর এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে লণ্ডনে আলোচনার পর জেনরল জর্জ মার্শাল ও হ্যারি হপ্‌কিন্স স্থির করলেন রাশিয়ার দিক থেকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে হবে। ২০ মে মলোটভ যুদ্ধে ঘনিষ্ঠতর সহযোগকল্পে ইংলণ্ডের সঙ্গে লণ্ডনে আরেকটি চুক্তি সই করলেন। ২৯ মে সোভিয়েট ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে লেণ্ড-লীজ চুক্তি সই হল। ৩০ মে আর-এ-এফ বাহিনী জার্মানির কলোন শহরের উপর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। ২৫ জুন ব্রেমেন শহর ও বন্দরের উপর এক-

হাজার আর-এ-এফ বোমারু বিমান একনাগাড়ে আক্রমণ চালিয়ে বোমা ফেলে। ২৬ জুলাই আর-এ-এফ বোমারুরা আবার হামবুর্গ বন্দরের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে।

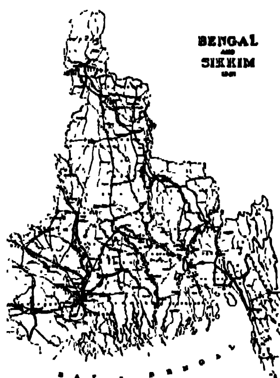
১৯৪২-এর ১২-১৫ অগাস্ট উইনস্টন চার্চিল, এভেরিল হ্যারিমান ও জোসেফ স্টালিন মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হন। ইওরোপে তখন অগ্রগতি শুরু হয়েছে, যদিও ২১ জুন রমেল উত্তর আফ্রিকার টোব্রুক দখল করেন। তার আগে, ৬ জুন মণ্টগোমারীর অষ্টম আর্মি হঠে গিয়ে এল-আলামেনে চলে আসে। জার্মানরা ২৬ অগাস্ট স্টালিনগ্রাডে পৌঁছয়। অগাস্ট মাসটি খুব খারাপ কাটে। আশার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা গেলেও এ মাসটি লোকে মোটামুটি দমবন্ধ করেই কাটায়। দেশে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। ৯ অগাস্টের আন্দোলন খুব নির্মমভাবে এবং দ্রুত ধ্বংস করা হয়। আভা তখন ছ'মাসের অন্তঃস্বত্তা, আমাদের এক এক সময়ে মনে হত বড় দুঃসময়ে পেটে সন্তান এল। বলাবাহুল্য দুশ্চিন্তাসত্ত্বেও আনন্দ হত।

১৯৪২-এর ৪ নভেম্বর রমেল পিছু হঠতে শুরু করেন। মণ্টগোমারী রুদ্ধশ্বাসে তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করলেন। ১০ নভেম্বর জার্মানদের ইজিপ্ট থেকে সম্পূর্ণভাবে তাড়ানো হল। টোব্রুক বৃটিশদের হাতে এল ১৩ নভেম্বর। ১৯ নভেম্বর, যেদিন সকাল এগারোটায় জয়ন্তীর জন্ম হয়, সেদিনই রাশিয়ান ফৌজ স্টালিনগ্রাড বেষ্টনকরা জার্মান ফৌজের উপর প্রতিআক্রমণ শুরু করে। ঐদিন জয়ন্তীর জন্ম-মুহূর্তের কিছু পরেই কলকাতায় সাইরেন বেজে উঠল। কলকাতার রাস্তা কী দিনে কী রাত্রে প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও, যখন নিশ্চিন্ত হলুম যে প্রসূতি ও সন্তান দুজনেই বিপদমুক্ত হয়েছে তখন সবকিছুই মধুময় মনে হল।

১৯৪৩-এর ৩১ জানুয়ারি পাউলাস সিবাস্টোপোল বা স্টালিনগ্রাড রাশিয়ানদের হাতে সমর্পণ করেন। ইংলণ্ডের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ২১ ফেব্রুয়ারি স্টালিন-গ্রাডকে সম্মান তরবারি উপহারদান ঘোষণা করেন।

১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলন

ক্রিপ্‌স্ মিশন



ইতিমধ্যে দেশে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ১৯৪২-এর ১১ মার্চ হাউস অভ কমন্‌সে চার্চিল ঘোষণা করেন, স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা মিশন নিয়ে ভারতে যাচ্ছেন। চার্চিলের ঘোষণা এমনই আটঘাট বাঁধা যে স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি আগে থেকে কোন কিছু কবুল করতে নারাজ: 'জাপানী আগ্রাসনের দরুণ ভারতের জীবনে এমন এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে যার ফলে আক্রমণকারীর গ্রাস থেকে উদ্ধারের জন্য ভারতীয় জনগণের সব শক্তি সংহত করতে বৃটেন বদ্ধপরিকর।' শূন্যগর্ভ এই উক্তিতে আমার সন্দেহ হল চার্চিল, এমেরি ও লিন্‌লিথ্‌গো, তিনে মিলে আদর্শবাদী শুদ্ধমনা স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে (আমি তাঁকে কখনও চাক্ষুষ দেখিনি, ফোটোগ্রাফেই মাত্র দেখেছি), এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্য ব্যবহার করছেন। প্রথমত, তাঁদের উদ্দেশ্য প্রমাণ করা ভারতীয় নেতারা আসলে সমাধানে নয়, বিরোধেই বিশ্বাসী; শুধু তাই নয়, নাৎসী ও ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁদের আদৌ মতি নেই। দ্বিতীয়ত, খোদ ইংলণ্ডে ভারতের অনুকূলে যে জনমত আছে তার কাছে প্রমাণ করা যে তাদের ভারত-সমর্থন নিতান্তই অসঙ্গত ও যুক্তিহীন।

১৯৪২-এর ২১ মার্চ নতুন দিল্লীতে তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে ক্রিপ্‌স্ বললেন, তাঁর এদেশে আগমনের মুখ্য কারণ হল, ভারতের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা। সেইসঙ্গে আপাতসরল ভঙ্গিতে এও বললেন, মিঃ চার্চিল ও তিনি বৃটেনের যুদ্ধ ক্যাবিনেটের প্রস্তাবে 'একান্ত একমত', এবং আশা করেন ভারতীয় নেতাদের কাছে সেটি গ্রহণীয় হবে। ২৫ মার্চ গান্ধীজি ক্রিপ্‌সের সঙ্গে ২৭ মার্চ সাক্ষাৎকারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বয়স্কাউটসুলভ ঔচিত্যবোধ দেখিয়ে ক্রিপ্‌স্,

গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, প্রথমে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ, আর তার অব্যবহিত পরে মুসলিম লীগ সভাপতি এম-এ জিন্নার সঙ্গে আলাপ করলেন। ২৭ মার্চ গান্ধীজি ক্রিপ্‌সের সঙ্গে বৈঠক শেষ করার পরই প্রকাশ্য ঘোষণা করলেন, ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলি সবই 'অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের তারিখ-দেয়া একটি চেক মাত্র', অর্থাৎ বর্তমানে তাদের কোন মূল্যই নেই। (আমার ঠিক মনে নেই, কে কৌতুক করে বলেছিলেন, চেকটি আবার 'একটি ধ্বসে-পড়া ব্যাঙ্কের খাতে লেখা')। গান্ধীজি আরো বলেন, ক্রিপ্‌স্‌কে তিনি এও বলেছেন যে 'এই যদি ভারতের কাছে আপনার সবকিছু প্রস্তাব হয়, তবে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব আপনি পরের প্লেনেই (দেশে ফিরে) যান।'

ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করা এই কাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। সে-সময়ে আমার মনে যে-সব আলোড়ন ও ঘাতপ্রতিঘাত হয় যথাসম্ভব সততার সঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি করাই আমার উদ্দেশ্য, তার মধ্যে যা কিছু ভুলচুক থাকুক, না থাকুক। স্বীকার করতে বাধা নেই, চার্চিল, এমেরি ও লিন্‌লিথ্‌গো সম্বন্ধে আমার বিরূপতা সম্ভবত আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে রঞ্জিত করে। বলতে বাধা নেই, আমার তখন নিজের ধারণা হয়েছিল, বৃটিশ সরকার ক্রিপ্‌স্‌কে ভালমানুষ পেয়ে বোকা বানিয়েছে। আমার বিশ্বাস লিন্‌লিথগোকে আগে থেকেই আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে পুরো ব্যাপারটাই আগাগোড়া সাজানো, এবং যথাসময়ে ক্রিপ্‌সের পায়ের তলা থেকে আসন সরিয়ে নেয়া হবে। তা সত্ত্বেও, ক্রিপ্‌স্ সকলের সঙ্গে যেভাবে অবাধে আলাপ-আলোচনা চালালেন, তার ফলে পাছে ক্রিপ্‌স্ তাঁর যাত্রায় সফল হ'ন, সে-সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সম্রাটের প্রতিনিধি লিন্‌লিথ্‌গো বৃটিশ সরকারের কাছে প্রকাশ্যে তাঁর আপত্তি জানাতে দ্বিধা করেননি। অপরপক্ষে ক্রিপ্‌স্‌ও বোধহয় আশঙ্কা করেননি যে তাঁর গণেশ ওলটাতে পারে। ফলে তিনিও তাঁর হৃতপ্রায় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চললেন। ২৮ মার্চ তিনি চেম্বার অভ প্রিন্সেস, তেজবাহাদুর সপ্রু, এম-আর জয়াকর, মৌলানা আজাদ, সিকন্দর হায়াৎ খান, ও হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করেন। আমি বিস্মিত হলুম, ক্রিপ্‌সের মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি কী করে এমেরি ও চার্চিলের কথায় ভুলে এই ফাঁদে পা দিলেন। তাঁর গোড়াতেই বোঝা উচিত ছিল যে চার্চিলের মিষ্টি কথা স্পষ্টতই একটি ধাপ্পা। কী করে তিনি তাঁর প্রিভি-কাউন্সিলরসুলভ প্রজ্ঞা হারালেন!

৩০ মার্চ নতুন দিল্লী থেকে ক্রিপ্‌স্ তাঁর বেতারভাষণে জনগণের প্রতি আবেদন করলেন, সকলে যেন একজোট হয়ে নিজেদের সংবিধান গঠন করেন।

ভাষণটি নিতান্তই শূন্যগর্ভ শোনালো। উনি হয়তো ভাবলেন তাঁর ভাষণে তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে টোপ ফেললেন: বৃটিশ যুদ্ধ ক্যাবিনেটে ও প্রশান্ত মহাসাগর যুদ্ধ কাউন্সিলে ভারত সদস্যপদ পাবে। আগে ঠিক ছিল ক্রিপ্‌স্ ২ এপ্রিল দেশে ফিরে যাবেন। ক্রিপ্‌স্ তাঁর প্রত্যাবর্তন স্থগিত রেখে সম্ভবত অক্সফোর্ডে এমেরিকে ৫ এপ্রিলের ঘোষণার সুযোগ দিলেন। অক্সফোর্ডে এই তারিখের বক্তৃতায় এমেরি বললেন, 'আমাদের সনির্বন্ধ ঘোষিত প্রস্তাব হচ্ছে, ভারত যত শীঘ্র সম্ভব অন্যান্য ডোমিনিয়নের সমতুল্য নিঃশর্ত ও পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।' ১৯৪২-এর ২৯ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত নতুন দিল্লীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক চলে। ৩০ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত ক্রিপ্‌স্ ও মৌলানা আজাদের মধ্যে যে বিস্তারিত পত্রালাপ চলে তার উপর ভিত্তি করে ২ এপ্রিল একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২ এপ্রিলে যে প্রস্তাব পাস হয় তার উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্‌স্ ও কংগ্রেস সভাপতির মধ্যে আবার দ্বিতীয় দফায় বিস্তারিত পত্রালাপ হয়। সেই পত্রালাপে ক্রিপ্‌স্ বারবার নিজের কথার হেরফের করে শেষ পর্যন্ত যে-সব প্রস্তাবে গোড়াতে রাজি হয়েছিলেন সবই প্রত্যাহার করলেন।

ইতিমধ্যে ৪ এপ্রিল রাজাগোপালাচারি আমেরিকান সাংবাদিক মহলে এক বিবৃতি দেন। তাতে বলেন, বৃটেন তার বিলম্বিত—বহু বিলম্বিত—যে প্রস্তাব দিয়েছে, ভারত যুদ্ধান্তে তার আপন সংবিধান তৈরি করার পূর্ণ ক্ষমতা পাবে, সে প্রস্তাবটি হতাশার সঞ্চার করেছে। ৬ এপ্রিল নেহরু ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি এবং নতুন দিল্লীতে আমেরিকান টেকনিক্যাল মিশনের অধ্যক্ষ কর্নেল লুইস জনসনের এক সাক্ষাৎকার হয়। নেহরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সেই সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট পেশ করে বলেন যে যুদ্ধ জেতার ব্যাপারে ভারতের পক্ষে আমেরিকান সমর্থন পেতে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কর্নেল জনসন মৌলানা আজাদ, নেহরু এবং সাথে সাথে ক্রিপ্‌সের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন সে বিষয়টি আমেরিকায় বৃটেনের রাজদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স নিউইয়র্ক হলে ৮ এপ্রিল তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করেন।

১০ এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলি কাগজে কলমে নাকচ করে, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলগুলিও একই সঙ্গে নিজ নিজ আপত্তি জানিয়ে তাদের নাকচবন্দি জানায়। তবে সে-সময়ে আমার মনে হয়, বিধিমত প্রথায় নাকচ সংবাদ জানার আগে, ২৩ মার্চ সুরাবর্দি কলকাতায় আসন্ন পাকিস্তান-দিবস বিষয়ে যে ঘোষণা করেন, তার পিছনে ভারত সরকারের প্ররোচনা ছিল।

এটি অবশ্য আমার নিজের সন্দেহ, কোন প্রমাণের ভিত্তি নেই। অবশেষে, ১১ এপ্রিল ক্রিপ্‌স্ নিজের সবকিছু প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নতুন দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে মহামহিম ভারত সম্রাটের সব প্রস্তাবগুলিই প্রত্যাহৃত হল। অতঃপর ১২ এপ্রিল অপরাহ্ণে ক্রিপ্‌স্ নতুন দিল্লী ত্যাগ করে ইংলণ্ডে পাড়ি দিলেন। 'হরিজন' পত্রিকার ১৯ এপ্রিলের সংখ্যায় মহাত্মা গান্ধী তাঁর একটি লেখা প্রকাশ করলেন : নাম "সেই দুরাদৃষ্ট প্রস্তাব" (দি ইল্‌ফেটেড প্রোপোজাল)। তাতে লিখলেন :

"অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বৃটিশ সরকার (ভারতের) রাজনৈতিক অচল অবস্থা সমাধানকল্পে এমন এক প্রস্তাব পাঠালেন যা নাকি একান্ত উপহসনীয়ভাবে প্রতিটি স্বার্থগত দলের অনুমোদনের অযোগ্য। আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে যিনি এই প্রস্তাব বহন করে এলেন তিনি স্বয়ং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্, যিনি নাকি চরমপন্থীদের মধ্যেও চরমপন্থী, উপরন্তু ভারতবন্ধু হিসাবে সর্বজনবিদিত।"

সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল ক্রিপ্‌সের মিশন, সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, এবং তাঁর নিষ্ফল প্রয়াসের কল্যাণে মুসলিম লীগের তথা জিন্নার হাতে-কষে দরাদরি করার শক্তি বাড়ে। ২৮ এপ্রিল হাউস অভ কমন্‌সে এল-এস এমেরি যে বিবৃতিটি দেন তারই ফলে আমার এই ধারণা হয় : 'আমাদের খসড়া ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের কাছে আমাদের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের নিরাকরণ করা। ভারতকে অবিভক্ত রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।' আমার মনে হল 'ভদ্রমহিলা বড় বেশী সচ্চরিত্রতা জারি করছেন।' কিন্তু একথা আমি বলব, তখনও আমার সত্যিই সন্দেহ হয়নি, যে-বৃটেন ভারতকে একদা একসূত্রে বেঁধেছে সে নিজের হাতে তাকে আবার টুকরো করে দিতে কৃতসংকল্প হবে। স্টিল ফ্রেমের লোক ছিলুম বলেই কি আমি এই সম্ভাবনাকে মনে স্থান দিতুম না ? কি জানি !

দেশবিভাগের ঘটনাবলী একের পর এক আসার সময়ে ও তার আগে আমি আম্বেদকর ও জিন্না সম্বন্ধে কী ভাবতুম এবং এখনও ভাবি, এবং তার ফলে আমার মনে কী ধরনের আশঙ্কা ক্রমশ ঘনীভূত হয়, সে-বিষয়ে এই সূত্রে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। আমার 'তিন কুড়ি দশ—প্রথম চব্বিশ বছর' বইতে লিখেছি কিভাবে আমার গুরু রাধারমণ মিত্র ও সুশোভন সরকার শিখিয়েছিলেন মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও নৃতত্ত্বভিত্তিক সম্প্রদায়ের

সমস্যার সমাধান কিভাবে খুঁজতে হয়। তাঁদের শিক্ষার ফলে আমার নিজের কাজ ও চিন্তাক্ষেত্রে মুসলিম ও নিম্নবর্ণ জাতি-উপজাতিদের দাবির সমর্থনে আমি অনেক সময়ে হয়তো অন্যায্য পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি। তার কারণ, ১৯৪০-৪৮ সালে নদীয়া, বাখরগঞ্জ ও ঢাকা জেলায় নিম্নবর্ণ জাতি, উপজাতি, মুসলমান চাষী ও খেতমজুরদের জীবন সম্বন্ধে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার, উৎপীড়ন ও অসাম্যের যে গুরুভার দেখেছি, তাতে ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে-সব অসাম্য, অবিচার, অনাচার বহুযুগ ধরে গাঁথা হয়ে আছে, সে-সব সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি গভীর হয়। ১৯৪১ সালে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ধাঙ্গড় গ্রামে আমার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা ইতিপূর্বে লিখেছি। তা সত্ত্বেও আমি যতক্ষণ না ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের ও ১৯৪৯ সালে মুর্শিদাবাদে তেভাগা আন্দোলনের নরককুণ্ড পরিক্রমা করি ততক্ষণ এ বিষয়ে আমার প্রত্যয়গুলি একান্তভাবে দৃঢ় হয়নি। তারপর থেকে কোন অবস্থাতে, কোন ক্ষেত্রেই আমার পক্ষে নিম্নবর্ণ হিন্দু ও নিম্ন অবস্থার মুসলমানদের পক্ষ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। বরং গত পঁচিশ বছরে আমেরিকায় বার ত্রিশেক গিয়ে সেখানকার কৃষ্ণকায়দের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আমার সে মনোভাব আরো দৃঢ় হয়েছে।

প্রস্তাব

১৯৫৩ সালে নেহরু কৈলাসনাথ কাটজুকে একটি চিঠিতে লেখেন :

> "ভারতের অদৃষ্ট অনেকাংশে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ও চারিত্রিক গড়নের খুঁটে বাঁধা। যদি বর্তমান হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি আমূল না বদলায়, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের সর্বনাশ হবে। আমার মতে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো, হয়তো কেন অনেকাংশে, আরো হানিকর। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির মত অত গুরুত্বপূর্ণ হবে না।"

ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে, সে পৃথিবীর বা ভারতের বলুন, নেহরুর মত সামগ্রিক ধারণা ও সমন্বয়সাধক মূল্যজ্ঞান পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই ছিল বা আছে। তার বলে তিনি পণ্ডিতদের মধ্যে পূজ্য আসন অধিকার করেন। তা সত্ত্বেও, ১৯৪০ সালে চাকরিতে ঢুকে যুক্তবঙ্গের অনেক জেলায় কাজ করে এবং পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জেলায় ঘুরে আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে আস্তে আস্তে

একটি ক্ষোভ ক্রমশ জমা হয়। এটি প্রকাশ না করলে আমার মন হাল্‌কা হচ্ছে না, এবং যে-কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত যদি আমার ক্ষোভ অমূলক বলে বিস্তৃত-ভাবে লেখেন, তবে আমি নিশ্চয় স্বস্তি পাব। কী কারণে বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের ভারে ভারত ক্রমশ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার প্রতিবাদে বৌদ্ধধর্ম সামাজিক সাম্য বা সমতার প্রবর্তন করে দাসবর্ণের জাতপাত, উপজাতিদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে ভারতে আবার কয়েক শ'বছর সর্ব-বিষয়ে এক স্বর্ণযুগ আনে; কীভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানে আবার ভেদাভেদপূর্ণ সমাজ কায়েম হয় ও পরে জীর্ণ হয়; কীভাবে ভেদাভেদ ও সামাজিক বিরোধ ও অসাম্যের সুযোগ নিয়ে মুসলমান আক্রমণের বিদেশী ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে অক্লেশে এদেশ অধিকার করে; কীভাবে হিন্দু-উচ্চবর্ণের সৃষ্ট সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচার, তার সঙ্গে লৌকিক ও জীবিকার দাসত্ব থেকে মুক্তির আশায় ভারতের সর্বত্র দাসবর্ণের জনগণ, এবং তাদের সঙ্গে উপজাতিদেরও অনেকাংশ ইসলাম ধর্ম—অতীত যুগে বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহণের মত—আগ্রহে বরণ করে; কী কারণে ধর্মান্তরিত জনগণ, ইসলামীয় সামাজিক ও ধর্মোপাসনায় সাম্যের স্বাদ পেয়ে কীভাবে হিন্দু বর্ণাশ্রমসমাজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়; কীভাবে হিন্দু উচ্চবর্ণগুলি পূর্বকালের দাস এবং পরে ধর্মান্তরিত হয়ে রাজার জাতের সামিল হওয়া নিম্ন-বর্ণদের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে এবং জাতক্রোধে বিরুদ্ধভাব পুষে রাখে, ফলে তাদের সমগোত্রের মানুষ বলে গ্রহণ করতে অপারগ হয়; এ সব বিষয়ে নেহরুর মত জ্ঞান ও বোধ নিশ্চয় খুব কম ব্যক্তিরই ছিল বা আছে। উপরন্তু, কীভাবে যুগে যুগে ভারতীয়দের বিধর্মীকরণস্রোত, এবং একই সঙ্গে হিন্দু সমাজের দৃঢ়ীকরণ ও বিস্তারকল্পে, নানা স্থানে, নানা সমাজে, সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন নতুন সমাজ ও ধর্মসংস্কারক ভূমিষ্ঠ হয়ে দেশে নবসমন্বিত ধর্মে সামাজিক সাম্যের প্রবর্তন করার প্রয়াস পান; কিভাবে হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্মী উচ্চবর্ণের শ্রেণীরা, তাঁদের সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থিক এবং উৎপাদিকা শক্তির অধিকারবলে সমন্বয়ধর্ম আন্দোলনগুলিকে একে একে নির্বাপিত করেন (একমাত্র গুরু নানক প্রবর্তিত শিখধর্মই ব্যতিক্রম); কিভাবে এমন-কি বাংলার চৈতন্যদেব প্রণোদিত সমন্বয়কামী বৈষ্ণবধর্মও লোপ পায়; এই শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুবর্ণাশ্রম কিভাবে ভারতের ঐক্যকে খণ্ডিত করে; কিভাবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিযুগেই বর্ণাশ্রম শনিপ্রবেশের অমোঘ রন্ধ্র হিসাবে কাজ করেছে, সে বিষয়ে নেহরুর মত জ্ঞান খুব কম নেতারই ছিল বা আছে। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে স্বামী

বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিদ্যাসাগর কি বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁদের যুক্তি সাজিয়েছিলেন তাও তাঁর অবিদিত ছিল না। নিম্নবর্ণ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ত্রিশ দশকেও এত বেশী ছিল, গান্ধীজি যখন হরিজন আন্দোলন শুরু করেন, এবং 'হরিজন' পত্রিকাকে আপন মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সহকর্মিরা আপত্তি করেন এই বলে যে একাজ করে গান্ধীজি বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্ব লঘু করে দিচ্ছেন। তবে বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী গান্ধীজি ন্যায়ের বদলে দয়া ও সমবেদনা বা সহমর্মিতার উপর বেশী নির্ভর করেছিলেন, তা না হলে হয়তো তিনি আম্বেদকরকে আরো কাছে টানতে পারতেন।

কোন সমস্যা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা এক বস্তু, আর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় বোঝা ভিন্ন বস্তু। যেহেতু এটি আত্মচরিত, নিজের দু'একটি অভিজ্ঞতা না বলে পারছি না। আধুনিক ইওরোপীয় সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমার শিক্ষাগুরু সুশোভনচন্দ্র সরকার ও রাধারমণ মিত্র আমাকে অবহিত করার ত্রুটি করেননি। সে সাম্যশিক্ষা মুখ্যত ইওরোপীয় সমাজে অর্থোৎপাদন-রীতিজনিত, রাজনৈতিক, শ্রেণীগত ক্রমবর্ধমান অসাম্যের নিরাকরণের শিক্ষা। কিন্তু বর্ণাশ্রমজনিত আমাদের সমাজে যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্য গড়ে উঠেছে সে বিষয়েও লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা। ঠিক এই কারণেই হয়তো আমরা উঁচুজাতের পাঠকরা তাঁদের উচিত সম্মান দিতে পরাঙ্মুখ। নৃতত্ত্বে ও জনসংখ্যাবিজ্ঞানে আমার অন্যতম দুই গুরু, যতীন্দ্রমোহন দত্ত (সাহিত্যিক ছদ্মনাম যমদত্ত) ও শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৫১-র সেন্সাসের সময়ে খ্রীষ্টীয় বারো শতক থেকে কত হিন্দু ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তার একটি সংখ্যা-ভিত্তিক আনুপাতিক হিসাব তৈরি করেন। গোড়া থেকে ১৬ এবং ১৭ শতক পর্যন্ত ভারতের বাইরে থেকে কত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ভারতে আসেন, তার মোটামুটি হিসাব প্রথমে করেন, ঐতিহাসিক বিবরণ আহরণ করে। যদি ধর্মান্তরকরণ না হত তাহলে স্বাভাবিক প্রজননহারে তাঁদের বর্তমান জনসংখ্যা কত হত তা ধার্য্য করেন। এখন মোট কত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান আছে তার থেকে স্বাভাবিক বৃদ্ধি-জনিত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান জনসংখ্যা বাদ দিয়ে তাঁরা এই কয়েকশত বছর ধরে কত ধর্মান্তরিত লোক এই দুটি ধর্মে এসেছে তার হিসাব করেন। যমদত্ত ও সেনগুপ্ত মোটামুটি এই হিসাবে উপনীত হন যে ১৯৫১ সালে মুসলমান ধর্মান্তরকরণের অনুপাত অনুসারে ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা এবং ভারতের সারা পূর্বাঞ্চলে এবং বাংলাদেশে (তখন পূর্ব

পাকিস্তান) যত মুসলমান ছিলেন তাঁদের শতকরা ৯৫ জন এই শতকের আগের পুরুষে হিন্দু ছিলেন। অর্থাৎ আদিতে তাঁরা হিন্দু ছিলেন, পরে তাঁদের ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। কেরলে, উত্তরপ্রদেশে, বিহারের এক-তৃতীয়াংশে, পাঞ্জাবের এবং গুজরাটের কিছু অংশে, এবং মধ্যপ্রদেশের উত্তর ও পশ্চিমাংশে ধর্মান্তরিত মুসলমানের হারাহার কিছু কম : তাঁদের পূর্বপুরুষদের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ হিন্দু ছিলেন। যেহেতু ধর্মান্তরিত মুসলমানরা এখনও অধিকাংশই কৃষক বা কারিগর শ্রেণীভুক্ত সেহেতু তাঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দুরাও বর্ণাশ্রমের নিম্নসারিতে ছিলেন। এই সম্পদসৃজনকারী দাসজাতিদের নিজেদের কবল থেকে হারিয়ে হিন্দু উচ্চবর্ণের বিদ্বেষ নিশ্চয় আরো বেড়ে যায়। সারাভারতের সমস্ত জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এখনও তপশীলী, অনুন্নত হিন্দু বর্ণাশ্রমভুক্ত নিম্নজাতি, উপজাতি ও মুসলমান। তার উপর প্রায় ৩৫ ভাগ যোগ করতে হবে সেইসব জাতির জনসংখ্যা যাঁরা হিন্দু বর্ণাশ্রমে ঠিক দাসবর্ণভুক্ত নন বা অন্য ধর্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত (ক্ষত্রিয়) বা মধ্য উচ্চজাতিভুক্ত নন। আজ যাঁরা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং যাঁরা শিক্ষা, পেশা, অর্থ, সম্পদ ও সম্মানবলে রাজনীতি বা হিন্দু সমাজের শীর্ষে, সমস্ত হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় তাঁদের আনুপাতিক জনবল শতকরা ১০ থেকে ১৫-র বেশী নয়; স্থানে স্থানে বড়জোর ২০। তাঁরাই আজ হিন্দু-ভারত আন্দোলনের পুরোধা। এমন-কি যেসব রাজনৈতিক দল ধর্ম বা বর্ণাশ্রম-নিরপেক্ষতার দাবী করেন, তাঁরাও কার্যত তাঁদের উচ্চবর্ণের উপর মুখ্য নির্ভরতার প্রমাণ দেন। যেমন ১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় মোট ৪২ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৭ জন ছিলেন উঁচুস্তরের পদবীধন্য ব্রাহ্মণ, ১২ জন ছিলেন সর্ববিদিত পদবীভুক্ত উঁচু কায়স্থ, ১ জন পদবীভুক্ত বৈদ্য। বাকি দশজনের মধ্যে পদবী দেখে মনে হয় অন্তত তিনজন মধ্যশ্রেণীর জাতিভুক্ত। ১৯৫১ সালে সাক্ষরতায় সারা-ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়; ১৯৮১তে সেই স্থান দাঁড়িয়েছে ১৮তম। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী ও জনজাতিদের সাক্ষরতার হার সারা রাজ্যের গড় সাক্ষরতার হারের সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। তপশীলী মেয়েদের সাক্ষরতার আনুপাতিক হার অ-তপশীলী উচ্চবর্ণের মেয়েদের তুলনায় আরো কম, অর্থাৎ প্রায় দশমাংশ। তপশীলী জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার রাজ্যের গড় হারের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এই হারগুলির তুলনায় তপশীলীদের হারগুলি আরো নগণ্যের কোঠায় পড়ে। মুখে আমরা যতই অস্বীকার করি না কেন, এই রাজ্যেও বর্ণাশ্রম কার্যত এখনও কত প্রবল এইসব হারে বেশ বোঝা যায়।

আমাদের আর্যকুলোদ্ভববিষয়ক দাবী যে কত হাস্যকর সে বিষয়ে গুরু সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথা মনে পড়ে। একদিন কথাচ্ছলে তাঁকে আমি বলি অধ্যাপক মহলানবিশ ও রাজচন্দ্র বসু আমার মাথা মেপে বলেন আমি মঙ্গোলীয়। ফলে বাস্তবজীবনে নেপাল থেকে হাওয়াই পর্যন্ত যে দেশেই গেছি, সে-দেশের লোক মনে করেছে আমি সেদেশীয়। সুনীতিবাবু হেসে বললেন, 'অশোক, আমার কুলপঞ্জীতে বলে আমি খাঁটি কনৌজীব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত। কিন্তু ১৯৩৬ সালে প্রশান্তবাবু আমার মাথা মেপে বলেন, আমার কেফালিক ইন্‌ডেক্স খাঁটি সাঁওতালি। অতএব আমি আমার কোন-না-কোন পিতামহ বা পিতামহীর ডনজুয়ানি বা জেজেবেল-প্রবৃত্তির ফল!'

১৯৫০ সালে আমি কলকাতায় সেন্সাস দপ্তরে বহু কর্মী নিয়োগ করার সুযোগ পাই। পূর্বপাকিস্তানের নানা স্থানে আমার সঙ্গে একদা কাজ করেছিলেন, এমন অনেক উদ্বাস্তু হিন্দু চাকুরিপ্রার্থী হয়ে আমার কাছে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, বিক্রমপুরের এক বিখ্যাত স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক। জাতে ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রসিদ্ধির হয়তো এও একটি কারণ ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—তিনি বিক্রমপুর ছাড়লেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, শেষদিন পর্যন্ত কোনরকম ব্যক্তিগত বা পরিবারগত শঙ্কাবোধের কারণ তাঁর কিছু ঘটেনি। বরঞ্চ, স্কুলে, গ্রামে, এমন-কি মহকুমার অনেকেই তাঁকে থেকে যাবার জন্য সাধাসাধি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও একদিন সকালে হঠাৎ তিনি দেশত্যাগের যে অমোঘ সিদ্ধান্ত নিলেন তার কারণটি বললেন। সেদিন সকালে তিনি উঁচু দাওয়ার উপরে চেয়ারে বসে আছেন, এমন সময়ে গ্রামের গণ্যমান্য কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক এলেন। সকলেই সমাজে মোটা-মুটি তাঁর সমতুল্য। এসে তাঁরা সোজা দাওয়ার উপর উঠে দাওয়ায় পাতা বেঞ্চির উপর বসলেন। মাস্টারমশায় বললেন, এরকমটি তাঁরা আগে কখনও করেননি। সর্বদা উঠোনে বিছানো মাদুরের উপর বসতেন। সেইদিনই তিনি ঠিক করলেন, আর নয়। এই বিবরণ শুনে মুহূর্তে আমার মনে এমন অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয়ে গেল, যা নিয়ে আমি পূর্ববঙ্গে কাজ করার সময়ে প্রায়ই অত্যন্ত চিন্তিত হতুম, কুল পেতুম না। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছো অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

আম্বেদকর

আম্বেদকরের লেখা আমি ভাল করে জানি না। সুতরাং বলতে পারব না তিনি নিম্নবর্ণ হিন্দুসমাজে নিজেদের মধ্যে যে আর্থিক অসাম্য আছে তার বিরুদ্ধে কতখানি অসহিষ্ণুতা বা আপত্তি প্রকাশ করেন। আমি সে-সব রচনাই পড়েছি যেখানে তিনি নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সমতার, বিশেষ করে সামাজিক সমতার স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। গান্ধীজির বর্ণাশ্রম সমর্থনে আমি কোনদিনই স্বস্তিবোধ করিনি। বর্ণাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে সমাজসংস্কার ও হরিজনদের পক্ষাবলম্বন, তাঁর বাণীর আধারকে 'হরিজন' নাম দেয়া সত্ত্বেও, মনে হত কোথায় যেন ফাঁক বা অভাব রয়ে গেল, কোথায় যেন সমতার বদলে দয়ার রেশ আছে ; তাঁর অভীপ্সা আর আম্বেদকরের সামাজিক সমতাস্বীকৃতি বা সম্মানের দাবী এক নয়। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক থেকেই বোঝা গেল গান্ধীজি আম্বেদকরের পাল থেকে হাওয়া টেনে নিতে পারেননি। তাঁকে গান্ধীজি কেন একান্তভাবে নিজের দলে টানতে পারলেন না, ভেবে বিমূঢ় হয়েছি। তার ফলে হরিজনদের হৃদয়ে আম্বেদকরের স্থান উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়েছে, সে-অনুপাতে গান্ধীজির স্থান কমেছে। আম্বেদকরের বাণী এখন যে পরিমাণ শক্তি আহরণ করেছে, সে অনুপাতে গান্ধীজির বর্ণাশ্রম উচ্চবর্ণ হিন্দু রাজনৈতিক পটভূমিতে এখন ভীতিকর দানবাকারে স্ফীত হতে শুরু করেছে। অথচ একটু ভেবে দেখলে সন্দেহ থাকে না আম্বেদকরকে পাশে রাখলে গান্ধীজির ভারত আরো কত শক্তিশালী, লোকায়ত, সামাজিক সমতার দিকে এগোত। আম্বেদকরের নির্বন্ধেই আমাদের সংবিধানের প্রি-অ্যাম্ব্ল্ ও মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ হয়। সংবিধানের অধিকাংশ বিধিতেই তাঁর নেতৃত্বের ছাপ আছে। সিভিল কোড বিলেও তাঁর হাত ও অধ্যবসায় অনস্বীকার্য, অথচ সেই সিভিল কোড বিল কার্যকরী হল না। আজ যদি সিভিল কোড আইন হত তাহলে আমাদের সমাজের অনেক আপদ চুকে যেত। ক্ষোভ হয় এবিষয়ে তিনি কেন নেহরুর কাছে উপযুক্ত সমর্থন ও সাহায্য পাননি।

পাঠকের মনে থাকবে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের মন্ত্রিসভাগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যানুপাতিক আসন বা গুরুত্ব পাননি। ১৯৪৬ সালে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে, এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় দু'বার এসে চেষ্টা করা সত্ত্বেও গান্ধীজি কৃষকপ্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব সাধনে সফল হননি। ফলে ফজলুল হক অগত্যা মুসলিম লীগের সমর্থন গ্রহণ করেন। এ ব্যর্থতার মূলে একটি বড় কারণ, আমার এখনও বিশ্বাস, কংগ্রেসের জমিদার শ্রেণীভুক্ত হিন্দু

সভ্যরা, শ্রেণীগত স্বার্থহেতু ফজলুল হক-প্রবর্তিত কৃষিঋণখাতক আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। খাতকদের অধিকাংশই ছিলেন নিচুজাতের হিন্দু ও উপজাতি এবং ধর্মান্তরিত মুসলমান। আমার এখনও মনে হয় ১৯৩৮ সালে গান্ধীজি যদি ফজলুল হক-কংগ্রেস কোয়ালিশন প্রচেষ্টায় সফল হতেন তবে পরের দশকে বাংলার এবং ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নিত, এবং ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান রেজলিউশন হয়তো অত জোরদার হত না।

জিন্না

অবিভক্ত ভারতে, এমন-কি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও জিন্না যে কখনও ইসলামিক প্রশাসনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও সকলের সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন সে মনে করার কোন নজির নেই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক পরিধিতে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান যে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ তা তিনি ভালভাবে জানতেন। তিনি এও জানতেন যে বাংলার ভূমিস্বত্ব আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যসব আইনের দুঃসহ অসাম্য সৃষ্টির ফলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙালি মুসলমান চাষীসম্প্রদায় এবং সেই সম্প্রদায়কে প্রচণ্ড বিস্ফোরক বারুদের কাজে লাগাতে পারা যায়। গান্ধীজির কৃষকপ্রজা-কংগ্রেস ঐক্যপ্রচেষ্টা যখন বিফল হল তখন জিন্না এই সত্য উপলব্ধি করে মুসলিম লীগকে নির্দেশ দেন নিরুপায় ফজলুল হকের পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতে।

জিন্না জীবন শুরু করেন মুখ্যত ইওরোপীয় উদারপন্থী, যুক্তিবাদী ঐতিহ্যে, যাতে ধর্মীয় গোঁড়ামির স্থান কম। বলা যায় তাঁর মানসিক জগতের সঙ্গে নেহরুর জগতের যতখানি মিল ছিল, তাঁর নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ বা কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সঙ্গে ততখানি ছিল না। তাঁর কাজ ও কথা থেকে বেশ বোঝা যায় যে এই শতকের বিশ দশকের শেষ পর্যন্ত তিনি ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। সেই যুগে ইংলণ্ডে একটি বক্তৃতায় সরোজিনী নাইডু জিন্নাকে 'হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রাজদূত' বলে অভিহিত করেন। এমন-কি, বলা যায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিন্না, কাজে ও কথায়, এখন আমরা ইসলামিক ফাণ্ডামেণ্টালিজম বলতে যা বুঝি, তাকে শতহস্ত দূরে রাখতেন। আমার ধারণা ছিল ইসলাম কথাটি তিনি রাজনৈতিক সংজ্ঞা হিসাবে বুঝতেন, ধর্ম হিসাবে নয়। আমার সহপাঠী ও সহকর্মী বন্ধু, হুমায়ুন কবীর মহাশয়ের ভাগিনেয়, আখতারুজ্-জামান

প্রায়ই বলতেন, বিভেদ ঘুচিয়ে হিন্দুমুসলিম ঐক্য আনতে হলে সব ভারতীয়ের একটি আহারের পদ 'অবশ্য' হওয়া উচিত, সেটি ভীল-অ্যাণ্ড-হ্যাম পাই, অর্থাৎ ষাঁড় ও শুয়োরের মাংসের মিশ্র কাবাব গোছের তরকারি। পাঠক হয়তো লঘুচিত্ততা ভাববেন, কিন্তু আমার ভাবতে ভাল লাগত যে জিন্না বোধহয় একই মত পোষণ করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত জিন্না মুসলিমধর্মীয় আচারনীতি, বিধিনিষেধ মানতেন না। এমন-কি সেগুলি অনেক বর্জন করেছিলেন। নেহরু যদিও কোনদিন মন্দিরে গিয়ে পুজা দেননি, তবুও তিনি হিন্দু রীতিনীতি অগ্রাহ্য বা অবহেলা করতেন না। গান্ধীজি ও নেহরু যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে নিশ্চয় হিন্দু-মুসলিম ও অনুন্নত হিন্দু জাতি ও উপজাতির উন্নতিকল্পে অনমনীয় মনোভাব নিতে পারতেন। তা যদি করতেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয় জিন্নার নৌকার পাল থেকে হাওয়া টেনে নিতে পারতেন এবং ভারতের ভাগ্য অন্যরকম হত।

আমার ধারণা জিন্না মনে করতেন হিন্দু-গরিষ্ঠতার তরফ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে যে-সব আশ্বাস দেয়া হত তা দাক্ষিণ্যের সামিল, তাকে সাম্যভিত্তিক ন্যায় অথবা সমান অংশীদারি স্বীকার বলা যায় না, যা নাকি ছিল তাঁর দাবী। আমার এখনও মনে হয় তাঁর অন্তরের আশা ছিল, ঠিক যেমন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী উনিশ শতকের প্রথম থেকে ভারতের সাংস্কৃতিক, আর্থিক, প্রশাসনিক, পেশাগত, বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ভারতীয় জীবনে ন্যায্য স্বীকৃতি আদায় করেছে, সেইমত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুগ থেকে উদ্ভূত নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সমানে হাত মিলিয়ে সমান সুযোগে সমান তালে, সসম্মানে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার সুযোগ পাবে। জিন্না এমন একটি ধর্মে জন্মগ্রহণ করেন যাতে, অন্যান্য অসাম্য সত্ত্বেও দু'তিনটি মুখ্য সাম্যনীতি প্রথম থেকেই স্বীকৃত হয়েছে, যথা সকলে একসঙ্গে আহারে আসন গ্রহণ ও একত্রে একপাতে খাওয়া, এবং একই সঙ্গে মসজিদের মেঝেতে পাশাপাশি বসে ধর্মোপাসনার অধিকার—যার কথা আগে বলেছি। সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সমান মর্যাদা দাবীর স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি পূর্ণভাবে না পেয়ে বোধহয় তিনি দেয়ালে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। আমার মনে হত তিনি যে একান্ত গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক রাষ্ট্র' আখ্যা দিলেন তা নয়। পাছে ভবিষ্যতে 'হিন্দু' ভারতের সঙ্গে পুনর্মিলনের আন্দোলন হয় সেই সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই তিনি এই পথ নেন। ১৯৪৬-এর অগাস্টের পর থেকে আমার সর্বদা পরিতাপ হত যে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য

রাজনৈতিক দলগুলি নৈবেদ্যের মত কেন নিজেদের বৃটিশদের হাতে তুলে ধরলেন। 'সমান' অংশীদারি কি, কিভাবে তাকে কার্যকরী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে কেউই যথেষ্ট চেষ্টা করেননি বলে আমার মনে হত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতা দুই নেতৃত্বকে বৃটিশের কোলে ঠেলে দিল, ঈসপের দুই বেড়াল ও বানরের গল্পের মত। তবে, দেশভাগের পর জিন্নার একটি কাজে আমি বিশেষ খুশি হই : মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনরল পদে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তিনি বৃটেন ও মাউন্টব্যাটেনকে সমুচিত জবাব দেন।

জিন্না একদা নেহরুর হাবভাবকে 'পিটার প্যান' ধাঁচের বলেছিলেন। নেহরুর দ্বিধার ফলে পঞ্চাশের দশকে সিভিল কোড বিল তাকে তোলা হয়, ফলে সামাজিক সংস্কারে ও অগ্রগতির পথে পাথর-চাপা পড়ে। সামাজিক ও আর্থিক অসাম্যের ভুক্তভোগীদের জন্য একের পর এক অসার্থক নাম-কে-ওয়াস্তে কার্যসূচি চালু হয়, সত্তর ও আশির দশকে যাদের সাধারণ নাম হয় 'গরিবী হাটাও' কর্মসূচি। এর ফলে গরীবী যত না হঠল তার চেয়ে বেশী হল আমলা ফয়লার প্রসার ও তাদের মধ্যে হরির লুঠের ব্যবস্থা। আমার বরাবরই অবাক লেগেছে, পণ্ডিতজী, এবং পরে তাঁর কন্যা সরাসরি অন্য অনেক আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতাসূচক ব্যবস্থা ফেলে দিয়ে কেন এই ধরনের কর্মসূচির প্রশ্রয় দিলেন, যার ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক ও আর্থিক অসাম্যগুলি বজায় থাকল, অথচ সরকার একের-পর-এক এমন সব কার্যসূচিতে টাকা ঢাললেন, যার মধ্যে ব্যর্থতার বীজ প্রথম থেকেই নিহিত হল, এবং দেশের অর্ধেকের বেশী নাগরিককে অনিশ্চিতকালের জন্য ভিক্ষার পথে জোর করে ঠেলে দেয়া হল।

১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গ ছাড়ার আটাশ বছর পর ১৯৭৪ সালে আমি আবার ঢাকায় যাই। ইতিমধ্যে আর যাইনি। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ উদ্দীপনার তুঙ্গে। যা দেখে আমার সবচেয়ে ভাল লাগল, এমন-কি বিস্ময়ে অভিভূত হলুম বলা যায়, তা হল দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু যে প্রশাসনের প্রতি ধাপে তা নয়—যাবতীয় শিক্ষানির্ভর পেশায়-প্রযুক্তিতে-বিজ্ঞানে-এঞ্জিনিয়ারিঙে-শিক্ষকতায় সর্বক্ষেত্রে আসন দখল করে আছেন বাঙালি মুসলমান। অথচ, ১৯৪৬ সালে এসব স্থান প্রায় একচেটিয়াভাবে অধিকার করেছিলেন হিন্দুরা। প্রত্যেকেই যথেষ্ট শিক্ষিত, দীক্ষিত, সজাগ। কাজে আছে প্রত্যেকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস। অথচ কথাবার্তায় বা ব্যবহারে নেই আমাদের কলকাতার ইয়াপিদের মত হামবড়,

চালবাজি। আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। একপুরুষ, বড়ো জোর দুই-পুরুষের মগজজীবী হবার দরুণ তাঁদের কারোরই হাতে-কলমে কাজ করতে, হাত ময়লা করতে, অথবা কত ধানে কত চাল তার হিসাব নিতে বা দিতে আপত্তি বা জ্ঞানের অভাব নেই। আমাদের মত ওসব 'ছোট ব্যাপারে' তাঁরা নাক উঁচু করে মুখ ঘুরিয়ে বসেন না।

মাত্র আটাশ বছরে এতখানি অগ্রগতি কী করে সম্ভব হল এই ভেবে আশ্চর্য হলুম। উপরন্তু এই ভেবে যে এই আটাশ বছরের ছাব্বিশ বছরই যখন পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের কেটেছে পশ্চিম-পাকিস্তানের আঁচলের খুঁটে-বাঁধা অবস্থায় থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষা ও জীবনধারার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে।

স্পষ্টই বুঝলুম এই আটাশ বছর ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ যখন নিজের ঘরে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে, মালিক হবার একান্ত চেষ্টায়, এক-নাগাড়ে লড়াই করে চলেছেন তখন আমাদের দেশের, বিশেষত পূর্বভারতের অনেক রাজ্যই—যেমন আসাম, উড়িষ্যা, মণিপুর, এমন-কি পশ্চিমবঙ্গও গয়ংগচ্ছ কেন্দ্র-নির্ভর নাবালক অবস্থায় নিশ্চিন্তভাবে কালপাত করছিল, এবং সাফাই গাইবার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অহরহ উচ্চকণ্ঠে বিষোদ্গার করেই পাশ ফিরে আবার শুত। স্পষ্ট প্রমাণ হল নিজের কুঁড়েঘরে রাজা হবার চেষ্টা করা এক কথা, আর সংবিধানগত মৌলিক অধিকারের, তথা নির্দেশনীতির মনোহারী তালিকায় আত্মবিস্মৃত থাকা আরেক কথা। সংবিধানগত অথবা আইনগত অধিকার এবং আশ্বাস এক কথা এবং বাস্তব জীবনে তার ফলভোগ আরেক কথা। প্রথমটি দিয়ে দ্বিতীয়টির অভাব পূরণ হয় না। এ বিষয়ে ভাবের ঘরে চুরির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে তার গত চোদ্দ বছরের ইতিহাস। গোর্খাদের অস্তিত্ব স্বীকারে প্রথমদিকে আপত্তি করে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মাটিতে নাকখত দিতে হল। প্রগতিঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবঙ্গ এখনও রাজনীতিতে বা প্রশাসনে একজনও জগজীবন রাম, কামরাজ, রফি আহমদ কিদোয়াই, জৈল সিং, বুটা সিং অথবা বংশীলালকে সমাজের শীর্ষে তুলতে পারল না। ছেলেবেলায় দেখেছি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মত সুদক্ষ প্রশাসককে আমরা কলকাতার পৌরসভার অধ্যক্ষ হতে দিইনি তার কারণ নেতারা সমস্বরে বলেছিলেন, ও তো জাতে কেয়ট, সে কলকাতার কী বুঝবে ?

পুঁথিগত, আইনপ্রদত্ত সমতা বা সমানাধিকারের ফল কার্যত কিভাবে পদদলিত হচ্ছে তা রোজ ভোরে যোধপুর পার্কে যখন প্রাতঃভ্রমণে বার হই তখন ডাস্টবিন

থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের খাবার খুঁটে খাওয়াতেই দেখি। নিজের চোখে দেখলুম ১৯৪৭ সালের সাতাশ বছর পরে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, অনেক অভাব সত্ত্বেও, অন্তত কতগুলি বিষয়ে হাতে-কলমে সমান ফল বাংলাদেশের জনসাধারণ পেয়েছে। ১৯৯০ সালে আবার যখন কয়েকদিনের জন্যে ঢাকায় যাই তখন মফঃস্বল জেলার সদর ও ছোট ছোট শহরগুলির সমৃদ্ধি নিজের চোখে দেখে ও পরের মুখে প্রমাণ পেয়ে পুলকিত হই। এবং আরো পুলকিত হই এই দেখে বাংলাদেশে যে ধন উৎপাদন হচ্ছে, তার অসম বণ্টন যদিও চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত ক্রমশ ফুটে উঠছে, তবুও সে ধন বাঙালিদের হাতেই আছে, অ-বাঙালিরা নেপোর মত সে দৈ মারছে না। ১৯৪১ সালে বরিশালে একটি লোকপ্রবাদ শুনেছিলুম সেটি ১৯৯০ সালে বিশেষ করে মনে পড়ল :

"গত বছর আমার পদবী ছিল মোমিন (জোলা), এবছর চাষে লাভ করে আমার পদবী হয়েছে খান, খোদা দেন তো আসছে বছর হব শেখ, খোদার দোয়ায় অবস্থা আরো ভাল হলে হব সৈয়দ।"

অবস্থা ভাল করার আগ্রহ ব্যাপারেও বাংলাদেশের কাছে পশ্চিমবঙ্গের যে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে সেটা বোঝাই যায়, বাংলাদেশের সামরিক নেতাকে গদিচ্যুত করে, সাম্প্রতিক মুক্ত ও স্বাধীন সাধারণ নির্বাচনে, আর তার সঙ্গে তুলনামূলক ১৯৯১ সালের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে।

বাংলাদেশের প্রথম যুগে. অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান থাকার সময়েই সমানাধিকারের লাভের অভিযান যেভাবে অগ্রসর হয় তার প্রধান কারণ সম্বন্ধেও আমার নিজস্ব একটি অনুমান আছে। ইসলাম সব মুসলমানকে অন্তত দুটি সামাজিক সমানাধিকার দেয়। প্রথম, খাবার সময়ে আপামর সকলে মিলে একত্রে বসে একই থালা থেকে সকলের ভোজনের অধিকার। দ্বিতীয়, ধর্মোপাসনার সময়ে সকলে একই মসজিদে ছোটবড় নির্বিশেষে পাশাপাশি বসে উপাসনা করার অধিকার। তৃতীয় একটি অধিকার আমি বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিং, চট্টগ্রাম সর্বত্র দেখি। মুসলমান জমিদার-বাড়িতে যত ছোট প্রজা বা ভাগীদারই হোক—তার ভাগ তাকে ঠকাবার জন্য কার্যক্ষেত্রে যত ফন্দিফিকিরই খাটানো হোক—জমিদারবাড়ির দাওয়ায় উঠে বসতে পারে। এই তথাকথিত সমান মর্যাদা, অনেকে আনুষ্ঠানিক নাম-কা-ওয়াস্তে বলে উড়িয়ে দিতে চান, ভুরু কোঁচকান। কিন্তু নাম-কা-ওয়াস্তেরও একটি মহৎ মূল্য থাকে, সেই সামাজিক সমতার সঙ্গে বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক সাম্য যদি নাও আসে, তবুও। তা না হলে আমাদের দেশের কোটি কোটি তথাকথিত ইতর-

জাতের নরনারী ইসলাম বরণ করতেন না এবং ঠিক এই কারণে আজও বোধহয় ইসলামীয় ফাণ্ডামেণ্টালিজ্‌ম্ অনেক দেশে শাস্ত্রীয় লেনিনবাদী সাম্যবাদের প্রতিবাদী ও সমকক্ষ প্রতীকমূল্য বা সম্মান পেয়েছে এবং পাচ্ছে। তবে সব ধর্মের ফাণ্ডামেণ্টালিজ্‌মের মত দুটি বিষ সমাজের দেহে ঢুকলে তাকে দূর করা শক্ত: একটি, দেশের অর্ধেক শক্তি অর্থাৎ নারীসমাজকে দাসত্বে বদ্ধ করা, অন্যটি, নেতাদের মধ্যে কে পবিত্র থেকে পবিত্রতর তার অগ্রাধিকার গায়ের জোরে, অত্যাচার ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষিত উচ্চবর্ণের অথবা মধ্যবিত্ত বা মধ্যবর্ণ খুব কম হিন্দু বাঙালিকে আমি শুনেছি মেথর বা মেছুনির সঙ্গে গলায় কর্কশ বা হুকুমের স্বর না এনে, সমানভাবে আপনি সম্বোধন করে কথা বলতে। বাড়িতে এলে বসতে বলার তো কথাই ওঠে না। আবালবৃদ্ধ সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করা আমি মুন্সীগঞ্জে বাঙালি মুসলমানদের কাছে প্রথম শিখি।

নেহরু

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিদের মাসে দু'বার নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সম্প্রতি সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সে চিঠিগুলি পড়ে সন্দেহ থাকে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের গরিমাময় স্থান তৈরি সম্বন্ধে তিনি কত যত্নবান ছিলেন। ভারত যদি তাঁর নেতৃত্বে শুরুতেই কৃচ্ছ্রসাধনের পথ না নিত, এবং সেই সঙ্গে শিল্পোন্নয়ন, পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, আমদানি দ্রব্যের বিকল্প উৎপাদন, সেচ, বিদ্যুৎ, যানবাহন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে দৃঢ়পদে না এগোত, তাহলে সঞ্চিত স্টার্লিং-তহবিল নষ্ট হত, এবং কবে বড় বড় শক্তিগুলি ভারতকে পদানত রাখার কায়েম ব্যবস্থা করত, যেমন নাকি অন্যান্য বহু বড় দেশকে তারা এখনও রেখেছে। ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতা ও ক্ষমতা লোপ পেত। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও অতি প্রিয় ঐতিহ্য, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও অনেক ব্যবহারিক মান তিনি সৃষ্টি করে যান। ব্যক্তিগত ভদ্রতা, ভব্যতা, স্বাভাবিক ব্যবহার, এমন-কি বেশ-ভূষায় শালীনতার মানও তিনি রেখে যান। চিন্তায় ছিলেন মহাজ্ঞানী অথচ কথাবার্তায় ছিল তাঁর শিশুবোধ্য চলিতভাষার প্রয়োগ। অপরের যুক্তির প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে যা কিছু মূল্যবান, তার মান তিনি ধার্য্য করে যান। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই ছিলেন বোধহয়

একমাত্র ভারতীয় সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সর্বজনসম্মানার্হ বিশ্বনাগরিক। তাঁর উদ্যমে আমাদের বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি-উৎপাদন, পারমাণবিক প্রচেষ্টা, সেচ, পরিবহন, সঞ্চার ও যাবতীয় গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়। নেহরু নিজে ১৯৫৬ সালে শিল্পীকরণ রীতির দ্বিতীয় রেজলিউশনের প্রবর্তন করেন। তখন অনেক কঠোর নীতিবাদীদের মতে সে প্রস্তাব হানিকর পেরেস্ট্রোইকার মত মনে হয়েছিল। এই রেজলিউশনের ফলে শিল্পের খাতে পাব্লিক ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে নতুন শিল্পসৃষ্টি অধিকারের পুনর্বণ্টন হয়। ফলে পঞ্চবার্ষিকী যোজনাগুলিতে সবকিছু ভরতুকি ও মূল্যনির্ণয় বিধির বলে সারাভারতে প্রাইভেট সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি পায়। নেহরুর উদ্যোগেই সারাভারত একটি অখণ্ড বিক্রয়স্থলে পরিণত হয় এবং তাঁরই নেতৃত্বে আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হার পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশের হার থেকে এখনও কম আছে। ১৯৮৭ পর্যন্ত আমাদের বিদেশী ঋণ অনেকদেশের তুলনায় ছিল অনেক কম। বহু দেশের তুলনায় বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই-এম-এফ আমাদের উপর ঋণের শর্ত এখনও অনেক নরম আকারে প্রস্তাব করে। সেও নেহরু প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের ফলে।

এসব তো বটেই। উপরন্তু ভারতের মঙ্গলকল্পে তাঁর প্রধান অবদান ছিল বহু পার্টির সংসদ গঠন ও ক্ষমতা বণ্টন এবং সংবিধানমতে প্রত্যেক পার্টিকে ক্ষমতা-লাভের গণতান্ত্রিক সুযোগ দান, সরকারের সমস্ত কার্যাবলী পার্লামেণ্ট ও রাজ্য-বিধানসভাগুলির অধীন করা। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটদানের অধিকার দিয়ে সরকার গড়ার ক্ষমতা এবং আমাদের যুগের বহুবিতর্কিত 'গ্লাসনস্ট' তিনি গড়ে যান। চীন প্রভৃতি দেশে আমরা যেরকম কয়েকবছর অন্তর প্রচণ্ড ওলটপালট, ব্যক্তিপূজার চূড়ান্ত, ইতিহাসের পুনঃপুন মিথ্যাকরণ ও পুনর্লিখন, মানবিক দাবী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার লোপ ইত্যাদি দেখেছি, যার ফলে আমার জীবদ্দশায় অনেক দেশে নানা দিকে বারবার হানিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে, সে-সব থেকে আমাদের দেশ অনেকাংশে বেঁচে গেছে।

এসব সত্ত্বেও মনে একটি ক্ষোভ আমার থেকেই গেছে। এব্রাহাম লিঙ্কন বলে-ছিলেন কোন জাতি অর্ধেক দাস এবং অর্ধেক স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। আমার ক্ষোভ এই, কেন তিনি লিঙ্কনের সূত্র অবহেলা করলেন। ভারত আবিষ্কার-পথে তিনি নিশ্চয় জেনেছিলেন যে তাঁর দেশ অর্ধেক কেন, এক-চতুর্থাংশেরও কম স্বাধীন এবং তিন-চতুর্থাংশের থেকেও বেশী দাস, যদি দ্বিতীয় বিভাগে হিন্দু-সম্প্রদায়ের তপশীলী ও অনুন্নত জাতি, অনুন্নত উপজাতি ও সংখ্যালঘু অন্য ধর্মীয়

সম্প্রদায়গুলিকে ধরা যায়। তাঁর জানতে বাকি ছিল না যে দাসত্বের প্রধান চিহ্ন হচ্ছে নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, বাসস্থান, সুস্থ পরিবেশের এবং জীবিকার অভাব। এবং তাদের সাথী হয় উঁচু শিশু ও প্রসূতিমৃত্যুর হার, মাথাপিছু অতি স্বল্প ধনোৎপাদন, যার থেকে আবার আসে স্বাস্থ্যাভাব, অপুষ্টি, জ্ঞানাভাব, প্রযুক্তির দৈন্য। তিনি নিশ্চয় জানতেন, ভারতে যারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন তারা অধিকাংশই উচ্চবর্ণের হিন্দু, যাঁরা সবকিছু সুযোগ-সুবিধার প্রায় একচ্ছত্র অধিকারী, যাঁরা চিরকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে ছলে বলে কৌশলে আধিপত্য বজায় রেখে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে যতদিন সম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। এ বিষয়ে তাঁর মনে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত, তাহলে গান্ধীজির হত্যায় সে-সন্দেহের নিরাকরণ হওয়া উচিত ছিল। এও তিনি অন্য সকলের থেকে নিশ্চয় বেশী গভীর-ভাবে জানতেন যে আমাদের দেশের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে মানবিক, সামাজিক, আর্থিক ও জীবিকার সুযোগের সমতার বিশেষ প্রয়োজন, এবং এই সুযোগ-সমীকরণের পথে দৃঢ়পদে না এগোলে ভারতের শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হবে। এবং এই অভাবের দরুণ অতিকায় দেহ সত্ত্বেও ভারতের পা দুটি এখনও কাদায়-গড়া থেকে গেছে, এবং ঠিক এই কারণে সে জগৎসভায় তার ন্যায্য সম্মান পূর্ণ-ভাবে পাচ্ছে না। বিদেশনীতি, ইত্যাদি নীতির পাশে আমি এককথায় একে গার্হস্থ্যনীতির অবহেলা বলব। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বে নেহরু ছিলেন সম্মানিত নেতা, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র তিনি ছিলেন আদর্শস্বরূপ। তবুও এই গার্হস্থ্য-নীতি অবহেলার ফলে তৃতীয় বিশ্বেও ভারতের যতখানি গরিমাময় আসনলাভ সম্ভব হত তা হয়নি। এই গার্হস্থ্যনীতির অবহেলা শুধু ভারতে নয়, হয়েছে পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, নেপালে, ভুটানে এমন-কি শ্রীলঙ্কাতেও।

এমন দু-একটি 'অতি অবশ্য' ক্ষেত্রের কথা ধরা যাক, যেখানে নেহরু যদি প্রথম থেকেই দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করতেন তাহলে কোন বিরুদ্ধতা বা গাফিলতি পাত্তা পেত না। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তিনি জানতেন ১৮৬৯ সালে মেইজি যুগের প্রারম্ভে জাপানসম্রাট অন্য কোন জনকল্যাণ খাতে কোন সরকারি দায়িত্ব নেননি। একমাত্র দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রতি শিশুর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চারবছরে সম্পূর্ণ করার সর্বজনীন আইনের ও তার পালনের। নেহরুর কাছে অবিদিত ছিল না যে বৃটেন ১৮৭০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে, যার ফলে সে দেশ দ্রুত শিল্পোন্নতির শীর্ষে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার কমে এবং শিশু ও স্কুলের বয়সী ছোট ছেলেমেয়েদের অর্থকরী কর্মে নিয়োগ আইনমতে

রদ হয়ে যায়। শিশু ও ছোটছেলেদের মারফৎ পরিবারের রোজগার বন্ধ হওয়ায়, উপরন্তু স্কুলে শিশুদের প্রতিপালনে ও শিক্ষার খাতে পরিবারের খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় মা-বাবারা জন্মহার হ্রাস করতে বাধ্য হয়। নেহরু সোভিয়েট যোজনাদর্শনের ভক্ত ছিলেন। সোভিয়েট যুগের প্রথমদিকে দেশময় দ্রুত বিদ্যুৎসঞ্চারকল্পে লেনিন যখন গোয়েলরো প্ল্যানে প্রচুর অর্থব্যয়ের সঙ্কল্প নিলেন, তখন সংখ্যাতত্ত্ববিদ স্ট্রুমিলিন তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য পেশ করে লেনিনের কাছে আবেদন করেন যেন বিদ্যুৎ-সঞ্চারের থেকে টাকা কেটে সারা দেশময় অন্তত চারবছরব্যাপী সর্বজনীন ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়, কারণ সে ব্যবস্থা দেশের পক্ষে আরো দ্রুততর উন্নতির সহায়ক হবে। তিনি নানা যুক্তি দিয়ে বলেন যে দেশের সর্বপ্রকার দ্রুত উন্নতির মূলে আছে প্রাথমিক শিক্ষা, এমন-কি, সনাতনী প্রথায় তিন শিক্ষা : পড়া, লেখা ও পাটিগণিত। তাছাড়াও আমাদের দেশেই নেহরুর সমুখে ছিল গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ। যদি প্রথমেই তিনি জেদ করতেন আগামী নির্দিষ্ট কয়েকটি বছরের মধ্যে দেশে পুরোপুরি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতেই হবে এবং নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, যা সোভিয়েট রাশিয়া বা জাপানে সম্ভব হয়েছিল; যদি তিনি তপশীলী, অনুন্নত জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়গুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য দূর করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবস্থা নিতেন; তাহলে সার্বিক ঐক্য, দেশের প্রতি আনুগত্য ও নির্ভরতা অনেক বাড়ত, যার ফলে জাতির শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পেত। আপামর সকলের মনে আসত প্রকৃত আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরতা, স্বেচ্ছায় পরিবার নিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পারিবারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও অর্জনশক্তি এবং প্রতিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গী। সঙ্গে সঙ্গে আসত সমাজের সর্বনিম্নস্তর থেকে স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকা, পরিবেশ ইত্যাদির উত্তরোত্তর উন্নতির দাবী।

মার্শাল ও শ্রীমতী চিয়াং কাই-শেক

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা এখন প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে। কিন্তু আমার কাছে সেটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় মনে হয়েছিল কারণ ঘটনাটি ঘটে পূর্ব-ভূখণ্ডের মহাযুদ্ধে এক অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে। ঠিক একই কারণে পঞ্চাশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে চু-এন-লাইয়ের সফর ও কলকাতায় আগমন

আমার স্মরণীয় বলে মনে হয়। দুঃখ হয় যে চিয়াং দম্পতির আসার উদ্দেশ্য বৃটিশ সরকার যেমন তখন পায়ে ঠেলেছিলেন, জু-এন-লাইয়ের সফরের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চীন-ভারতের উত্তরসীমা নতুন করে নির্ধারণের যৌক্তিকতা—সেটিও নেহরু সমান রূঢ়ভাবে অগ্রাহ্য করেন। আমার পক্ষে আরো ক্ষোভের বিষয় এই, যে বাঙালি মনীষী করুণাকর গুপ্ত এই দ্বিতীয় বিষয়ে সবথেকে স্বচ্ছদৃষ্টিতে সব কিছু পরীক্ষা করে নির্ভীক ও সদ্‌যুক্তি উপস্থাপিত করেন, তাঁর উপযুক্ত সমর্থন ও সম্মান কলকাতার ও ভারতের ঐতিহাসিক সমাজ আজও যথাযথভাবে করেননি। সে যাইহোক, চিয়াং দম্পতির সফরের কথা সংক্ষেপে বলি।

৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, ১৯৪২ সালে মার্শাল ও শ্রীমতী চিয়াং কাই-শেক দিল্লীতে পৌঁছন। খবরটি সেদিন অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। পরের দিন, অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি, দিল্লীর কয়েকটি বাড়ির উপরে তখনকার কালের চীনের জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে তাঁদের সঙ্গীসাথীরা উঠেছিলেন। মার্শাল চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর স্ত্রীকে ১০-১১ তারিখে একের পর এক সংবর্ধনা জানানো হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লীর লেডী আরউইন কলেজে অখিল ভারতীয় মহিলা সঙ্ঘ (অল্-ইণ্ডিয়া উইমেন্‌স্ কনফারেন্স) শ্রীমতী চিয়াংকে সংবর্ধনা জানান। ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি মার্শাল চিয়াং খাইবার পাস, পেশোয়ার, জম্মু ও লাহোর পরিভ্রমণ করেন। সেই সময়ে, ১৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীমতী চিয়াং আগ্রা ঘুরে আসেন, এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি সরোজিনী নাইডু নতুন দিল্লীতে তাঁকে চায়ে আপ্যায়িত করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার মার্শাল ও মাদাম চিয়াং নতুন দিল্লীতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন, এবং কলকাতায় যান। কলকাতায় বুধবার ১৮ ফেব্রুয়ারি মার্শাল চিয়াং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা বলেন। সাক্ষাৎকালে পণ্ডিত নেহরু ও মহাদেব দেশাই উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি দুজনে শান্তিনিকেতন যান। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ-কে-ফজলুল হকের সঙ্গে চিয়াং-এর সাক্ষাৎকার হয়। শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি মাদাম চিয়াং কলকাতার অল ইণ্ডিয়া রেডিও কেন্দ্র থেকে তাঁর স্বামীর বিদায়ভাষণ জানান। ভাষণটি দীর্ঘ ও উদ্দীপনাময় হয়। তাঁদের সম্মানে ভাইসরয় ঘোষণা করেন যে ২ মার্চ চীন দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হবে (তারিখটি পরিবর্তিত করে অবশেষে ৭ মার্চ হয়)। ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে ২১ ফেব্রুয়ারি মার্শাল চিয়াং ভাইসরয়ের সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ বিনিময় করেন। এই প্রসঙ্গে

জাপানের ঘৃণ্য তানাকা ঘোষণা নতুন করে সকলের স্মৃতিপটে তুলে ধরা হয়। পাঠকের মনে থাকতে পারে ত্রিশের দশকে তানাকা ঘোষণা ও হিটলারের 'মাইন কাম্ফ' রচনাদুটিকে সমান পর্যায়ে ফেলা হত। হিটলার যেমন 'মাইন কাম্ফ' প্রকাশ করে তাঁর বিশ্বজয় অভিযানে পা দিলেন, ১৯২৭ সালে জাপান তানাকা ঘোষণা দিয়ে কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন ও ফরমোজা অধিকারের অভিযান শুরু করে। আমাদের দেশে আর কোন ভারতীয় মনীষী রবীন্দ্রনাথের মত দৃপ্ত ও ঘৃণার কণ্ঠে তানাকা ঘোষণার বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেননি।

এর অব্যবহিত পরে আমাদের দেশে যে-সব ঘটনা ঘটতে শুরু করল তার ফলে মার্শাল চিয়াং-এর ভূয়োদর্শন সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা বাড়ে। যে সময়ে তাঁরা এসেছিলেন সেটি তাঁদের পক্ষে অতি সংকটের মুহূর্ত, তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দীর্ঘ তেরো দিন তাঁরা কাটিয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যাবার তিন সপ্তাহের মাথায় অর্থাৎ ১১ মার্চ হাউস অভ কমন্সে উইন্স্টন চার্চিল ক্রিপ্‌স্ মিশন পাঠাচ্ছেন ঘোষণা করলেন। আমার মনে হল এই সন্ধিক্ষণে দুজনের আগমন তাঁদের কূটবুদ্ধির নিদর্শন রেখে যায়। তাঁদের উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল চীন ও ভারতের যুগ্ম ভৌগোলিক স্বার্থের একাত্মতা ও বিপদের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বিশেষত পূর্ব-ভূখণ্ডের মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষই যখন একমাত্র প্রধান যুদ্ধ সরবরাহ ও সবরকম লড়াইয়ের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়। মার্শাল চিয়াং-এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল বৃটিশ সরকারকে পরোক্ষে মনে করিয়ে দেয়া যে ভারতবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগ না পেলে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ভারতবর্ষ তত নির্ভরযোগ্য ও অটল থাকবে না, এবং তার জন্য ভারতের রাজনৈতিক সংকট বৃটিশ সরকার যত তাড়াতাড়ি সমাধান করেন ততই মঙ্গল। চার্চিলের ১১ মার্চের ঘোষণার পিছনে হয়তো মার্শাল চিয়াং-এর কিছু অনুপ্রেরণা ছিল। বিদ্যুৎগতিতে বর্মা দখল করে জাপানীরা বর্মারোড পথে চুঙকিং-এ আমেরিকান সরবরাহের পথ নষ্ট করে। মান্দালয় পতনের পর বর্মারোডের পূর্বান্তে লাসিও-র শত্রুহস্তে পতন আসন্ন হয়। লাসিওতে মার্শাল তাঁর সেরা সৈন্যদের পাঠিয়েছিলেন। দূরদর্শী চিয়াং দেখলেন চীনকে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের যোগসূত্র হিসাবে দ্বিতীয় একটি পথ খোলা নিতান্ত আবশ্যক, এবং তার জন্য প্রয়োজন ভারতের অকুণ্ঠ সহযোগিতার। ১৯৪২-এর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এই দ্বিতীয় পথ—লিডো রোড—নির্মাণের কাজ শুরু হয়। চীনে জেনরল ষ্টিলওয়েল, ভারত-বর্মা প্রান্তে জেনরল উইনগেট, আর পূর্ব-যুদ্ধমঞ্চে জেনরল স্লিম জাপানকে রুখতে সমর্থ হন। ইরাবতী নদীর ধার ধরে লিডো থেকে মিচিনা

পর্যন্ত, পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দুর্গম ও দুর্জেয় ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে পুরো তিনশ' মাইল রাস্তা তৈরির মত বিরাট কাজ ভারতীয়, বৃটিশ ও চীনে কর্মীর সাহায্যে ভারতীয়, বৃটিশ ও আমেরিকান এঞ্জিনিয়াররা সম্পূর্ণ করেন। স্পষ্টই বোঝা গেল জেনারালিসিমো চিয়াং ও তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন এই দুঃসাধ্য কাজে শুধু উৎসাহ দিতে নয়; যাতে ভারতবর্ষে অতি দ্রুতবেগে কতকগুলি বড় বড় হাওয়াই জাহাজ আড্ডা তৈরি করা যায়, যার থেকে আমেরিকান সুপার-ফোর্ট্রেস উড়োজাহাজ যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম নিয়ে পূর্ব হিমালয় পর্বতমালা পেরিয়ে চুংকিং ও চাংশা যেতে পারে, মুখ্যত হয়তো তারই তদ্বির করতে। ভারতবর্ষে যাতে সন্তোষজনক রাজনৈতিক মীমাংসা হয়ে এইসব কাজ ত্বরান্বিত হয় সেই স্বার্থে উদ্বিগ্ন হয়ে চীন আমেরিকান সরকার ও পরে ইউনাইটেড নেশন্সের উপর চাপ দিয়ে যেতে থাকে।

১৯৪২ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ৯ অগাস্ট পর্যন্ত যে সব রাজনৈতিক অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাদের সম্বন্ধে এত বই লেখা হয়েছে এবং এত মত প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছে যে আমার পক্ষে নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই। এই চারমাসে, যার পরিণাম তুঙ্গে উঠল ৮ অগাস্টে, গান্ধীজির সম্বন্ধে আমার মতমত বদলে গেল, অন্য মনোভাব হল। ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে কম্যুনিস্ট সাহিত্যে ও আলোচনায় আমি গান্ধীজির বিরুদ্ধে কেবল সমালোচনাই শুনেছি ও পড়েছি। জেনেছি তিনি ছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুখপাত্র, ভারতীয় পুঁজিপতিদের বন্ধু, কিছুটা হিন্দু মৌলবাদী এবং তর্কে পণ্ডিত। আমার সে মত প্রথম বদলে গেল এবং শ্রদ্ধা দৃঢ় হল যখন, আগেই যা লিখেছি, লিন্‌লিথগো সম্বন্ধে তাঁর অভিমত পড়ি। তার আগে ভারতীয় সমাজে হরিজন ও গিরিজনদের সকলের সঙ্গে সমান অধিকার ও বৈষম্যহীনতায় তাঁর একান্ত বিশ্বাস আছে বলে মনে হয়নি বরং তাঁর বর্ণাশ্রমে আস্থার প্রতি আমার বিরূপতা ছিল ও আছে। তিনি এ বিষয়ে আসল কথাটাই যেন সর্বদা এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হত। অবশ্য আমার এও মনে হত যে স্বাধীনতা সংগ্রামে সকলের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রয়োজন এই বোধে তিনি হয়তো এ বিষয়ে তাঁর আসল মত সম্যক ও সুস্পষ্টভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করছেন না, অন্যপক্ষে ফাঁকা সমাজবিপ্লবীসুলভ বুলিও আওড়াচ্ছেন না। ১৯৫২-৫৪ সালে, তারা কীভাবে জীবনযাপন করে, কী ভাবে, কী আশা করে, তা মনেপ্রাণে জানা ও অনুভব করার জন্যে আমি যখন মাঝে মাঝে, রাঢ় অঞ্চলে, ডোম, বাউড়ি, চামারদের ঘরে, তাদের সঙ্গে একসাথে খাওয়া, বসা, নিদ্রায় কাটিয়েছি, তখন

গান্ধীজি গত হয়েছেন। কিন্তু তখন বুঝেছি ভাঙ্গি কলোনিতে কেন গান্ধীজির জন্য আলাদা ব্যবস্থা হত। ডোমচামারদের সঙ্গে আধসিদ্ধ কাঁকড়ভর্তি চাল, তেঁতুলপাতা দিয়ে জলের মত ডাল, আধপচা মাছ বা মাংস, পানাপুকুরের সবুজ থকথকে জল, রাত্রে বদ্ধঘরে ভিজেমাটির উপর শোয়া, এইসবের পরে প্রতিবার যখন সাইনাস, পেটখারাপ বা রক্ত আমাশয় নিয়ে বাড়ি ফিরতুম, তখনই হাড়ে হাড়ে হরিজনদের জীবনযাপনের রীতি হৃদয়ঙ্গম করেছি।

৯ অগাস্ট ও তারপর

১৯৪২-এর মার্চ মাস থেকে আমার মনে অনুতাপ এল কেন এতদিন আমি গান্ধীজির রচনাবলী মন দিয়ে পড়িনি, উল্টে অবহেলা করেছি। এই সালের প্রথম চার মাসে যা কিছু ঘটল তাতে আমার ধারণা হল ভারতবর্ষকে যদি কোন লোক বুঝতে সাহায্য করে থাকেন তিনি সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমাদের যুগে যিনি চাবিকাঠি যোগালেন তিনি মহাত্মা গান্ধী। ইওরোপীয় ইতিহাস অনুসরণে কম্যুনিস্ট বুলি, লেবেল বা টেনে-বুনে উদাহরণ টানাতে দেশকে সবটা বোঝা যায় না। ভুলে যাই যে স্বয়ং মার্ক্সও তাঁর আপেক্ষিক অপারগতা স্বীকার করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'ওরিয়েন্টাল মোড অভ প্রডাক্‌শন' নামকরণের আড়ালে। কিন্তু যে অমূল্য পদ্ধতি আমি আমার মার্ক্সবাদের গুরু এবং বন্ধুদের —যাঁরা চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকাশ্যে কংগ্রেস পার্টির সভ্য ছিলেন— কাছে উপহার পেয়েছিলুম সেটি হচ্ছে মার্ক্সিস্ট বিজ্ঞানের বিশ্লেষণপদ্ধতি ও ধারা। যদিও আমার গুরু বা বন্ধুরা অনেক সময়ে ভারতের বাস্তব অবস্থাকে সে পদ্ধতি ও ধারার মধ্যে জোর করে টেনে-বুনে পুরে দিতেন, তা সত্ত্বেও মার্ক্সিস্ট বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এবং তার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির কল্যাণে তাঁরা যে যুক্তি বা হেতুপরম্পরা দেখাতেন, সেগুলি, বিশুদ্ধ কংগ্রেসীরা যেভাবে যুক্তি উপস্থাপিত করতেন, তার থেকে অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী হত। আমার ধৃষ্টতা পাঠক মাপ করবেন, কিন্তু সাধারণ লোক যাতে চট করে বুঝতে পারে সে-ধরনের বিশ্লেষণী যুক্তিতর্কের ধারা ও পদ্ধতি গান্ধীজি সবসময়ে উত্তরাধিকার হিসাবে আমাদেরকে দিয়ে যেতে পারেননি।

তবে, ১৯৪২ সালে সরকারি স্বীকৃতির প্রাক্কালে, বিশেষত সেই বছরের জুলাই-অগাস্ট মাসে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি যে কর্মসূচী গ্রহণ করল, সেটি আমার

কাছে একটু বেশী মসৃণ মনে হল। আমি সে মসৃণতাকে সুবিধাবাদী অথবা বুলি-বচন বলে দোষ দেব না। তার কারণ, তার পূর্বের কুড়ি বছর, অর্থাৎ পার্টির প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্টিকে কত মূল্য দিতে হয়েছে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট ধারণা ছিল। আরও জানতুম কংগ্রেসের কত শ্রেষ্ঠ নিঃস্বার্থ, নিবেদিতপ্রাণ কর্মী কম্যুনিজমের পথে এগিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা জানতেন, শুধু দেশপ্রেমই সব নয়, তাকে ঘিরে বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তিপ্রসূত একটি পুরো আর্থ-সামাজিক দর্শন গড়ে তুলতে না পারলে কাজে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ প্রত্যয় ও আত্মনিয়োগ আসবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে ১৯৪২ সালে আমার মনে হল কোথায় যেন একটা ফাঁকি ঢুকেছে। আমার নিজের একটি সাধারণ কিন্তু মোক্ষম অনুভূতির কথা বলি। ১৯৪২-এর মার্চ থেকে অগাস্টের পর পর্যন্ত যদি আমার কাছে কোন কংগ্রেসের সভ্য দেখা করতে আসতেন আমার একটু অস্বস্তি হত, আই-বির লোকেরা আমার সম্বন্ধে কী রিপোর্ট করবে এই ভেবে। অথচ সেই সময়ে কম্যুনিস্টরা যখন আমার খাস-কামরায় প্রয়োজনমত যখন-তখন দেখা করতে আসতেন তখন আমার মনে কোন অস্বস্তি হত না। এই দুই ধরনের অনুভূতির ফলে আমার মনে সন্দেহ হত কম্যুনিস্টরা সত্যিই ঠিক পথে আছেন, কি না।

এবিষয়ে আমার একটি খুব সরল নিরিখ ছিল। কোন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা রাখতে গিয়ে যদি আমার মনে হত আই-বি আমার উপর নজর রাখছে, তাহলে আমার মনে হত যে তাঁর সঙ্গে আলাপ রাখাটা আমার নৈতিক দায়িত্ব, এবং নিজের পক্ষে উপকারী। ঠিক যেমন কৃষ্ণনগর থাকতে গোঁফ-বাবু সম্বন্ধে আমার মনে হত। কিন্তু, উল্টোপক্ষে, যদি কারোর সঙ্গে আলাপ বা সম্পর্ক রাখার সময়ে আমার মনে হত, ব্যাপারটা আই-বির তরফ থেকে আমার পক্ষে নিরাপদ, তাহলে বুঝতুম নৈতিক ক্ষেত্রে আমি কিছু ঝুঁকি নিচ্ছি না। ১৯৪২-এর অগাস্ট থেকে ১৯৪৭-এর গোড়া পর্যন্ত, অর্থাৎ অগাস্ট আন্দোলন থেকে পার্টিশন পর্যন্ত, আমার কেন জানি না কংগ্রেস কর্মীদের সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট কর্মীদের প্রত্যেকের থেকে, বেশী শ্রদ্ধা ছিল, যদিও আমি সবসময়ে কংগ্রেস মতবাদ গ্রহণ করতে পারতুম না। এমন-কি অনেক সময়ে, সে মতবাদ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাও থাকত না। সেই অনুপাতে অবশ্য আমি সি-পি-আই নীতি বেশী বুঝতুম এবং সি-পি-আইতে আমার বন্ধুসংখ্যা বরাবর বেশীই ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে। 'নিউ এজ' এবং 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে'র উপর ১৯৪২-এর জুলাইয়ের শেষে যখন নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল, এবং সেইসঙ্গে অন্যসমস্ত পত্র-

পত্রিকার উপর অতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা চালু হল, তখন আমি যাকে বলে একটু খচে গেছলুম। অন্তপক্ষে, আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হল যখন ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এল এবং ১৯৪৮ সালে সি-পি-ই বেআইনি ঘোষণা হল। সেই থেকে আমার জীবনে ও মনে এইরকম মায়া ও বিরূপতার দোলা চলছে। হয়তো আমি সারা জীবনের মত মুন্সীগঞ্জের নীতিটি গ্রহণ করেছি। যে কেউ সরকারের গদিতে বা সঙ্গে থাকবে তার সম্বন্ধে আসে আমার প্রচ্ছন্ন বিরূপতা; ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যান্টি-এস্ট্যাবলিশমেণ্ট। মুন্সীগঞ্জে যাকে বলত 'আমি একটা আফত্য রাখলাম।'

উপরোক্ত মন্তব্যের পিছনে তখনকার একটি ঘটনা আছে। ১২ অগাস্ট ১৯৪২ সালে সি-পি-আই সেক্রেটারি পি-সি যোশী গ্রেটবৃটেনের কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি হ্যারি পলিটকে একটি তারবার্তা পাঠান। সেই তারে তিনি সরকারের নিষেধাজ্ঞা-মুক্ত ভারতীয় সি-পি-ইয়ের তরফে শুভেচ্ছা জানান। সেইসঙ্গে তিনি সময়োপযোগী ভাল আওয়াজগুলিও প্রয়োগ করলেন, যেমন 'ফ্যাশিবিরোধী ভারতীয় জাতীয় সংহতি।' সেইসঙ্গে যোগ করলেন, 'আমাদের সহদেশপ্রেমীরা বর্তমান ঘটনাচক্রে বিরূপ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী পথ নিয়েছেন।' মনে হল এ কথাগুলি শুধু শুধু যোগ করার কি প্রয়োজন ছিল? সব তারবার্তাই সেন্সর হত বলে কি যোশী রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সন্তোষের জন্য এগুলি লিখেছিলেন? কথাগুলি আমার একটু উপরচালাকি বলে মনে হয়েছিল, দুপক্ষকেই খুশি রাখার চেষ্টা !!

মুন্সিগঞ্জে অগাস্ট আন্দোলন

১৯৪২-এর ৯ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট পর্যন্ত মুন্সীগঞ্জ বাদে, ঢাকা জেলার অন্য অনেক স্থানে পুলিশ বহু গ্রেপ্তার করে এবং কিছু কিছু গুলি চালায়। আমার ভাগ্য ভাল ছিল আমার কালেক্টর জে-এল লিউয়েলিন বা কমিশনার এ-এস লার্কিন (ইনি আইরিশ ছিলেন) উপরপড়া হয়ে যখন তখন হুকুম চালাতেন না। উল্টে যথাসম্ভব আমার উপরেই ছেড়ে দিতেন। আমার এস-ডি-পি-ও মদনমোহনলাল হুজা, আই-পি, আর আমার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বেশ মিল ছিল। আগেই বলেছি কৃষ্ণনগরে প্রথম আলাপ হয়। পরে উত্তরজীবনে তিনি ভারত সরকারের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক গোয়েন্দাপদে নিযুক্ত হন। সত্তর দশকের প্রথমভাগে স্বেচ্ছায় অবসর

নিয়ে কলকাতায় এসে বেসরকারি কাজ নিয়ে টিভলী কোর্টে থাকতেন। বছর চারেক হল মারা গেছেন। ঢাকার এস-পি ছিলেন আরেক আইরিশম্যান, রিচার্ড হিগিন্স্। অ্যাডিশনাল এস-পি ছিলেন উপানন্দ মুখুজ্যে, পরে পশ্চিমবঙ্গের আই-জি হয়ে অবসর নেন। জেলার গোয়েন্দাবিভাগের কর্তৃত্বে ছিলেন রায়সাহেব পি-এম চক্রবর্তী, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের লোক। যদিও উপর থেকে সরাসরি নির্দেশ আসেনি তা সত্ত্বেও হুজ্জা ১৬-১৭ অগাস্ট নাগাদ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, কারণ মহকুমার স্থানে স্থানে আইনশৃঙ্খলা অমান্য করা শুরু হয়। সরকারি আদেশে ২৩ এপ্রিল থেকে 'যুগান্তর' কাগজের প্রকাশ বন্ধ হয়। সেই থেকে কলকাতার সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের গুরুতর রকমের মতবিরোধ বাড়ে। ইতিপূর্বে তাদের উপর যা নির্যাতন হয় তার কথা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি। সংবাদপত্রে যেসব খবর থাকত না, সেগুলি আমরা গোয়েন্দাবিভাগ থেকে পেতুম, সেগুলি অবশ্য এক-তরফা। অগাস্ট আন্দোলনের কোন সংবাদই কাগজে ছাপার অনুমতি ছিল না। বিহারে, উত্তর ও পূর্বভারতে বিশেষ বিশেষ স্থানে সরকার নৃশংস অত্যাচার চালায়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায়, বিশেষ করে কাঁথি ও তমলুক মহকুমায়, অবাধে দমননীতি চলে। গুলি চালালে পুলিশকে পুরস্কার দেয়া হত, অভিনন্দন জানানো হত। স্পষ্ট বোঝা গেল, সরকার যুদ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থায় যাতে কোন বাধাবিপত্তি না আসে তার জন্য শুধু বদ্ধপরিকর ন'ন, উপরন্তু অযথা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহিংসাপরবশ। এদিকে মুন্সীগঞ্জে এ পর্যন্ত একটিও গুলি চলা দূরের কথা, কোন গ্রেপ্তারও হয়নি, যদিও ত্রিশের দশকের আন্দোলনে বিক্রমপুরের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যবিষয়ে নামডাক ছিল, এবং এবারও কংগ্রেস মহকুমার বহুস্থানে মিছিল করে মিটিং করে। তবে কোন স্থানেই জনসাধারণের বা সরকারের সম্পত্তির লোকসান বা প্রাণহানি হয়নি। মহকুমায় গুলি চালালে আমার নেতৃত্বের হার হবে, মনে মনে সেই ছিল আমার অহঙ্কার, যদিও সে অহঙ্কারের কোন মানে হয় না। অগাস্ট আন্দোলনের মত ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনে এই ধরনের দর্প একান্ত অবান্তর জানতুম। তবুও আরেকটি কারণ ছিল। এস-ডি-ওর সংরক্ষিত গোপন দলিলের লাইব্রেরিতে ১৯৩০-৩৫ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কাগজপত্র পড়ে' ধারণা হয়েছিল, অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে মহকুমার খ্যাতি যত না হয়েছিল, তার থেকে বেশী হয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধের ফলে। মুন্সীগঞ্জে ঘুরে ঘুরে আলাপ করে আমার ধারণা হয়েছিল, সরকার যদি অত্যাচার চালিয়ে লোককে খুঁচিয়ে না তুলতেন, তাহলে চাষী এবং

দিন-আনি-দিন-খাই পরিবাররা—যাদের অধিকাংশই ছিল গরীব মুসলমান বা তপশীলী জাতি—তারা নিজেদের জীবিকা ফেলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্ররোচনায় দলে দলে যোগ দিত না। ত্রিশের দশকে তাদের জীবিকা কিছুটা ব্যাহত হওয়াতেই আন্দোলন বাড়ে। সেই কারণে, এবার সরকারের অত্যাচারের অভিযোগ যাতে যথাসম্ভব কম হয়, সেজন্য আমি বদ্ধপরিকর ছিলুম। ব্যক্তিগত বা স্থানীয় অভিযোগ না থাকলে বিরোধভাবও কমে যাবে।

ওদিকে প্রয়োজন হলে গুলি চালাবে, সরকারের এই নির্দেশের চাপ ক্রমশ বাড়তে লাগল, কারণ সরকার যতশীঘ্র সম্ভব নির্মম হাতে অগাস্ট আন্দোলন নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ১৬, ১৭ অগাস্ট থেকে প্রায় রোজই হুজা এ বিষয়ে পুলিশ বিভাগ থেকে কড়া কড়া নির্দেশ এনে আমাকে দেখাত। তখনকার দিনে গুলি ছোঁড়ার আগে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ আবশ্যিক ছিল; যতক্ষণ না ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিত ততক্ষণ মিছিলের উপর গুলি চালানো যেত না। ঠিক এই বিষয়ে এস-ডি-পি-ও বা পুলিশকে নির্দেশ দিতে হুজার এস-ডি-ও ছিল নারাজ। এস-ডি-পি-ওকে রক্ষা করার জন্যে, এবং প্রয়োজন হলে নিজের ঘাড়ে দোষ নেবার অভিপ্রায়ে আমি হুজাকে সর্বদাই নিজের সঙ্গে রাখতে শুরু করলুম। একলা ঘুরতে দিতুম না। অবশ্য এটি সম্ভব হত হুজার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং পরস্পরের প্রতি আস্থার ফলে।

সেদিন ২২ অগাস্ট শনিবার। হুজা দুপুরের দিকে বিচলিত মুখে ইন্দ্রাকপুর ফোর্টে এসে বলল, শনিবার সকালে স্থানীয় জনতা সিরাজদীঘা থানা ঘিরে ফেলে হামলা শুরু করে। পুলিশ ঘাবড়িয়ে গিয়ে গুলি চালায়, একটি যুবক মারা গেছে। মৃতদেহ জনতার হাতে দেয়া হয়নি. সেটি থানায় রক্ষিত আছে। পরের দিন, অর্থাৎ রবিবার, মহকুমার বহু জায়গা থেকে দলে দলে মিছিল এসে তালতলা বাজারে জমায়েত হয়ে প্রথমে মিটিং করবে, পরে সকলে মিলে সিরাজদীঘা থানা চড়াও করে, প্রয়োজন হলে, জবরদস্তি মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

তার আগের কয়েকদিন ভাবনা-চিন্তায় আমার অল্প জ্বর হতে শুরু করেছিল। সেই অজুহাতে আমি প্রায় সারাদিন হুজাকে আমার কাছে বসিয়ে রাখতুম, যথাসম্ভব তার বেরনো বন্ধ করে। কিন্তু এবার কিছু একটা করতেই হয়। একটি উপায়ে রক্তারক্তি বন্ধ করা যায়, যদি পরের দিন তালতলায় আমরা এত পুলিশের সমাবেশ করতে পারি যাতে জনতা বুঝতে পারে এত অস্ত্রশস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন ফল হবে না; প্রাণটুকুই শুধু যাবে। মিছিলে যাঁরা নেতৃত্ব করবেন, যেমন

ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, জিতেন কুশারি প্রভৃতি, তাঁদের সংকল্পের অটলতার উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, সেইজন্যই এই পন্থার কথা ভাবলুম। কিন্তু যা ভাবছি তা কি করে সম্ভব? আমাদের তো বড়জোর এক-দু'ডজন মাজানলের রাইফেল বা মাস্কেট সম্বল।

নদী পেরিয়ে দাউদকান্দি থেকে ফোন করে হুজা উপানন্দর সঙ্গে কথা বলল। উপানন্দ যা ব্যবস্থা করলেন তা আমাদের প্রত্যাশার অতীত। আমরা শুনেছিলুম তালতলা বাজারে মিছিল এসে জড়ো হতে শুরু করবে বেলা চারটের সময়ে। হুজা আর আমি উপানন্দর পাঠানো একটি মোটরবোটে রওনা হলুম বেলা দেড়টার সময়ে। মীরকাদিম ঘাটের সমুখে লক্ষ্যা আর ধলেশ্বরীর সঙ্গম কলাগাছিয়ায় পৌঁছে দেখি উপানন্দ একটি বড় লঞ্চের খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পিছনে প্রায় একটি গোটা কোম্পানি অর্থাৎ একশ'জন উর্দ্দিপরা পুলিশ, তার মধ্যে অন্তত দুই প্লেটুনের, অর্থাৎ চল্লিশজনের, কাঁধে রাইফেল। দুটি লঞ্চ একত্র হয়ে আবদুল্লাপুর পেরিয়ে তালতলার দিকে এগোল। যাবার সময়ে দেখি দুটি মারাত্মক দেখতে আগাগোড়া বর্মে-আঁটা বর্মা নৌসেনার গানবোট—সে দুটি আগে বর্মার নৌসেনার ছিল, রেঙ্গুন-পতনের সময়ে কক্সবাজারে পালিয়ে আসে—বুড়িগঙ্গার দিক থেকে আসছে। প্রত্যেকের মাথার উপর থেকে একটি কামানের নল আকাশের দিকে উঁচিয়ে তালতলার দিকে মুখ করা। মুন্সীগঞ্জের লোক কেন, আমার কাছেও, এ দৃশ্য অভাবিত। প্রথমত, এরকম সাঁজোয়া রণতরী আশা করিনি, দেখতে সাক্ষাৎ যমদূত বললেও যথেষ্ট হবে না, গাঢ় ধূসর রং করা। ওদিকে একশ'জন সশস্ত্র পুলিশ। উপানন্দর হাতে বড় মেগাফোন। তালতলা ঘাটের কাছে আমাদের লঞ্চদুটি ভিড়তেই উপানন্দ মেগাফোনে আমার নাম নিয়ে চিৎকার করে বললেন, ১৪৪ ধারানুসারে এস-ডি-ওর আদেশে এ জমায়েত বেআইনি, জনতা এখনি ছত্রভঙ্গ না হলে গুলি চলবে। বারবার মেগাফোন এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে বলছেন আর আমাদের লঞ্চ ততক্ষণে ঘাটে ভিড়ছে, পিছনে সাক্ষাৎ শমনরূপী দুটি সাঁজোয়া নৌতরী।

আমার হঠাৎ ভয় হল এই বুঝি পুলিশরা মহানন্দে রাইফেলের ট্রিগার টেপে। নিরীহ নিরস্ত্র জনতার উপর বীরত্ব দেখানর এই সুযোগ। দিগ্বিদিক চিন্তা না করে আমি একলাফে ডাঙায় পড়ে, ভীড়ের দিকে ছুটলুম। কিসের তাড়ায় যে ছুটলুম এখনও জানি না। আমি নিজে জানি আমি কত ভীতু, কাপুরুষ। সুতরাং নিজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে যে বীরত্ববলে ছুটেছিলুম, তা মোটেই নয়। 'টেল্‌স্ অভ

সিবাস্টোপোলে' টলস্টয় সম্ভবত আমার মত ভীরু লোককে কল্পনা করেই মানুষ কী অবস্থায় বীর হয় আলোচনা করেছেন। নিজের কথা বলি। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কী করে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করা যায়। ভেবেছিলুম, এযাত্রা যদি গুলি না ছুঁড়ে পারা যায়, তবে ভবিষ্যতে মহকুমায় গুলি চালানোর প্রয়োজন হবে না। আর যদি এযাত্রা না পারি, তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা তারও বেশীবার গুলি চালাতে হবে। আমি ছুটতে ছুটতে এগোচ্ছি, হুজাও উদ্বিগ্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার পিস্তল হাতে ছুটছে, পিছনে উপানন্দর লঞ্চের লাইন করা পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে আসছে, তার পিছনে কামান-উঁচনো মানোয়ারি জাহাজ। এতখানি অস্ত্রশস্ত্রের সমারোহ, পরে যখন আইজেনস্টাইনের 'ব্যাট্‌ল্‌শিপ পোটেমকিন' দেখি, এবং এখন যখনই মনে পড়ে তখন লজ্জা হয়, কিন্তু এই সমারোহ না হলে ইন্দ্রনারায়ণবাবুরা থাকতে জনতা অত তাড়াতাড়ি হাওয়ায় মিলিয়ে যেত না। অতবড় বাজারভর্তি লোক শূন্য হয়ে গিয়ে পড়ে থাকলেন মাত্র জনাবিশেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নেতা, তার মধ্যে দুজন মহিলা। তাঁরা নড়লেন না।

তাঁদের কাছে এগিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে বললুম, আমি নিরুপায় হয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ তাঁরা আমার জারি করা ১৪৪ ধারা অমান্য করেছেন। পুলিশে তাঁদের ঘিরে নিয়ে চলল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অমূল্য চন্দ, ভগবতী তালুকদার, প্রফুল্লচন্দ্র সেন (স্থানীয়), ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, জিতেন কুশারি, আশালতা সেন (অর্থনীতিবিদ সমররঞ্জন সেনের মা)। এঁদের আমরা আমাদের লঞ্চে তুললুম। তাঁদের সকলেরই বয়স হয়েছিল, সে রাতে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠালে তাঁদের কষ্ট হত। বাকি জন-পনেরোকে আমরা উপানন্দের লঞ্চে ঢাকা পাঠিয়ে দিলুম। তার আগে অবশ্য আগের দিনের মৃতদেহটি আত্মীয়দের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলুম। মুন্সীগঞ্জে পৌঁছলুম রাত ৮টা-নটার সময়ে। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের আমার বাড়ির তলায় মুন্সীগঞ্জ সাবজেলে রাখা হল।

কেন আমি গুলি চালানোর এত বিপক্ষে ছিলুম? রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণগুলি একটু আগেই বলেছি। ব্যক্তিগত কারণ হচ্ছে আমার জেদ ছিল গুলি চালালে আমার নিজের কাছে আমার নৈতিক ও নেতৃত্বগত হার হবে। রাজনৈতিক কারণ হল, একবার গুলি চললে বার বার গুলি চালাতে হবে। তৃতীয় একটি কারণ ছিল, যে কারণটি, অত্যন্ত দুঃখ ও খেদের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্বাধীনতা পাবার পর, আমাদের সরকার বর্তমানকালে যার এক কাণাকড়িও

মূল্য দেন না। পরাধীনতার সময়ে ভারতবাসীর জীবনের যে মূল্য ছিল, আজ স্বাধীন হয়ে তার কিছুমাত্র নেই। আজকের দিনে কথায় কথায় পুলিশ ট্রিগার টিপেই যায়, জীবনহরণের কোন জবাবদিহি নেই, ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই, সে বিরাটি বা বাণতলার ভয়ঙ্কর পাশবিক হত্যাকাণ্ডই হোক, বা অল্পবয়স্কা রাজনৈতিক নেত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেয়াই হোক, বা রাজনৈতিক শত্রুদের ট্রাক থেকে নামিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মেরে রাস্তায় ফেলে রাখাই হোক। পুলিশের তদন্তাধীন লোককে সম্পূর্ণ বেআইনি সাফাই গেয়ে তাকে হত্যা করা সেকালে সম্ভব হত না। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর বৃটিশ সরকার গুলি চালাতে রীতিমত ভয় পেত, শুধু যে ভারতীয় জনমতের ভয়ে তা নয়, তার থেকে বেশী বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির ভয়ে। উপরন্তু গুলি চললে সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারির কাজ খুব কম ক্ষেত্রেই বিনা ওজরে পূর্ণ সমর্থন করতেন। অবশ্য অগাস্ট আন্দোলন দমনে সরকার সব অত্যাচারেরই সমর্থন করেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন জানালেও, উপরওলারা, আরো উপর থেকে—পার্লামেণ্ট বা বৃটিশ প্রেস থেকে—গঞ্জনা খেয়ে হয়তো যে অফিসার গুলি চালিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে একটি বদনাম চালু করতেন—'গরম স্থানে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না।' নিজের দেশের লোকের উপর গুলি চালাবো, ওদিকে আবার মাথাগরমের অপবাদও ঘাড়ে নেব, দুই অপবাদ সহ্য করতে আমি রাজী ছিলুম না।

সম্প্রতি আরেকটি অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে রাজকর্মচারিদের নৈতিক শৈথিল্য আসন্ন। যে রাত্রে মুন্সীগঞ্জ সাবজেলে নেতাদের ঢোকালুম, বলা বাহুল্য ছ'জন বৃদ্ধব্যক্তির আহার বা অন্য ব্যবস্থা সাবজেলে ছিল না। ২২শে শনিবার তাঁরা রাত্রে গ্রেপ্তার হয়ে আসেন, ২৫ অগাস্ট মঙ্গলবারের আগে তাঁদের ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো সম্ভব হয়নি। ২২শে শনিবার অত রাত্রে আমাদের বাড়ি থেকে চা আর জয়ন্তীর জন্য রাখা দুধ ছাড়া আর কিছু পাঠানো সম্ভব হল না। রবিবার সকালে জলখাবার ও খবরের কাগজ, দুপুরের ও রাত্রের আহার, তার পরেরদিন, সোমবার সকালের জলখাবার ও কাগজ, সবই আভা জেলে ওয়ার্ডার-মারফৎ পাঠিয়ে দিল, যতক্ষণ না তাঁরা ঢাকায় চালান হলেন। রায়সাহেব পি-এম চক্রবর্তীর কৃপায় সরকার সবকিছু জানতে পারলেন, কিন্তু আমাকে এ নিয়ে কোনদিনই কেউ কোন প্রশ্ন করেননি, আমাকে জবাবদিহিও করতে হয়নি। এগুলি অতি সাধারণ ভদ্রতা, আতিথেয়তা; নিতান্ত অমানুষ

বা পা-চাটা না হলে সব সাধারণ ভদ্রলোকের করা উচিত। কিন্তু পরবর্তীকালে অধিকাংশ রাজ্য সরকার এতই ভীরু ও ভদ্রতাবোধরহিত পরন্তু ক্ষুদ্রমনা হলেন, যে আজ যদি কোন অফিসার বিপক্ষ দলের কোন লোককে সামান্য সৌজন্য দেখায়, তাহলে সরকারের হাতে তার নিগ্রহ হবেই। স্বাধীনোত্তর কালের একটি ভুক্ত-ভোগীর উদাহরণ দিই। ষাটের দশকে সি-পি-আই সি-পি-এম বিভেদের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক কম্যুনিস্টকে জেলে পোরেন। দিল্লীতে আমি খবর পেলুম, কলেজের বন্ধু স্নেহাংশু আচার্যকে জেলে পোরা হয়েছে এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা বেকার রোডের বাড়িতে আছেন। আভা তখন বাবার কাছে গ্রোভ লেনে আছে। সে-অবস্থায় স্নেহাংশুর স্ত্রী স্থপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সমর সেনের দাদা অমলদা তাকে বারণ করে বলেন, আভা যদি দেখা করে তাহলে আমি সরকারের কোপে পড়ব। সরকারের অসম মনোভাবের সম্বন্ধে বেসরকারী মহলে পর্যন্ত এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। আমি কাজ জোগাড় করে কলকাতায় এসে চীফ সেক্রেটারি রণু গুপ্তকে বলি স্নেহাংশু আচার্য আমার কলেজের বন্ধু, সে জেলে গেছে, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে আমি আর আমার স্ত্রী দেখে আসা কর্তব্য মনে করি, আমি শুধু তাঁকে জানিয়ে যাচ্ছি (আমি তাঁর অনুমতি চাইনি)। রণু গুপ্ত বললেন, নিশ্চয় যাবে। আমি যাবার পর, পুলিশের মারফৎ খবর পেয়ে রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর কাছে নালিশ হিসাবে একথা জানান। গৃহমন্ত্রী বা তাঁর সচিব অবশ্য এ বিষয়ে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করেননি। আমি তখন কেন্দ্রের গৃহমন্ত্রীর অধীনে ভারতীয় সেন্সাসে কাজ করি।

সে যাই হোক, মুন্সীগঞ্জে অগাস্ট আন্দোলন এইভাবে শেষ হওয়ায় মদন হুজা আর আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

জয়ন্তীর জন্ম

জয়ন্তী পেটে থাকার সময়ে ডাঃ নন্দী ও ডাঃ দাশ আভাকে মাসে মাসে নিয়মিত পরীক্ষা করতেন। অগাস্ট আন্দোলন বেশ কিছুদিন হল শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ। প্রসবের সাত সপ্তাহ বাকি আছে। আভার চোখের দৃষ্টি একটু মগ্ন, অন্তর্মুখী; ধীরে, হুঁসিয়ার হয়ে চলে ফিরে বেড়ায়, সে ঘর-কাঁপানো হাসিও কমে গেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর হঠাৎ বাবার একটি চিঠি পেলুম। তিনি কী এক স্বপ্ন দেখে

ব্যস্ত হয়ে আভার খোঁজ করে লিখেছেন, তিনি শীঘ্রই আসার জন্য রওনা হচ্ছেন। আভা সন্তানসম্ভবা একথা আমি বাবাকে জানাইনি, শুধু শুধু তাঁকে চিন্তিত করা হবে বলে, বিশেষত মুন্সীগঞ্জে আসা যখন অত হাঙ্গামার। বাবা মুন্সীগঞ্জে পৌঁছলেন ৪ অক্টোবর। তাঁকে জানাইনি বলে আমাকে ভৎর্সনা করলেন, বললেন তিনি আভাকে নিতে এসেছেন, কলকাতায় মেডিকাল কলেজের ইডেন হাসপাতালের ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ সরকারের হাতে প্রসব হবে বললেন। বাবাকে দেখেই মনে হল তাঁর মন খুব বিক্ষুব্ধ। আভাকে নিয়ে তিনি ৬ অক্টোবর কলকাতা রওনা হলেন।

পরের ডাকে বাবার একটি বড় চিঠি পেলুম। গিয়েই তিনি ইডেনের রেসিডেন্ট সার্জন ডাঃ আমেদ ও প্রধান সার্জন ডাঃ মণি সরকারকে দিয়ে আভাকে পরীক্ষা করান। তাঁরা বলেছেন শিশু পেটে আড়াআড়ি রয়েছে। তাঁরা আভাকে অজ্ঞান করে হাত দিয়ে জোর করে শিশুকে মায়ের পেটে ঘুরিয়ে মুখটি প্রসবদ্বারের দিকে করে দেবার চেষ্টা করবেন। যদি তাঁদের চেষ্টা সফল হয় তবে স্বাভাবিক প্রসব হবে। না হলে পেট কেটে সন্তান প্রসব করাতে হবে। তখনকার দিনে আজকালের মত যখন তখন সীজারিয়ান অস্ত্রোপচার হত না। ডাঃ নন্দীর নিজের প্রথম সন্তান হয় যমজ। শিশু পেটে আড়াআড়ি থাকায় উনি ভেবেছিলেন আভাও বোধহয় যমজ সন্তানের জন্ম দেবে। আড়াআড়ি থাকতে পারে এ সম্ভাবনা তাঁর মাথায় আসেনি।

আমি চার সপ্তাহের মত ছুটির দরখাস্ত করলুম। তখনই রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে পাল্টা হুমকি এল, মিত্র কেন এতদিন ছুটি নিয়ে সরকারকে বিব্রত করতে চায়, এক সপ্তাহ ক্যাজুয়াল ছুটি নিলে কি চলবে না? অগাস্ট আন্দোলনে আমি কেন গুলি চালাইনি, এই হুমকি কি তারই শাস্তি? আমি অগত্যা চারদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা গেলুম। বাবার কাছে শুনলুম, ডাঃ সরকার হাত দিয়ে শিশুকে পেটের ভিতর ঘুরিয়ে দিয়ে, পেট উপর থেকে ভাল করে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন, যাতে শিশু আবার না ঘুরে যায়। এখন তার অবস্থান স্বাভাবিক, অর্থাৎ যেমন হওয়া উচিত তাই আছে। বাবা যেভাবে সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, বলতে বলতে মাঝে মাঝে তাঁর গলা এমন কেঁপে যাচ্ছিল, বুঝতে পারলুম তিনি কত চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, এবং এখনও আছেন। আভা বলল, অজ্ঞান করে ডাক্তাররা উপর থেকে হাত দিয়ে শিশুর অবস্থান ঠিক করে দেবার পর তার যখন জ্ঞান হল, তখন চোখ মেলে দেখে বাবা তার মুখের দিকে ব্যাকুল

দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সারা মুখ ও শরীর ঘামে ভিজে, দেহে যেন তাঁর এককোঁটা শক্তি নেই। আমি ছুদিন থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ১৮ অক্টোবর স্টীমারে মুন্সীগঞ্জ পৌঁছলুম। আগের দিন রাতে পদ্মার বুকে মেদিনীপুর সাইক্লোনের লেজের ঝাপটা খেয়ে পদ্মা-মেঘনার সঙ্গমের কাছে, স্টীমারটি কয়েক ঘণ্টা মোচার খোলার মত দাপাদাপি করে ভেসেছে। অনেকদিন পরে শুনলুম ১৬ অক্টোবরের সাইক্লোনে দক্ষিণবঙ্গের কী সর্বনাশ হয়েছে।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে বাবার টেলিগ্রাম পেলুম আভার প্রসব আসন্ন। আগেরবার রাইটার্স বিল্ডিংসের রূঢ় ব্যবহারে আমার এত অপমানবোধ হয় যে এবারও ক্যাজুয়াল লীভ নিলুম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিউয়েলিন বললেন যদি প্রয়োজন হয় আরো কিছুদিন থেকে যেতে, পরে ক্যাজুয়াল লীভকে রীতিমত ছুটি করিয়ে নিলেই হবে। বাবাকে এতদিন সব একাহাতে করতে হয়েছে, আমি কোন কাজে লাগিনি মনে করে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এই বয়সে যখন সব কিছু মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তখন নিজেকে খুবই দোষী ও স্বার্থপর মনে হয়। অজ্ঞতা ও অল্পবয়স মানুষকে আসল সময়ে ও পরে বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

আমি কলকাতা পৌঁছই বুধবার ১৮ নভেম্বর সকালে। জয়তীর জন্ম হয় পরের দিন, বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর ১১টার সময়ে। বেলা বারোটার সময়ে যখন কেবিনে নিয়ে এল, দেখি শিশু বেশ বড় হয়েছে, ওজন সাড়ে আট পাউণ্ড। বিকেল-বেলা যখন শিশু আর প্রসূতিকে আবার দেখতে গেলুম তখন সমস্ত রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। সেদিন সকালে জয়তীর জন্মের অল্প পরেই কলকাতায় বোধহয় সেই প্রথম এয়ার-রেড সাইরেন বাজে। পরের দিন, শুক্রবার, বিকালে রাধারমণ মিত্র আমার সঙ্গে এলেন আভা ও শিশুকে দেখতে। সন্ধ্যাবেলা রাধারমণবাবু আর আমি প্রায় শূন্য দোতলাবাসের দোতলায় চড়ে জনহীন রাস্তা দিয়ে উত্তর কলকাতা ছুঁয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ২২ নভেম্বর কলকাতা থেকে ফিরে গেলুম। আমার সঙ্গে রাধারমণবাবুও মুন্সীগঞ্জে গেলেন।

ক্রিপ্‌স্ : টট্‌নাম রিপোর্ট

আগেই লিখেছি ১৯৪২-এর পর মার্চ মাসে যখন ক্রিপ্‌স্ দিল্লীতে এলেন তখন আমার মনে হয়েছিল, আদর্শবাদী, উচ্চমনা লোক পেয়ে, চার্চিল ও এমেরি তাঁকে

বোকা বানাবার জন্যে পাঠিয়েছেন। মুন্সীগঞ্জে সব খবর পাওয়া শক্ত হত। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে যা না ছাপা হত তার হদিশ আমি অনেক পরে পেতুম। সেই-সব খবর পাবার পর আমার মনে হয়েছিল প্রথমে যা ক্রিপ্‌স্‌কে লোকে ভেবে-ছিল তিনি তা নন। যখন এলেন তখন সকলে মনে করেছিল, খোলা মন নিয়ে এসেছেন, উপরন্তু নিজে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তিনি নিয়ে এসেছেন। পরে যে-সব তথ্য প্রকাশ পেল তাতে বেশ বোঝা গেল তিনি রওনা হবার আগে চার্চিল আর এমেরির হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করার জন্য রাজি হয়েই এসেছিলেন। আমার প্রথম সন্দেহ জাগে ২৮ মার্চ এবং তারপরে হায়দ্রাবাদ প্রতিনিধিদের তিনি যেভাবে আশ্বাস ভরসা দেন। এইসব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির কথা চার্চিল, এমেরি বা লিনলিথ্‌গো এর পূর্বে স্পষ্টভাবে কখনও বলেননি বা আভাস দেননি।

ভারতে আসার পর থেকেই ক্রিপ্‌স লোক বুঝে বুঝে একাধিকরকম কথা বা আশ্বাস দেন। তাতে স্পষ্ট ধারণা হল যে তিনি যতটা স্বাধীন ও আদর্শমনা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন বলে লোকের মনে হত, তা নয়, উল্টে তিনি যেন বৃটিশ যুদ্ধ ক্যাবিনেটের মুখপাত্র হয়েই এসেছেন। এদেশ থেকে ১২ এপ্রিল ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি এখানে যে-সব কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন তার সমর্থনে যখন বলা শুরু করলেন তখন তাঁর উক্তির মধ্যে অনেক কিছু পরস্পরবিরোধী অসংলগ্ন কথা প্রকাশ পেল। স্পষ্ট বোঝা গেল নতুন দিল্লীতে সে সময়ে যে-সব আমেরিকান সাংবাদিক কাজ করতেন তাঁদের কর্মপটুত্ব, নিষ্ঠা ও সবকিছু খুঁটিয়ে জানার ও বোঝার উদ্যম সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল না। ফলে, তিনি আমেরিকার উদ্দেশে যে-সব বেতার ভাষণ দেন, অথবা ভারতে যে-সব আলাপ আলোচনা তিনি চালান, সে-সব বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি আমেরিকায় যেভাবে উপস্থাপিত করেন, সেগুলি নিয়ে নতুনদিল্লীস্থিত আমেরিকান পত্র-পত্রিকার সংবাদদাতারা তৎক্ষণাৎ প্রতি-বাদ করে তাঁর উক্তির ভুলচুক ও অসঙ্গতি ধরিয়ে দিতেন। এইসব পত্রিকার মধ্যে প্রধান ছিল ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌, নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন, সাপ্তাহিক নেশন, চিকাগো টাইম্‌স্‌ এবং হার্স্ট সংবাদপত্র গোষ্ঠী।

আমর ধারণা ক্রিপ্‌স্‌ কল্পনাই করতে পারেননি যে তাঁর হের-ফের করা, অযথা বানানো উক্তি, অথবা অসঙ্গত ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি ওয়েণ্ডেল উইল্কির মত নেতার বিরোধিতা ও তিরস্কারের পাত্র হবেন। ওয়েণ্ডেল উইল্কি ক্ষিপ্ত হয়ে আমেরিকান সরকারকে এই ভাষায় ধিক্কার দেন :

"ভারতের স্বাধীনতা সমস্যা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিরবতার ফলে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে আমাদের প্রতি যে সদিচ্ছা ও অনুরাগ জমে উঠেছিল তার অধিকাংশই আমরা নষ্ট করেছি। যে অর্থে ফিলিপিনৃস্ আজ বৃটেনের সমস্যা, ঠিক সেই অর্থে ভারতও আজ আমাদের সমস্যা। এ পৃথিবীতে ভারতই আমাদের অস্তিত্বের অগ্নিপরীক্ষা-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে যদি অকৃতকার্য হই তাহলে সর্বত্রই আমাদের হার হবে।"

১৯৪২-এর ২৮ এপ্রিল হাউস অভ কমনৃসে তাঁর বক্তৃতায় গর্ডন ম্যাকডোনাল্ড যে তীব্র ও পরিহাসপূর্ণ ভাষায় ক্রিপ্‌স সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, তা আমি সেই বছর নভেম্বর মাসে প্রথম পড়ি। তাঁর ভাষণেই আমার বিশেষভাবে টনক নড়ে। তার আগে মার্চ মাসে ক্রিপ্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর গান্ধীজির উক্তিতে আমার মন সচকিত হয়। ক্রিপ্‌স মিশনের ভাঙন ও নিষ্ফলতা সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরুর বিবৃতিকে ম্যাকডোনাল্ড প্রামাণ্য বলে অভিহিত করে বলেন, ক্রিপ্‌স্ যা বলতে চান, নেহরুর উক্তি তা সম্পূর্ণ খণ্ডন করে এবং নেহরুর উক্তিতে এই নিষ্ফলতার জন্য কে দায়ী, তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ম্যাকডোনাল্ড বলতে বাধ্য হন :

'মিঃ গান্ধীকে বলা হয় তিনি একজন সাধুসন্ত, যিনি ওকালতি পেশায় মানুষ হয়েছেন। স্যর স্ট্যাফোর্ড সন্তগৃহে জন্মে আইনব্যবসায়ী হিসাবে মানুষ হন। আজ সকালে তিনি আইনব্যবসায়ীর কাজটি বেশ ভালভাবেই করেছেন। তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকে তিনি অবশ্য এক-আধটি সন্তসুলভ বাণী উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা একান্ত আইনব্যবসায়ীর মত। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে এর বেশী কিছু আমি প্রত্যাশা করিনি।

আমার মনে হয় পাঠক আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এইধরনের শ্লেষ মিছরির ছুরির মত—একদিকে যেমন অত্যন্ত শিষ্ট, সংযত অন্যদিকে তেমন শল্যচিকিৎসকের ছুরির মত অমোঘ—যা আমার মতে ক্রিপ্‌সের মুখোশ নির্মমভাবে কেটে খুলে দেয়।

সেক্রেটারি অভ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার উপর এই মন্তব্যটিও একটি রত্ন :

"আমি জানি বিশেষ একজাতীয় ব্যক্তিত্বের দোষে ভাল নীতিও কার্যকরী হয় না। আমি তাই ভাবছি। আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে সবথেকে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই ভারতে পাঠানো হয়েছিল এবং এই সত্যটিই সেক্রেটারি অভ স্টেটের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। যে ব্যক্তি ভারতবাসীর বিশ্বাস ভোগ

করেন না, এবং যাঁর কথায় একজন সেক্রেটারি অভ স্টেটের উপযুক্ত ওজন ও মূল্য থাকে না, সেই পদে তাঁর পক্ষে আর বেশীদিন থাকা সাজে না।"

আরেকজন এম-পি এস-ও ডেভিস তাঁর জিহ্বাও প্রায়ই সমান তীক্ষ্ণভাবে ব্যবহার করেন :

"লর্ড প্রিভি সীল (ক্রিপ্‌স্) ভারত ঝামেলা নিয়ে দেখছি খুব বেকায়দায় পড়ে গেছেন। যখন আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলুম তখন নৈতিক সততা ও সত্যের প্রতি, প্রকৃত ঘটনার প্রতি, তাঁর অনেক বেশী নিষ্ঠা ছিল।"

আমি প্রায়ই ভেবেছি কোন জাতের শ্লেষ বেশী শাণিত তরবারির মত—আইরিশ অথবা বৃটিশ পার্লামেন্টের? ধরুন, যেমন নিচের আইরিশ মন্তব্যটি। যদিও বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কম, তবুও আমি যা বলতে চাই, তা স্পষ্ট হবে। মন্তব্যটি আইরিশ ডেল-এর এক সভ্যের দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পর্কে :

এম-পি : মিঃ স্পীকার, আমি জানতে চাই কোন মন্ত্রীকে নর্দমার এক ধেড়ে ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করা কি উচিত হবে?

মিঃ স্পীকার : আমি একথা উচ্চারিত হতে শুনিনি।

এম-পি : আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মিঃ স্পীকার, যদিই আপনি শুনতেন, সেটি কি সঙ্গত মনে করতেন?

মিঃ স্পীকার : কখনই নয়।

এম-পি (অতি বিনীত ও আশ্বস্ত স্বরে) : আমার বিশেষ ধন্যবাদ, মিঃ স্পীকার, আপনার এই কথা শুনে ধেড়ে ইঁদুররা যথেষ্ট আশ্বস্ত বোধ করবে।

তেজবাহাদুর সপ্রু বাকসংযমের জন্য বিখ্যাত ও সর্বজনপূজ্য ছিলেন। তিনি বলেন :

"আমার ব্যক্তিগত বিচার ও জ্ঞান মতে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ সবকিছু গোলমাল করে একেবারে ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।"

তবে ১৯৪২-এর জুন মাসের 'প্যাসিফিক এফেয়ার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এই মন্তব্যটিতে, ক্রিপস্ কত যে মারাত্মকরকম উল্টোপাল্টা, হেরফের কথা বলেছিলেন, তার প্রমাণ পাই :

"নতুন ভারতীয় সংবিধানের সৃষ্টির পক্ষে যে-সব আগাম শর্ত বেঁধে দেয়া

হয়েছিল, সেগুলি যদি খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা যায় তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, সেইসব শর্তে দেশীয় রাজাদের ও সংখ্যালঘুদের ভূমিকা ১৯৩৫-এর আইনে যতখানি আছে তার থেকেও বেশী করে দেয়া হয়েছে। শুধু যে তাদের ওপর ভিত্তি করেই সংবিধান সৃষ্টির গোষ্ঠী তৈরি হবে তা নয়, তারাই হবে ভিন্ন ভিন্ন ডোমিনিয়নের প্রধান ভিত্তি, এমন-কি খোদ কেন্দ্রীয় ভারতীয় ইউনিয়নের থেকেও বেশী শক্তিশালী। ক্রিপস্ এই শর্তগুলি যখন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন তখন স্পষ্টই বলেন, যে-সব প্রদেশ ভারত ইউনিয়নে থাকতে রাজী হবেন না (এবং সেই সঙ্গে অতি অবশ্যই দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলি) তাঁরা নিজেদের সৈন্যসামন্ত রাখতে ও বাড়াতে পারবেন। তাঁর প্ল্যানের সমস্ত ঝোঁকই, স্পষ্টত, একটিমাত্র সংহত ভারতের জাতীয়তাবাদের সংকল্পকে একেবারে নস্যাৎ করছে।"

১৯৪২-এর মে মাসের প্রথমে এমন একটি ব্যাপার সহসা ঘটে যা ক্রিপস্ মিশনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকার হিসাবে দিগন্তে উদয় হয়। ২৭ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির যে বৈঠক চলে, তাতে ৩০শে রাজাগোপালাচারি তাঁর ইস্তফা পেশ করেন, এবং মৌলানা আজাদ সে ইস্তফা গ্রহণ করেন। সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ২৯ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত এলাহাবাদে বৈঠক করে। শেষের দিন, অর্থাৎ ২ মে, রাজাগোপালাচারি এক প্রস্তাব পেশ করেন। সে প্রস্তাবটি এখনও আমাকে বিচলিত ও বিস্মিত করে। সেই প্রস্তাবে তিনি মুসলিম লীগের বিচ্ছেদদাবী স্বীকার করে নেন। এ-আই-সি-সি এই প্রস্তাবটি ১৫ ভোট সপক্ষে ও ১২০ ভোট বিপক্ষে নাকচ করে। একই সঙ্গে জগৎনারায়ণ লাল পরিপন্থী একটি প্রস্তাব করেন, যে প্রস্তাবে তিনি ভারত ভাঙার প্রস্তাবের একান্ত বিরুদ্ধতা করেন। এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ৯২ ভোট সপক্ষে ও ১৭ ভোট বিপক্ষে পাস হয়।

যদি আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি, যার নাকি এসব বিবাদ বিপত্তিতে কোন ভূমিকা বা অংশই ছিল না, সেও গভীরভাবে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের জাতীয় নেতারা তখন কতখানি বিচলিত হয়েছিলেন এখন তাই ভাবি। ২২ মে লাহোরে নেহরু এ বিষয়ে এক বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে তিনি রাজাগোপালাচারির এই পদক্ষেপকে দেশের স্বার্থের একান্ত বিরোধী বলে বর্ণনা করেন। সেইসঙ্গে বলেন, 'আমার মনে হয় গত বাইশ বছরে বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করে কংগ্রেস যে অস্ত্র তৈরি ও শাণিত করেছে তা তিনি টুকরো টুকরো করে

ভেঙে ফেলছেন।' আমি শুধু কল্পনাই করতে পারি কি অশেষ দুঃখে ও দুশ্চিন্তায়, কেবলমাত্র আসন্ন সংগ্রামে সকলকে একত্র ও সংহত রাখার অভিপ্রায়ে গান্ধীজি এই কথাগুলি তাঁর 'হরিজন' পত্রিকার ৩১ মে সংখ্যায় লিখলেন : "এবিষয়ে সন্দেহ নেই রাজাজি এমন একটি মত চালু করেছেন যা তাঁকে তাঁর সকল সহকর্মী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যে অসাধারণ আগ্রহে তিনি এই বিবাদে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাতে তাঁকে পূর্ণ অভিনন্দন জানাতে হয়। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই আমাদের সম্ভ্রমভরে বিচার করা উচিত। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ।" যে আশঙ্কা আমার অস্থি-মজ্জায় তখন আমি বোধ করেছিলুম তার পুরো প্রকাশ হল যখন গান্ধীজি দেশবিভাগের বলি হলেন, এবং তার অল্প পরেই রাজাজি তাঁর নিজের প্রস্তাবের পুরস্কারস্বরূপ পেলেন স্বাধীন ভারতের একমাত্র গভর্নর জেনরল পদ। কয়েক বছর পরে যখন ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তিনি নিউইয়র্কে যান, তখন একজন আমেরিকান তাঁকে বিদ্রূপ করে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি জানেন আপনার নামে হলিউডে এক অতিবিখ্যাত স্টুডিও তৈরি হয়েছে? বিস্মিত হয়ে রাজাগোপালাচারি প্রশ্ন করেন, 'আমি তো বিন্দুমাত্র জানি না, সেটি কী স্টুডিও?' আমেরিকানটি বলেন, 'টোইন্‌টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স!'

১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সি-পি-আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি মীমাংসার আশায় এক আবেদন প্রকাশ করেন। ভাষার ব্যবহারে ত্রুটি ছিল না, তবে ঐ কয়মাসে আমার গান্ধীজির প্রতি আনুগত্য অটুট হওয়ায় আমি সে আবেদনে অযথা নিচু হয়ে দয়াভিক্ষার স্বর পেয়েছিলুম। এ বিষয়ে মুন্সীগঞ্জে স্থানীয় সি-পি-আই নেতা অনিল মুখার্জি বা সত্যেন সেনের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ তৃপ্তি পাইনি।

১৯৪৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের গৃহদপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারি রিচার্ড টট্‌নামের রিপোর্ট 'কংগ্রেস রেস্‌পন্‌সিবিলিটি ফর দি ডিস্টার্বান্সেস্' প্রকাশিত হয়। ঐ সালের ১৫ জুলাই গান্ধীজি-রচিত অতি বিস্তারিত প্রত্যুত্তরও প্রকাশিত হয়। গান্ধীজির উত্তরটি ১২০ পৃষ্ঠা ভর্তি খুব ঘন করে টাইপকরা ফুলস্ক্যাপ কাগজে মুদ্রিত হয়। তার সঙ্গে প্রকাশিত হয় গান্ধীজির ইতিপূর্বে ১৯৪৩-এর ২৭ মে রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলকে লেখা চিঠি। এই-সব দলিলগুলি আমার মনে গভীর বেদনার দাগ কাটে। প্রায় একই সময়ে আমি অগাস্ট আন্দোলন ব্যাপারে হার্বার্টের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত হই, মেদিনীপুর সাইক্লোন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, খাদ্যসঙ্কট বিষয়ে এবং

বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর নানারকম আপত্তিকর হেরফের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হই। এ সবই আমার মনে গভীর ক্ষত রেখে যায়। প্রতিষ্ঠান হিসাবে আই-সি-এসের স্থান আমার মনে ক্রমশই গৌণ হতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও হাণ্টার, ডিগ্‌বী, বেভারিজ, দত্ত, বীটসন বেল প্রভৃতি পূর্বসূরীদের এবং আমার জীবনে পেডি, মার্টিনদের কৃপায় ঐ তিনটি অক্ষর এখনও ব্যক্তিগত সততা, নির্ভীকতা, সংযম, কর্তব্যানুরাগ, দেশের বিষয়ে জ্ঞানাহরণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে আছে ও থাকবে, যার ফলে এই চাকরির প্রতি এখনও আমি নিজেকে ঋণী ভাবি, এবং যার প্রতি অনুরক্তির ফলে এখনও যে-কোন বিতর্কে বা আলোচনা সমাগমে আত্মবিশ্বাস ও আপন অভিজ্ঞতার প্রতি আস্থা রাখার শক্তি পাই।

এক ধরনের আনন্দের ফলে সেইসময়ের এতসব হাঙ্গামা পুষিয়ে যেত। জয়তী বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সব বিষয়ে তার ঔৎসুক্য দেখা দিচ্ছে। 'কোন তার মানে নেই সেই তার খোঁচা'র মত জয়তীকে আমরা প্রথমে ডাকতুম, ভুল্‌কি বুড়ি। পরে সেটি হল, 'ভুল্‌কি', তার থেকে বুগলু। এখনও সে বুগলু বা বুগু। জন্ম থেকেই বুকের দুধ পায়নি বললেই হয়। ডাঃ নন্দী খাঁটি গরুর দুধ কীভাবে ফুটিয়ে, তাকে বার বার দুটি লম্বা বীকারের মত পাত্রে উঁচু করে উপরনীচে ঢালাঢালি করে, খানিকক্ষণ পরে একটি গ্লাসে সবটি থিতোতে দিয়ে, উপর অর্ধেকে যেখানে মাখন জমেছে সেটি ঢেলে রেখে, বাকি পাতলা অর্ধেকে সমভাগ জল মিশিয়ে চিনি গুলে খেতে দিতে হয় তার নির্দেশ দিলেন। আর্নল্ড ম্যাকার্টিচ বুগুর জন্য একটি কালো গরু কিনিয়ে দিলেন। আমাদের মালী রহিম তার ভার নিল। ১৯৭৫ সালে আভা আর আমি যখন ঢাকায় গেলুম তখন রহিম তার বাগান থেকে এক বড় ঝুড়ি শাকসব্জি, প্রকাণ্ড এক কাঁদি অগ্নীশ্বর কলা, আর বড় এক থালা-ভর্তি পুরু পাতক্ষির নিয়ে এসে হাজির। রহিম বলল আমরা বুগুর গরুর যে বকনা বাছুরটি তাকে উপহার দিয়ে গেছলুম তারই অধস্তন অমুকতম পুরুষের গরুর দুধ থেকে পাতক্ষিরটি তৈরি করে এনেছে। ১৯৯০ সালে আবার যখন দুজনে ঢাকায় যাই তখনও রহিম ১৯৭৫ সালের প্রজন্মের অধস্তন প্রজন্মের বাছুরের দুধে এক বড় হাঁড়ি কাঁচাগোল্লা সন্দেশ করে নিয়ে আসে। গরু-পালা সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা বলি। জয়তীর গরুটি আসার কয়েকমাস পরে রহিম আভার কাছে এসে মুখ নিচু করে কাঁচুমাচু হয়ে বল্‌ল, গরুর গা গরম হয়েছে। বিরাট অভিজ্ঞ গৃহিণীর মত আভা দ্বিরুক্তি না করে তৎক্ষণাৎ বিধান দিল, 'তাহলে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।' রহিম থতমত খেয়ে তখনি চলে গেল। আভা আমাকে একথা বলায়

আমি রহিমকে ডেকে পাঠালুম। রহিম বল্ল কালীকে 'ষাড় (ষাঁড়) দেখাইতে হইব।' কালীর সেই সন্তান আমরা মুন্সীগঞ্জ ছাড়ার সময়ে রহিম উপহার পায়।

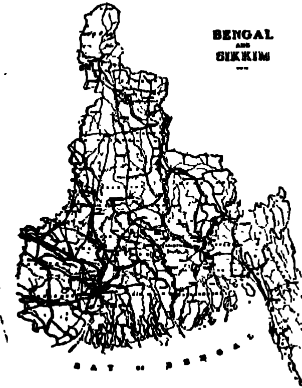
ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমার প্রথম কাজ ছিল, ডাঃ নন্দীর বিধানমতে জয়তীর দুধ তৈরি করে নিয়ে এসে বোতলটি জয়তীর ঘুমন্ত মুখে গুঁজে দেয়া। দুধ শেষ হলে, ন্যাপকিন বদলানোর পর সে যখন পুরো জেগে উঠত তখন তার সঙ্গে আমি পুরো আধঘণ্টা ধরে দুড়দাড় করে তার হাত পা ছোঁড়া খেলা খেলাতুম। বিশেষ কোন ছন্দে বা আধুনিক এরোবিক মতে অবশ্য নয়। তবে তার সবকিছুতেই একটি স্বর্গীয় প্রতিভার ভাব আছে বলে মনে হত, বাপেদের বোধহয় তাই হয়। এই সময়ে অধ্যাপক সত্যেন বসু ও সুশোভন সরকার মুন্সীগঞ্জে এসে একদিন করে থেকে যান।

১৯৪২ সালের এপ্রিলে 'যুগান্তর' কাগজের উপর প্রকাশের নিষেধাজ্ঞার কথা আগেই লিখেছি। ৯ অগাস্ট আন্দোলনের কোন সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে সরকার যে কঠোর ব্যবস্থা নিলেন, তার প্রত্যুত্তরে 'স্টেট্স্ম্যান' ছাড়া কলকাতার সমস্ত কাগজপত্র ২১ আগস্ট থেকে প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। আর্থার মুরের সম্পাদনায় 'স্টেট্স্ম্যান' প্রকাশিত হত। প্রকাশ করা নিশ্চয় কষ্টসাধ্য ছিল, তবে আর্থার মুর চালিয়ে যান, ওরই মধ্যে যেটুকু খবর প্রকাশ করা সম্ভব, তার আশায়। আকার ইঙ্গিতে এমনভাবে ভাষা ব্যবহার করতেন যাতে পাঠক আসল অবস্থা অনুমান করতে পারে।

অগাস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বৃত্তান্ত কিছুই প্রায় পাওয়া যায়নি। ফলে 'টট্নাম রিপোর্ট' যখন প্রকাশিত হল তখন সাধারণ পাঠকের পক্ষে জানার কোন উপায় ছিল না রিপোর্টে কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে-সব অভিযোগ ছিল তার কতখানি সত্যি, বা আদৌ সত্যি কিনা। কতখানি মিথ্যা প্রচার 'টট্নাম রিপোর্টে'র কল্যাণে হয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল তখনই যখন গান্ধীজি, রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল আর রিচার্ড টট্নামের পত্রালাপগুলি প্রকাশিত হল। সুতরাং হোয়াইট পেপার হিসাবে 'টট্নাম রিপোর্টে'র দাবি ধোপে টেকে না। অগাস্ট ১৯৪২ থেকে প্রায় পুরো একবছর আমি রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যেটুকু বেসরকারী খবর পেতুম তার প্রায় সবটুকুই পরিচিত কংগ্রেসকর্মীদের কাছ থেকে।

এমেরি ; লিনলিথগো ; হার্বার্ট

১৯৪৩-এর মন্বন্তর



ক্রিপ্‌স মিশনের পর সেক্রেটারি অভ স্টেট এমেরি, বড়লাট লিন্‌লিথগো, বাংলার লাট হার্বার্টের প্রতি আমার বিরূপতা বাড়ে। তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগও হয়। আমার কেমন ধারণা হয় তিনজনেই যেমন ধূর্ত, তেমন শঠ। ভারতের উপর এক হাত নিতে বদ্ধ-পরিকর। হার্বার্ট সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণা শুরু হয় উনি যখন কৃষ্ণনগরে ১৯৪১ সালে দু'এক-দিনের জন্যে সফরে আসেন, স্ত্রীকে সঙ্গে করে। হর্তাকর্তাবিধাতা ভাব। এ ধারণা আমার অকারণ বিরূপতা বলে মন থেকে দূর করার অনেক চেষ্টা করেছি। তবে, ১৯৪২-এর গোড়া থেকে যে-সব ঘটনা শুরু হল তাতে মনে হল হয়তো খুব ভুল করিনি। ১৯৮৮ সালে এমেরির ১৯২৯-৪৬ যুগের ব্যক্তিগত ডায়ারি প্রকাশিত হয়। সেটি পড়ে মনে হয়, ১৯৪০-এর অগাস্ট মাসে যখন আই-সি-এস চাকরির সনদ সই করতে আমি তাঁর কাছে যাই ইণ্ডিয়া অফিসে, তখন তাঁর চোখে যে সুদূর, শূন্যদৃষ্টি দেখেছিলুম তা হয়তো আমারই ভুল। তবে আমি মনে করি 'বার্ধক্যের প্রজ্ঞা'র আলোয় যে মতামত হয় তার থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মতামতের দাম অনেক বেশী। সেজন্যে আমি তখনকার মতামত অমান্য করতে পারি না।

১৯৪২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আমি মুন্সীগঞ্জে যাই, পরের দিন এস-ডি-ও হিসাবে মহকুমার ভার নিই। ১৯৪২-এর ২০ নভেম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। পরের বছর ২৯ মার্চ ফজলুল হকও মুখ্যমন্ত্রীপদ ত্যাগ করার পর কিছু কিছু ব্যাপার পরিষ্কার হল। তবুও, বাংলার আইনসভায় ১৯৪৩-এর ১২ ফেব্রুয়ারি শ্যামাপ্রসাদ ও পরে ২৯ মার্চ ফজলুল হক পরপর বিবৃতি না দেয়া পর্যন্ত সমস্ত পশ্চাদ্‌পটটি খুব স্পষ্ট হয়নি। ফজলুল হক এ বিষয়ে তাঁর শেষ বিবৃতি দিলেন ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই। তিনটি বিবৃতির উপর বিধানসভায়

যে-সব আলোচনা ও বিতর্ক হয় তার থেকে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর কীভাবে শুরু হল, কেমন করে ধাপে ধাপে তা তুঙ্গে উঠল, তার একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য ছবি মনে মনে তৈরি করতে আমার সুবিধা হয়। সেই সঙ্গে ভারত সাম্রাজ্যের নাইট গ্র্যাণ্ড কমাণ্ডার মান্যবর স্যর জন আর্থার হার্বার্টের কুটিলতা সম্বন্ধেও আমার ধারণা আর সন্দেহ দৃঢ় হয়।

এই ছোট পরিধির মধ্যে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের কীভাবে অঙ্কুর থেকে পরিণতি ঘটল, তার মোটা মোটা ঘটনাগুলির উল্লেখ ব্যতীত বেশী কিছু আর সম্ভব নয়। মন্বন্তরের সবথেকে নির্ভরযোগ্য কালক্রমিক তথ্য ও মন্তব্য, আমার মতে, মিলবে তখনকার কেন্দ্রের ও প্রদেশের বিধানসভা ও কাউন্সিলের বিতর্কাবলীর নথিপত্র থেকে। আর মিলবে বৃটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনগুলির নথি থেকে।

আমি প্রচলিত প্রথায় ইতিহাস লিখতে বসিনি। এটি মুখ্যত আত্মকথা। সে সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার তৎকালীন ধ্যানধারণা স্মৃতির থলি থেকে বার করে গেঁথে গেঁথে বলাই আমার উদ্দেশ্য, তবে সন তারিখ দেয়া ঘটনাবলী ও অন্যদের উক্তি থেকে একটি নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসও নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে। আমার নিজের বিশ্বাস, ক্রিপ্‌স্ মিশনের ব্যর্থতার পর, এশিয়াযুদ্ধের বৃহত্তর কূটনীতি ও সমর-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বৃটেন ভারত সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করে—তার প্রভাব মন্বন্তরের উৎপত্তি ও গতির উপর যথেষ্ট ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে, আমার মতে, মন্বন্তরের গতিপ্রগতি ও ফলাফল বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্য কারণা-বলীর হদিশ ঠিকভাবে মিলবে না, কালানুক্রমিকতার উপরে জোর না দিলে ঠিক বোঝা যাবে না, প্রবৃত্তিবশেই হোক বা ভেবেচিন্তেই হোক, সরকার এই ধরনের পথ কেন বেছে নিয়েছিলেন। একটা মূল কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। আঠারো ও উনিশ শতকে এবং পরে ১৯৬৬-৬৭তে যে বাইশ-তেইশবার করাল দুর্ভিক্ষ হয়, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে ছিল তাদের চরিত্রগত তফাৎ। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বৃটেনের এশিয়াযুদ্ধের বৃহত্তর নীতির তৈরি করা অঙ্গ ছিল বলে আমার যে ধারণা হয়, ও এখনও আছে, তার সমর্থনে আমার মনে একটি বড় আভ্যন্তরিক যুক্তি সদাই মনে জাগে। সেটি হচ্ছে, অন্যসব দুর্ভিক্ষের উপর যে-সব রয়াল কমিশন বসেছিল তার অধিকাংশ রিপোর্টেই দেখি দুর্ভিক্ষের প্রায় প্রতি স্তরে সরকারি মুখপাত্রদের সে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক, এমন-কি, পরস্পরবিরোধী মতামত, বিশেষত দুর্ভিক্ষ প্রশমন ও নিরাকরণ উদ্দেশে যে-সব নীতি সরকার নিয়েছিলেন, তাদের বিষয়ে। কিন্তু ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের বিতর্কগুলিতে দেখি চার্চিল থেকে

হার্বার্ট পর্যন্ত সকলেরই এক বয়ান, এক যুক্তি, বাংলায় যাকে বলে 'সব শেয়ালের এক রা'। সর্বস্তরে এত মতৈক্য আগে কখনও ঘটেনি।

কালক্রমিকতার উপর জোর দিয়ে আমি ঘটনাগুলি একের পর এক যেভাবে গেঁথেছি, তা ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের উপর যাঁরা লিখেছেন তাঁদের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। অবশ্য পাঠক লক্ষ্য করবেন, যুদ্ধের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সঙ্গতি খোঁজার চেষ্টায়, আমি মাঝে মাঝে আগে পিছে ঘটনারও উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ লেখক দুর্ভিক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশের উপর নিজের মতের মর্জিমত একান্তভাবে জোর দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মুখার্জি বা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মত পণ্ডিতপ্রবররা মন্বন্তরের অব্যবহিত পরে লিখেছিলেন বলে হয়তো যথেষ্ট তথ্যসংগ্রহ বা গবেষণার সুযোগ পাননি, বিশেষত অধিকাংশ তথ্যই যখন প্রকাশিত হয়নি অথবা সরকার থেকে চেপে রাখা হয়েছিল। অমর্ত্যকুমার সেন প্রায় চার দশক পরে লিখলেন; সেই হিসাবে তাঁর বইয়ে আরো তথ্যসমৃদ্ধি দেখলে আমি উপকৃত হতুম।

দুর্ভিক্ষের অগ্রগতির সময়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় অত যে স্ত্রী ও শিশু মারা গেল তার মুখ্য কারণ পরিবারের পুরুষদের তুলনায় তাঁরা যে কম পুষ্টি পেতেন তা নয়। তার কারণ ১৯৪২ সালের ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণা জেলায় যে ভয়ঙ্কর সাইক্লোন হয় তাতে একরাত্রির প্রথম দুঘণ্টার মধ্যেই প্রায় লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়, তার অধিকাংশই পুরুষ। মৃত পুরুষদের পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুরাই আশ্রয় ও খাদ্যের অভাবে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। দিনের পর দিন অনাহারে রোদে জলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভিক্ষার আশায় ঘুরলে সেই দুঃসহ শ্রমে মৃত্যুর হার দ্রুত বাড়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি কলকাতায় আমাদের পাড়ায় যে-সব নারী শিশু কোলে নিয়ে ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে দরজায় দরজায় ঘুরতেন, তাঁদের প্রায় সকলেই মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার লোক। খাদ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ, খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন, পুরুষচালিত সমাজে দৈনিক আহারের পরিমাণে ও গুণে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বেশীরকম অসাম্য ও তার ফলে নারী ও শিশুমৃত্যুহারের আধিক্য, এগুলি সবই সেইসব দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে খাটে যেখানে দু'তিন বছর উপর্যুপরি অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দুর্ভিক্ষ ক্রমে ক্রমে আসে। এসব কারণের বিশেষ গুরুত্ব থাকে যখন মানুষ ও সরকার দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়, প্রতিরোধের সাধ্যমত ব্যবস্থা করে। কিন্তু ১৯৪৩ সালে যখন মাত্র তিন মাসেই চালের মণ দশ টাকা থেকে লাফ দিয়ে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট টাকায় উঠল, এবং চাল সরবরাহ সম্বন্ধে সরকার

তৎপর না হয়ে একান্ত উদাসীন রইলেন তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুর্ভিক্ষের পুঁথিগত আর্থিক, সমাজতাত্ত্বিক, পরিবারভিত্তিক কারণের কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

ডিনায়াল ও অপসারণ

আমার নিজের ধারণা হয়, ১৯৪১ সালের ২৭ জানুয়ারি নেতাজীর অন্তর্ধানকে হার্বার্ট নিজের গালে একটি প্রচণ্ড থাপ্পড় হিসাবে নিয়েছিলেন। সরকারের সুচতুর গোয়েন্দা বিভাগের এরকম পরাজয় লিন্‌লিথগো এমন-কি হোয়াইট হলেরও নিশ্চয় অসহ্য লেগেছিল। আমার ধারণা এরপর নতুন কোন অঘটন যাতে না ঘটে, উপরন্তু যা ঘটেছে তার উপযুক্ত শাস্তির জন্যে, বৃটিশ সরকার বদ্ধপরিকর হলেন। নেতাজী শুধু যে অন্তর্ধান করলেন তা নয়, তিনি নাৎসীদের এবং পরে জাপানীদের কাছে যে সাহায্য পেলেন তাতে তাঁরা আক্রোশে ক্ষিপ্ত হলেন। এরপর, গান্ধীজি, নেহরু, অন্য নেতারা যখনই বলেছেন তাঁরা নেতাজীর সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চান না, তাঁকে অস্বীকার করেন, এমন-কি নেতাজীর আই-এন-এ সংগঠন ও ভারতের জনগণের উদ্দেশে তাঁর বেতারবাণীর তাঁরা বিরুদ্ধতা করেন, তখনই বৃটিশ সরকার সে-সব ঘোষণার প্রতি অবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। বৃটিশ সরকারের এই মনোভাব বোঝা অবশ্য শক্ত নয়। সকলেই যেমন মনে করে শত্রুর শত্রু তার মিত্র, বৃটিশ সরকারও নিশ্চয় আমাদের নেতাদের সম্বন্ধে তাই ভাবতেন। ভারতে তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপ এত কালিমালিপ্ত ছিল, এবং সে বিষয়ে বৃটিশ সরকারের নিজেরই এত অপরাধবোধ ছিল, যে বৃটিশরা ভাবতেই পারত না ভারতীয়রা তাদের শত্রুদের নিজেদের শত্রু বলে ঘৃণা করবে। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের দম্ভবশে বৃটেনের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল যে জনযুদ্ধের সময় এলে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিরোধে যোগ দেবে। ১৯৪০ সালে লণ্ডন ব্লিৎসের পর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বৃটেনের সকলে প্রতিরোধের জন্যে যেভাবে বদ্ধ-পরিকর হল তার দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও বৃটেনের পক্ষে মেনে নেয়া শক্ত হল যে ভারতেও সে ধরনের সংকল্প সম্ভব হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের মনস্তত্ত্বানুসারে তাঁরা পেশাদারী মাইনে করা সেনাবাহিনীর উপরেই বেশী আস্থাশীল থাকলেন। যুদ্ধের চরম সঙ্কট অবস্থাতেও বৃটেনের কাছে ভারতবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্যের কোন মূল্যই ছিল না, যদিও আমেরিকা ও চীন বিশ্বাস করত যে তাদের যুদ্ধে ভারতবাসীর

সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য। সে বিষয়ে বৃটেনকে তারা বোঝাতে কসুর করেনি। এমন-কি যে সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন নাৎসী আক্রমণে একান্ত বিপর্যস্ত, সে দেশও ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন তা ব্যক্ত করার জন্যে লিটভিনফ্‌কে—যিনি রাজদূত হিসাবে আমেরিকায় গেলেন—ভারত হয়ে আমেরিকায় পাঠালেন। বৃটেনের কাছে এবিষয়ে চীনের আবেদনের অর্থ না হয় বোঝা যায়, তার কারণ যুদ্ধার্থে চীনের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ তখন ভারতের মধ্যে দিয়েই হচ্ছিল। কিন্তু ভারতের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন কিছু সরবরাহের প্রয়োজন তো হয়নি!

১৯৪১ সালের ১০ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর বন্দরে দুটি শ্রেষ্ঠ বৃটিশ রণতরীর উপর জাপানী কামিকাজে বোমারু আক্রমণের পর ১৯৪২-এর ১৯ জানুয়ারি জাপানীরা বর্মাদেশ আক্রমণ করে। বাংলার তৎকালীন দুরবস্থা সত্ত্বেও এই প্রদেশে যে ধরনের বেধড়ক দমননীতি চলে, তাতেই হার্বার্টের প্রতিহিংসাবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। সে নীতিতে লিন্‌লিথগো ও এমেরিরও নিশ্চয় সায় ছিল। হার্বার্ট এমন সব কাজে প্রবৃত্ত হলেন যা একমাত্র ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য লোকের পক্ষেই সম্ভব।

সে যাই হোক, এখন কালক্রমিক বিবরণ লিখি।

নেতাজীর অন্তর্ধানের আগেই, ১৯৪০ সালে ভারতীয় নেতারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে প্রস্তাব দিলেন, সরকার যদি বিলেতের মত হোমগার্ড সৃষ্টি করেন, তাঁরা পূর্ণ মদত দেবেন। সে প্রস্তাব সরকার অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। ছেঁদো অজুহাত দিলেন, গ্রামের চৌকিদারদের আর স্থানীয় পুলিশদের উপযুক্ত শিক্ষক সরকারের হাতে নেই। যেন ডানকার্কের পর ইংল্যাণ্ডে রাতারাতি সারা দেশময় যে হোমগার্ড গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল তাদের সকলকে বিশদভাবে রপ্ত করা হয়েছিল। দেশের লোককে সরকার যে আত্মরক্ষায় শিক্ষা দিতে চাননি এ সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না। তবে, পরে ১৯৪১ সালে নেতাজীর অন্তর্ধান ও সেই বছরের শেষে জাপানীদের বর্মা আক্রমণের পরে হার্বার্ট ও লিন্‌লিথগো সরকার যে নীতি মনপ্রাণ দিয়ে অনুসরণ করলেন তাকে নিতান্ত প্রতিহিংসামূলক, উপরন্তু একান্ত নঞর্থক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বাংলা সরকার কথাটি ব্যবহার না করে হার্বার্ট নামটি ব্যবহার করছি তার কারণ আছে: ১৯৩৭-এর আইনানুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে আসীন মন্ত্রিসভা তখন চালু ছিল, কিন্তু এ নীতি ছিল হার্বার্টের নিতান্ত নিজস্ব, মন্ত্রিসভার কোন সম্পর্ক ছিল না। হার্বার্ট সিদ্ধান্ত নিলেন রাশিয়ানদের পোড়ামাটি নীতি তিনি বাংলায়

চালু করবেন। এই নীতি নিলেন এমন সময়ে যখন সামান্যতম বুদ্ধি ধরে এমন লোকও জানত যে জাপানীদের তখন একান্ত উদ্দেশ্য ছিল বর্মা দখল করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিত্রশক্তিদের ব্যবহৃত চীনে সরবরাহ পাঠাবার রাস্তাটি যথা-সত্বর বন্ধ করে দেয়া। তারপর তারা ধীরে-সুস্থে ঠিক করত ভারতে পূর্ব সীমানার ঠিক কোন বিন্দুতে আক্রমণ করে সেটি বিধ্বস্ত করে কোন কোন জায়গা থেকে তারা ভারতের দিকে এগোবে। স্পষ্টই বোঝা গেল বর্মা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আক্রমণের জন্যে তারা মোটেই ব্যস্ত নয়। তা যদি হত তাহলে সিঙ্গাপুরের মত, প্রথমেই তারা বাংলার বন্দরগুলি ও তৎসংলগ্ন শহরগুলিতে আকাশপথে আক্রমণ শুরু করত।

রাশিয়াতে নাৎসী অগ্রসরের বিরুদ্ধে যে পোড়ামাটি নীতি অনুসৃত হয়েছিল তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল স্থানীয় অতিসাধারণ অধিবাসীরা যারা মেরে মরবো এই পণ করে নিজের হাতে তাদের সমস্তকিছু নির্মূলভাবে নষ্ট করে পিছু হঠতে শুরু করে, যাতে কোন কিছু উপকারে লাগার মত সামগ্রী নাৎসীদের হাতে না পড়ে। রাশিয়ানদের এই আত্মদানের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে হার্বার্ট বিশুদ্ধ ধ্বংসলীলায় মেতে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্যই হল শত্রুর বিরুদ্ধে দেশ-বাসীর প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি দুইই নষ্ট করা। এর ফল হল রক্ষাকর্তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি। এই ক্ষোভ সবথেকে ফেটে পড়ল মেদিনীপুরে, ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনে, যেখানে হার্বার্টের দুটি অস্ত্রই—ধ্বংসাশ্রয়ী পোড়া-মাটি আর দেশবাসীর অপসারণ—সবথেকে ভয়াবহভাবে সম্পন্ন করা হল। তার ভৌগোলিক কারণ আছে। চব্বিশ-পরগণা জেলা ও পূর্ববঙ্গের সবগুলি সমতট জেলা এত অজস্র দ্বীপ ও খালবিলে ভরা যে সেগুলিতে ধানচাল ও অন্য সম্পত্তি লুকিয়ে রাখা এবং প্রাণ নিয়ে পালানো তবু কিছুটা সম্ভব। কিন্তু মেদিনীপুর সে তুলনায় তিনদিকে শুকনো ডাঙা জমি দিয়ে ঘেরা, তার থেকে পালিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগরে ডুবে মরা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার দিয়ে ঢোল ঢ্যাটরা পিটিয়ে ডিনায়াল বা পোড়ামাটি আর অপসারণ বা ইভ্যাকুয়েশন, এই জোড়া নীতি ঘোষণা করে এমন নৃশংসভাবে ও সম্পূর্ণভাবে পালন করা হল, অথচ সংশ্লিষ্ট অত্যাচারের বিন্দুমাত্র খবরও যাতে প্রকাশ না হয় তা এমন নিশ্ছিদ্রভাবে পালিত হল যে না সংবাদপত্রে না সরকারি মহাফেজখানায় সে বিষয়ে কোন খবর তখন তো প্রকাশ হয়ইনি,

আজও কিছুমাত্র পাওয়া যায় না।* এমন-কি ঠিক কবে এই দুই নীতির কাজ শুরু হল এবং কবে শেষ হল তার সঠিক তারিখগুলি জানারও উপায় নেই। মেদিনীপুর বা আশেপাশের জেলাগুলির কথা বলতে পারি না, কিন্তু ডিনায়াল নীতির ফলে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলির যে অবস্থা হল তার ফলাফল আমি ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় স্বচক্ষে দেখলুম। সারা বিক্রমপুরে তখন অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটি ধানচালের বড় বড় গঞ্জ ছিল। তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে বাঁধা ছিল একাধিক সাপ্তাহিক হাট যেখানে ধানচালের কেনা-বেচাই হত বেশী। মুন্সীগঞ্জে যখন প্রথম যাই তখন শুনি ১৯৪১ সালে শীত-কালেও বিক্রমপুরের গঞ্জে গঞ্জে কমপক্ষে দশ হাজার থেকে একলক্ষ বস্তা চাল সর্বদা মজুত থাকত। মিরকাদিম, তালতলা, তারপাশা ও লৌহজঙ্গ ছিল পূর্ব-বঙ্গের ধানচাল ব্যবসার প্রধান ঘাঁটি। সেইদেশে আমি যখন ৫ ফেব্রুয়ারি কাজে যোগ দিয়ে কিছুদিন পরে মহকুমার গঞ্জে গঞ্জে ঘুরলুম তখন তন্নতন্ন করে খোঁজা সত্ত্বেও আমি কোন আড়তে বড়জোর একশ' দু'শ' বস্তার বেশী চাল দেখিনি।

ডিনায়াল নীতির আবার দুটি অঙ্গ ছিল। যেখানে যেখানে ধানচাল থাকা সম্ভব—গঞ্জ বা আড়ত, বড় মাঝারি চাষীর গোলা বা বড় পরিবারের খাবার চালের মরাই হোক—গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি পুলিশ হানা দিয়ে যথাসম্ভব ধ্বংস করে দেয়া বা বলক্রমে চাল সরকারি দালালের হাতে চালান দেয়া। এই বিনাশ সব থেকে বেশী হয় মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলায়। যদি কেউ নষ্ট করার কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করত, তাকে সামান্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকাও দেয়া হত না। যে চাল নষ্ট করা হত বা সরকারের গুদামে চালান করা হত তার কোন হিসাব কোন সময়েই পাওয়া যায়নি, সরকারও দেননি। এই ধরনের ধরা চালের অনেকাংশ ১৯৪৪-এর জুন-জুলাই মাস থেকে ক্রমশ রেশনে ছাড়া হয়। নিতান্ত অযত্নে রাখা চাল অজস্র

*'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ১৯৯২, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় এই অংশটি ছাপা হবার পর জুন সংখ্যায় শ্রীতাপস সিংহরায় এই উক্তি অংশত ভুল দেখিয়ে আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছেন। ১৯৫২ সালে আমি যখন মহাফেজখানায় অনুসন্ধান করি, তখনও দেশবিভাগের ফলে মহাফেজখানা সুগ্রথিত হয়নি। সংশোধন হিসাবে তৎকালীন যে গোপন পাক্ষিক রিপোর্টগুলির কথা লিখেছেন, সেগুলি অবশ্য এস-ডি-ও হিসাবে আমি মুন্সীগঞ্জে পেতুম। তাতে ডিনায়াল নীতি যে নৃশংসভাবে পালিত হয় তার বিশদ উল্লেখ থাকত না। সাইকেল ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে শ্রীসিংহরায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দেয়া উল্লেখ করেছেন কিন্তু কার্যত তার কোন ফল ফলেনি একথা শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগী বারবার কেন্দ্রসভায় বলেন।

কাঁকড় ও ময়লায় ভর্তি হত, তার উপর ভাল করে রক্ষা না করায় জলে, গুমোটে পচে তাতে গোবরের পচা গন্ধ বেরতো। যাঁরা ১৯৪৪-এর রেশনের চাল খেয়ে এখনও বেঁচে আছেন তাঁরা আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। প্রতিবছর, বোরো, আউশ, আমন এই তিন ফসল সত্ত্বেও ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বাংলায় মোট চাহিদার তুলনায় ধানের ফলন অনেক কম হত। যা ঘাটতি হত বর্মা থেকে আমদানি করে সেটি পূরণ হত। মুন্সীগঞ্জে বর্মা চালের নাম ছিল পেগু। দক্ষিণ-বঙ্গ থেকে মুন্সীগঞ্জে যে চাল আমদানি হত, যে ধরনের নৌকায় আসত তার নামে নাম ছিল বালাম। পেগু চালের আমদানি ১৯৪২-এর এপ্রিল-মে মাস থেকে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

ডিনায়াল নীতির আরেকটি অঙ্গ ছিল মেদিনীপুর বা ২৪-পরগণায় যে-সব গরুরগাড়ি ছিল আর পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ জেলাগুলি, যেখানে নৌকার চলন ছিল, সেইসব গরুরগাড়ি ও নৌকা যথাসম্ভব ধ্বংস করা। সেই বিনাশের জন্যে হয় অতি নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়া হত, না হয় আদৌ হত না। ফলে কোটি কোটি টাকার গরুরগাড়ি ও নৌকা সারা দক্ষিণবঙ্গময় ধ্বংস করে ধানচাল বা অন্যমাল কাঁচারাস্তায় বা নদীপথে আনা-নেয়া একেবারে বন্ধ করা হয়। মধ্য ও উত্তরবঙ্গে ধানচালের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৪২ সালে মার্চ মাস থেকে আমি যতদিন মুন্সীগঞ্জে ছিলুম তখন মেঘনা-পদ্মার বুকে বড় বালাম-নৌকা খুব কমই দেখেছি। বালামনৌকা যখন পুরো বোঝা নিয়ে দক্ষিণের হাওয়ায় সব পাল তুলে পদ্মার বুক বেয়ে ঢাকার দিকে আসত তখন একেকটিকে মনে হত যেন সম্রাজ্ঞী পূর্ণ গৌরবে ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে। মনে পড়ত জন মেসফীল্ডের কবিতার কথা।

যে যাই বলুন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস থেকেই যাবে যে এই দুমুখো ডিনায়াল নীতিই বিক্রমপুরের ভয়াবহ সর্বনাশের জন্যে মুখ্যত দায়ী। ডিনায়াল নীতির অনুসারে একদিকে ধানচাল যথাসম্ভব নষ্ট বা অপসারণ করা, অন্যদিকে মাল-বহনের উপযোগী গরুরগাড়ি ও যাবতীয় নৌকা ধ্বংস করার ফলে মুন্সীগঞ্জে চাল আমদানি মোটামুটি বন্ধ হয়ে যায়, যৎসামান্য যা আসত সবই লুকিয়ে-চুরিয়ে। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৪৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত আমি নিজে অথবা বিশ্বস্ত ছাত্রকর্মী বা শিক্ষকের সাহায্যে প্রতিটি গঞ্জের খবর রাখতুম। খুব কম ধানচালেরই খোঁজ পাওয়া যায়। সুতরাং মহাজনরা চাল লুকিয়ে রেখে কালোবাজার সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ এনেছে বলে যে রাজনৈতিক জিগির উঠেছিল,

অন্তত মুন্সীগঞ্জের পক্ষে তা খাটেনি। কংগ্রেসের পক্ষে ডিনায়াল নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সম্ভব হয়নি কারণ অধিকাংশ নেতাই ছিলেন জেলে। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি হয়তো এ প্রশ্ন তুলতে পারতেন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ মূলত যে মানুষের হাতের তৈরি, মুখ্যত সরকারের তৈরি, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না। সরকারের পক্ষ নিয়ে কেউ যদি বলতে চান, বড়জোর বলতে পারেন, জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় ভীতত্রস্ত হয়ে সরকার এই সম্পূর্ণ অ-প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নেন। কিন্তু আসলে এটুকু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট হত যে এই নীতির মূলে ছিল প্রতিহিংসা প্রণোদিত শাস্তিদান যা পুরোদস্তুর নারকীয় তৎপরতায় সম্পন্ন করা হয়।

মুন্সীগঞ্জে অত বেশী মৃত্যুর দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমটি হল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ বাংলা জেলাগুলি থেকে চাল আমদানি হঠাৎ ভীষণভাবে কমে ১৯৪৩-এর প্রথম তিন মাসে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় কারণ হল ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে যে চালের দাম ছিল মণ পিছু তিন-চার টাকা, ডিসেম্বর ১৯৪২-এ তা হল ষোল টাকা, ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে হল নব্বই থেকে একশ' টাকা। সে দামও বাড়তির মুখে রইল যতদিন না ওয়েভেলের চাল একটু বেশী করে আসতে শুরু করল। তফাৎ হল এই ১৯৪২ ফেব্রুয়ারিতে যে চাল ছিল পরিষ্কার ও কাঁকড়বিহীন বালাম চাল, ১৯৪৩-এর অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে সেটি হল ধুলো, কাঁকড়ে-ভরা পাঁচমিশেলি চাল, বালাম নয়।

এই দুটি কারণের ফলে পাঠ্যপুস্তকে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসম্বন্ধে পুঁথিগত অর্থনীতির যে-সব ব্যাখ্যা আমরা সচরাচর পড়ি—যেমন ক্রয়শক্তি, কেনাবেচার গতিবিধি, একই পরিবারের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী, শিশুর লিঙ্গ ও বয়সভেদে আহারের ও পুষ্টির মাত্রায় বৈষম্য, পরিবার-পিছু পুষ্টিমানানুসারে খাদ্যের বরাদ্দ, এই ধরনের গালভরা সংজ্ঞা বা মান ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে কোথায় তলিয়ে গেল। সরকার থেকে সারা বছরের চাহিদার শতকরা চল্লিশভাগও যদি সরবরাহ করা হত তাহলে এইসব মান কতখানি কার্যকরী ছিল তার আলোচনার মানে হত। বিক্রমপুরে জনহিতৈষিতার যে ঐতিহ্য ছিল, সমগ্র চাহিদার শতকরা চল্লিশভাগ সরবরাহ থাকলেও দুর্ভিক্ষ অত ভয়ঙ্কর রূপ নিত না। মুন্সীগঞ্জের ফল, শাকসব্জি, জলে-স্থলে উৎপন্ন শাকপাতাড়ি দিয়ে চালের ঘাটতি কোনওরকমে কিছু মিটিয়ে সমবণ্টনের সাহায্যে মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেত। একথা জোর করে বলছি তার যথেষ্ট কারণ আছে। দুঃস্থদের পরিবারে কাঁচা ধানচাল বিলি এবং লঙ্গরখানায় যে খিচুড়ি

সঙ্গে রান্নাকরা খাবার সমভাবে বাঁটা হত তাতে যে যত্ন, সততা, বিবেচনা, দক্ষতা ও মানবিকতা প্রকাশ পেত তা আমি এখনও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

এই গেল হার্বার্টের প্রথম নীতি। হার্বার্টের দ্বিতীয় নীতি, বলপূর্বক অপসারণ, সম্বন্ধে দু'এক কথা না বললেই নয়। ১৯৪২-এর ১৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় বিধান-সভায় ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বাংলা সরকারের অপসারণনীতি যে ভাবে কার্যকরী করা হচ্ছিল তার বিশেষ নিন্দা করেন। খাদ্য, ওষুধপত্র, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, অতি সাধারণ নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের অভাবের কথা বলার পর তিনি এই সমস্যার উল্লেখ করেন। "এর উপর গোদের উপর বিষফোড়ার মত এল হাজার হাজার দরিদ্র নিরক্ষর গ্রামবাসীকে বলপূর্বক অপসারণ।" এই ধরনের কয়েকটি অপসারণের উল্লেখ করে তিনি বললেন, "১৯৪২-এর ৪ এপ্রিল নোয়াখালি জেলার একটি দুটি নয়, পঁয়ত্রিশটি গ্রাম ঘরিঘড়ি জনশূন্য করা হয়েছে।" বর্তমানকালে এগুলির সঙ্গে ইজরেলিদের দ্বারা প্যালেস্টিনিয়ানদের উৎখাত হানার তুলনা করা চলে। তিনি আরো বললেন :

"ক্ষতিপূরণ এতই নামমাত্র আর মাপকাঠিহীন, যে কোন সভ্য সরকারের পক্ষে এ ধরনের কাজ সম্ভব নয়। এ ধরনের কাজ তখনই সম্ভব যখন কোন সরকার ত্রাসভরে পালাবার ব্যবস্থা করছে। গ্রামবাসীদের গ্রাম থেকে খুলিবাঁশের দেয়াল বা ছাতশুদ্ধ তুলে নিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়নি।"

শুধু দরিদ্র বা নিরক্ষরদের উপরেই নয়, হার্বার্টের অত্যাচারের কোপ স্থানীয় নেতৃবর্গের উপরেও পড়ল। ১৯৪০ সালে গান্ধীজির আশীর্বাদ নিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নোয়াখালির ফেণীতে গ্রামোন্নতির কাজ শুরু করেন। ১৯৪২-এর ১৯ জুলাই সরকারের আদেশে তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জেলা ত্যাগ করতে বলা হয়। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন তিনি এ আদেশ পালনে অপারগ, তার কারণ তিনি অপসারিত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন উদ্দেশ্যে তথ্যসংগ্রহ করছেন। আরো জানালেন, তিনি রাজস্বমন্ত্রী প্রমথ-নাথ ব্যানার্জিকে জানিয়েছিলেন, যে বিহার সরকার এই ধরনের ক্ষেত্রে খালিকরা জমিতে একবছরে যে ফসল জন্মায় তার দামের শতকরা ১১৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে স্থলে ফেণীতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাত্র শতকরা ৫০ ভাগের। রাজস্বমন্ত্রী আর তাঁর সচিব বি-আর সেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আবেদনে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে তাঁদের অসামর্থ্যও জানিয়েছেন।

উত্তর হিসাবে সতীশবাবুকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নিয়োগী এই বলে শেষ করেন :

"আজ ক্ষমতার আসনে এমন একজন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী আসীন যিনি আজীবন ভারতের ঘোর শত্রু বলে বিদিত। আরেকটি পরম দুঃখের বিষয় এই যে ভারতের ভিতরেই সমস্ত ক্ষমতা আজ তাঁদের হাতে যাঁরা একান্ত গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল। এলাহাবাদ কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির বৈঠকের বহু আগে থেকেই সারা দেশময় জনসাধারণের মনে সরকার সম্বন্ধে যে ব্যাপক অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠছিল সে-বিষয়ে গৃহমন্ত্রী কর্ণপাতমাত্র করাও প্রয়োজন মনে করলেন না। ফলে সাধারণের মন যখন গভীরভাবে তিক্ত হয়ে উঠল, ঠিক তখনই বর্মা থেকে উদ্বাস্তরা অভূতপূর্ব সংখ্যায় দলে দলে এসে পৌঁছল। তাদের বিরুদ্ধে জাতিবৈষম্যগত দুর্ব্যবহার ও অবহেলার কাহিনীতে ভারতীয় উদ্বাস্তরা সারাদেশে সরকারের নিন্দায় মুখর হয়। সারা দেশময় ব্যাপক অসন্তোষের ফলে কংগ্রেস মরিয়া হয়ে যে সিদ্ধান্ত নেন তার শাস্তিস্বরূপ কংগ্রেস নেতাদের যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়, তার ফলে দেশে যেসব অবাঞ্ছনীয় ঘটনাবলী ঘটে তাদের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান অবস্থার বিচার করা উচিত।"

যেদিন নিয়োগী এই বক্তৃতা দেন সেদিনই, তাঁর আগে, ইওরোপীয় দলের নেতা পি-জে গ্রিফিথ্‌স্‌ (যিনি আই-সি-এস থেকে পদত্যাগ করেন), এবং তার আগের দিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দলের ফ্র্যাঙ্ক অ্যাণ্টনি ঠিক একই সুরে একই অভিযোগ করেন। 'বৃটিশদের সদিচ্ছা ও অন্তরের অভিপ্রায় বিষয়ে সারাদেশে জনসাধারণের মধ্যে যে অবিশ্বাস আজ বর্তমান', সে বিষয়ে বলেন গ্রিফিথ্‌স্‌। একই সঙ্গে তিনি অতি সাধারণ নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী—যথা খাদ্যশস্য বা কেরোসিন—যথেষ্ট পরিমাণে মজুত না রাখা সরকারের তরফে অমার্জনীয় অবহেলা বলে তিনি সরকারকে অভিযুক্ত করেন, বলেন, তারই ফলে কংগ্রেস বিরোধিতার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। বৃটেন সারাদেশের আত্মাভিমানের উপর কীভাবে পদাঘাত করেছেন, তার ফলে দেশে কী পরিমাণ নৈরাশ্য ও নঞর্থকভাব এসেছে অ্যাণ্টনি তার উল্লেখ করেন।

দুর্ভিক্ষের অপ্রতিহত গতি

মেদিনীপুর সাইক্লোনের ভয়াবহ ফলাফলের গুঞ্জন ওঠার আগে, এবং সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের ফলে, খাদ্য পরিস্থিতি কত খারাপ হল তার খুঁটিনাটি জানাজানি হবার আগে, দুর্ভিক্ষের যে দুর্বিপাক দ্রুত এগিয়ে আসছিল সে বিষয়ে ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে আমার কী মনে হয়েছিল সে বিষয়ে যত সম্ভব সংক্ষেপে পারি এখানে বলি। প্রথমত বলি, ১৯৩৯-এর অগাস্ট মাস থেকে ১৯৪২-এর জুন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাইকারি দামের সূচী ১০০ থেকে ১৮২ পয়েন্টে উঠে যায়। এই দুই সূচীর পার্থক্যের অর্ধেকের বেশী ওঠে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে। সারা দেশময় সকলের মোটামুটি একই ধারণা হয় যে এই বৃদ্ধির জন্যে মূলত দায়ী লিন্‌লিথগো'র ঔদাসীন্য ও বৈরীভাব। এই মনোভাবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ থাকে ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, আব্দুল হালিম গজনভী, পি-জে গ্রিফিথ্‌স্‌, ভারত সরকারের খাদ্য-সদস্য জে-পি শ্রীবাস্তবের মত বিভিন্ন জগতের ব্যক্তিদের প্রকাশ্য উক্তিতে। অন্যদিকে বাংলার খাদ্যমন্ত্রী আজিজুল হকই কেবল যেন রাজার থেকে বেশী রাজভক্তি দেখাতেন। তবে কি তিনি হার্বার্টের ভয়ে করতেন? এই মর্মন্তুদ সময়ে যতদিন বেঁচে ছিলেন হার্বার্ট তাঁর কাজে ও কথায় যে অবহেলা ও অনীহা দেখান তাকে একান্ত গর্হিত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। চাষী ও গ্রামের ছোট আড়তদারের হাতে খাদ্য-শস্যের গোপন মজুতের যে-সব গল্প তখন চালু ছিল সেগুলি যে কত অতিরঞ্জিত তা মুন্সীগঞ্জের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি। এর সমর্থন বাংলার ধানচাল বিষয়ক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টেও আমরা পাই। বাংলায় শতকরা আশি-জনের ক্রয়শক্তি এতই কম ছিল যে গোপন মজুতের অভিযোগ যদি সত্যি হত তাহলে ১৯৪৩-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে চালের দাম যখন পাঁচছয় গুণ বেড়ে গেল তখন লাভের লোভে নতুন চাল আসার আগে গোপন মজুত আপনিই বেরিয়ে আসত।

১৯৪২-এর অগাস্টের পর ১৯৪৩ সালে যতদিন পর্যন্ত লিন্‌লিথগো ছিলেন, তখন তাঁর প্রতাপ এত ছিল যে মুখের কথা খসাতে না খসাতে কাজ হত। কিন্তু না লিন্‌লিথগো, না হার্বার্ট, যে-সব প্রদেশে ফসল ভাল হয়েছিল তাদের কাছে শস্যদ্রব্যের জন্যে সামান্যমাত্র আবেদন জানাননি।

এসবের উপরে আবার প্রদেশ সরকারের তরফে মুনাফা করার প্রবৃত্তির প্রশ্নও ছিল। পাঞ্জাবের আঞ্চলিক খাদ্য কমিশনার কলিন গার্বেট হিসাব দিয়ে দেখিয়ে

দিলেন সিন্ধু ও পাঞ্জাব সরকার বাংলার দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কী ধরনের অন্যায্য মুনাফা আদায় করলেন এবং সেই দুষ্কৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকার কীরকম হাসিমুখে সায় দিলেন। ওদিকে পাঞ্জাবের রাজস্বমন্ত্রী ছোটুরাম বাংলা সরকারকে অন্যায্য লাভ করার জন্যে এইভাবে অভিযুক্ত করলেন :

কলকাতায় যখন পাঞ্জাবের গম পেঁছিয় তখন তার দর পড়ে মণ পিছু সাড়ে বারো টাকা। বাংলা সরকার সেই গম মিলকে বিক্রি করেন পনেরো টাকা দরে। মিলকে আটাভাঙানির জন্যে মণ পিছু চার টাকা দিয়ে ফের মণ পিছু উনিশ টাকা দরে আটা কিনে জনসাধারণকে বিক্রি করেন কুড়ি টাকা দরে।"

সাফাই হিসাবে বাংলা সরকার বলেন, তাঁরা আটা আর গম দূর দূর জেলায় নানাবিধ যানবাহনে পাঠানোর (মুন্সীগঞ্জে অবশ্য তার কণামাত্রও আসেনি) খরচ মেটাবার জন্যে একটি স্থিতিস্থাপকতা তহবিল খুলেছেন। বাংলা সরকার বললেন, 'এই ফাণ্ড সত্ত্বেও পাঞ্জাবের গম কেনার চুক্তিফলে বাংলা সরকারের মোট সাত লাখ টাকা লোকসান হয়েছে।' শুনে ছোটুরাম পুনরায় খাপ্পা হলেন।

বোঝার উপর শাকের আঁটি। বাংলায় সরবরাহ অবস্থা আরো খারাপ হল যখন ধান-চাল-গম চালানের ওয়াগনগুলি ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে যুদ্ধের মাল সরবরাহের জন্য নিয়মিতভাবে বিদেশে রপ্তানি করা শুরু হল। উপরন্তু ১৯৪২-এর ৮ অগাস্ট থেকে বাংলাপ্রদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের রেলসংযোগ এক-এক-খেপে অনেকদিন ধরে বিচ্ছিন্ন থাকত। অবশ্য রেলসংযোগ বিচ্ছিন্ন না হলেও বাংলার যে খুব সুরাহা হত তা বলা যায় না। হার্বার্ট আর তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারিরা তারও সুব্যবস্থা অনায়াসে করতে পারতেন। তার কারণ ১৯৪৩-এর শেষে আমার চিঠিপত্র পাঠানো সম্বন্ধে যখন একটা তদন্ত হল তখন দেখা গেল, ১৯৪২-এর ডিসেম্বর থেকে প্রতি সপ্তাহে ধানচাল চেয়ে অন্তত একটি করে যে টেলিগ্রাম আমি পাঠাতুম তার সবগুলি রাইটার্স বিল্ডিংসের দপ্তরে ধুলো চাপা পড়েছিল, একটিও মন্ত্রীকে দেখানো হয়নি।

সব দুর্বিপাকেরই একটা না একটা সুফল ফলে। ধানচালের ব্যবসায়ে সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের আগে থেকে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। সরকার থেকে এই দুর্যোগে অনেক মুসলমান ব্যাপারী ধানচাল সংগ্রহের ঠিকাদারি পেলেন, পরে খুচরো রেশনশপের দোকানদারিও পেলেন, এসব ক্ষেত্রে। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও কিছু কিছু গরীব ব্যাপারী উপরতলার মুসলমান ব্যাপারীর মাৎস্যন্যায়ের শিকার হলেন।

লিন্‌লিথগো আর হার্বার্ট সবথেকে বেশী অপরাধ করলেন আশু দুর্যোগের বহু তথ্য ও নিভৃতার্থ বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে গোপন করে অথবা তাদের যথার্থ গুরুত্ব না জানিয়ে।.এ-বিষয়ে এমেরিও যথেষ্ট দোষী ছিলেন মনে হয়, যদিও তাঁর ডায়ারিতে তিনি চার্চিলের ঘাড়ে দোষ চাপান। অবশ্য ১৯৪৩-এর জানুয়ারি মাসে পার্লামেণ্টে যে আলোচনা হল তাতে বোঝা গেল তাঁরা সবকিছু একেবারে চাপতে পারেননি। পার্লামেণ্টের যে-সব সভ্য ভারত-বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন তাঁরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ভারতীয়সূত্রে খবর রাখতেন। আমেরিকান, এমন-কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকেও ভারতের খবর এমেরি লুকিয়ে রাখতে পারেন-নি। মহাযুদ্ধের মানচিত্রে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটির দেশবাসীকে সন্তুষ্ট ও বন্ধুভাবাপন্ন রাখার জন্য আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরপথে খাদ্য-সরবরাহের নিশ্চয় আপ্রাণ চেষ্টা করত, বিশেষত তাদের দেশে যখন ভূরিভূরি গম মজুত ছিল। যে-সব আমেরিকান কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতারা ভারত থেকে সংবাদ পাঠাতেন তাঁরা অত্যন্ত উদ্বেগজনক সব সংবাদ পাঠাতেন ঠিকই; কিন্তু, এক সরকার থেকে অন্য সরকারের কাছে যে-সব সরকারি তথ্য বা সংবাদ যেত তাতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ থাকত নিতান্তই সামান্য।

সংবাদ চেপে রাখার ব্যাপারটি কতদূর গড়িয়েছিল বোঝা যায় একটি ব্যাপারে। লাহোরের 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' পত্রিকাটি বিখ্যাত হয় রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মহিমাকীর্তনমূলক কবিতাগুলি ছেপে। সে-পত্রিকাটিকে বৃটিশবিরোধী আখ্যা কেউ দিতে পারবে না। সেই পত্রিকাটি পর্যন্ত এই কথাগুলি লিখতে বাধ্য হয়:

"প্রকৃত কথা হচ্ছে, বাংলা সরকারের তথ্যবিভাগ প্রত্যহ কত মৃত্যু হয়েছে, কতজনকে অনাহারে মুমূর্ষু-অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তার যে হিসাব দেন, সে-হিসাব তারযোগে বিদেশী সংবাদদাতারা স্বদেশে পাঠাতে পারেন না। মন্বন্তরের কিছু-কিছু খবর পাঠাবার অনুমতি তাঁরা তখনই পান যখন মর্মন্তুদ হিসাবগুলির সঙ্গে সরকার কি কি-উপায়ে মন্বন্তর রোধ করার বিপুল প্রয়াস্ করছেন—যার প্রায় কোনটাই কাজের হিসাব নয়, শুধু সদিচ্ছার তালিকা—সেগুলিও তাঁদের তথ্যের সঙ্গে পাঠাতে রাজি হন। দুর্ভিক্ষের কেবল মিরাভরণ তথ্যাদি বিদেশী পত্রিকার প্রতিনিধিরা বৃটিশ বা আমেরিকান পাঠককে দিতে পারবেন না।"

১৯৪২-এর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে একজন আমেরিকান প্রতিনিধি তাঁর

কাগজে এই সংবাদ পাঠান : 'অগণিত ভারতীয়দের বেলায় অহরহ ক্ষুধা আর সত্যিকারের অনশনের মধ্যে সীমারেখাটি নিতান্তই সূক্ষ্ম। গত সপ্তাহে এই রেখাটি সূক্ষ্মতর হয়ে পড়ল।' রেখাটি কত সূক্ষ্ম হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪৩-এর অগাস্টে।

মেদিনীপুর : ডিনায়াল, সাইক্লোন ও দমননীতি

১৯৪৩-এর ১২ ফেব্রুয়ারি নিজের ইস্তফার উপর বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে বলেন, যে ফজলুল হক বারংবার দাবি করা সত্ত্বেও, হার্বার্ট কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৯৪২-এর ৯ অগাস্ট আন্দোলন-বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা করতে হবে, সে-বিষয়ে যে-সব নির্দেশ এসেছিল তা ফজলুল হককে আদৌ জানাননি। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃটিশ আই-সি-এস অফিসারই শুধু আন্দোলন কীভাবে দমন করতে হবে তার প্ল্যান ও নির্দেশ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, আর কেউ নয়। আন্দোলন যখন নিঃশেষ হয়ে গেল তারপরে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের খুঁটিনাটিগুলি মন্ত্রীদের জানানো হল। তার আগে নয়। তা সত্ত্বেও, মেদিনীপুর জেলায় কী উপায়ে দমননীতি কার্যকরী করা হয়, কী কী শাস্তির ব্যবস্থা হয়, সে-সম্বন্ধে সমস্ত কিছু তথ্য শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার নিকট থেকে গোপন রাখা হয়।

তিনদিন পরে, ১৫ ফেব্রুয়ারির বিতর্কে, তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় দমননীতি কী নৃশংসভাবে চালানো হয়, সে-বিষয়ে ভুরিভুরি রোমহর্ষক বিবরণ দেওয়া হল। মেদিনীপুরের অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা থেকে শুরু করে, বাড়ি-ঘরদোর ধ্বংস ও পোড়ানো, নারী-পুরুষনির্বিশেষে বেধড়ক মারধোর ও নির্যাতন, তার-সঙ্গে খুন ও নারীধর্ষণ কোনটাই বাদ যায়নি। ফজলুল হক তখনও মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সরকারের পক্ষ নিয়ে সাফাই গাইবার চেষ্টায় বললেন, তমলুক ও কাঁথিবাসীরা কী-ভাবে সে-দুটি মহকুমায় পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যেতে পারে, তাদের এই কাজ সরকারের সন্ত্রাস ও দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-হিসাবে হয়েছিল। পরক্ষণেই তিনি সভ্যদের বললেন, ১৯৪২-এর শুরুতে, অগাস্ট আন্দোলনের বহু আগে পোড়ামাটি বা ডিনায়াল নীতি যে ভয়ঙ্কর ও নৃশংসভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল তার কী জবাব-দিহি থাকতে পারে? আমার নিজের তখন ধারণা হয়, ত্রিশের দশকে মেদিনীপুরে যে-সব বিদ্রোহ হয়, ইংরেজ কর্মচারি হত্যা হয়, এবং সেই ক্ষতের উপর নিরাময়ের

প্রলেপ লাগানোর জন্যে বি-আর সেনকে পাঠাতে সরকার বাধ্য হন, সেই অপমানের প্রতিশোধ হিসাবে ডিনায়াল-নীতির আড়ালে আগুন আর গুলির শরণ নেওয়া হয়। ১৯৪২-এর প্রথম ছ'মাস ধরে নৌকা, গরুরগাড়ি, অন্যান্য যানবাহন নষ্ট করে, তার সঙ্গে দশ হাজারের বেশী সাইকেল বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করার অবিরাম যজ্ঞ চলে। আইন ও শান্তির মালিকরা গ্রামের পর গ্রাম, বাড়ির পর বাড়ি লুঠ করে, পুড়িয়ে, নারীপুরুষ নির্বিচারে সকলের উপর বর্বরের মত অত্যাচার করেছে। 'সে বিতর্ক আজও পড়লে রক্তগরম হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক হাঙ্গামার মাসগুলিতে এবং ১৬ অক্টোবরের সাইক্লোনের পর মেদিনীপুরের অবস্থা সম্বন্ধে যখনই মন্ত্রিসভা হার্বার্টের কাছে অথবা উচ্চতন কর্মচারিদের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অথবা তথ্য ও সংবাদ বিষয়ে অনুরোধ করেছেন, প্রতিবারেই তাঁরা একই উত্তর পেয়েছেন: মিলিটারির স্বার্থে কোন সংবাদ দেয়া নিষিদ্ধ। ১৯৪২ সালের প্রথম দশমাস মেদিনীপুরের কিছুমাত্র খবরই পাওয়া যায়নি। প্রথম খবর পাওয়া গেল যখন শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে কয়েকজন মন্ত্রী মেদিনীপুরের নানাস্থানে পাঁচদিনের সফর শেষ করে ৪ নভেম্বর কলকাতায় ফিরে হার্বার্ট ও চীফ সেক্রেটারির অনুরোধ অমান্য করে যেটুকু দেখেছেন তার বিবরণ দিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ভাষণে হার্বার্টের বিশ্বস্ত কর্মচারিদের ছোট গোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবির কিছু কিছু উদাহরণ দিলেন। একটি উদাহরণে বললেন, একজন বৃটিশ কর্মচারি কাগজে কলমে লেখেন: 'সম্রাটের কর্মচারি হিসাবে তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কী হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ মানতে পারেন না, কারণ তাঁর মতে সে-সব ক্ষতিপূরণের হার উদ্বাস্তরা যা পাবার উপযুক্ত তার থেকে অনেক বেশী।'

শ্যামাপ্রসাদ আরো বললেন মন্ত্রিসভার কাছ থেকে সরকারের নীতি গুপ্ত রাখার মানেই হচ্ছে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। গভর্নরের বিশ্বস্ত কর্মচারিদের হাতে যতখানি সম্ভব ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। তিনি বললেন: "'যে যে বাড়িতে পুলিশ বা মিলিটারির আদেশে হানা পড়ে, অথবা আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হয়, তার বিশদ বিবরণ দিয়ে লম্বা লম্বা তালিকা দিয়েছিলুম। এই ধরনের আরো একটি বড় লম্বা তালিকা, যেদিন ভয়ঙ্কর সাইক্লোন হয়, অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর, তার ঠিক পরের দিনই, আমি আমাদের গৃহদপ্তরের কয়েকজন উচ্চতম কর্মচারিকে দিয়ে অনুরোধ করি যেন এই ধরনের বর্বর অত্যাচার

এই মুহূর্তে বন্ধ করা হয়।' তিনি তাঁর বক্তব্য একটু পরিবর্ধিত করে আরো বলেন, তিনি শ্রেণী হিসাবে সব কর্মচারিকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসননীতির বিরোধী বলে দোষী করছেন না, কারণ তিনি এমন অনেক বৃটিশ ভারতীয় কর্মচারিকে জানেন প্রদেশের সেবায় যাঁদের দান অপরিমেয়।

এই অভূতপূর্ব অত্যাচার ও তাণ্ডবলীলার খবরের সঙ্গে সাইক্লোন-বিষয়ক যাবতীয় সংবাদ একেবারে চেপে দেয়া হয়। সমস্ত খবর চেপে দেয়ার ফলে জেলাটি বর্ণনাতীত দুঃখ ও যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়। ১৯৪২-এর ২ নভেম্বর অর্থাৎ শ্যামা-প্রসাদের দল ফেরার দু' দিন আগে বাংলা সরকার একটি ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি সংবাদ-পত্রগুলিকে দেন। বিজ্ঞপ্তিটি দেয়া হল টাইফুন ও সাইক্লোন সারা বাংলার সমতট জেলাগুলিকে বিধ্বস্ত করার পুরো ষোলদিন পরে। ইতিমধ্যে জাপানী রেডিও বারংবার বেতারে প্রচার করেছে যে সাইক্লোনের প্রথম একটি ঘণ্টায় মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় লক্ষাধিক প্রাণ নষ্ট হয়েছে। অথচ বাংলা সরকারের বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এই: 'বঙ্গোপসাগর থেকে বড় একটি সাইক্লোন ১৬ অক্টোবর তারিখে বাংলার কয়েকটি জেলার উপর দিয়ে যায়। ১৬ অক্টোবর সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে সাইক্লোন শুরু হয় ও ১৭ তারিখের সকালে নিঃশেষ হয়।'

এর আগে অবশ্য কিছু সংবাদ বেরিয়েছিল, '১৬ অক্টোবর বাংলার যে-সব জেলার উপর দিয়ে সাইক্লোন যায়, তার মধ্যে ছিল ২৪-পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং নোয়াখালি।' মেদিনীপুরের উল্লেখ নেই, কারণ মেদিনীপুর সম্বন্ধে কোন সংবাদ ছাপার অনুমতি দেয়া হয়নি। উল্টে বাংলা সরকারের তরফ থেকে একটি সতর্কবাণী জারি হয়েছিল যে কোন সংবাদপত্রই মেদিনীপুর জেলায় কী হয়েছে তার কোন খবর কোনমতে ছাপতে পারবে না।

পরে জানা যায় ১৬ অক্টোবরের টাইফুন আর সাইক্লোনের প্রথম পনেরো মিনিটে ত্রিশ হাজারের বেশী লোক প্রাণ হারায়। মৃতদের মধ্যে স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল কারণ পুরুষরা বাড়ি ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু রক্ষার্থে ঘরের বাইরে যায়। মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় সব মৃত্যুর সংখ্যা আরো কয়েকগুণ হয়।

শ্রীমতী কনক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ১৯৯০ সালে কিছু বিবরণ শুনেছি। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁরা মধ্যপ্রদেশের পেণ্ড্রারোড স্টেশন থেকে ট্রেনে হাওড়ায় ফিরছিলেন। তাঁর বিবরণ শুনে আমার ধারণা হয় যে-সব রিপোর্ট পরে প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে আসল ধ্বংসলীলা অনেক বেশী ভয়ঙ্কর

হয়েছিল। অক্টোবরের শেষে হাওড়া স্টেশনে তাঁদের ট্রেন সকালে পৌঁছনর কথা ছিল। কিন্তু বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইন সাইক্লোনে এত বিধ্বস্ত হয় যে যুদ্ধোচিত ত্বরা সত্ত্বেও, দুমাস পরেও মেদিনীপুর জেলার উপর লাইন ভাল করে মেরামত হয়নি। ফলে তাঁদের ট্রেন ঝাড়গ্রাম থেকে হাওড়া পৌঁছতে, সাড়ে তিন ঘণ্টার বদলে, পুরো একটি দিন নেয়। বালিচক থেকে মেচেদা রেলপথে মাত্র ৩৩ কিলোমিটার। সেটুকু পরিক্রমা করতে লাগে চার ঘণ্টার উপর। লাইনের দু' পাশে, বিশেষত দক্ষিণ পাশে, যতদূর চোখ যায়—ঢেউ তোলা বালির সমুদ্র, মাঝে মাঝে শুধু জেগে আছে এক-আধটি মরা গাছের গুঁড়ি, শেকড়গুলি আকাশের দিকে তোলা। মনে হয় যমদেব তাঁর তরোয়াল চালিয়ে সারা দেশটি কেটে শুইয়ে দিয়েছেন। সারা দেশ বালিতে ভরা, তার উপরে সর্বত্র রাশি রাশি মানুষের, জীবজন্তুর মাথার খুলি, কঙ্কাল ও হাড়, দু' বছর ধরে রোদ্দুরে পুড়ে খড়ির মত সাদা হয়ে গেছে, রোদ্দুরে চোখে লাগে। ছেচল্লিশ বছরের পূর্বের স্মৃতি বলার সময়ে তাঁর শরীর যেভাবে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল তাতেই বোঝা গেল জাপান রেডিও যে প্রচার করেছিল একরাতে লক্ষাধিক লোক মারা যায়, গরু ও অন্য গৃহপালিত পশুর তো কথা ওঠে না, সে উক্তি বোধহয় মোটেই অতিরঞ্জিত ছিল না।

আগেই বলেছি, একরাত্রির তাণ্ডবে স্ত্রীমৃত্যুর তুলনায় পুরুষমৃত্যু অনেকগুণ বেশী হওয়ার ফলেই বোধহয় হাজার হাজার স্ত্রীলোক ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে, ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাস থেকে একটু ফ্যানের সন্ধানে ঘুরতে বাধ্য হয়, এবং তখনই মোটামুটি দুর্ভিক্ষের শুরু হয়। পুরুষরা অনেক বেশী হারে মারা না গেলে, সম্ভবত স্ত্রী ও শিশুদের বদলে পুরুষরাই রাস্তায় রাস্তায় 'ঘুরত'। ভিক্ষার আশায় এইভাবে যত্রতত্র ভেসে ভেসে বেড়ানো আগের কালের দুর্ভিক্ষেও ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। এই ধরনের ঘোরার ফলে মৃত্যুর হারও বেড়ে যায়।

সাইক্লোনঘটিত দুর্বিপাকের সুরাহার্থে সরকার কী ধরনের ব্যবস্থা করলেন? পরে শোনা গেল, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রিপোর্টে নাকি সুপারিশ করেন, 'মেদিনীপুরবাসীর রাজনৈতিক দুষ্কৃতির শাস্তি হিসাবে সরকারের ত্রাণকার্যে নামা তো উচিত হবেই না, উপরন্তু কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানকেও বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে একমাসের মধ্যে ত্রাণকাজে নামার অনুমতি দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।' এই সুপারিশ করা হয় 'বিদ্রোহীদের শিক্ষা' দেবার উদ্দেশ্যে। আত্মম্ভরিতায় স্ফীত

সেক্রেটারিয়েট কমাণ্ডগোষ্ঠীর অনুমোদিত 'দিনমানে ত্রাণকার্য, নিশীথে হানা ও অত্যাচার, এই উন্মাদসুলভ কার্যনীতি'—এই কথাগুলি শ্যামাপ্রসাদ নিজের বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ হিসাবে তাঁর লিনলিথগো ও হার্বার্টকে লেখা চিঠিতে ব্যবহার করেন। সরকারের আদেশে এই চিঠি দুটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এবং তাদের বিষয়ে আলোচনাও সরকারি আদেশে বন্ধ করা হয়। আদেশ জারির সমর্থনে বলা হয়, "জনৈক মন্ত্রীর পক্ষ থেকে তথাকথিত স্বৈরতন্ত্রসুলভ কুশাসন-অভিযোগের জবাব হিসাবে কৈফিয়ৎ বা তথ্যসহ উত্তর দেয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, এবং তার সঙ্গে অভিযোগপত্র নিষিদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।" 'নেটিভ'দের সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে দেখে কলকাতার 'রাজ'-ভক্ত ভারতীয়রা নিশ্চয় আত্মপ্রসাদলাভ করবেন।

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ও হার্বার্ট

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩-এর বিধানসভায় মুলতুবী প্রস্তাবপ্রসঙ্গে নাজিমুদ্দিন মন্তব্য করেন : 'যদি মন্ত্রিসভার বিবেচনায় মেদিনীপুর জেলায় সহ্যাতীত অত্যাচার হয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে এই সভা এবং প্রত্যেক সভ্যের অভিযোগগুলির তদন্ত দাবি করা উচিত।' প্রত্যুত্তরে ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট বিচারকদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করানো হবে।

ব্যস, আগুনে ঘি পড়ল। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীপদ থেকে ২৮ মার্চ ইস্তফার কথা ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই বিধানসভায় উল্লেখ করে বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, হার্বার্ট তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির শেষে ছিল, 'আজ সকালে আপনি সরকারের সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করেছেন, মেদিনীপুরের কর্মচারিদের কার্যকলাপ বিষয়ে তদন্ত হবে। এই ঘোষণার আগে আপনি আমার সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করেননি। আপনি কেন করেননি সে-বিষয়ে কাল সকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি আপনার এই আচরণের জবাবদিহি প্রত্যাশা করব।' এর উত্তরে হার্বার্টকে লেখা তাঁর ১৬ ফেব্রুয়ারির চিঠি ফজলুল হক এইভাবে শুরু করেন, 'আমি আপনাকে জানাতে চাই, আমি সরকারের সিদ্ধান্ত বিধানসভায় ঘোষণা করার আগে আপনার মত চাইনি, তারজন্যে আপনার কাছে কোন জবাবদিহি দিতে বাধ্য নই। উল্টে, আপনার প্রতি আমার একটি অবশ্য কর্তব্য আছে।

সেটি হচ্ছে আপনাকে আমি মৃদুভাবে এই সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য মনে করি যে, ভবিষ্যতে গভর্নরের স্বাক্ষরে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র লেখার সময়ে আপনার এই চিঠিতে যে-ধরনের অশোভন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।' কেন কমিটি নিযুক্ত করেছেন সে-সম্বন্ধে চিঠিতে উল্লেখ করে তিনি লিখলেন, কী-ভাবে সরকারি কর্মচারিরা ভব্যতার খাতিরেও নাম-কা-ওয়াস্তে কোন তৎপরতা দেখাননি। আরো লিখলেন, হার্বার্ট যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর চিঠি ফজলুল হক বিধানসভায় পড়ে শোনাবেন। এর পরিণামে বিধানসভায় একবাক্যে সকলে বললেন হার্বার্টের বিদায় দাবী করা হোক।

আগের ডিসেম্বর থেকেই অবশ্য মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন নিয়ে হার্বার্ট ও ফজলুল হকের মধ্যে মতান্তর ও দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই বিধানসভায় ফজলুল হক হার্বার্টকে ১৯৪২-এর ২ অগাস্টে লেখা একটি চিঠি প্রকাশ করেন। সে চিঠিতে তিনি হার্বার্টের কাছে অনুযোগ করে লিখেছিলেন যে হার্বার্টের কার্যকলাপ সং-বিধানের নির্দেশবিরুদ্ধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেন তিনি যেন সব বিষয়ে সংবিধান অনুসারে চলেন। ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই হক আরো বলেন গত ২৮ মার্চ কী করে হার্বার্ট হককে ধাপ্পা দিয়ে একটি ঝুটো দলিলে হকের ইস্তফাপত্র সই করিয়ে নেন।

হক তাঁর ৫ জুলাইয়ের বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলেননি তাঁর নাকের ডগায় হার্বার্ট ঠিক কী ধরনের প্রলোভন ঝুলিয়ে ইস্তফাপত্র লিখিয়ে নেন। হকের নিজের বিবৃতিতে এই মনে হয়, হার্বার্ট যদি কোন প্রলোভন ঝুলিয়ে থাকেন তবে তা মুখ্যমন্ত্রিপদের নয়। যাইহোক, আগে থেকে তৈরি করা একটি ইস্তফাপত্র হকের সমুখে এগিয়ে দিয়ে হার্বার্ট সেটি সই করিয়ে নেন। সেইদিনই, অর্থাৎ ২৮ মার্চ সংবিধানের ৯৩ ধারায় গভর্নরের শাসন জারি হয়। ১৯৪৩-এর ২৪ এপ্রিল নাজিমুদ্দিনকে মুখ্যমন্ত্রী এবং শহীদ সুরাবর্দীকে খাদ্যমন্ত্রী করে কোয়ালিশন সরকার ঘোষিত হয়।

সে সময়ে আমার মনে হার্বার্ট সম্বন্ধে দুটি সন্দেহ দৃঢ় হয়। মন্ত্রিসভা এইভাবে পুনর্গঠন করে তিনি দুটি অভিসন্ধির মধ্যে প্রথমটি সিদ্ধ করেন—আমার মতে সেটি ছিল বাংলার রাজনীতিমঞ্চের মধ্যস্থলে মুসলিম লীগকে প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয়টি ছিল যতদিন সম্ভব খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী থেকে বাংলাকে যতদূর সম্ভব বঞ্চিত ও বুভুক্ষু রাখতে হবে। ১৯৪৩-এর ৩ সেপ্টেম্বর হার্বার্ট গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দ্বিতীয় সিদ্ধিতে বাধা পড়ল। হার্বার্টের স্থলে ৬ সেপ্টেম্বর

বাংলার লাট পদে রাদারফোর্ড এলেন। ১৯৪৩-এর ১১ ডিসেম্বর হার্বার্ট মারা গেলেন।

নভেম্বর মাসে রাদারফোর্ড মুন্সীগঞ্জ সফরে এলেন। হার্বার্ট থেকে তিনি ভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন। মনে হল তিনি সেই ধরনের আই-সি-এস ছিলেন যাঁকে আমি কল্পনায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতুম, এবং যে ধরনের অফিসার আমার যুগে প্রায় লোপ পেয়েছে। রাদারফোর্ড, ও-এম মার্টিন এবং এ-এস লার্কিন—আমার জীবনে আমি মাত্র তিনজন ইংরেজ অফিসারকে দেখেছি—যাঁদের প্রতি আমি অকুণ্ঠ আনুগত্য দিতে রাজি হতুম।

বললে রূঢ় শোনায়, কিন্তু হার্বার্টের মৃত্যুতে মনে হয়েছিল, গেছে আপদ গেছে। লিন্‌লিথগো বিদায় নিলেন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গভীর ক্ষতিসাধনের পর। ১৯৪৩-এর ২০ অক্টোবর ওয়েভেল বড়লাটপদে আসীন হলেন।

সেপ্টেম্বরে রাদারফোর্ড আসার পর বাংলায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হল। অক্টোবরের শেষে ওয়েভেল আসার পর সেই উন্নতি আরো ত্বরান্বিত হল। ২৬ অক্টোবর ওয়েভেল, তাঁর স্ত্রী ও রাদারফোর্ড কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফুটপাথে নিরাশ্রয় বুভুক্ষুদের অবস্থা দেখে বেড়ালেন। দুজনে মিলে তাঁরা বাংলায় প্রাণ আনলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছিল।

এক এক সময়ে আমার মনে হয় এডমাণ্ড ক্লেরিহিউ বেণ্টলি নিশ্চয় ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা হয়ে দিব্যচক্ষে হার্বার্টকে দেখে তাঁর 'ছোটদের জন্য জীবনকাহিনী'তে ক্লাইভের উপরে এই লাইনগুলি লিখেছিলেন :

রবার্ট ক্লাইভ যে বেঁচে নেই
তাঁর বিষয়ে এর থেকে ভাল কিছু আমার জানা নেই।
গত হবার সপক্ষে
অনেক কিছু বলার আছে॥

আর তাঁর এই কবিতাটি, তিনি এমেরি না লিন্‌লিথগো, কাকে বেশী মানসচক্ষে দেখে লিখেছিলেন, আমি স্থির করতে পারি না।

সম্রাট তৃতীয় জর্জের
জন্মানোই উচিত হয়নি।
ভাবলে অবাক হতে হয়
এ বীভৎস ভুল কী করে সম্ভব হয়॥

বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষের অগ্রগতি

আমার বিক্রমপুরের ছোট্ট জগতে এখন ফেরা যাক।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের গুটি দুয়েক ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে ডিনায়াল নীতি ও ব্যাপকভাবে চালের নৌকা ধ্বংসের ফলে দক্ষিণের জেলাগুলি থেকে ধানচাল আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, এবং আড়তদাররা মজুত ধানচাল লুকোতে শুরু করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই চালের মণ সাড়ে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকায় উঠে গেল। ছেলেদুটি আমাকে মিরকাদিমের তিন-চারটি বড় বড় আড়তের নাম বলল। তাদের মধ্যে একজন, বসন্ত মণ্ডল, ছিলেন ভাগ্যকুল রাজাদের ভাগ্নে। তিনি পূর্ববঙ্গের বণিকসভার সভাপতিও ছিলেন। তখনকার দিনেই তিনি অন্তত দু' কোটি টাকার মালিক। এখনকার সারা বাংলাদেশময় ছিল তাঁর ব্যবসা ছড়ানো।

আমার মহকুমা পুলিশ অফিসার, মদনমোহনলাল হুজার সঙ্গে আমার ১৯৪০-এর নভেম্বরে কৃষ্ণনগরে প্রথম আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলুম। তিনিও মনে করলেন কিছু খানাতল্লাসিতে ভবিষ্যতের জন্যে ফল ভাল হতে পারে। এবং এ বিষয়ে চুনোপুঁটি ছেড়ে রুই-কাতলার পিছনে ধাওয়া করাই ভাল। ভারতরক্ষা আইনবলে তখন যদি কারোকে গ্রেপ্তার করা যেত, কিছু-কালের জন্যে তাকে জামিন অমঞ্জুর করে জেলে রাখা যেত। ফলে মজুতদারদের প্রাণে ভয়সঞ্চার করা সম্ভব হত। একদিন দুপুরের পর মুন্সীগঞ্জ থেকে দুটি পুলিশ অফিসার সঙ্গে করে মিরকাদিম গেলুম। যে-কয়টি গুদাম দেখলুম প্রায় সবগুলিই খালি। অথচ তাদের থানা থেকে খবর পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পূর্বে কখনও এরকম হানা পড়েনি, যে তারা সাবধান হবে। সেদিন সকালেই হুজার সঙ্গে কথা বলে স্থির হয়েছে, সুতরাং মাল সরাবার সময়ও কেউ পায়নি। একটি-মাত্র আড়ত পাওয়া গেল যেখানে প্রকাণ্ড গুদামের এককোণে ত্রিপল ঢাকা একটি ছোট চালের বস্তার ঢিবি দেখা গেল, তাও শ'-দুয়েক বস্তার কোনমতেই বেশী নয়। গুদামের আয়তনের তুলনায় নস্যি বলা যায়। এটি বসন্ত মণ্ডলের গুদাম।

গ্রেপ্তার করা হল বসন্ত মণ্ডলকে, পরানো হল হাতকড়া, কোমরে বাঁধা হল দড়ি, সারা গঞ্জের লোকের সমুখ দিয়ে হাঁটিয়ে মুন্সীগঞ্জে নিয়ে পোরা হল জেলে। শুধু তাই নয়। তাঁর পরিবারের সব বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে, তাদের লাইসেন্স সাময়িকভাবে রদ করা হল, যতক্ষণ না মামলায় নিষ্পত্তি হয়।

ঘটনাটির খবর রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল, এমন-কি ঢাকা জেলার অন্যত্রও খবর গেল। কলকাতার সংবাদপত্রে গ্রেপ্তারের খবর বেরলো। আমার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জে-এল লিউয়েলিন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পাছে রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে আমাকে ভৎ´সনা করা হয়। তাঁর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণও ছিল। ভাগ্যকুল রাজারা গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী ও শ্যামাপ্রসাদের কাছে নালিশ জানালেন। তাঁদের ভাগিনেয়কে ছেড়ে দিয়ে পরিবারের অস্ত্রশস্ত্র ফিরে পাবার আবেদন করলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে বসন্ত মণ্ডল ছাড়া পেলেন। তার মাস দুয়েক পরে, সাধারণ লোকের স্মৃতি যখন কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে, তখন লিউয়েলিন আমাকে মণ্ডলের বন্দুকগুলি ফেরৎ দিতে লিখলেন (তখন ফোন ছিল না)। বললেন, এমন ভাষায় আদেশটি যেন লিখি যাতে মনে হয় আমি নিজের বিবেচনামতে ফেরৎ দিচ্ছি। সরকারের আদেশে নয়। চিঠির শেষে একটি বাক্য যোগ করলেন যা আমি আজীবন মনে রেখেছি: আইন এমনিতেই এত কড়া যে সেটিকে আরো বেশী কড়া বলে দেখানো নিষ্প্রয়োজন।

তবে এই ধরপাকড়ের সুফল আমি যতদিন মুন্সীগঞ্জে ছিলুম ততদিন পেয়েছি। প্রথম সুফলটি হল, লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হল আমি কড়া ও জেদী এবং চোরাকারবারের বিরুদ্ধে, ফলে আমার সদিচ্ছা সম্বন্ধে গোড়া থেকে বিশ্বাস এল। দ্বিতীয়ত, ১৯৪২-এর প্রথম থেকে ১৯৪৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত যেখানেই আমি পায়ে হেঁটে বা সাইকেল চড়ে গুদাম দেখেছি তখনই স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা এসে আমাকে সাহায্য করেছেন। ধরা চাল লঙ্গরখানার কাজে বা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে স্থির করা দরে বিলি করতে সাহায্য করেছেন। এইভাবে আমি বিক্রমপুরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত সাইকেলে করে ঘুরেছি, সঙ্গে থাকত আমার আর্দালি সামাদ কিংবা জলিল। দিনে গড়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল সাইকেলে ঘোরা হত। বসন্ত মণ্ডলের ব্যাপারটি আমাকে জনপ্রিয় করে তোলে, তার সঙ্গে লোকের বিশ্বাস হয় আমি পরিশ্রমে বিমুখ নই। সুতরাং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোন আশঙ্কা ছিল না। বহু সময়ে আড়তে ঢুকে যেটুকু চাল দেখেছি, তার থেকে আড়তদারের সমুখে হিসাব করে তার নিজস্ব প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে বাকিটুকু একটুকরো কাগজে লিখে নামসই, তারিখ ও রবার স্ট্যাম্পে এস-ডি-ওর সীলমোহর লাগিয়ে আদেশ জারি করেছি বাকি চাল, যতদিন পর্যন্ত আমি লিখিত আদেশে সে চাল না খালাস করি ততদিন রেখে দিতে। সে আদেশ সর্বদাই অক্ষরে অক্ষরে পালন হয়েছে। আদেশের ধানচাল হয়তো ইতিমধ্যে খারাপ হয়ে গেছে তবুও আড়তদার

ভয়ে সে চাল বদল করে নতুন চাল রেখে আমার কাছে খালাসের জন্যে আবেদন করেছে, আমার হাতের পুরনো চিরকুট আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।

এই ধরনের তল্লাসি ব্যাপারে আমি স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন, কম্যুনিস্ট পার্টির ও রিলিফ কমিটির সভ্যদের কাছে যে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি এখনও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। খুব কমক্ষেত্রেই তাঁরা ভুল করে অথবা ব্যক্তিগত কিংবা স্থানীয় শত্রুতাবশে ঝুটো খবর দিয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে মজুত চাল অত্যন্ত কম ছিল। ফলে প্রথম কয়েকমাস ধরপাকড়ের পর এই পন্থাটি বিশেষ ফলপ্রসূ না হওয়ায় আমার নীতি বদলাতে হল। স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে মহাজনদের উপর হামলা করার পরিবর্তে, যেন তেন প্রকারে চাল আমদানি করার জন্যে তাদের খোসামোদ করা, এবং আমদানি চাল তাঁরা কতখানি কী দরে কমিটিকে দিতে পারবেন তার নিষ্পত্তি করা। বাকি চাল তাঁরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য অথবা বাজার দরে ছাড়ার অনুমতি পেতেন। আমি বিশেষ আনন্দিত হলুম যখন, অপমান ভুলে গিয়ে, বসন্ত মণ্ডল নিজে এ বিষয়ে এগিয়ে এলেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ থেকে এইভাবে পরস্পরের মধ্যে কিছুটা আস্থা না গড়ে উঠলে আসল দুর্ভিক্ষ যখন এল তখন এবং তার পরে মুন্সীগঞ্জে—যত লোক মারা যায় তার থেকে অনেক বেশী মারা যেত।

১৯৪২-এর ১৯ নভেম্বর কলকাতায় আমার মেয়ের জন্ম হয়। তখন আমি কলকাতায়। ২২ নভেম্বর মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রয়াত রাধারমণ মিত্র কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে মুন্সীগঞ্জে এলেন। যে কয়দিন আমার কাছে ছিলেন, আমরা দুজনে নৌকা করে তালতলা খাল বেয়ে লৌহজঙ্গ, লৌহজঙ্গ খাল বেয়ে শ্রীনগর যাই। শ্রীনগর থেকে ভাগ্যকুল গিয়ে তিনি স্টীমারে কলকাতা ফিরে যান। এই কয়দিন সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে—তাঁর কাছে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের অনেক কথা জানতে পারি আর শুনি গঙ্গাধর অধিকারী, অজয় ঘোষ, এস-জি সরদেশাই, সাজ্জাদ জহির প্রভৃতি নেতাদের গল্প, তদুপরি রাধারমণবাবুর নিজের কারাগারের অভিজ্ঞতার কথা। আমার দুর্ভাগ্য তাঁর জন্মদিনে গতবছর (১৯৯২) থেকে আমি আর তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসতে পারি না।

১৯৪২-এর শেষ-দু'মাসে চালের দাম মণ পিছু আট থেকে বারো টাকার মধ্যে প্রায় স্থির ছিল। আউশ চাল বাজারে আসায়, আমন ধানে ভাল ফুল হওয়ায় মজুতদাররা বোধহয় নতুন চালের আশায় ছিল। ডিসেম্বরের শেষভাগে যখন কলকাতায় গেলুম আমার স্ত্রী ও মেয়েকে আনতে তখন দাম সামান্য চড়ছে।

কলকাতায় গিয়ে যখন দেখলুম ছিন্নবস্ত্রে, শীর্ণদেহে, কোলে-কাঁখে শিশু নিয়ে একহাতা ফ্যান চেয়ে দোরে দোরে মেয়েরা ঘুরছে, তখন স্বামী হিসাবে, এবং সদ্যোজাত মেয়ের পিতা হিসাবে আমার মনে খুব কষ্ট হয়। দুটি-একটি মেয়েকে জিগ্যেস করে জানলুম মেদিনীপুর আর ২৪-পরগণায় কী ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়ে গেল। তবে তখনও মেদিনীপুর সাইক্লোনে আন্দাজ কত লোক মারা গেছে সে বিষয়ে ভাল খবর পাওয়া যায়নি। দুই জেলায় কী ধরনের অত্যাচার হয়েছে, ত্রাণকার্যে ইচ্ছা করে কত অবহেলা হয়েছে সে বিষয়ে সংবাদ তো দূরের কথা, কোন ধারণা ছিল না মাত্র একদিনে কত হাজার হাজার স্ত্রীর বৈধব্যদশা হয় এবং সেইসঙ্গে কত শিশু অনাথ হয়ে যায়।

১৮৭৮-৭৯ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে কমিশনের সভ্য কেয়ার্ড ও বম্বের লাট রিচার্ড টেম্পলের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর হয় তার একাংশ এইরকম :

কেয়ার্ড : আপনি কি উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোকে বিপদের চিহ্ন হিসাবে দেখেন? এই ধরনের ঘোরাফেরা বন্ধ করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে কীভাবে সম্ভব একটু বলবেন!

রিচার্ড টেম্প্‌ল্‌ : হাঁ নিশ্চয়, দুর্ভিক্ষের সময়ে যে-সব বিপদের লক্ষণ দেখা যায় তার মধ্যে এই ধরনের ঘোরাফেরাকে আমি সমূহ বিপদের চিহ্ন বলে মনে করি। এটি দেখা গেলেই বিপদ অনিবার্য ও ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে ধরে নিতে হবে। ব্যাপক মৃত্যুসম্ভাবনার আগাম সঙ্কেত। এই ধরনের এলোমেলো ঘোরাফেরা যত মৃত্যুর কারণ হয়, অন্য কোন কারণ তার ধারে-কাছে যেতে পারে কিনা সন্দেহ। সাধু, পেশাদার ভিখারী বা ভবঘুরের কথা অবশ্য আলাদা। এই ধরনের ঘোরাফেরার সব থেকে ভাল ওষুধ হচ্ছে গ্রামে গ্রামে যথাসত্বর ত্রাণকার্য শুরু করে দেয়া। যদি গ্রামে গ্রামে এই ত্রাণকাজ আগে থেকে, তাড়াতাড়ি, সুষ্ঠুভাবে শুরু করতে পারা যায় তাহলে এই জাতীয় ঘোরাফেরা বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্বের অধিকাংশ দুর্ভিক্ষের বছরে, মেয়েরা-শিশুরা ঘরে থাকত। পুরুষরাই ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আনত, যার পরিশ্রমে ও অপুষ্টিফলে তারা প্রাণ হারাত। মুন্সীগঞ্জে দেখেছি এই ধরনের ভিক্ষার খোঁজে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা বা নৌকা বাওয়ার ফলে অতি দ্রুত মৃত্যু আসত। আমি অন্তত দু'শ মুসলমান বা নমঃশূদ্র মাঝির কথা জানি যারা অনাহারে জীর্ণ হয়ে নৌকা বাইতে বাইতে নিঃশেষ হয়ে জলে টুপ করে পড়ে গেছে। আগের আগের দুর্ভিক্ষে মেয়ে বা শিশুদের

থেকে পুরুষরা বেশী সংখ্যায় মারা যেত বলে অনেক কমিশনের সাক্ষীরা বলতেন যে মেয়েরা রান্নার ভার নিত বলে হয়তো লুকিয়ে পুরুষদের থেকে একটু বেশী খেত। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের দুর্ভিক্ষে আমার অভিজ্ঞতায় কখনও মনে পড়ে না, এমন-কি লঙ্গরখানার খাওয়াতেও নয়—যে, খিদের তাড়না যদিও মানুষকে যথেষ্ট অমানুষ করে দেয়, তবু মেয়েরা তাদের ছেলেদের বা পুরুষদের অংশে ভাগ বসিয়েছে। বরং তারা চিরাচরিত সংস্কারবশে ছেলেমেয়েদের, স্বামীদের বেশী খেতে দিয়েছে। সুতরাং ১৯৪৩-এ, বিশেষ করে কলকাতায়, পুরুষদের থেকে মেয়েদের যে বেশী মৃত্যু হয়েছিল তার কারণ এ নয়—যে মেয়েরা পুরুষদের থেকে কম খেতে পেত। উপরন্তু আইনের বরাদ্দ রেশন বলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে কিছু ছিল না। উল্টে চালের দাম এত আকাশচুম্বী হয়েছিল যে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠে গেছল। যদিই-বা রেশনিং থাকত তাহলেও পাঁচ বা ছয় গুণ দামে কেনার সামর্থ্য খুব কম পরিবারের ছিল।

আমার নিজের পরিবারের কথা বললেই আসল অবস্থার কিছুটা বোঝা যাবে। ১৯৪২ সালের বড়দিনের সপ্তাহে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে যখন মুন্সীগঞ্জে ফিরে যাই, তখনই স্থানীয় বন্ধু ম্যাকার্টিচ নিজে থেকে একটি বন্দোবস্ত করেন, যার কল্যাণে আমি সপরিবারে কোনমতে বেঁচে যাই। ম্যাকার্টিচের নিজস্ব পাটের ব্যবসায় ছিল এবং সেই কারণে পাটের নৌকা ছিল। নিজের চালের সঙ্গে তিনি আমার পরিবারের প্রয়োজনমত চাল ফরিদপুর থেকে আনিয়ে নিজের গুদামে রেখে দেন। সে চালের দর পড়ে মণপিছু বারো থেকে ষোল টাকা। আয়কর ইত্যাদি সরকারকে অবশ্য-দেয় টাকা বাদ দিয়ে ঘরে আনার মত মাহিনা আমার দাঁড়াত পাঁচশ' টাকা। মুন্সীগঞ্জে শতকরা দশটি পরিবারেও এই আয় ছিল না। উপরন্তু মুন্সীগঞ্জে আমার কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। পদমর্যাদার দরুণ হুট করে আমার বাড়িতে এসে কেউ সহসা খেতে চাইবে বা সাহায্য চাইবে এও সম্ভব ছিল না। আমরা ছিলুম তিন প্রাণী, এবং পরিচর্যার জন্য ছিল বাবুর্চি : লোকনাথ, বেয়ারা মোজাফ্‌ফর, রহিম মালী, মেয়ের আয়া ঠাকুরদাসী, তার ছোট মেয়ে সুহাসী। আমাদের পরিবারে এই ছিলুম নিত্য খাইয়ে। ক্রমে আমাদের যা জমানো চাল থাকত তার থেকে কিছু-কিছু ভাগ পেত আমার দুই চাপরাশি সামাদ আর জলিল, এবং আমার স্টেনো হুসেন। জুলাই মাসে দুবেলা আরো খাবার লোক হল পাখাটানা ছেলে সোহরাব, তার বাচ্চা ভাই শফি। শেষে তার নিজের ব্যবসা খুইয়ে এল আমাদের বাড়িতে যে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করত, রাখাল, তার স্ত্রী সুশীলা আর মেয়ে

রেণু। আমাদের পরিবারে আসার আগে রাখালের যা কিছু বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি ছিল বেচে আর যখন কুলোল না, তখন তারা আমার সংসারে এল। তারপর এল একটি ছেলে রফি। তার বাবা ছিলেন মাঝি, নৌকা বাইতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে জলে পড়ে মারা যান। ম্যাকার্টিচ নিলেন তার ভার, আমি তার পড়াশোনার খরচের। ১৯৪৭-এ দেশভাগের ক্ষণপর্যন্ত আমি তার পড়াশুনার খরচ পাঠাতুম। রফি ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করে নারায়ণগঞ্জের একটি জুটমিলে চাকরি পায়। তার জন্য সামান্যই করেছি, কিন্তু ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সে তার খিতিরপাড়ার পয়সা গ্রাম থেকে যখনই চিঠি লিখত, বলত সে যদি পারত তার গায়ের চামড়া দিয়ে আমার জুতো বানিয়ে দিত। এই ধরনের কথা আমার অকিঞ্চিৎ জীবনের চরম পুরস্কার বলে মনে করি। ১৯৯০ সালের জুলাই মাসের পর তার কোন চিঠি আর পাইনি। এতগুলি ব্যক্তিগত কথা লিখলুম এই কারণে, যে, এই যদি আমার অবস্থা হয়ে থাকে, তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থঘরে, বিশেষত যাঁদের আগে থাকতে থালাদরে চাল পাবার ব্যবস্থা ছিল না, তাদের কী দুরবস্থা হয়েছিল তা শুধু কল্পনাই করা যায়। ভেবে দেখুন, এতগুলি লোকের মুখে, আমার অবস্থার লোক আশি-নব্বই টাকা দরে চাল কিনে, ভাত দিতে পারত!

তবে, আমার এক বিষয়ে সবথেকে বেশী যে কষ্ট হত, সেটা বিবেকের। আমার কথা শুনে পাঠক হয়তো ভাববেন, আমি মহৎ হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে রাখবেন আমার তখন বয়স পঁচিশ, মনের সততা আমার নিশ্চয় এখনকার থেকে বেশী ছিল, তার সঙ্গে বিবেকও। যখন শত শত শিশু অনাহারে মারা যাচ্ছে —তখন আমরা আমাদের শিশুকন্যা যাতে ঠিকমত বাড়ে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বলাবাহুল্য আমাদের দু'জন বিচক্ষণ ডাক্তার বন্ধু, মন্মথনাথ নন্দী ও শৈলেন দাশের উপদেশে যথাসম্ভব সহজপ্রাপ্য সস্তা সব্জি ও সাদামাটা, অথচ পুষ্টিকর খাবার তাকে দিতুম। যাদের সেবায় নিযুক্ত তাদের থেকে নিজে ভাল অবস্থায় থাকার জন্যে মনে মনে যে অপরাধবোধে আমি অহরহ ভুগেছি, ভাগ্যক্রমে ঠিক সে ধরনের অপরাধবোধ উত্তরজীবনে আর হয়নি। অবশ্য মানুষ নিজের বিবেককে স্তোক দেবার জন্যে বহুরকম ফন্দি ও অজুহাত খুঁজে বার করে।

১৯৪২-এর শেষে আউশ ধানের মজুত ফুরিয়ে গেল। ১৯৪৩-এর জানুয়ারির শেষার্ধ থেকে ধানচালের দাম আবার বাড়তে শুরু করল। সেই সময় থেকে পনেরো দিন অন্তর আমাদের যে গোপনীয় রিপোর্ট দিতে হত তাতে এবং

ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ধানচাল চেয়ে আমি যে টেলিগ্রাম পাঠাতুম তার কোন ফলই ফলেনি। তবে এইসব লেখা ও টেলিগ্রাম পরে প্রমাণ করে কী ধরনের অবস্থা ঘনিয়ে উঠছিল, এবং সে বিষয়ে আমি বরাবর সরকারকে জানিয়ে গেছি।

কলকাতা, দিল্লী, লণ্ডন

কলকাতা, দিল্লী ও লণ্ডনে ১৯৪২-এর শেষ থেকে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পুরো প্রকোপ অবধি খাদ্য পরিস্থিতি ও সরকারের তৎপরতা সম্বন্ধে কী-ধরনের আলোচনা ও চিন্তাভাবনা চলছিল সে-বিষয়ের সামান্য উল্লেখ করলে মুন্সীগঞ্জের অবস্থা বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে।

খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে ১৯৪৩ সালের প্রথম দিনের বাণী হিসাবে ঢাকার নবাব-বাহাদুর যে বাণী প্রচার করলেন, তাকে জনসাধারণ অবিশ্বাসের ধিক্কার জানালেন। ১৯৪৪-এর জানুয়ারির শেষে হাউস অভ কমন্সে এমেরি বললেন, বৃটিশ সরকার ভারতে গম পাঠাবার কথা ভাবছেন। আণ্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট, আর্ল অভ মান্স্টারও পার্লামেণ্টে বললেন, ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি যদিও জটিল, তবু তাকে দুর্ভিক্ষ বলা যায় না; খাদ্যের ঘাটতি বিশেষ-বিশেষ নগরাঞ্চলে আর গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ আছে। দু'টি উক্তিই সমান-দরের ধাপ্পা মনে হলেও ক্ষীণ আশা হত মুন্সীগঞ্জ হয়তো এই বিশেষ ঘাটতি-এলাকার তালিকায় পড়বে। ওদিকে 'স্টেট্স্-ম্যান' কাগজে খবর হল কলকাতার রাস্তায় শত শত লোক মৃত্যুপথে।

২৮ জানুয়ারি, এমেরি পার্লামেণ্টে যা বললেন, তার উপর মন্তব্য করে কুন্নুরের 'নিউট্রিশান ইন্স্টিটিউটে'র বিশেষজ্ঞ ও রবার্ট ম্যাক্ক্যারিসনের সহকর্মী, এন-গাঙ্গুলী (দু'জনকেই আমি ১৯৪০-এ অক্সফোর্ডে দেখেছি) ৩০ জানুয়ারি লিখলেন: 'যদি চোরামজুত খাদ্য ধরে বাজারে ছেড়ে সুষমভাবে বিলি করা সম্ভব হয় তবে দেশের লোকের অনাহারে থাকার আশঙ্কা কমবে।' তিনি আরো বললেন, 'খুবই খেদের বিষয়, বৃটেনের জনসাধারণকে ভারতের সত্যিকার খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখা হচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে যেটুকু খবর আসছে তা এমেরির উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা এই প্রমাণ করে।' পাঠক জানেন, মুন্সীগঞ্জে সকলে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি চোরামজুত চাল উদ্ধার করতে, কিন্তু প্রায় কিছুই পাইনি। ১৯৪৩ সাল যে-সব উল্টোপাল্টা উক্তি দিয়ে শুরু হল তার সামান্য নমুনা দিলুম। তাতে

দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে বৃটিশ ও ভারত সরকারের অনাগ্রহ, এমন-কি বিরুদ্ধতাই প্রকাশ পায়।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটল। তাতে ইন্ধন জোগালো ২৯ মার্চ তারিখে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার ইস্তফা এবং গভর্নরের শাসনাজ্ঞা জারি। গভর্নরের শাসনকালে উন্নতির পরিবর্তে যে-বেগে খাদ্যাবস্থার অবনতি শুরু হল, তাতেই প্রমাণ হয় লাটসাহেব আর তাঁর বিশ্বস্ত অফিসারদের ঔদাসীন্যই শুধু নয়, প্রতিশোধ-বৃত্তিরও। মুদ্রাস্ফীতি-সম্বন্ধে আমার প্রথম তাত্ত্বিক-পাঠ হল কয়েকজন অর্থনীতিবিদের একটি বিবৃতিতে, স্বাক্ষর করেছিলেন ভি-জি কালে, কে-টি শাহ, সি-এন ভকিল ও ডি-আর গ্যাডগিল। তাঁরা বললেন, মুদ্রা-স্ফীতি হচ্ছে যুদ্ধের বোঝা জনসাধারণের ঘাড়ে অত্যন্ত অসমহারে ফেলার অন্যতম অস্ত্র। মুদ্রাস্ফীতির মানে হচ্ছে অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোল থেকে ভুরি-ভুরি সম্পদ কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় ধনীশ্রেণীর কোলে সেগুলি ঢেলে দেওয়া। প্রমাণ আমার নাকের ডগায় পেলুম। যুদ্ধের রসদ হিসাবে খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে যা-কিছু ভাবা যায় তার দাম হু-হু করে বাড়তে লাগল। সেই দামের ফয়দা তুলল দালালরা আর মারা গেল গরীবরা। বর্তমান দশকে এর যোগ্য জুড়ি হয়েছে বছর বছর কেন্দ্রে ও রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচন। দেশবাসীর রক্ত জল-করা ট্যাক্স জলের মত খরচ করে নির্লজ্জভাবে পাইকবরকন্দাজ ও স্বজন পোষণে নেতারা অসমবণ্টন আরো অসম করে দেশকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছেন।

নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ১৯৪৩-এর ২৪ এপ্রিল কার্যভার গ্রহণ করে। মে মাসে অবস্থা আরো খারাপ হল। আসন্ন দুর্ভিক্ষের মুখে সরকারের দৃঢ়ভাবে কাজ করার প্রতিজ্ঞার উপর আস্থা চলে গেল। এই সন্ধিক্ষণে এমেরি আরেকটি নিষ্করুণ মন্তব্য করলেন, কিন্তু সরকার কী করছে বা করবে মনে করছে তার কোন উল্লেখ করলেন না। ৩ জুন তিনি হাউস অভ কমন্সে বললেন :

"যতদিন পর্যন্ত বর্মার চাল আমরা না ফিরে পাব ততদিন চালের অবস্থা আজকের মত উদ্বেগজনক থাকতে বাধ্য। বাংলা, বিশেষত কলকাতা নিয়েই এখন আমাদের সবথেকে বেশী উদ্বেগ। যুদ্ধের আগে চালের যা দাম ছিল, কলকাতায় এখন তার দাম আটগুণ বেশী, যদিও একথা ভারতের অন্যত্র সম্বন্ধে খাটে না।"

অবশ্য সেইসঙ্গে তিনি বললেন না চালের দামের সঙ্গে সমতা রেখে যুদ্ধের পর

থেকে লোকের গড় আয়ও সেইমত বেড়েছে কি-না। অথবা একই রয়েছে না আরো কমেছে। ভুললে চলবে না, মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণায় সাইক্লোন-ক্লিষ্ট অগণিত পরিবারের আয় শূন্যে নেমেছিল।

এই সময়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে যার ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আমার মত অনুরক্ত লোকের বেশ অভিমান এমন-কি সাময়িক বিরক্তির উদ্রেক হয়। ১৯৪৩-এর ২৩ মে থেকে ২৬ মে পর্যন্ত বম্বেতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির যে প্রথম কংগ্রেস হয় তার দু'একটি কথা এখানে, অপ্রাসঙ্গিক হলেও, বলি। তাঁদের বক্তৃতায় ডাঙ্গে, যোশীর মত নেতারা যেভাবে আবেদনের স্বরে আন্তর্জাতিক অবস্থা, যুদ্ধের প্রগতি, এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের উপর জোর দিলেন, তার তুলনায় দুর্ভিক্ষের উল্লেখ কম ছিল, বিশেষত আমার সমস্ত মন তখন দুর্ভিক্ষ নিয়ে ভারাক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন থাকত। একবারও বললেন না যে, ভারতের অগণিত জনগণকে অনশনে রাখলে যুদ্ধজয়ের পক্ষে তা মঙ্গলকর হবে না। আন্তর্জাতিক অবস্থার অন্য দিকগুলি সম্বন্ধে অবশ্য তাঁরা ঠিক ঠিক আওয়াজ করলেন, তাতে খুঁত ধরার কিছু ছিল না। তবু আমার মনে হল সদ্যপ্রাপ্ত আইনবলে স্বীকৃতির জন্যে তাঁরা যেন ম্যাক্সওয়েল ও লিন্‌লিথগো-কে খুশি রাখার জন্যে ব্যস্ত, সরকারের গড়া দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে হাতে লগুড় তুলতে অনিচ্ছুক। ৩১ মে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল তার কোনটাতেই মুখ্যত সরকারের অবহেলার ফলেই যে ভারতে এই কালদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে সে-বিষয়ে কোন প্রস্তাব পাস হয়নি, এমন-কি উত্থাপনও হয়নি দেখে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। স্থানীয় কম্যুনিস্ট-নীতিজ্ঞ অনিল মুখার্জিকে এ-বিষয়ে জিগ্যেস করাতে উনি নীরব থাকলেন। অবশ্য সি-পি-আই কংগ্রেস একটি মামুলি প্রস্তাব নিলেন এই মর্মে যে চোরাই-মজুত শস্য উদ্ধারের চেষ্টা জোরদার করতে হবে এবং খাদ্য নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা যাতে না হয় তা দেখতে হবে, কিন্তু তার মত নিরীহ মিনমিনে প্রস্তাব আর কী হতে পারে? এই ধরনের প্রস্তাব তো যে-কোন সরকারি কর্মচারি—থ্যাকারের কালেক্টর অভ বোগলিওয়ালার মত লোকও—নিতে পারত। সি-পি-আই-এর সভ্যরা দেশ-সম্বন্ধে যে-ধরনের খুঁটিনাটি খবর রাখতেন, তাতে অনায়াসেই ধরা যায় তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন চোরা-মজুত ধরা তখন আর বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা সরকারের অমার্জনীয় গাফিলতি, এমন-কি বিরোধিতা। যদি কেউ বড় রকম মজুত করে থাকে তবে তা' করেছে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকাররা ও তাদের দালালরা। তাদের তুলনায় ছোট আড়তদারদের মজুত নিতান্ত মশকের কামড় বলা যায়।

আরেকটি প্রস্তাব ছিল পাকিস্তান প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত: যে-কোন জাতির

সমবেত দাবিতে স্বাতন্ত্র্যের অধিকার যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করা উচিত বলে। আমার মনে হয়েছিল এই সংকটমুহূর্তে বৃটেন যখন ভারতে গণ্ডগোল বাধাবার জন্যে বদ্ধপরিকর মনে হচ্ছে তখন এই ধরনের প্রস্তাব কতখানি সমীচীন। অনেক পরে সত্তর দশকের প্রথমে সি-পি-এম যখন গোর্খাল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রস্তাব নেন, এবং পরে আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তারই নিষ্ফল বিরোধিতা করেন তখন ১৯৪৩ সালের এই প্রস্তাবের কথা আমার বারবার মনে পড়ে। জড়বাদী পণ্ডিতরা সর্বদা ইতিহাসের নামে মাতামাতি করলেও ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে চান না, প্রায়ই মস্ত হাঁ করে মুখের মধ্যে নিজের পা পুরে দেন।

খাদ্যের বিতর্কে আবার দিল্লী, লণ্ডনে ফিরে আসা যাক। ১৯৪৩-এর ২৭ জুন দু'দিনব্যাপী অল বেঙ্গল ফুড কন্‌ফারেন্স শেষ হয় : নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে তিনি আবেগভরে দাবি করেন যেন একটি ব্যাপক পরিকল্পনা-প্রসূত কার্যসূচীর সাহায্যে দুর্ভিক্ষের গতি রোধ করা যায়। এর ঠিক আগে তিনি সরকারের প্রতি আবেদন করেন যাতে সরকার সুস্থ সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এবং শুধু কাগজে-কলমেই সে আহ্বানের শেষ না হয়। আশার প্রথম আলো দেখা গেল যখন বাংলার খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী ২ জুলাই তিলজলায় ধানচাল বিক্রির প্রথম সরকারি দোকানের উদ্বোধন করলেন। অবশ্য তার আগেই যা-কিছু ধানচাল পাওয়া যেত তাই নিয়ে মুন্সীগঞ্জে স্থানীয় রিলিফ কমিটিগুলি সুষ্ঠুভাবে ধানচাল বিলি ও বিক্রির ব্যবস্থা করে।

এমেরির গণ্ডারের চামড়া। হাউস অভ কমন্‌সে তিনি বারবার বলেই চললেন, সব মিলিয়ে ভারতবর্ষে খাদ্যের ঠিক অভাব নেই, তার উপরে গত বসন্তকালে গমের ফলন খুব ভাল হয়েছে। মুস্কিল হচ্ছে সকলে মিলে সুষ্ঠু বণ্টনে ঘোর অব্যবস্থার সৃষ্টি করেছেন, যার জন্যে নিম্নতম চাষী থেকে উচ্চতম ব্যক্তিদের সকলেই দায়ী।

আগেই বলেছি লিন্‌লিথগো কোনদিন একটি আঙুল হেলিয়েও উদ্বৃত্ত প্রদেশগুলিকে চালগম দিতে অনুরোধ জানাননি। অথচ তিনি বিলক্ষণ জানতেন, তাঁর মুখ থেকে একটি কথা খসলেই কাজ হত। ১৯৪৩-এর ১২-১৩ জুলাই বাংলার বিধানসভায় সরকার সারাদেশের দুর্গতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে খুব গাল খেলেন, হাউস অভ কমন্‌সে এমেরি তাঁর পুরনো গৎ গেয়েই চল্লেন। একদিকে গাইলেন, চোরামজুতের পুরনো কাসুন্দি, অন্যদিকে এক নতুন সুর ধরলেন, 'প্রতি পরিবারের আয়বৃদ্ধির দরুণ খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে।' যেন প্রাচুর্যে দেশ ফেটে পড়ছে।

কোথা থেকে এই বাড়তি আয়টি এল সেটা অবশ্য এমেরি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেননি।

২০ অগাস্ট বাংলা সরকার এক আদেশ জারি করলেন—২৮ অগাস্ট ১৯৪৩ থেকে সারা প্রদেশে ধানচালের দাম বাঁধা হবে এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, যেখানে আউশ ধান ভাল হয়েছে সেখানে মজুত করার জন্যে সরকার উদ্বৃত্ত ধান কিনবেন। মুন্সীগঞ্জে আউশ কমই হত, যেটুকু হত খাদ্যকমিটিগুলি আগে থেকেই তার হিসাব তৈরি করেছিলেন, কিন্তু এদিকে অনশন আর অপুষ্টি চরমের দিকে এগিয়েছে।

৫ অগাস্ট এমেরি যা বললেন, তাতে আমার সন্দেহ রইল না যে বাংলা সরকার এখনও কিছুকাল ধরে কাজ করার মিথ্যা ভড়ং দেখাবেন, কাজ বিশেষ কিছু হবে না। যদিই-বা সুরাবর্দীর ইচ্ছা থাকে, যতদিন হার্বার্ট থাকবেন তাঁকে কিছু করতে দেবেন না। বাংলার সৌভাগ্যক্রমে ৩ সেপ্টেম্বর হার্বার্ট খুব অসুস্থ হলেন, এবং রাদারফোর্ড গভর্নরের ভার নিলেন ৬ সেপ্টেম্বর। ৫ অগাস্ট হাউস অভ কমন্সে যে আলাপ হয় তা এইরকম :

প্রশ্ন : উনি (এমেরি) কি জানেন বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক নিত্য এসে কলকাতা শহরের পাঁশগাদা ঘেঁটে ঘেঁটে খাবার খুঁটে খাচ্ছে ? উনি কি বলবেন উনি এ বিষয়ে কী করছেন এবং ভবিষ্যতে কী করবেন ভাবছেন ?

(উত্তরটি পড়বার আগে আমার মনে হয়, সেক্রেটারি অভ স্টেট ঘোড়ার ডিমে তা দিচ্ছিলেন, নিশ্চয় তাস খেলছিলেন এবং মনে মনে দুষ্টুমি ফন্দি আঁটছিলেন)।

উত্তর : আমি যা কিছু জানি নিশ্চয় সবটাই বলব। আমার মাননীয় বন্ধু স্মরণ রাখবেন বাংলার সমস্যা ও তার সমাধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণই সেই স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশের খাদ্যবিভাগের।

এরপর পাঠক কী বলবেন ? ঈশ্বর নির্লজ্জতার জন্য তাকে ক্ষমা করুন।

২৭ সেপ্টেম্বর যখন এমেরি বিবৃতি দিলেন, কলকাতায় এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে এবং তিনি আশা করেন নভেম্বরে রেশনিং চালু হবে, তখন বোঝা গেল এগুলি লিন্‌লিথগো বা এমেরির কথা নয়, তাঁদের ডিঙিয়ে রাদারফোর্ডের কথা।

এমেরির শেষ যে জলজ্বলে কথা আমার মনে পড়ে সেটি এল হাউস অভ কমন্সে ২১ অক্টোবর। তার আগের দিন ওয়েভেল দিল্লীতে বড়লাটের পদে আসেন।

প্রশ্ন : বিশেষ মাননীয় ভদ্রলোক কি অবিলম্বে খোঁজ নেবেন কলেরার মহামারী কীভাবে কতদূর ছড়িয়েছে এবং স্থানীয় ওষুধপত্র যেটুকু আছে কেন্দ্রীয় সরকার তার উপরে আর কত কী ওষুধ কবে কোথায় পাঠাচ্ছেন ?

এমেরি : আমার কাছে যা খবর আছে তাতে ওষুধের কোথাও কোন অকুলান নেই। অসুখটিও বেশী ছড়ায়নি।

এই উত্তর-প্রত্যুত্তর হয় এমন সময়ে যখন ডাঃ নন্দী, আর-এ-এম-সির মেজর আয়ার আর আমি কয়েক হন্দর ব্লিচিং পাউডার আর কয়েক হাজার কলেরার টীকার জন্যে মরিয়া হয়ে চষে বেড়াচ্ছি। চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্রের অভাব আমাদের সবসময়েই ছিল। তার ওপরে ছিল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্যে হাসপাতাল। এসব অভাব কিছুটা মিটতে শুরু করল তখনই যখন ভারতের পাব্লিক হেল্‌থ্ কমিশনার কর্নেল ই-কটার এবং মিলিটারি কর্তৃপক্ষ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে আকিয়াবের কাছে দুটি বৃটিশ ঘাঁটি, মংড' ও বুথিডঙের উপর জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণ চলেছে, আর উত্তর বর্মায় জেনরল উইনগেট তাঁর জঙ্গল অভিযান শুরু করেছেন। এই সংকট সময়ে ভারতের সহযোগিতা অর্জন সম্বন্ধে লিন্‌লিথগোর যেমন অবজ্ঞা ছিল, নতুন বড়লাটের তেমনি আগ্রহ ছিল।

রাদারফোর্ডের একান্ত চেষ্টায় সেপ্টেম্বরে খাদ্য আসতে শুরু করল, আমরাও আশান্বিত হলুম। ওয়েভেলের আগ্রহে অক্টোবরের শেষ থেকে আসতে শুরু করল ওষুধপত্র, হাসপাতালের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করলেন, যে-দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কে-সি নিয়োগী একবার বলেছিলেন ১৭৭০-এর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে মার্কামারা বৃটিশ কীর্তির ছাপ বয়ে এসেছে। এ কথাটি তিনি ১৫ নভেম্বর ১৯৪৩-এ কেন্দ্রীয় বিধানসভায় বলেন। সেই সময়ে আমরা মুন্সীগঞ্জের কুড়িটি ডিস্পেন্‌সারির সঙ্গে কুড়িটি ২০-বেড হাসপাতাল এবং মেজর আর-ডি আয়ার তালতলাঘাটে দু'শ' বেড হাসপাতাল স্থাপন করেন। তার দুমাস আগে থেকে লঙ্গরখানাগুলিতে আমরা শুধু ফ্যানভাত বিলি করতুম। ১৯৪৩-এর ৯ নভেম্বরের কেন্দ্রীয়সভার বিতর্কে কে-সি নিয়োগী খাদ্যমন্ত্রী জে-পি শ্রীবাস্তবকে প্রশ্ন করেন তিনি (শ্রীবাস্তব) কখনও ফ্যান খেয়ে দেখেছেন কিনা। নিয়োগী বললেন, তিনি জিগ্যেস করছেন, কারণ বিশেষজ্ঞদের কাছে তিনি শুনেছেন একটি বুভুক্ষ ব্যক্তি যে-পরিমাণ ফ্যান খেতে পায় তা একটি প্রমাণ-সাইজের ইঁদুরের পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষের অন্তিম পর্যায়

১৯৪৩-এর মার্চে যখন দুর্ভিক্ষ নির্মমভাবে এগিয়ে আসছে, তখন আমার দু'জন প্রিয় সহকর্মী বদলি হয়ে গেলেন। একজন হলেন আমার এস-ডি-পি-ও মদন হুজা। বিয়ে করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮ মার্চ ছুটিতে গেলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাদের আরো ঘনিষ্ঠ হলেন। ইদানীং তাঁরা কলকাতার টিভলি কোর্টে থাকতেন। তাঁর স্থলে এলেন আবু মুসা সৈফুদ্দিন আহমদ। ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গেও খুব বনে গেল। আরেকজন হিতৈষী ছিলেন ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে-এল লিউয়েলিন। ১ এপ্রিল তিনি বদলিতে চলে গেলেন। অগাস্ট আন্দোলনের সময়ে ঢাকায় ছিলেন। মহকুমার ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, অথচ মুস্কিলে পড়লে কিছুটা ঝুঁকি ঘাড়ে নিতেন, সে বিষয়ে আগেই বলেছি। তাঁর কাছ থেকে আমিও আগে থেকে কোন নির্দেশ চাইতুম না পাছে বাঁধা পড়ি। অগাস্ট আন্দোলনে আমি নিজের বিবেচনামত চলতে চেয়েছিলুম, তিনি উপরপড়া হয়ে আমাকে উপদেশ দেননি।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল একদা লিখেছিলেন তাঁর ঠাকুমা, র‍্যান্ডল্‌ফ্ চার্চিল জমিদার-বংশে বিবাহ না করে ব্যবসায়ী বংশে বিবাহ করেছিলেন বলে, তাঁকে কখনও ক্ষমা করেননি। 'ব্যবসায়ী' কথার বদলে তাঁর ঠাকুমা 'দোকানদারী' কথাটি ব্যবহার করতেন। অথচ ঠাকুমা জানতেন র‍্যান্ডলফ্ যদি ব্যবসায়ী বংশে বিয়ে করে স্ত্রীর সম্পত্তি না পেতেন তাহলে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস থেকে চার্চিল নামটি বিলোপ পেত। র‍্যান্ডল্‌ফের স্ত্রী ছিলেন আমেরিকান, তাঁর বাবা লেনার্ড জিরোম নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী ছিলেন। বৃটিশ ও ভারতীয় আই-সি-এসদের রেওয়াজ ছিল জমিদারী বা পেশাদারী-বংশে বিয়ে করা। লিউয়েলিন দু'বিষয়ে সমাজে একটু নিচু স্থানে চলে যান। প্রথমত, তিনি ব্যবসায়ী-বংশে বিবাহ করেন, দ্বিতীয়ত, তাঁর স্ত্রীর পিতা ইংলণ্ডে বাস না করে ভারতে ব্যবসা করতেন।

আমি শুনেছিলুম মিসেস লিউয়েলিনের বাবার উত্তরপ্রদেশে অনেক অর্থকরী ফসলের চাষের জমি ছিল। রাডিয়ার্ড কিপলিং লিখে গেছেন: "কোন্ পিয়ানো বা ইংরেজ মহিলা তার স্বর বা রূপ ভারতবর্ষে এক গ্রীষ্মের বেশী অটুট রাখতে পারে?" মিসেস লিউয়েলিন কিন্তু ভারতে অনেক গ্রীষ্ম কাটানো সত্ত্বেও বেশ রূপসী ছিলেন। সেজন্য তিনি এবং তাঁর স্বামী ভারতীয় ইংরেজ সমাজে ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। কোন ইংরেজ আই-সি-এসের খুব পয়সা ছিল বলে আমার জানা নেই, বরং তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের আর্থিক অবস্থার পরিচয় দিতেন ক্লাবে তাঁদের

কত ধার আছে সেটি প্রকাশ করে। লিউয়েলিনের নিজের পয়সা থাকার কথা নয়, তাঁর স্ত্রীর সূত্রে তিনি অনেক অর্থ পান। পঞ্চাশের দশকে তিনি চাকরি ছেড়ে ভারতীয় চা অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করতেন। তখন তাঁকে নিত্য দেখেছি একটি হাল মডেলের রোল্‌স্ রয়েসের সিল্‌ভার ক্লাউড, আর তার ছোটভাই বেণ্ট্‌লি চালাতেন। কোকো ম্যাকার্টিচ পর্যন্ত, নতুন সিল্‌ভার ক্লাউড তো দূরের কথা, পুরনো একটি রোল্‌স্ রয়েসের বেশী যেতে পারতেন না।

লিউয়েলিনের স্থলে এক ভদ্রলোক এলেন আর-এস-টি জন। ১৯৩২ সালে চাকরিতে ঢোকেন, লিউয়েলিন ঢুকেছিলেন ১৯২৯-এ। কলকাতার বড়কর্তাদের থেকেও দুর্ভিক্ষ বিষয়ে জনের ঔদাসীন্য বেশী ছিল। দুর্ভিক্ষ যতই বাড়তে লাগল ততই যেন তাঁর সমবেদনা কমতে লাগল। মুন্সীগঞ্জের জন্যে তিনি কিছু করা পছন্দ করতেন না। চিন্তাও করতে চাইতেন কিনা সন্দেহ। রাদারফোর্ড আসার পর আমি সেপ্টেম্বরের শেষে ঢাকায় জনের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, চাল পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ করতে। জনের অফিসে দেখা করতে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড চওড়া সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ একটি দুপিঠ-ওলা সাইনবোর্ড। একপিঠে লেখা আছে, 'কালেক্টর সাহেব বাহাদুর আজ সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দপ্তরে থাকবেন কিন্তু কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না'। অন্যপিঠে লেখা আছে, 'কালেক্টর সাহেব বাহাদুর আজ দপ্তরে আসবেন না'। ফলে আমি তাঁকে ঢাকা ক্লাবে ধাওয়া করলুম, কারণ তখনকার কালে লাঞ্চের আগে বারোটা নাগাদ ছিল আরাম করে বসে পিংক্ জিন বা গিমলেট খাবার সময়। গিয়ে দেখি তার কোণে বসে তিনি দ্বিতীয় গ্লাসে পিংক্ জিন ঢালাচ্ছেন; আমাকে খেতে বললেন। আমি গ্লাস নিলে বললেন চালের কথা বাদ দাও। তার মানে তিনি চেষ্টাও করবেন না।

আরেকটি ব্যাপারে অন্যরকম দুঃখ পাই, যদিও ভদ্রলোককে আমি কখনও চোখে দেখিনি। তিনি জে-আর ব্লেয়ার, বাংলার চীফ সেক্রেটারি। ও-এম মার্টিন আমাকে পরে বলেন তিনি মেদিনীপুরে সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অতি কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেন। বাইরে থেকে সে-বিষয়ে আমার জানার কথা ছিল না। তবে নাগপুরের 'হিতবাদ' কাগজে ১৯৪৩-এর ২ অগাস্ট একটি সংবাদ বেরোয় 'আরেকটি সিভিলিয়ান চাকরি ছাড়লেন! একটা সেন্সর করা চিঠির ব্যাপারে।' এই সংবাদ ছাপার জন্য 'হিতবাদে'র বিরুদ্ধে কেস হল। ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ব্লেয়ার ছুটি নিয়ে সেই সঙ্গে অবসর চাইলেন। সরকার তাঁর ইস্তফা বিষয়ে নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয়সভায় একটি বাজে কৈফিয়ৎ দিলেন।

আগেই বলেছি জুন মাস থেকে অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে শুরু করল। চালের মণ হল পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা। রিলিফ কমিটিগুলি প্রথমে যে-সব পরিবার বছরে দশ টাকার কম ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স দিতেন তাঁদের রিলিফের চাল কম দামে বিক্রি করতেন। জুনের শেষ থেকে এই সীমা কুড়ি টাকা পর্যন্ত তোলা হল। তাতে উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, নিচুপদস্থ কর্মচারিদের কিছুটা সুবিধা হল। অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পরিবার চালের লাইনে দাঁড়াতে লজ্জা পেতেন, তাঁদের বরাদ্দ চাল রাত্রে বিলি হত। স্বেচ্ছাসেবকরা করতেন। এবিষয়ে বণিক সমাজ ঝুঁকি নিয়ে চাল আনার চেষ্টা করতেন। এই ধরনের কাজে, আগেই বলেছি, কম্যুনিস্ট ও মুসলিম ছাত্রলীগ খুব সাহায্য করত। জুন মাসে আমার ভয় হয়েছিল বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষে হয়তো হাজার ষাটেক প্রাণ নষ্ট হবে। রিলিফ কমিটিগুলির আপ্রাণ চেষ্টায় এবং পরে চাল আসাতে, আমার অনুমানে সবশুদ্ধ পঁচিশ হাজারের বেশী প্রাণ যায়নি, তার উপরে আরো হাজার পাঁচেক মৃত্যু হয় হাসপাতালে। কর্নেল কটার ও ফ্রেণ্ড্স্ অ্যাম্বুলেন্স ইউনিটের গ্ল্যান ডেভিসের কল্যাণে ব্লিচিং পাউডার এবং ওষুধপত্র পাওয়ায় কলেরা বা অন্য মারী একেবারেই হয়নি।

আগেই আমার সংসারের উল্লেখ করে বলার চেষ্টা করেছি মুন্সীগঞ্জের সাধারণ পরিবার কী কষ্ট পেয়েছেন। অগাস্ট মাস থেকে আমি মনে যে কষ্ট পেয়েছিলুম তার কথা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। আমার জীবনে এত মানসিক যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, একমাত্র ১৯৮১-৮২ সালে যখন আমার দৌহিত্র ক্যান্সার রোগে প্রাণ হারায়। একদিকে এত চেষ্টা এবং সকলের অকুণ্ঠ সাহায্য সত্ত্বেও কিছু না করতে পারার গ্লানি ও অনুতাপ, অন্যদিকে মৃত্যুর স্রোত। সারাক্ষণ চিন্তা কখন, কী করে ধানচাল আসবে। যে দেশ কয়েকমাস আগেও স্বাস্থ্য ও উদ্যমে টগবগ করত, সে যেন কাটা গাছপালার মত নিমেষে শুকিয়ে গেল। জুলাই পর্যন্ত লোকে কোনরকমে ছিল, সারা শরীরের শক্তি অল্পে অল্পে শেষ করে। অগাস্ট থেকে অন্তঃসারশূন্য হয়ে হঠাৎ ভেঙে পড়তে শুরু করল, সব অঙ্গ যেন খুলে-খুলে পড়ল। রাস্তায় যে লোক দেখতুম তাদের অর্ধেকের বেশীর চোখে শূন্যদৃষ্টি, সারা মুখচোখ শীর্ণ, গায়ের চামড়া যেন শুকনো কাগজের মত লেগে আছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই বেশ সময় নিত। হাড়গুলি বেরিয়ে এল, গৌতম বুদ্ধের আমরণ পণের তপস্যার মত। হাতে-পায়ের লোম মোটা মোটা কালো পিনের মত দাঁড়িয়ে উঠল। পরের মাসের মৃত্যুর দৃশ্যের থেকেও এই দৃশ্যগুলি আমার চোখে এখন বেশী ভেসে আছে। অল্পবয়স থেকেই মানুষ মৃত্যুর চিন্তা নিয়ে মনে নাড়াচাড়া করে। কিন্তু অপুষ্টির

আক্রমণে একটি পুরো দেশের লোক এইভাবে জলের মধ্যে নুনের মত গলে যাবে তা কখনই ভাবিনি।

শেষ পর্যন্ত, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কিছু কিছু ধানচাল যখন আসতে শুরু করল, তার আগেই শ'য়ে শ'য়ে প্রাণ যেতে শুরু হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় ঘুরে দেখা তো দূরের কথা, হার্বার্ট লাটভবন থেকে বেরোতেনই খুব কম। রাদারফোর্ড কিন্তু কলকাতার ভিতরে ও জেলাগুলিতে সর্বত্র আশার বাণী ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হার্বার্টের নেতিবাদ থেকে তিনি সুরাবর্দী ও নাজিমুদ্দিনকে নিজের দলে টেনে নিলেন। এমন-কি সুর বদলালেন। ৮ অক্টোবর রাদারফোর্ড এক রেডিও বক্তৃতায় দেশবাসীর কাছে আবেদন করলেন, সব বাদবিসংবাদ, দোষারোপ ভুলে গিয়ে সকলে একজোট হয়ে বাংলাকে যতশীঘ্র সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে। বক্তৃতাটি তিনি করলেন জেলায় জেলায় চাল পাঠাবার ব্যবস্থা করার পর। ফলে লোকের আস্থা হল। ১১ অক্টোবর দিল্লী গিয়ে তিনি লিন্‌লিথগো, তাঁর অনড় কাউন্সিল ও কর্মচারিদের নাড়া দিয়ে সবল করলেন।

২০ অক্টোবর ওয়েভেল শপথ নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদলে গেল। ২৬ অক্টোবর সস্ত্রীক কলকাতায় এসে রাদারফোর্ডের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে স্বচক্ষে অবস্থা দেখলেন, এর কথা আগেই লিখেছি। ২৯ অক্টোবর ওয়েভেল এক খাদ্য-সভার সভাপতিত্ব করলেন। ঘোষণা করলেন ভালভাবে ধানচাল সরবরাহ চালু করার জন্যে মেজর জেনরল এ-ভি-টি ওয়েকলি বলে একজন অফিসার নিয়োগ করবেন। মিটিং-এ সার্ভেণ্ট্‌স্ অভ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভ্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ্‌রু ওয়েভেলকে সাধুবাদ জানালেন। ওয়েকলি পদমর্যাদা ধরে বসে থাকার লোক নন, সোজাসুজি তাঁকে আমার কী প্রয়োজন জানানোতে তিনি এত খুশি হলেন যে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, যতদিন আমি মুন্সীগঞ্জে ছিলুম, ততদিন আমি যা চেয়েছি পাঠাবার চেষ্টা করেছেন। চিকিৎসার জন্যে ওষুধপত্র চেয়েও তাঁর কাছে তার পাঠাতুম। আমার মনে হয় উনিই আমার তার ও চিঠি পেয়ে কর্নেল কটারকে আমার কথা বলেন। কটার স্বয়ং নভেম্বর মাসে মুন্সীগঞ্জে এলেন।

তবে, আমার ধারণায় মুন্সীগঞ্জের বিষয়ে যিনি কর্তৃপক্ষকে সবথেকে বেশী অবহিত করলেন তিনি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ্‌রু। অক্টোবরে তিনি মুন্সীগঞ্জে আসেন ও একরাত্রি কাটান। বার্ধক্য ও ক্ষীণ স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি কয়েকটি লঙ্গরখানা ও হাস-পাতাল ঘুরে যতখানি সম্ভব নিজের চোখে সব দেখলেন, কথা শুনলেন। সেই-

সঙ্গে স্থানীয় কমিটিগুলির একাগ্রতা ও উৎসাহও নিশ্চয় তাঁর মনে দাগ কাটে। তিনি যাবার অল্পদিন পরেই সার্ভেন্ট্‌স্‌ অভ ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে একজন প্রতিনিধি কিছু খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্র পৌঁছে দেন। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজের সম্পাদক আর্থার মুর কুঞ্জ্‌রুর পরেই এসে নিজের স্বাক্ষরে মুন্সীগঞ্জের বিষয়ে তাঁর কাগজে সংবাদ পাঠান।

মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির তরফে ভগীরথ কানোরিয়া মুন্সীগঞ্জে সাহায্য পাঠান। তার সঙ্গে সাহায্য আসে কলকাতা রিলিফ সোসাইটি ও মুসলিম চেম্বার অভ কমার্স থেকে। ফ্রেণ্ড্‌স্‌ অ্যাম্বুলেন্স থেকে বেশ কিছু সংক্রামণনাশক ওষুধ, টীকা আর ইন্‌জেকশন পাঠানো হয়।

সবথেকে বেশী প্রাণনাশ হয় ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে। ২০ অক্টোবরের মধ্যে সারা মহকুমায় প্রায় একশ'টি লঙ্গরখানা চালু করি। প্রথমে দেয়া হত ফ্যানভাত। এখন শুরু হল তিনভাগ চাল, একভাগ মুসুর ডালের খিচুড়ি, তাতে থাকত একটু হলুদ, নুন, তেল আর তেজপাতা। আর থাকত সরু সরু করে কোটা আলু আর লাউ। যারা এতদিন অনাহারে ছিল বা ফ্যানভাত খেত তাদের হত অসম্ভব শোথ। সারা শরীর, বিশেষত হাত-পা ফুলে, ঠিক কাঁচা ডিমের সাদাটির রঙের, স্বচ্ছ ফোলা বেলুনের মত হয়ে যেত। যখন বহুদিনের উপবাসের পর মুখরোচক একটু খিচুড়ি পেল তখন লোভের বশে বারণ সত্ত্বেও অনেকখানি করে খিচুড়ি খেয়ে ফেলত। তাদের চোখের আকুতি দেখলে তাদের ধমক দেয়া সম্ভব হত না। বহুদিন অনাহারের পর নুন-তেল দেয়া খিচুড়ি অতিসারগ্রস্ত শরীরে বিষের কাজ করত এবং মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ হত। তাদের প্রাণশক্তি অবশ্য এতই ক্ষীণ হত, যে মারা তারা যেতই। তবে মারা যাবার আগে একটু মুখরোচক খাবার পেয়ে তাদের সাধ মেটার পর মারা গেল—এই চিন্তা আমাদের সান্ত্বনা দিত। স্ত্রীলোক আর শিশুই এইভাবে বেশী মারা গেল, কারণ তাদের শারীরিক অবস্থার পুরুষরা আগেই মারা গেছে। যারা মারা যেত তাদের মধ্যে নমশূদ্র, কারিগর ও মুসলমানের সংখ্যাই হত বেশী। এই লঙ্গরখানাতেই দেখেছি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মানুষ কীভাবে অমানুষ হয়ে যায়।

অবস্থা একটু ফিরতে শুরু করল। তবে অনেক মুমূর্ষু প্রাণ আহার সত্ত্বেও আর ফিরল না। তাদের শেষ অবস্থার কথা ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে সার বার্ট্‌ল্‌ ফ্রিয়র (Frere) তাঁর "On the Impending Famine" নিবন্ধে এইভাবে লিখেছিলেন:

মারা যাবার অনেকদিন আগে থেকেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মানুষ মূলত মৃত্যুপথের পথিক হয়েই বেঁচে থাকে, অর্থাৎ তাদের ফেরাবার উপায় থাকে না। এমন অবস্থা হয় যখন অত্যন্ত স্নেহ যত্ন ও বিজ্ঞানসম্মত শুশ্রূষা সত্ত্বেও প্রাণশক্তি এত কম থাকে যে সাময়িকভাবেও স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে আসে না। দুর্ভিক্ষের পরিণাম হিসাবে, মৃত্যু ছাড়াও আসে নানা ধরনের জ্বর ও মহামারী, যার দণ্ডও কিছু কম হয় না।"

আরো ছোট ছোট সাহায্য আসতে শুরু করে বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি, বাংলা মহিলা খাদ্য কমিটি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও পিপ্‌ল্‌স্ রিলিফ কমিটি থেকে। এতদিনে আমার একটি সংকোচ কেটে গেল। সেটি ট্রেজারি রুল ২৭-এর বলে ট্রেজারি থেকে টাকা তোলা। ট্রেজারির এই নম্বর রুলটি বিশেষ প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতার ফল। এর বলে অত্যন্ত জরুরী অবস্থায়, যখন সরকার থেকে অনুমতি নেবার অবস্থা বা সময় থাকে না, তখন স্থানীয় কোষাগারের প্রশাসক কোষাগার থেকে নিজের ঝুঁকিতে টাকা ওঠাতে পারতেন। এতে প্রশাসকের উপর সরকারের বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ পেত। যে অর্থ তোলা হত সে অর্থ কোষাগারেই একটি সীলমোহর করা ব্যাগে থাকত। প্রয়োজনমত সেই সীল প্রতি-বার ভেঙে টাকা তুলে আবার সীল করা হত। এই টাকা খরচের খুব নিখুঁত হিসাব রাখতে হত। প্রতিবারই প্রদেশের রাজস্ব বিভাগে জানাতে হত। একটু কিছু তঞ্চকতা হলে প্রশাসক মুস্কিলে পড়তে পারতেন। সে বহুবছর পরেও হতে পারত। সেই কারণে ১৯৪৩-৪৪-এর এই সংক্রান্ত কাগজপত্র এখনও আমার কাছে আছে।

সুরাবর্দীর সফর

সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দীর অফিস থেকে লিখে জানালেন মন্ত্রী মুন্সীগঞ্জে সফরে আসবেন। আমি তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ করি এবং সেইসঙ্গে রাত্রির আহারে। ২৮ নভেম্বর অপরাহ্ণে তিনি ষ্টীমারে এসে পৌঁছবেন, মুন্সীগঞ্জে রাত্রিবাস করে পরের দিন যাবেন। তখনকার দিনে মন্ত্রীরা পদমর্যাদা বিষয়ে এখনকার মত স্পর্শালু ছিলেন না। আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। মন্ত্রীর ষ্টীমার ঠিক সময়ে ঘাটে ভিড়ল। ততদিনে খাদ্যের অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। লোকের মনে যদিও ক্ষোভ ছিল, তবু ষ্টীমারঘাটে কোন প্রতিবাদ বা সোরগোল হয়নি।

হরগঙ্গা কলেজের প্রকাণ্ড খেলার মাঠে প্রায় পাঁচশ' লোকের জনসভায়

সুরাবর্দী মহকুমার দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করলেন। বক্তৃতা শেষ হলেই একজন উকিল গলায় চাটুকারিতার সুর ঢেলে তাঁকে স্বর্গ থেকে আগত লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করে বললেন, এত মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী, কেন তিনি মন্ত্রীমশায়কে যথাসময়ে বিপদের গুরুত্বের কথা জানাননি, তা যেন মন্ত্রীমশায় নির্ণয় করেন। সুরাবর্দী এই কথা শুনে যেন নিজের অবহেলা স্খালনের একটি সুযোগ পেলেন। লাফিয়ে উঠে বললেন, সত্যিই তাই। উনি শত শত কোটি টাকা এই কয়মাসে খরচ করেছেন, কেউ যদি তাঁকে সময়মত একটু জানাতো তাহলে তাঁর পক্ষে আরো এক-আধ ক্রোড় খরচ করে মুন্সীগঞ্জে চাল পাঠানো কিছু কঠিন ব্যাপার হত না।

রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে গত দশমাসে যে অবহেলা পেয়েছি তার উপরে এই ধরনের বোঝার উপর শাকের আঁটি সহ্য করা আমার পক্ষে একটু বেশী মনে হল। বিশেষত যাঁদের দুঃখকষ্টে আমি এতকাল নিজের মত করে ভাগ নিয়েছি তাঁদের মুখ থেকে এই নালিশ শুনে। উপরন্তু আমার মুখরক্ষারও তো একটা প্রশ্ন আছে। শুধু আত্মসম্মান নয়। যার ওজন গত ছয় মাসে ১৩৫ পাউণ্ড থেকে ১০০ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে তার যদি একটু আত্মকরুণা হয় তাহলে কি খুব দোষ দেয়া যায়! প্রতিবাদ না করলেই নয়। আমিও লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম মন্ত্রী এখনি যা বললেন তাতে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। তাঁর দপ্তরে তাঁকে সবকিছু জানাবার যাঁর দায়িত্ব, তিনি এতমাস ধরে কেন আমার সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম মন্ত্রীর গোচরে একেবারেই আনেননি তা বার করা উচিত।

সুরাবর্দী রাগতভাবে উঠে পড়লেন। সভাভঙ্গ হল। সুরাবর্দীর সচিব, আমার কলেজের মাস্টারমশাই অপূর্ব চন্দ, ঠাণ্ডা মাথায় মন্ত্রীকে আমার বাড়ি নিয়ে চললেন। ইদ্রাকপুর ফোর্টের ছাপান্নটা উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙে চাতাল পার হয়ে বাড়ির বসার ঘরে ঢোকার আগেই রাগ চাপতে না পেরে সুরাবর্দী ফেটে পড়লেন, কেন আমি তাঁর মুখের উপর কথা বলেছি। আমারও মেজাজ তখন গরম। বসার ঘরে সুরাবর্দী, চন্দ, মন্ত্রীর সহকারী সচিব নীহার চক্রবর্তী, এস-ডি-পি-ও আহমদ, এম-এল-এ বিক্রমপুরী বসতে না বসতেই আমি গলা উঁচু করে বললুম, মন্ত্রীমশায় নিশ্চয় মনে করেননি তিনি যা বলবেন আমি সব চুপচাপ হজম করে নেব, বিশেষত তিনি যখন আমার মহকুমাবাসীর সামনে আমাকে অভিযুক্ত করলেন। অপূর্ব চন্দ মাঝখানে বসে আমাদের শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুরাবর্দী তো ষণ্ডাগণ্ডা লোক, উঠে মারমুখো হয়ে আমার সামনে এসে আমার চোখে

তাকিয়ে আবার বললেন, 'তোমার বলা উচিত হয়নি।' আমিও দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর চোখে চোখ রেখে বললুম, 'যদি প্রয়োজন হয় আবার বলব।'

সে মুহূর্তে আমাকে নিশ্চয় গোলায়াথের সমুখে ডেভিডের মত দেখাচ্ছিল। আসলে, সমস্ত দৃশ্যটি নিশ্চয় যারপরনাই কমিক হয়েছিল। প্রফেসর চন্দর ভয় হল আমরা না হাতাহাতি করি। দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সত্যিকারের সভ্যলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে আমার প্রকাণ্ড চোঙাওলা ই-এম-জি হাতে তৈরি গ্রামোফোনের প্রতি সুরাবর্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ভারতবর্ষে ঠিক ওর দ্বিতীয়টি নেই। সুরাবর্দী ইউরোপীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। আমি ভিতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললুম, বসার ঘরে তাঁর আসার প্রয়োজন নেই, বেয়ারা মোজাফ্‌ফরের হাতে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিতে। নিঃশব্দে চটপট চা খেয়ে সুরাবর্দী গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে সামান্য ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেলেন।

রাতে আহমদ আমাদের বাড়িতে সুরাবর্দীর জন্যে করা ডিনারে ভাগ বসালেন। আমি আর বিক্রমপুরীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম না। পরের দিন মন্ত্রী আর চন্দ লৌহজঙ্গে গেলেন, তাঁদের লঞ্চে। আমি ফেরী স্টীমারে গেলুম। অপূর্ব চন্দ মন্ত্রীর সঙ্গে না থেকে ম্যাকার্টিচের বাড়িতে আমার সঙ্গে আমার ঘরে রাত কাটালেন। প্রোফেসর চন্দ আমাকে সদুপদেশ দিলেন, তার আগে বললেন সুরাবর্দী বড় স্পর্শকাতর লোক, সহজে অপমান ভোলার পাত্র নয়। ১৯৪২-এর নভেম্বর থেকে এপর্যন্ত ধানচাল চেয়ে যত চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, মায় চিরকুটটি পর্যন্ত, যেন জোগাড় করে কালক্রমিকতায় সাজিয়ে প্রত্যেকটির একাধিক কপি করে কয়েক সেট তৈরি করে ফেলি। তার সঙ্গে সমস্ত সংগ্রহটির বিশদ কালক্রমিক সূচী করি। প্রত্যেকটির সারার্থ লিখে রাখি। এই যে উপদেশ তিনি দিলেন, প্রোফেসর চন্দর শরীর সোনা দিয়ে ওজন করলেও তার দাম উঠত না।

মৌচাকে ঢিল পড়ল। সেই থেকে ১৯৪৪-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতা থেকে একের পর এক আগমন শুরু হল, মুখে বলতেন দেখতে এসেছেন, আসলে সরেজমিনে তদন্ত করতে।

র‍্যাদারফোর্ড ; তদন্ত

সুরাবর্দীর অব্যবহিত পরেই ডিসেম্বরে এলেন র‍্যাদারফোর্ড স্বয়ং। বুঝলুম সুরাবর্দী ফিরে গিয়ে হৈচৈ করেছেন। আমার বিশ্বাস র‍্যাদারফোর্ড পণ্ডিত কুঞ্জ্রুর কাছে শুনেছিলেন মহকুমার কী দুর্দশা হয়েছিল এবং আমরা কী কী করেছি। মুন্সীগঞ্জ ঘাটে তাঁকে আনতে গেলুম। জিগ্যেস করলেন, এস-ডি-ও নেই? আমার ধারণা ছিল না আমার চেহারায় চোখে পড়ার মত কোন ব্যক্তিত্বই ফুটে ওঠে না, এতই সাধারণ। থতমত খেয়ে বললুম আমিই এস-ডি-ও। নিশ্চিন্ত হবার জন্য আবার জিগ্যেস করলেন, আমি কি আই-সি-এস? আমি একটু চুপসে গিয়ে মাথা নেড়ে জানালুম, হাঁ। নিজের উপর রাগ হল, একটুও কেউকেটা দেখাচ্ছে না বলে। উনি ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে রিলিফ কাজের কথা পাড়লেন, বললেন, এক-আধ জায়গায় যেতে পারেন কি? আমি তখুনি ম্যাপ খুলে তাঁর সমুখে ধরলুম, তিনি ফস করে একজায়গায় আঙুল লাগিয়ে বললেন, ওখানে পণ্ডিত কুঞ্জ্রুও গেছলেন কিনা। না বলাতে, তিনি ওখানেই যেতে চাইলেন। পৌঁছে যখন দেখলেন কারোকে কিছু জানানো হয়নি, সকলেই তিনি কে চুপিচুপি জানতে চাইছে, তখন তিনি খুশি হয়ে সাইকেল করে কয়েকটি রিলিফ কেন্দ্র আর হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে তিন ঘণ্টা কাটালেন। লঞ্চে ফিরে এসে প্রসন্নমুখে আমাকে বসিয়ে নিজের হাতে পিংক্ জিন বানিয়ে খেতে দিয়ে প্রশ্ন করলেন আমি ওঁর এ-ডি-সি জন আরউইনকে চিনি কিনা। কলকাতায় বিষ্ণুবাবু, যামিনীবাবুর বাড়িতে তার আগে জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বললুম হ্যাঁ। বললেন, বেচারী বড় খেটেছে, একটু ছুটি নিতে চায়, আমার কাছে যদি পাঠান তবে আমি জনকে একটু নৌকো করে বেড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি কি? উদ্দেশ্য বোধহয় জন যাতে নিজের চোখে মহকুমার ভিতরের অঞ্চলগুলি একটু দেখে। সাতদিনের মধ্যে জন এসে আমার সঙ্গে লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর প্রভৃতি জায়গা নৌকো করে তিনদিন ঘুরলো, অনেক সুন্দর সুন্দর লক্ষ্মীর সরা ওকে কিনিয়ে দিলুম (আমার বাড়িতে সরা দেখে ওর খুব শখ হয়েছিল)।

এরপর এলেন এইচ-এস-এম ঈশাক। ইতিমধ্যে আমার কাগজপত্র চন্দ'র কথামত সব সাজিয়ে ফেলেছি। আমার স্টেনো হুসেন দিনরাত টাইপ করে সব তৈরি করে ফেলেছিল। ঈশাক প্রথমে একটু বড়সাহেবি চাল শুরু করেছিলেন, কাগজপত্র দেখে অল্পক্ষণেই ভদ্রলোকের মত আমাদের দুজনের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। এই সময়ে আমি সমস্ত কাগজপত্র কমিশনার এ-এস-লার্কিনের কথামত মন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে কলকাতার কয়েকজন অফিসারের কাছে রেজেস্ট্রিডাকে পাঠিয়ে দিলুম।

তার সঙ্গে চন্দকে এক সেট, মন্ত্রীর পরিদর্শন উল্লেখ করে। লার্কিন আমাকে এবিষয়ে চিন্তা করতে বারণ করলেন। এই ব্যাপারে রাজস্বসচিব এ-এম ব্যানার্জি সম্বন্ধে আমার একটু খারাপ ধারণা হল। উনি নাকি আমার জ্ঞাত্যার্থে কাকে বলেছিলেন সুরাবর্দীকে চটিয়ে দিয়ে আমি খুবই নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছি, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না, মুস্কিলে পড়ব।

কিন্তু, যে ভদ্রলোক আমাকে পুরো তিনদিন নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে বেড়ালেন এবং যাঁর কাছে শিখলুম পুরনো যুগের আই-সি-এসরা কীরকম ধারায় কাজ করতেন তিনি হলেন ও-এম মার্টিন। লিউয়েলিন, লার্কিনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু যে ধরনের পণ্ডিত ও নিবেদিতপ্রাণ আই-সি-এসদের কল্পনা করে মনে মনে পূজা করতুম এঁরা ঠিক সেরকম ছিলেন না। জে-আর ব্লেয়ার চাকরি থেকে ইস্তফা দেবার পরে মার্টিনকে চীফ সেক্রেটারি হতে বলা হয়েছিল। তিনি চীফ সেক্রেটারি হতে অস্বীকার করায় তাঁকে রিলিফ কমিশনার করা হয়। মুন্সীগঞ্জে আসার আগেই তিনি আমার সব কাগজপত্র দেখে রেখেছিলেন মনে হল। স্বভাবতই আমি তাঁকে আমার বাড়িতে থাকতে বলিনি (তিনি আসছেন আমার কাজ দেখবেন বলে)। যে তিনদিন তিনি মুন্সীগঞ্জের ডাকবাংলায় ছিলেন জ্বরে ভুগলেন, বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। রোজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে খেতে আসতেন।

এটি ছিল ১৯৪৪-এর জানুয়ারি, মুন্সীগঞ্জে বেশ শীত পড়ত। জ্বর গায়ে প্রতিদিন ভোর ৬টায় তৈরি হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতেন। পিঠে একটি রুকস্যাক বোঁচকা, তার মধ্যে দুই বড় বড় বোতল খাবার জল, এক বাক্স স্যাণ্ডউইচ, একটি শার্ট, পুলোভার, একজোড়া মোজা ও জুতো। আমি পৌঁছলে তিনি ম্যাপ খুলে একটা অঞ্চলে আঙুল লাগিয়ে বলতেন, চল এখানে যাই। তারপর জিগ্যেস করতেন ওখানে কী কী জিনিস উনি দেখতে পাবেন, কতগুলি লঙ্গরখানা, হাসপাতাল, কী ধরনের লোক চালাচ্ছে ইত্যাদি। নোটবইয়ে সব টুকে নিতেন। তারপর দুজনে সাইকেলে রওনা হতুম। গায়ে জ্বর, বয়স প্রায় ষাট, আমার মাত্র সাতাশ। তা সত্ত্বেও মুন্সীগঞ্জের খারাপ কাঁচা রাস্তায়, আধমাইল অন্তর সাইকেল ঘাড়ে করে খালের উপর একতক্তার সাঁকো পার হয়ে তিনি প্রতিদিন গড়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল ঘুরতেন। যখনই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতেন আমাকে সদর-রাস্তার মোড়ে গাছতলায় বসতে বলে, নিজে সাইকেল চড়ে গ্রামের দিকে চলে যেতেন। পূর্ববঙ্গের টানে বাংলা বলতে পারতেন। যথেষ্ট সময় নিয়ে দেখে এসে পরিহাসের সুরে বলতেন 'জানো, মিত্র, যা বলেছো হুবহু তাই। মায় কোণে

ফিল্টারের সেই ভাঙা কলসিটা শুদ্ধ। আর ঐ যে লোকটা, সত্যিই হীরের টুকরো ছেলে, নয় কি?' দ্বিতীয় দিনের ট্যুরে ওঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হল। এই ধরনের কথা বললেই বলতুম আপনি কি ভেবেছিলেন আমি ধাপ্পা দেব? আপনাকে তো আগেই বলেছি, কোনটা জানি না তাও বলব! তারপর দু'জনে ধীরেসুস্থে গাছ-তলায় বসে যে-যার লাঞ্চ খাওয়া। ভাবখানা যেন দিনের খাটুনির উপযুক্ত মজুরী পেয়েছি। খাওয়া শেষে আবার পাড়ি।

মুন্সীগঞ্জ যখন ছাড়লেন বেশ বোঝা গেল জ্বরগায়ে পরিশ্রমে বেশ ক্লান্ত। এমন ছেলেমানুষ, স্টীমারঘাটে লোক ওঠানামার তর সয় না, বেয়ারার হাতে জিনিস দিয়ে, টপ করে রেলিং-এর উপর লাফ দিয়ে কেবিনের জানালা গলিয়ে কেবিনে ঢুকে আমার দিকে দাঁত বের করে হাসি। তারপর সস্নেহ কণ্ঠে বিদায় নিলেন। তিনিই আমাকে ব্লেয়ারের ইস্তফার কথা বলেন, শ্যামাপ্রসাদের থেকেও কড়াভাষায় তিনি মেদিনীপুরের অত্যাচারের নিন্দা করেছিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা গরমজলে স্নান করে খেতে আসতেন, দশটা-সাড়ে-দশটা অবধি গল্প করে হাসিয়ে গৃহকর্ত্রীকে তাঁর আতিথেয়তার প্রতিদান দিতেন।

জে-জি ডানলপ, আই-সি-এসের গল্প বললেন। ভদ্রলোকের জজিয়তি কাজ একদম পছন্দ ছিল না। গ্রীষ্মকালে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে খালি গায়ে গোসল-খানায় একটা টিনের টবে জলে বসে বইপড়া ছিল কাজ। আফিস থেকে কেউ কাগজপত্র সই করাতে আসলে বই থেকে চোখ না তুলে বলতেন, 'আংলি লাগাও।' আঙুল লাগালে তিনি বড় বড় করে সই করতেন জে-জি ডানলপ। তারপর কাগজ-গুলি ঠেলে দিয়ে চাপাগলায় কেরানিটিকে বলতেন 'ফাইল জাহান্নামে যাক।' তাঁর আপীল শোনার গল্প শুনে পেট ফাটার দাখিল হয়। এজলাসে জজের টেবিলে বসে একটি ডবল ফুলস্ক্যাপ কাগজ টেবিলের উপর পেতে আপনমনে লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় গোল বৃত্ত এঁকে ঠিক মধ্যিখান কালি দিয়ে একটি কালো কেন্দ্র করতেন। এদিকে দুইপক্ষ তাদের সওয়াল করছে। কাগজে আঁকা শেষ হয়ে গেলে, উকিলের আর্জি মাঝপথে থামিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন, 'বাস্ খতম।' অর্থাৎ ঢের হয়েছে, থামো। তারপর উঁচুগলায় চাপরাশিকে ডাকতেন। চাপরাশি নিজের কাজ জানত। আঁকা কাগজটি দুহাতে মেলে সে কাছারির উঠানে একটি অশ্বত্থগাছের গুঁড়ি বেয়ে ডালের উপর কাগজ মেলে দিয়ে সুতো দিয়ে চারদিক বাঁধত। ডানলপ কিছুক্ষণ পরে হাতে একটি এয়ারগান নিয়ে বেরিয়ে আসতেন। কাগজের দিকে তাগ করে দুম্ করে বন্দুক ছুঁড়তেন, যদি কালো বিন্দুতে গুলি

লাগত, আপীল মঞ্জুর। যদি ফসকে যেত, আপীল ডিস্‌মিস্‌। এইসব রত্নগুলি সারাজীবন মনে রেখেছি আর গল্প করেছি। মার্টিনের মত ছেলেমানুষও আজকাল নেই, ডানলপের মত ইংরেজিতে যাকে বলে ক্র্যাংক, অর্থাৎ মাথাখারাপ, তাও নেই।

মার্টিনের মত একটিমাত্র বাঙালি অফিসার আমি দেখেছি, সত্যেন্দ্রনাথ রায় নম্বর ২। আমার চীফ সেক্রেটারি ছিলেন পাঁচের দশকে। তিনিও আমার মতে একটি ক্র্যাংক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ডানলপের কাছাকাছি যায় এমন একটি গল্প এখানে না বলে পারছি না, আরো অনেক গল্পের মধ্যে। উনি কোট, টাই, জুতো মোজা পরতেন একমাত্র পণ্ডিত নেহরুকে দমদম থেকে আনতে যাবার সময়ে। তা না হলে তাঁর পোশাক ছিল বুশশার্ট আর চপ্পল। গৃহসচিব, মৃগাঙ্কমৌলি বসু, কিন্তু সর্বদা পুরোদস্তুর সাহেবী পোশাক পরে থাকতেন। দু'জনে পাশাপাশি ঘরে বসতেন। চীফের ঘরটি ছিল প্রকাণ্ড, গৃহের ঘরটি ছিল ছোট্ট। প্রতিদিন লাঞ্চের সময়ে রায় বসুর ঘরে বসে 'স্টেট্‌সম্যানে'র ক্রসওয়ার্ড করতেন, মাঝে মাঝে অবশ্য চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে ভারতভবনের মুখোমুখি ইণ্ডিয়া কফি হাউসে যেতেন। একদিন বসুকে বললেন, 'দেখ, মৃগাঙ্ক, রোজ রোজ আমি তোমার লাঞ্চে ভাগ বসাই, আমার খারাপ লাগে, চল কাল তোমাকে লাঞ্চ খেতে নিয়ে যাব।' বসু তাঁর অননুকরণীয় বাগবাজারী 'স' উচ্চারণে বললেন, 'তুমি তো জানো, অশোক, আমি লাঞ্চে কী খাই, তাতে আবার ভাগ বসানো—একটি সন্দেশ আর দু'তিনটি কালোজাম'। রায় নেমন্তন্ন করেছেন বলে পরের দিন আরেকটু ফিটফাট হয়ে এলেন। বেলা পৌনে একটায় রায় ঘরে ঢুকে বললেন, 'চল, মৃগাঙ্ক, যাই।' ঝরঝরে ভক্সহল গাড়িতে, মৃগাঙ্ককে পাশে বসিয়ে, স্টার্ট দিয়ে রায় বললেন, 'মৃগাঙ্ক, আজ তোমাকে এমন জায়গায় লাঞ্চে নিয়ে যাব, যেখানে জীবনে যাওনি। তোমার ফারপো, গ্রেট ইস্টার্ন নয়, দেখবে এমন রান্না হয় না।' মৃগাঙ্ক আমাকে বললেন, 'জানো, অশোক, ঘুরতে ঘুরতে আমরা শেষে মেছোবাজার স্ট্রীটে দেখে-ভক্তি-হয় না এমন একটা খাবারের জায়গায় পৌঁছলুম, "পাইস হোটেল" গোছের।' "মৃগাঙ্ক, এইখানে যা কবিরাজি কাটলেট করে, কোথাও সেরকমটি হয় না। এখুনি বুঝতে পারবে"। আচ্ছা, অশোক, ভেবে দেখো একবার, বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি আর হোম সেক্রেটারি মেছোবাজারের এক এঁদো পচা দোকানে খেতে বসেছে। "মৃগাঙ্ক, তুমি তো বিরাট ধরনের লাঞ্চ খেতে চাও না, নয়কি ?" আমি বললুম, "আপনি তো জানেনই, আমি কী খাই"। বললেন, "এক কাজ করা যাক, একখানা কবিরাজী কাটলেট অর্ডার দেয়া যাক—খুব বড় হয় জানো—তাই আমরা

দুজনে ভাগ করে খাব'। উনি একটাই কাটলেট অর্ডার দিলেন, আর বিশ্বাস করবে আমরা দুজনে সেটি ভাগ করে খেলুম ! ভাবতে পারো দোকানের মালিক আমাদের বিষয়ে কী মনে করলে !'

এখনও পর্যন্ত মার্টিন বা রায়ের মত তীক্ষ্ণধী অথচ ক্র্যাংক অফিসার দেখিনি, যাঁদের বিন্দুমাত্র হামবড়াই বা চাল ছিল না। সুরাবর্দীর সঙ্গে হাঙ্গামা না হলে হয়তো কোনদিন মার্টিনের সঙ্গে আলাপ হত না, আমারই ক্ষতি হত ! পরে, একমাত্র দিল্লীর হোম সেক্রেটারি, বিশ্বনাথন, যিনি পরে কেরলের লাট হন, তিনি কিছুটা এরকম ছিলেন। তাঁর একটি কথা আমার কানে এখনও লেগে আছে। আমি সেন্সাস কমিশনার হয়ে ১৯৫৮-এর জুলাইতে দিল্লীতে যোগ দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বললেন, 'সত্যেন রায় তোমার সম্বন্ধে ভাল লিখেছে। চমৎকার লোক রায়; জানো, লোকটার সাহস আছে বলতে হবে। একমাত্র সিভিল সার্ভেন্ট যে রোজ রাত্রে এক মন্ত্রীর বিছানায় একসঙ্গে শোয় ! হা হা হা !' রায়ের স্ত্রী, শ্রীমতী রেণুকা রায় তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে মন্ত্রী ছিলেন।

শেষ পর্যায়

১৯৪৪-এর মে মাসে সব হাঙ্গামার ফয়সালা শেষ হল। তার আগে এপ্রিল মাসে আমার এক অগ্রজ অফিসার কার্সিয়ঙ দিয়ে যাবার সময়ে আমাদের কাছে চা খেতে এসে বললেন কলকাতায় যখন যাব তখন যেন সুরাবর্দীর সঙ্গে দেখা করি। মে মাসে কলকাতা গেলুম। ১৯৪০ সালের নভেম্বরে প্রথম রাইটার্স বিল্ডিংস্‌-এ যাই, এই দ্বিতীয় বার। সরবরাহ মন্ত্রীর ঘরের সামনে চাপরাশিকে কার্ড দিতে সেকণ্ডের মধ্যে ঘরে ডাক পড়ল। সুরাবর্দী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে চেয়ারে বসিয়ে নিজে বসলেন। দু'একটি হাসি-কৌতুকের পর বললেন, 'মিত্র, তুমিই ঠিক কথা বলেছিলে, আমি মোটেই ঠিকমত খবর পাইনি।' ওঁর এই কথার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না, ভেবেছিলুম সে-কথা উত্থাপন না করে মিষ্টি কথায় বিদায় করবেন। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করে বিদায় নিলুম। কার্সিয়ঙে কাঁকিনার রানীর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল। আমি কার্সিয়ঙ থাকাকালে যখনই উনি কাঁকিনার বাড়িতে এসেছেন, দেখা হলে ভদ্র ব্যবহার করেছেন। আজকাল কোন্ মন্ত্রীর এমন বংশমর্যাদাবোধ আছে যে তিনি আপনবংশজাত ভদ্রতাকে তাঁর ক্ষুদে মন্ত্রীত্বের অহঙ্কারের উপরে স্থান দেবেন ?

একমাত্র পাইকপাড়া বংশের মন্ত্রী বিমল সিংহকেই দেখেছি, তাও প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা একটু বলে শেষ করি। দ্বিতীয় পর্যায়ে হয় দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের শুশ্রূষা ও হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা। শুরু হয় ১৯৪৩-এর নভেম্বরের প্রথমে। যুদ্ধের সময়ে রুশেরা রাতারাতি কী করে মেঠো হাসপাতাল (ফেল্ডশেরিস্তা) তৈরি করত আমাদের তখন জানা ছিল না, বিশেষত তারা অল্পসময়ে হাসপাতাল কর্মীদের কী করে শিক্ষা দিত। ভাগ্যক্রমে ১৯৩৮ সালে জন্‌স্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হেনরি সিজারিস্টের লেখা 'সোশ্যালিস্ট মেডিসিন ইন দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' বইটি কিনেছিলুম। বইটি এই সময়ে খুব কাজে লেগে গেল।

ডাঃ মন্মথ নন্দী, মেজর আয়ার, ডাঃ শৈলেন দাশ আর আমি মিলে হাসপাতালে কী কী যন্ত্রপাতি দরকার তার তালিকা তৈরি করে, দুর্ভিক্ষত্রাণের ডিরেক্টর জেনরল স্টুয়ার্ট আর ফ্রেণ্ড্‌স্ অ্যাম্বুলেন্সের গ্ল্যান ডেভিসকে দিলুম। তিনজনে মিলে নতুন হাসপাতাল কর্মীদের জন্যে সরল ভাষায় বিশদ নির্দেশ লিখলেন। কী করে রোগী ভর্তি করতে হয়, আরাম দিতে হয়, কী ওষুধপত্র উপকারী, কী করে অন্তিম অবস্থার রোগীর শুশ্রূষা করতে হয়, তার কী কী খাওয়া নিষিদ্ধ, কী করে খুব ধীরে ধীরে পুষ্টি বাড়াতে হয়। তার সঙ্গে একটি 'অবশ্য' লিস্ট ছিল, কী কী করবে, আর কী কী করবে না। স্টেরিলাইজার না থাকলে, কী করে বড় ডেগচিতে তিনভাগ জল ঢেলে, যন্ত্রপাতি ডুবিয়ে, ঢাকনা ডেগচির সঙ্গে মাটির প্রলেপ দিয়ে সীল করে, ঢাকনির উপর দশ-পনেরো সেরের পাথর বা ইট চাপিয়ে, অন্তত আধঘণ্টা ফোটাতে হবে। এরকম অনেক খুঁটিনাটি নির্দেশ ছিল।

জানুয়ারি মাসের মধ্যে মহকুমার কুড়িটি ডিস্‌পেন্সারিতে কুড়িটি কুড়ি-বেড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হল। তাছাড়া ছিল ডাঃ নন্দীর শ্রীনগর হাসপাতাল, আর ডাঃ দাশের মুন্সীগঞ্জ হাসপাতাল। তার উপরে হল মেজর আয়ারের ২০০-বেড হাসপাতাল। মহকুমায় যত এল-এম-এফ. এল-এম-এস ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার ছিল তাদের কাজে ভর্তি করা হল। কর্নেল কটার, জেনরল স্টুয়ার্ট, ডেভিস সাহায্য করলেন। ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারির গোড়ায় সব মিলিয়ে সাতশ' বেডে রোগী ভর্তি হল। অল্পবয়স্ক রাজনৈতিক কর্মীরা রোগী আনা-নেয়া, যাবতীয় তদারকি কাজ সযত্নে করতেন।

জীবনে বিশেষ কিছু কাজে লেগেছি একথা বলতে পারি না, তবে এইটুকু দাবি করতে পারি যে অন্তত দশ হাজার ছেলেমেয়েকে আমি অকালমৃত্যু, জীর্ণতা, অঙ্গ-হানি ও বিকৃতি থেকে বাঁচিয়েছি। সারা কর্মজীবনে আমি অন্তত দশ-বারো হাজার ছেলেমেয়েকে বসন্তের টীকা ও কলেরার ইঞ্জেকৃশন দিয়েছি। মুন্সীগঞ্জেই তার হাতেখড়ি হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের কী করে ভুলিয়ে টীকা বা ইঞ্জেকৃশন দিতে হয় ফন্দি বার করলুম। তখনকার দিনে নানারঙের চিনির গুলি লজেঞ্চুস নামে পাওয়া যেত, পয়সায় আট দশটা করে। তারই একটি ঠোঙা পকেটে পুরে প্রাথমিক স্কুলে ঢুকে ছেলেমেয়েদের গল্প বলতে শুরু করতুম। তখনকার দিনে টীকার কাঠি বা ইঞ্জেকৃশনের সিরিঞ্জ দেখলেই ছেলেরা দৌড় দিত। লজেঞ্চুস বিলি আর গল্প করতে করতে বীরপুরুষ মনিটরকে ধরে টীকা আর ইঞ্জেকৃশন দিতে পারলেই অর্ধেক যুদ্ধ জয় হত। তাকে খুব প্রশংসা করে, মাথায় তুলে, এই কাজটি করতে হয়। তারপর মনিটরই সকলকে জড়ো করে এনে দিত।

টি-আর ২৭ রুলে টাকা তুলে, টাকার ও সব মালমশলার নিখুঁত হিসাব রেখে, লঙ্গরখানা আর অন্যান্য খাতে কত টাকা ও জিনিসপত্র দেয়া হয়েছে তার হিসাব ও প্রত্যেকটির রসিদ রেখে কমিটিগুলি দিয়ে এসব করিয়ে নিতে অনেক মেহনত ও নেতৃত্বের প্রয়োজন হত। এ বিষয়ে আমার দুই অফিসার আবুল খয়ের ও এস-এম ভট্টাচার্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন। এত বিরাট কাজের যখন অডিট হল তখন আপত্তির কোন কিছু বেরলো না। তাঁদের সাহায্য করত মোটামুটি জন পনেরো কেরানি। এই কাজ করার জন্যে মাস তিনেক পরে এল প্রায় আশি জন অফিসার ও কেরানি। এতেই বোঝা যায় রিলিফ কমিটিগুলি কী উৎসাহ ও সততার সঙ্গে মুন্সীগঞ্জের দুর্ভিক্ষে কাজ করেছিলেন।

বিদায় ও পুনর্মিলন

যে কোন বড় কাজে নিয়মিত তদারক ও মাঝে মাঝে আকস্মিক পরিদর্শনের গুরুত্ব কতখানি হতে পারে সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে যতদিন না মুন্সীগঞ্জ থেকে বদলি হই ততদিন আমি রোজই কোন না কোন রিলিফের কাজ তদারক করে বেড়াতুম। আমার রীতি ছিল খবর পাঠানো অমুক দিনে অমুক স্থানে দেখতে যাব। সেদিন ‘ক’-স্থানে না গিয়ে আমি ‘খ’-স্থানে গিয়ে অন্য একটি রিলিফের কাজ দেখতুম। ‘ক’-য় যেতুম অন্য একদিন,

যা আমি আগে থেকে জানাতুম না। ফলে রিলিফ কেন্দ্রগুলি তটস্থ থাকত, কবে কোন জায়গায় যাই ঠিক নেই। আগে থেকে বলা থাকলে সেই জায়গায় সেদিন গেলে লোকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত থাকত, এই হত মুস্কিল।

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধে যখন জানলুম আমি বদলি হব তখন স্থির করলুম শেষবারের মত মহকুমার সর্বত্র ঘূর্ণির মত ঘুরে আসব, যতগুলি পারি লঙ্গরখানা ও হাসপাতাল শেষ পরিদর্শন করে। সর্বত্রই প্রায় ঘুরেছি কেবল আড়িয়ল বিলের জলাদেশে শেখরনগর ও বাড়ৈখালি হাসপাতালে আদৌ যাইনি। দুটিই আড়িয়ল বিলের ধারে ছিল, ফেব্রুয়ারির আগে সাইকেলের রাস্তা শুকিয়ে গিয়ে খুলত না। আমি মুন্সীগঞ্জ থেকে ত্রিশ মাইল দূরে শ্রীনগরে ডাঃ নন্দীকে খবর পাঠালুম অমুক দিন আমি সাড়ে আটটায় শেখরনগর পৌঁছব, সেখান থেকে বাড়ৈখালি যাব, উনি যদি আমার সঙ্গে যান। মুন্সীগঞ্জ থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় রওনা হয়ে আমি শেখরনগর পৌঁছলুম সওয়া আটটায়। ডাঃ নন্দী তখনও আসেননি। হাসপাতালে গিয়ে দেখি কুড়িটি রোগীর মধ্যে পনেরোটিরই সারা গায়ে ভয়ানক ইডিমা, প্রায় মরণোন্মুখ। প্রত্যেকের শরীর বেলুনের মত ফুলে উঠেছে, চামড়ার স্বচ্ছ পাউডার-নীল রং। কুড়িটির মধ্যে কুড়িটিতেই মশারি টাঙানো।

সোয়া আটটা বেজে গেছে অথচ কোন রোগীকে তখন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে কিছু খাওয়ানো হয়নি। মশারিশুদ্ধ তোলা হয়নি। একটি বিছানায় গিয়ে হতভম্ব হয়ে দেখি রোগী সম্ভবত মাঝরাতে মারা গেছে—সারা গা শক্ত হয়ে এসেছে, পেটটি ফুলে উঠছে, গায়ের যেটুকু খোলা তাতে বড় বড় গুবরে মাছি ভনভন করছে। মশারির বাইরে আরো মাছি জড়ো হচ্ছে।

যে চারজন পুরুষ পরিচারক ও দুটি নার্স বরাদ্দ ছিল তারমধ্যে মাত্র দু'জন সমুখের বারান্দায় বসে আছে, তখনও কাজ শুরু করেনি। ডাক্তার তখনো আসেননি, কম্পাউণ্ডারও নয়। আমি একটি পরিচারককে বললুম ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তাকে পাঠিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পে খানিকটা কুইনিন মিক্সচার চড়িয়ে দিলুম, জল শুকোলে কুইনিনের গুঁড়ো ওজন করে দেখব বলে, ঠিক মাপের কুইনিন আছে কিনা।

মাল আনার জন্যে মুন্সীগঞ্জে গিয়ে ডাক্তারবাবু আমাকে দেখেছিলেন, কথাও হয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দূর থেকে চিনতে পেরে, পিছন ফিরে পালাবার মতলবে ছিলেন বোধহয়। তাই দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ

চেঁচিয়ে আমার কাছে আসতে হুকুম করলুম। পালাবার ইচ্ছা দেখে পিছন পিছন দৌড়োলুম, শেষে একটা ভাঙা চেয়ারের পায়া তুলে তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারলুম। পালিয়ে পার পাবেন না দেখে ভিজে বেড়ালের মত ফিরে এলেন। ঘাড় ধরে তাঁকে হাসপাতালের ভিতর নিয়ে গিয়ে যে লোকটি মারা গেছে তার বিছানায় নিয়ে জিগ্যেস করলুম কখন মারা গেছে জানেন কিনা। ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, না। জিগ্যেস করলুম, মৃত লোকটিকে দেখে অন্য মুমূর্ষু রোগীরা আরো ভয় পেয়ে যেতে পারে কি না? আমি তখন রেগে প্রায় দিগ্‌বিদিকশূন্য। বললুম, 'উঠুন, বিছানায় উঠুন, ঐ মড়া জড়িয়ে শুয়ে থাকুন, আমি যতক্ষণ না বাড়ৈখালি থেকে ফিরে আসি, ততক্ষণ শবকে ছেড়ে বিছানা থেকে নামবেন না। আমি দেখতে চাই—যখন ফিরব তখন আপনার জ্বর ও প্রলাপবকা শুরু হয়েছে কিনা।'

এরকম লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা আমার জীবনে হয়নি। আতঙ্কে দেখি ডাক্তার সুড়সুড় করে বিছানায় উঠে মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে শোয় আর কি! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে তাঁকে এক হেঁচকা টান মেরে নামালুম। এর মধ্যে কখন ডাঃ নন্দী এসে হাজির খেয়াল করিনি, বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। সারা ব্যাপারটাই কেমন যেন লোমহর্ষক হয়ে উঠেছিল, এডগার অ্যালান পো'র গল্পর মত। আমি ডাক্তারকে বললুম বাড়ৈখালি থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। তার মধ্যে যদি দেখি সমস্ত হাসপাতাল ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়েছে, বিছানাপত্র পরিষ্কার, টান করে পাতা হয়েছে, সব ওষুধপত্র নতুন করে করা হয়েছে, রোগীদের পরিষ্কার করে গা পুঁছে খাওয়ানো হয়েছে, রান্নাঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রান্না হয়েছে, মৃতলোকটির দেহ তার আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, তবে ভাল। তা না হলে আমি ডাক্তারকে সোজা জেলে নিয়ে যাব।

সাড়ে এগারোটায় যখন ফিরলুম দেখি সারা হাসপাতাল নতুনের মত ঝকঝক তকতক করছে। রোগীদের দেখে অনেক সুস্থ আর প্রফুল্ল মনে হল। সব থেকে মজা লাগল ডাক্তারের মুখে আকর্ণ হাসি দেখে। পরিচারকরা একে একে বিরাট নমস্কার করল। আমি পিঠ ফেরালে তারা নিশ্চয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু গল্পটা নিমেষে আগুনের মত সারা মহকুমায় ছড়িয়ে পড়ল। ফল ভাল হল।

এই সময়ে আরেকটি অবিমৃষ্যকারিতা করি। শ্রীনগরের লালাবাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর আতিথেয়তা গ্রহণ করে শ্রীনগরে দু-তিন দিন ছিলুম। আমি জানতুম না তাঁদের সঙ্গে ষোলঘরের সাহাবাবুদের বহুদিন ধরে বৈরিতা আছে। কে একজন খবর দিল সাহাবাবুদের বাড়িতে অনেক ধানচাল লুকোনো আছে। তাঁদের

বাড়িতে পুলিশে হানা দিল। দেখা গেল ঘরের মেঝের নিচে পোঁতা বড় বড় মটকায় অনেক চাল রাখা আছে। আমি এর আগে জানতুম না মাটির তলায় এভাবে ধানচাল রাখা হয়। সাহাবাবুরা আমার নামে মানহানির মামলা করলেন, পঁচিশ হাজার টাকার খেসারত চেয়ে। এখনকার দিনে তার মূল্য হবে সাড়ে তিন লাখ চার লাখ টাকা। তখন আমার পাঁচশ' টাকা বার করার অবস্থা নেই। স্থানীয় মুনসেফ সুবোধচন্দ্র তালুকদার আমাকে সৎ-পরামর্শ দিলেন। জেলা জজ জ্ঞানাঙ্কুর দে অপরপক্ষকে ডেকে মিষ্টি কথা বলে মিটিয়ে দিলেন।

১৯৪৪-এর জানুয়ারির শেষে যখন সুরাবর্দীর ব্যাপারটি মিটে গেল তখন আমি বদলি চাইলুম। আমাকে বলা হল মেদিনীপুরের কাঁথি যেতে। ১৯৪২-এর সাইক্লোনে কাঁথির এস-ডি-ওর বাড়ি উড়ে যাওয়ায় আমি সরকারকে লিখলুম। সরকারের দয়া হল। চিঠি পেলুম কার্সিয়ঙে বদলির।

১৫ মার্চ ১৯৪৪-এ আমানুল্লা বলে এক বি-সি-এস অফিসারকে চার্জ দিলুম। মনে হল অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বেরোচ্ছি। দুবছর আগে যে মানুষ ছিলুম তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হয়ে বেরোলুম।

১৯৪৭ থেকে চুয়াল্লিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা আদি বিক্রমপুরীদের কাছেই শুনেছি তাঁরা বিক্রমপুরকে প্রায় ভুলতে বসেছেন। ঠিক এই কারণে আমি এই আত্মকথায় বিক্রমপুরের ভৌগোলিক, সামাজিক ও চারিত্রিক গুণাগুণ বিশদ করে লিখেছি। বিক্রমপুরের প্রতি অঞ্চল, বহু গ্রাম আমার চোখের সমুখে এখনও ভাসছে। ১৯৬১ সালে ত্রিপুরা যাবার সময়ে আমাদের ছোট প্লেন ভাগ্য-কুল থেকে ধলেশ্বরী পর্যন্ত বিক্রমপুরের উপর দিয়ে উড়ে গেল। আমি প্রতিটি গ্রাম চিনতে পারলুম। ভাগ্যকুল-লৌহজঙ্গ-সোনারং-টঙ্গিবাড়ি-তালতলা, (দূরে দক্ষিণে মালখানগর, মিরকাদিম)। বিক্রমপুরের বছরগুলি আমার প্রাপ্তবয়সের সমস্ত জীবন, চৈতন্য, বোধ, মন গড়ে তোলে। এখানেই আমার যাবতীয় মনোভাব, দৃষ্টিশক্তি, সংবেদনশীলতা, চিন্তা, উদ্বেগ, বীক্ষণ ও বিচারশক্তি উন্মোচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী জীবনে নিজের বিরুদ্ধে যা কিছু অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতা জমে ওঠে এখানে তার সূত্রপাত হয়।

অন্যদিকে এই বিক্রমপুরে মনের ও অভিজ্ঞতার যে ঐশ্বর্য, পরিপূর্ণতা পেয়েছি তা যদি অস্বীকার করি পাপ হবে। এই দু'বছরে বৃটিশ শাসনের ভিতরে আগে কী শক্তি ছিল এবং এখন কী পাপ ঢুকছে সে বিষয়ে ভাল করে জানলুম। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কোনদিন যদি মাত্র আধঘণ্টার জন্যেও রোদে বা জলে ঘুরেছি তাহলে

হয় মাথাধরা না হয় সর্দিতে ভুগতুম। মুন্সীগঞ্জের কাঁচা রাস্তায় আধমাইল অন্তর সাইকেল ঘাড়ে করে খালের উপর দিয়ে একতক্তার সাঁকো পার হয়ে দিনে গড়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইল ঘুরে, আমার মধ্যে যে বাঙালী নাড়ুগোপালটি লুকিয়ে ছিল সেটি নষ্ট হল। চলে আসার আগে আমার এক পূর্বসূরী জেম্‌স্ পেডির—ইনি সন্ত্রাসবাদের যুগে মেদিনীপুরে গুলি খেয়ে প্রাণ হারান—তাঁর ৮৮ মাইল সাইকেল চালানোর রেকর্ড আমি অতিক্রম করি একদিন তিরানব্বই মাইল চালিয়ে। এমন-কি আমার ঘনঘন ভীষণ আধকপালে রোগও আমি তুচ্ছ করতে শিখি।

মুন্সীগঞ্জে যেদিন প্রথম পদার্পণ করি, অর্থাৎ ১৯৪২-এর ৪ ফেব্রুয়ারি, সেদিন সন্ধ্যায় রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ দে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—'পোলা হইবো'—তা পূর্ণ হয়। আমার কন্যা ও একমাত্র সন্তান ১৯৪২ সালের নভেম্বরের শেষে আসে। অন্যদিকে শেষ একবছর মুন্সীগঞ্জ আমাকে দান্তের 'নরকে' ঘুরিয়ে বেড়ায়। সান্ত্বনার জন্যে টেম্পল ক্লাসিক্‌সের দান্তের 'ইন্‌ফার্নো' বইটি সবসময়ে পকেটে নিয়ে ঘুরতুম। মুন্সীগঞ্জেই একদিকে আমাকে সমতার প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে সমতার পরিবর্তে দয়াপরবশ ভিক্ষা এই দু'য়ের দ্বন্দ্ব আমার মনে গভীর দাগ কেটে যায়। সমতার পরিবর্তে ছিটেফোঁটা ভিক্ষা দিয়ে বিবেককে সন্তুষ্ট রাখা, এমন-কি তা নিয়ে গলাবাজি করে গর্ব করা ও স্লোগান আওড়ানোর খেলা দেখার গ্লানি আজীবন সঙ্গে রইল। কাতারে-কাতারে হাজার হাজার নমঃশূদ্র, কারিগর ও মুসলমান শ্রেণী চোখের সমুখে মারা গেল, আমি রোধ করতে পারলুম না, আমার এখনও আপশোসের শেষ হয় না। পরে 'দরিদ্র'দের উন্নতিকল্পে যে কান্নাকাটি ও দরদ শুনেছি তাতে আমার শুধু ঘৃণাই হয়। যোধপুর পার্কের পাঁশ-গাদায় রোজ ভোরে এখনও শিশুরা খাবার খুঁজে ফেরে। দরিদ্র চিরকাল দরিদ্র ও নিরক্ষর থাকবে, তার সাক্ষরতা ও অবস্থার উন্নতি হলে সর্বনাশ হবে এ ত্রাসে বাম-অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ চোদ্দবছর ধরে ভুগছে। দুঃসময়ে যদি কোনসময়ে সমতা আসা সম্ভব হত, বিক্রমপুরেই হতে পারত, কারণ দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে অতবছর আগে সেখানে ছিল স্বাস্থ্য, উদ্যম, উৎসাহ এবং প্রায় পূর্ণ-সাক্ষরতা।

মুন্সীগঞ্জ ছাড়ার সময়ে রামায়ণে, রাবণের মৃত্যুর পর, তাঁর মা নিকষা আর রামের মধ্যে কথোপকথনের কথা ক্রমাগত মনে পড়ছিল। রাবণের মৃত্যু, তাঁর অন্যান্য বিশ্ববিজয়ী পুত্র ও পৌত্রদের নিধন, লঙ্কার বিনাশ বিষয়ে নিকষার কাছে শোকপ্রকাশ করে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে রাম বললেন, 'মাতঃ, আপনি নিশ্চয় ভাবছেন এসব চোখে দেখা, সহ্য করার জন্যে বেঁচে না থাকলেই ভাল হত।'

রামের কথায় বাধা দিয়ে নিকষা তাঁকে বলে উঠলেন, 'পুত্র, ওকথা বোলো না, বেঁচেছিলুম বলেই আমি এতসব দেখতে পেলুম।' নিকষা হয়তো প্রত্যবায়ের অমোঘ নিয়তির কথা ভাবছিলেন। সেভাবে দেখলে ভারতত্যাগ করার আগে সাম্রাজ্যবাদকে হয়তো অগাস্ট আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষের মূল্য দিতে হল।

আমার স্মৃতিরূপ ছাঁকনির বড় বড় ফুটো বাঁচিয়ে যেটুকু মনে আছে মুখ্যত তাই লিখেছি। সাহায্য করেছে কিছু কিছু নোট। তারিখ ও উক্তিগুলি আমি নথির সঙ্গে মিলিয়েছি। শুরুতেই বলেছি আমি ইতিহাস লিখতে বসিনি, চেষ্টা করেছি যুবা বয়সের স্মৃতি ও চিন্তাভাবনার উপর বৃদ্ধবয়সের প্রজ্ঞার বোঝা যথাসম্ভব কম চাপাতে।

১৯৪৩-৪৪ সালের শোকদুঃখের স্মৃতির উপর পরম প্রলেপ আসে উপর্যুপরি দুবার, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে, মুন্সীগঞ্জ ছাড়ার ত্রিশ বছর পরে। ১৯৪৭ সালে মুন্সীগঞ্জ অন্যদেশ হয়ে গেল। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সৃষ্টি হওয়ায় নতুন জীবন ও উদ্যম এল। প্রথমবার গেলুম ভারতের রাষ্ট্রপতির সচিব হিসাবে। অর্থমন্ত্রী নুরুল ইসলাম ও প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমানকে আমি ছাত্রকর্মী হিসাবে ১৯৪২-৪৪ সালে জানতুম। যেদিন রাষ্ট্রপতি গিরি চট্টগ্রাম হ্রদ দেখতে গেলেন, সেদিন ঢাকার দুজন বড় অফিসার আমাকে মুন্সীগঞ্জে নিয়ে গেলেন। মুন্সীগঞ্জ ঘাটে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সারা মহকুমা থেকে প্রায় দুহাজার স্ত্রীপুরুষ হাজির ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, অথবা সাহায্য পেয়েছিলেন, অথবা শুশ্রূষায় প্রাণে বেঁচে গেছলেন, তাঁরা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা। আমার প্রথম পবিত্র কর্তব্য হল আমার আর্দালি আবদুস সামাদ ও আবদুল জলিলের সমাধিতে গিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্পণ করা। আমাকে সে দুই সমাধিতে নিয়ে গেলেন আমাদের মালী রহিম। পরের দিন ঢাকায় রাষ্ট্রপতির অতিথিগৃহে মুন্সীগঞ্জ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রায় পঞ্চাশজন লোক এসেছিলেন।

একটি কনফারেন্স উপলক্ষ্যে পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে আবার গেলুম ঢাকায়, এবার সস্ত্রীক। ঢাকার কর্তৃপক্ষ আমাদের দু'জনকে খুব যত্ন করে আবার মুন্সীগঞ্জে নিয়ে গেলেন। আমরা ইদ্রাকপুর ফোর্টের বাড়িতে গেলুম। এস-ডি-ও ছিলেন আলম, অল্প বয়স, কবি হিসাবে খুব নাম। অত্যন্ত যত্ন করলেন। এবার হরগঙ্গা কলেজের মাঠে, যেখানে সুরাবর্দীর মিটিং হয়েছিল, সকলে সমবেত হয়ে উৎসবের হাওয়া আনলেন।

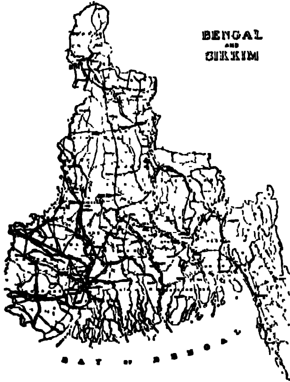
কলেজের প্রিন্সিপাল যত্ন করে আমাদের কলেজ লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। ১৯৪২ সালে আমি যামিনী রায়ের তিনটি বড় ছবি উপহার দিয়েছিলুম: দুপাশে দুই গোপিনী, মধ্যে কৃষ্ণ-বলরাম। তিনটি ছবি সযত্নে টাঙানো রয়েছে। লাইব্রেরিতে যে-সব বই উপহার দিয়েছিলুম, সে-সবও দেখালেন।

মুন্সীগঞ্জের সঙ্গে আমার শেষ যোগসূত্র ছিন্ন হয় ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১। ঐদিন আমাদের মালী আবদুর রহিম দেওভোগ গ্রামে পঁচাশি বছর বয়সে মারা যান। ১৯৯০-র জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহে আমরা দুজন ঢাকায় যাই। কর্তৃপক্ষ আমার অনুরোধ রক্ষা করে মুন্সীগঞ্জ থেকে রহিমকে আমার সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন। ১৯৪৪ সালে মুন্সীগঞ্জ ত্যাগ করার আগে আমার স্ত্রী রহিমকে জয়ন্তীর জন্য কেনা গরুর প্রথম বাছুরটি দান করে যান। সেই বাছুরের কততম প্রজন্ম বলতে পারি না, তারই দুধে ছানা তৈরি করে রহিম নিজের হাতে বড় এক হাঁড়িভর্তি অতি উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা নিয়ে আসেন। সে উপহার আমাদের জীবনপ্রান্তে পরম স্বীকৃতি হিসাবে আমরা সাদরে গ্রহণ করি।

এই হল আমার চরম পুরস্কার। সে-উপহার আমাদের কাছে অমূল্য, তার কারণ ইতিমধ্যে প্রায় আধ-শতাব্দী গত হয়েছে, মুন্সীগঞ্জ হয়েছে আলাদা দেশ, সেখানকার দেশবাসী হয়েছে আরেক দেশের নাগরিক, এবং তাদের কাছে আমি এখন বিদেশী। একমাত্র যোগসূত্র যা ছিল তা পরস্পরকে সাহায্য করে দুর্যোগ কাটিয়ে একসঙ্গে বেঁচে থাকার স্মৃতি।

অন্তর্বর্তীকাল : কার্সিয়ঙ ১৯৪৪-৪৫

ভূমিকা



১৯৪৪-এর ১৯ মার্চ সোভিয়েট সৈন্য নিস্টার নদী পার হয়ে নাৎসীদের তাড়া করে পশ্চিম-দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। তার তিনদিন আগে অর্থাৎ, ১৬ মার্চ মুন্সীগঞ্জ ত্যাগ করে আমরা কার্সিয়ঙের পথে কল্‌কাতা পৌঁছই। পশ্চিম ইওরোপেও মিত্রপক্ষ যুদ্ধে ভাল করছিল। ২১ মে মিত্রপক্ষ 'হিটলার লাইন' ভেদ করে পূর্বদিকে এগিয়ে যায়। দক্ষিণে মিত্রপক্ষের পঞ্চম বাহিনী ৪ জুন রোম প্রবেশ করে।

১৯৪৪-এর সারা মার্চ ও এপ্রিল মাস ধরে ভারতের পূর্ব প্রান্তে ইম্ফল আর কোহিমার উপর সমূহ বিপদের খাঁড়া উদ্যত থাকে। বর্তমান নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমাকে কেন্দ্র করে চল্লিশ দিন ধরে জাপানীদের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করার পর ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্য জাপানীদের হঠিয়ে দেয়। কোহিমা একটি ক্ষুদে স্টালিনগ্রাড হয়। কোহিমা পাহাড়ের শিরদাঁড়াটি কতবার যে দু-পক্ষের হাতবদল হয় তার ঠিক নেই। কোহিমায় আন্তর্জাতিক গ্রেভ্‌স্ (কবর বা গোরস্থান) কমিশনের তদারকে নির্মিত একটি অতি সুন্দর গোরস্থান আছে; যেমন নিভৃত, শান্ত, তেমনি পরিষ্কার, সুন্দর। স্থানটি দেখলেই আপনার ধারণা হবে চল্লিশদিন ধরে কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছিল; আমার আপনার আজকের জন্য, আমাদের কত সৈন্য সেদিন প্রাণ দিয়েছিল। প্রায় তিনহাজার জাপানী সৈন্য প্রাণ হারায়, ভারতীয় ও বৃটিশ প্রাণও কম যায়নি। চীনা ও আমেরিকান সৈন্য ১৮ মে মিচিনা প্রবেশ করে, কিন্তু জাপানী প্রতিরোধ এত প্রচণ্ড ও মরিয়াভাবে চলে যে জাপানী সেনাবাস সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পুরো আড়াই মাস লাগে। ৩ অগাস্ট যখন মিচিনা পুরো দখল হয় তখন একটিও জাপানী সেনা জীবিত কিনা সন্দেহ। ৫ জুলাই ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্য মণিপুর প্রান্তে উখরুল দখল ক'রে ইম্ফল আর মণিপুরের বিপদের অবসান ঘটায়। ততদিন পর্যন্ত ভারতের মাটিতে প্রাচ্য-যুদ্ধমঞ্চের ফলাফল সম্বন্ধে খুব উদ্বেগ থাকে।

আমার স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ডে (১৯১৭-১৯৪০) শিলিগুড়ি ও কার্সিয়ঙে আমার ছেলেবেলা কাটানোর কথা লিখেছি। কার্সিয়ঙ ও শিলিগুড়ি হচ্ছে ভূস্বর্গ দার্জিলিং জেলার দুটি মহকুমা। ১৯২৫ সালের শেষে আমরা দার্জিলিং থেকে কলকাতা যাই। উনিশ বছর পরে ১৯৪৪ সালে যখন কার্সিয়ঙের পথে ২৭ মার্চ শিলিগুড়িতে পৌঁছই, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে শিলিগুড়ি এত ফেঁপে উঠেছে যে চেনা যায় না। সেই সময়ে শিলিগুড়ি হয় ভারতের পূর্বপ্রান্তে ও চীনে যাবতীয় যুদ্ধসরবরাহ ও সৈন্যচলাচলের বিরাট ঘাঁটি। ১৯৪৪ সালে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলটি পূর্বপ্রান্তের যুদ্ধের ফাঁকে বৃটিশ ফৌজদের জন্য বিশ্রাম ও অবসর-বিনোদনের আশ্রম হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে যে অর্থে থাইল্যাণ্ড, বিশেষ করে ব্যাংকক, আমেরিকান ফৌজের বিশ্রাম ও অবসরবিনোদনস্থল হয়, সে অর্থে দার্জিলিং জেলা আশ্রম হয়নি। ফৌজরা সাধারণত ছুটি কাটাত চা-বাগানের বৃটিশ ম্যানেজারদের বাড়িতে তাদের অতিথি হয়ে, সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতার কোন অবসর ছিল না।

১৯৪৩-এর ৫ ডিসেম্বর জাপানী বোমারু বিমান কলকাতায় অল্পকিছু বোমা ফেলে। দিনের আলোয় হাওয়াই আক্রমণ এই প্রথম হয়, ফলে, কলকাতাবাসীরা শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে, কলকাতার জমি-বাড়ি জলের দামে বিক্রি শুরু হয়। ডিসেম্বর মাসে এসব ঘটা সত্ত্বেও পরের মার্চ মাসে মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে আমরা যখন ১৭ তারিখে কলকাতায় এলুম তখন মনে হল কলকাতায় প্রাণের জোয়ার ফিরে এসেছে। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে স্টালিনগ্রাডের রাহুমুক্তি এবং তার পর একবছর ধরে ইওরোপের সর্বত্র রাশিয়ার দুঃসাধ্য অথচ অপ্রতিহত অগ্রগতির ফলে বোধহয় এই জোয়ার আসে, যা জাপানী বোমার ভয়ে স্তিমিত হয়নি। বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যম দেখলুম সাংস্কৃতিক জগতে। যাঁরা এই যুগ সম্বন্ধে এখন পড়াশোনা করছেন, অথচ সে সময়ে হয় জন্মাননি বা অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাঁদের কানে কয়েকটি নামের উল্লেখ ভাল লাগবে। যুব-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু কর্মী নাম করলেন, যথা, জলি ক'ল, সুব্রত ব্যানার্জি, রামকৃষ্ণ মুখার্জি, সুজাতা মুখার্জি (পরে ডেভিস), উমা চক্রবর্তী (পরে সেহানবিশ), দিলীপ বসু, চিন্তামণি কর, সুনীল জানা, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী প্রভৃতি। অধ্যাপক শাহেদ সুরাবর্দী হলেন প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি, এ-কে-এম জাকারিয়া ও নীহাররঞ্জন রায় যুগ্ম সহ-সভাপতি। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কলকাতা শাখা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর তুল্য প্রসিদ্ধি সে যুগে একমাত্র লাহোরের গণনাট্য সঙ্ঘই দাবি করতে পারত।

সভ্যদের মধ্যে ছিলেন বিনয় রায়, চিন্মোহন সেহানবিশ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, আবদুল্লা রসুল, হেমন্ত মুখার্জি, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। প্রগতি লেখক সংঘের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জি ছিলেন বিশেষ নাম করা, তাঁরা আই-পি-টি-এ ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘেরও পাণ্ডা ছিলেন।

দেবব্রত বিশ্বাস ও দ্বিজেন চৌধুরী ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই ত্রিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আলাপ ছিল। পরেও যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল বা আছে তাঁদের মধ্যে যে দুজনকে, বিষ্ণু দে ছাড়া, আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে এবং বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে, প্রতিভার পর্যায়ে ফেলতুম তাঁরা হচ্ছেন সুনীল জানা, ফটোগ্রাফার হিসাবে বহুদেশে সুবিদিত। আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কবি ও গায়ক। তাঁরা যা করতে চাইতেন, তাতে মনপ্রাণ ঢালতেন, জাগতিক উন্নতি বা নামডাকের পিছনে ঘুরে তাঁদের আত্মাহুতিতে কার্পণ্য করতেন না। বাকি অনেকেই সংসারে খ্যাতি ও সম্মান পেয়ে তাঁদের অন্বিষ্ট লক্ষ্য থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছলেন অথবা পরিতৃপ্ত জীবনে প্রবেশ করলেন, কিন্তু এ দুজন শেষ পর্যন্ত অবিচলিত আছেন বা ছিলেন। সুনীল জানা এখন লণ্ডনে থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্রকে আমি পরে আরো ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানলুম দিল্লীতে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত। নামযশের প্রতি তাঁর একান্ত অনীহারএকটি নমুনা দিই। ১৯৬৬-র শুরু থেকে ১৯৬৯-এর গোড়া পর্যন্ত আমি সূচনা ও প্রসারণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলাম। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের যাবতীয় ব্যবস্থা তখন আমার আজ্ঞাধীন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজগতে শ্রদ্ধেয় সুনীল বসু ও লোকসঙ্গীত জগতে সুপরিচিত অনিল বিশ্বাস তখন আকাশবাণীতে কর্তৃত্বপদে আসীন এবং আমার প্রস্তাবে উৎসাহী। জ্যোতিরিন্দ্রকে বহুবার সাধ্যসাধনা করেছি বিদেশী ও দেশী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তুলনামূলক উদাহরণ ও মতামত এবং তার সঙ্গে তাঁর নিজের কবিতা ও গান রেকর্ডিং করাতে রাজি হতে। আমার ইচ্ছা ছিল এই রেকর্ডিংগুলি আকাশবাণীর পুরাসংগ্রহে স্থান পাবে ভবিষ্যতের জন্য ; অন্য কেউ হলে প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ লুফে নিতেন। শুধু অমরত্বের আশায় নয় ; আকাশবাণী প্রতি রেকর্ডিং-এর জন্য দর্শনী দিত ও দেয়। কিন্তু বটুকদা নিজের আর্থিক অবস্থা ও অমরত্ব সম্বন্ধে এতই উদাসীন ছিলেন যে প্রতিবারই রাজি হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ তিনবছরে তাঁর কোনদিন সময় হল না। ১৯৪৪-এর মার্চে, একই সময়ে, ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে পরিচয় হয়, বটুকদা-রথীন মৈত্রের পাঁচ নম্বর এস-আর-দাশ রোডের বাড়িতে। সারা কলকাতায় তখন আগ্রহের জোয়ার বইছে। আমেরিকান ফৌজের

অনেক সৈনিক আসতেন, তাঁদের প্রায় সকলেই অল্পবয়স্ক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ বা অধ্যাপনা বন্ধ রেখে তাঁদের সৈন্যে ঢুকতে হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যদের মত আমেরিকানদের জাতবিচার ছিল না। তবে ইংরেজ মার্টিন কার্কমান ছিলেন কিছুটা স্বতন্ত্র। ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁর আবক্ষ মূর্তি করেন।

অস্থায়ী লাট রাদারফোর্ড বিদায় নিলেন। তাঁর স্থলে অস্ট্রেলিয়ান রিচার্ড কেসি ২২ জানুয়ারি ১৯৪৪-এ লাটপদে আসীন হন। তাঁর স্ত্রী, মেরী কেসি চারুকলা-সংক্রান্ত বহুবিধ কার্যকলাপের মধ্যমণি হলেন। কেসি নিজে ছিলেন ভাল যোদ্ধা—বীরত্বের জন্য অলঙ্কৃত হন: ডি-এস-ও এবং এম-সি। একে অস্ট্রেলিয়ান, তার উপর ছিল মিলিটারি চালচলন, কথাবার্তা। কাজেও ছিলেন কড়া মানুষ। তবে ইংরেজদের মত উদ্ধত বা দূরত্ব বজায়-রাখিয়ে নয়।

কার্সিয়ঙ

দশদিন কলকাতায় থেকে মুন্সীগঞ্জের দুর্ভিক্ষজনিত অবসাদ অনেকটা কেটে গেল। ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের দার্জিলিং মেল-এ চড়ে মন তাজা হল। শিলিগুড়িতে দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের ছোট গাড়িতে চড়ে যখন শুকনার জঙ্গল পার হয়ে, চুণাভাটি পেরিয়ে টিনঢেরিয়ায় উঠছি তখন হঠাৎ শরীর-জুড়নো ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনে হল নতুন জীবন পেলুম। মহানদী স্টেশনের মোড় পেরিয়ে ট্রেন যখন আস্তে আস্তে কার্সিয়ঙ স্টেশনের সমতল চাতালে গিয়ে থামল তখন স্টেশনের ছাতের নিচে দেয়ালে একটি সাঁটা ফলকে দেখলুম লেখা আছে, 'সমুদ্রতট থেকে ৪৮০০ ফুট উঁচু'। দেখে মন আরো প্রফুল্ল হল। অস্থায়ী এস-ডি-ও ডি-এন ব্যানার্জি, শহরের গুটিকয়েক ভদ্রলোক এবং ছ'টি কনস্টেবল ও তাদের হাবিলদার আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পুলিশদের পরণে গাঢ় নীল গরম সার্জের উর্দি; হাতের আস্তিনে আর পাজমার ধার ধরে লাল পাইপিং। মাথায় টেরচা করে পরা চ্যাপটা টুপি, টুপির মাথায় পশমের কদম ফুল। আমার মুখে ও শরীরে মঙ্গোলীয় ছাপ। পুলিশদের চেহারার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে মনে হল। আশা হল, মাস তিনেকের মধ্যে আমার শরীর সেরে গেলে আমার মুখটা আর পায়ের ডিমদুটো গুর্খাদের মত গোল হবে. মুখে কিছু নেপালি কথা ও টানও আয়ত্ত হবে। তার ফলে কার্সিয়ঙবাসীদের কাছে আমার কদর বাড়বে।

বরিশালের সেট্‌লমেণ্ট থেকে বদলি হয়ে অরুণ মুখার্জি ১৯৪৩-এর অক্টোবর

পর্যন্ত কার্সিয়ঙের এস-ডি-ও ছিলেন। তার আগে ১৯৩৬-৩৭ সালে করুণাকেতন সেনই ছিলেন কার্সিয়ঙের একমাত্র বাঙালি এস-ডি-ও। এস-ডি-ওর সরকারি বাস-গৃহ ছিল কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া। কার্সিয়ঙ স্টেশনের উপর গিদ্দাপাহাড়ের কাঁধ চলে গেছে শেষপ্রান্ত ঈগ্‌ল্‌স্ ক্র্যাগ পর্যন্ত। তারপর পাহাড় নেমে গিয়ে আবার একটি একক চূড়ায় উঠেছে, সেটিই হল কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া। অরুণ থাকাকালেই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে বাড়িটির ছাত উড়ে যায়, অরুণ অন্যবাড়িতে উঠে যেতে বাধ্য হয়। অরুণের পরে যিনি আসেন এবং আমি না যাওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী হিসাবে কাজ চালান, তাঁর কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া মেরামত করায় স্বভাবতই উৎসাহ ছিল না। না থাকার আরেকটি কারণ ছিল। এস-ডি-ওর সরকারি বাড়ির জন্য ভাড়া দিতে হত না। সরকারি বাড়িতে থাকতে না পেলে এস-ডি-ও যদি অন্য বাড়ি ভাড়া করতেন, তাহলে সরকার ভাড়াবাবদ দৈনিক ভাতা হিসাবে অনেক টাকা দিতেন, যার কৃপায় বাড়ি সারানোর উৎসাহ কমে যেত।

যতদিন না আমরা বাড়ি পাই ততদিনের জন্য মিঃ ব্যানার্জি হিলকার্ট রোডের ইন্‌স্পেকশন বাংলাটি ঠিক করিয়ে রেখেছিলেন। মার্চের শেষেও কার্সিয়ঙে খুব শীত থাকত। কার্সিয়ঙের শীতের উপযুক্ত আভার বা জয়তীর যথেষ্ট কাপড়জামা ছিল না। ভাগ্যক্রমে কাপড়ের দোকান, হনুতরাম আগরওয়ালা, আমাদের একটি হিসাব খুলতে রাজি হলেন, মাসিক কিস্তিতে টাকা শোধ হবে, এই ব্যবস্থায়। দোকানের ছোট শরিক আভার সঙ্গে স্কটিশ চার্চে এক ক্লাসে পড়েছিলেন। কাপড়জামা করাতেও কয়েকদিন লাগল; সে ক'দিন আমার গরম ড্রেসিংগাউন ও গ্যাবার্ডিনের বর্ষাতি গায়ে চড়িয়ে দুজনের সন্ধ্যাবেলাটা কাটত।

পৌঁছনোর পরের দিন, অর্থাৎ ২৮ মার্চ, সকালবেলা মিঃ ব্যানার্জি আমাকে পাংখাবাড়ি রোডে মহাতাব ক্লাবের নিচে এস-ডি-ওর অফিসে নিয়ে গেলেন। রাস্তাটি স্টেশন থেকে বেরিয়ে গিদ্দাপাহাড়ের কোল দিয়ে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়াকে ডাইনে রেখে মকাইবাড়ি চা-বাগানের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ির তরাই পাংখাবাড়ি চলে গেছে। রাস্তাটির তখন নতুন নাম হয়েছে অরুণ মুখার্জি রোড। গত দু'বছর মুন্সীগঞ্জের কাছারিতে এত ঘূর্ণিবাত্যার জীবন কেটেছে, সে-তুলনায় কার্সিয়ঙের গাছঘেরা কাছারিবাড়ি নিভৃত সরোবরের মত এত শান্ত, স্তব্ধ, জনবিরল যে হঠাৎ এই পরিবর্তন আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। গায়ে বসতে বেশ কিছুদিন লাগল। আসল কাছারিটি ছোট পাথর আর কাঠে তৈরি, টিনের ছাত। পুতুলের বাড়ির মত একটি ছোট্ট বাড়িতে সাব-ট্রেজারি; অনুরূপ ছোট থানাবাড়ি আর তারসঙ্গে

সাব-জেল। লোকজনও কম আসত। সবথেকে ব্যস্ত দিনে, অর্থাৎ মাইনে ও পেনশনের দিনে একসঙ্গে ত্রিশজনের বেশী লোক হত কিনা সন্দেহ। সর্বত্র শৃঙ্খলা আর চুপচাপ, কোথাও ধাক্কাধাক্কি নেই, একসঙ্গে কথা বলা বা চেঁচানো নেই, কেউ নিজের কথা অপরের গলার উপরে চেঁচিয়ে শোনাতে চায় না। সাব-জেলটি প্রায় সর্বদাই খালি থাকত। তিনজন উকিল এবং দুজন মোক্তার ছিলেন। এস-ডি-ও একাধারে সব পদবীধারী ছিলেন: ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, ট্রেজারি অফিসার, জেলকর্তা, সাব-রেজিস্ট্রার, কী নয়! অর্থাৎ আমি ছিলুম গিলবার্ট সালিভানের লিখিত 'মিকাডো' অপেরার পু-বা চরিত্র: গিলবার্ট যার চরিত্র-পরিচয়ে লিখেছেন: লর্ড হাই সবকিছু—লর্ড হাই প্রধান মন্ত্রক থেকে লর্ড হাই জহ্লাদ অবধি। এত সত্ত্বেও সারাদিনের সমস্ত কিছু কাজ করতে আমার কোনদিন দু'ঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি; তার মধ্যে ট্রেজারি, ফৌজদারি, দেওয়ানি, রেজিস্ট্রি, দপ্তরের কাজ, চিঠি লেখা সবকিছু হয়ে যেত। আমি ছাড়া আরেকজন অফিসার ছিলেন, মণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; তিনি কার্সিয়ঙ ও মিরিক দুটি থানারই সার্কল্ কাজ দেখতেন, উপরন্তু সিভিল সাপ্লাই অফিসার ছিলেন।

দণ্ডনীয় অপরাধ হতই না বলা যায়। চুরি অথবা সম্পত্তির জন্য ডাকাতি খুব কচিৎ হত। কন্স্ট্যান্শিয়ায় আমরা চোদ্দমাস ছিলুম। আমি বা সকলে কার্সিয়ঙের বাইরে গেলে ঘরদোর, বাক্স-আলমারি সবই খোলা থাকত, অথচ একটি আল্-পিনও কোনদিন হারায়নি, পাহারার মধ্যে ছিল মালী, সে বৃদ্ধ, জয়ন্তী তাকে বলত মালী বাজে, মালী দাদু। তবে বছরে কয়েকটি খুন হত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুনী নিজে এসে ধরা দিত। সাব-জেলে মামলার আসামী হিসাবে থাকত একজন কি বড়জোর দু'জন; তাদের বিরুদ্ধে নালিশ থাকত মুখ্যত আগের দিন অনেক রাত্রে মাতলামির। পরের দিন সাব-জেল থেকে নিয়ে এসে কোর্টে হাজির করা হত। বিচার ও শাস্তি হত তেমনি সরল ও সরাসরি। কোর্টের ইন্স্পেক্টর আসামীর নাম, তারিখ, সময়, অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে যেতেন। আসামী তখন কাঠগড়ায়। ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করতেন: 'রক্সি খায়ো (মদ খেয়েছিলে?)।' বাংলার মত গোর্খালিতেও আহার আর পান দুটিকেই বলে 'খায়ো'। উত্তর হত, 'খায়ো'। ('হাঁ, খেয়েছি')। 'মাতোয়ালা ভয়ো?' ('মাতোয়ালা হয়েছিল?' 'হুজুর (হাঁ)।' 'কসুর ভয়ো?' ('দোষ স্বীকার করছো?')। 'ভয়ো।' যে-আমি অজুহাত পেলে নিজে ঢুকুঢুকু জলচিকিৎসার ভক্ত, সে কোন মুখে কড়া শাস্তি দেয় বলুন? সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে দু'টাকার থেকে আরো বিরাট জরিমানা কোন

মুখে দিতে পারি! রক্সি হচ্ছে দেশী চোলাই মদ; কার্সিয়ঙে এর নাম ছিল কালী মার্কা। কোদো বা ছাঙ ছিল সদ্য তৈরি বিয়ারের মত। একটি মোটা পাকা বাঁশের চোঙার মধ্যে কোদো বা মারোয়ার বীজ ঢেলে (কিছুটা শর্ষেবীজের মত দেখতে), তাতে ফুটন্ত জল ঢেলে চোঙা ভর্তি করে, কিছুক্ষণ ভিজিয়ে, তারপর সরু বাঁশের নলের সাহায্যে মুখে জলটি টানতে হত। বাঁশের চোঙাটি আর তার মুখের ঢাকনাটি সাধারণত বেশ সুন্দর করে পেতল তামা দিয়ে বাঁধানো থাকত। তার নাম ছিল তুম্বা। কোদোতে কিছুটা বিয়ারের কাজ হত। অনেকটা খেলে মাথা আরামে বেশ ঝিমঝিম করত। শরীরে কিছুটা পুষ্টি হত, yeast থাকত বলে।

কার্সিয়ঙে আসার আগে আমি মুন্সীগঞ্জ থেকে লিখেছিলুম, জয়তীর জন্যে অনুগ্রহ করে একজন আয়া ঠিক করে রাখতে। আসার পরের দিন আমার বুড়ো আর্দালি (জয়তী তাকে ডাকত 'দর্জি বাজে') একটি ষোল সতেরো বছরের ফুটফুটে, সুন্দরী, নম্র, শান্ত মেয়ে এনে হাজির করল। পরনে মেরুন রঙের ভেলভেট কাপড়ে ব্রোকেডের কাজ করা 'বোকু' (কিছুটা লম্বা ড্রেসিং গাউনের মত), কোমরে সোনার জরির কাজ করা চওড়া পাটি। পায়ে ছুঁচের কারুকার্য করা দুরঙা ফেল্টের তিব্বতী বুট, কানে বড় বড় ছাঁচে পেটা গোল পাকা সোনার ভুটানি বড় বড় কানের গয়না, বুকে সোনার হারে ঝোলানো ততোধিক বড় লকেট, তার সঙ্গে আস্ত পলার ডেলা দিয়ে গাঁথা দুই ছড়া হার। এসব দেখে আমি তো থ, মুখে কয়েক মুহূর্ত কথা ফোটে না। মেয়েটি সলজ্জ কনেবৌয়ের মত মাথা নিচু করে সমুখে দাঁড়িয়ে। আর্দালি বলল ছোট দারোগাবাবুর মেয়ে। জয়তীর তাকে তৎক্ষণাৎ ভাল লেগে গেল।

তিন দিনও গেল না, আভা বিপদ গণল। ঠিক হল যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। বাড়ির সবথেকে ছোট মেয়েকে গোর্খালি ভাষায় বলে কান্ছি। ঠিক হল, কান্ছি যদি এইরকম রাজকীয় পোশাকে সংসারে ঘোরাফেরা করে তাহলে লোকে আভাকে ভাববে আয়া, আর কান্ছিকে ভাববে বাড়ির কর্ত্রী। আভা বুদ্ধি করে একটি ছুতো বার করল। রোজ বাড়ির কাজ করতে গিয়ে, বিশেষত জয়তীকে চান করাতে গিয়ে তার অত সুন্দর দামী পোশাক খারাপ হয়ে যেতে পারে, অতএব আভা তাকে তার দুটি পুরনো আটপৌরে শাড়ি আর ব্লাউজ দিয়ে বলল বাড়ি থেকে এসে রোজ সে এই শাড়ি-ব্লাউজ পরবে, আবার সন্ধ্যাবেলা বাড়ি যাবার সময়ে কাপড় ছেড়ে রেখে, বোকু পরে বাড়ি যাবে। আমরা যতদিন কার্সিয়ঙে ছিলুম অর্থাৎ ১৯৪৫-এর মে মাস পর্যন্ত, ততদিন কান্ছি আমাদের কাছে

ছিল। ১৯৫০ সালে সেন্সাসের কাজে আমি কার্সিয়ঙে যাই, তখন কাঞ্ছির খোঁজ করি, আভা তার জন্যে আমার সঙ্গে একটি উপহার দিয়েছিল। কিন্তু তখন সে বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেছে।

কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া

বাড়ি খোঁজার আগে ভাবলুম কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ার বাড়িটি একবার দেখে আসি। পরের দিন দুজনে ডাকবাংলা থেকে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ায় হেঁটে গেলুম। পাংখাবাড়ি যেখানে মকাইবাড়ি চা-বাগানের দিকে নেমে গেছে, সেখান থেকে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ায় ওঠার রাস্তা উঠে গেছে। কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ার মাথায় উঠে বুঝতে পারলুম, ঐ বাড়িতে যদি না থাকতে পাই, তাহলে কার্সিয়ঙে থাকার সব মজাই নষ্ট হবে।

দার্জিলিং শহর থেকে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গমালা যেমন অপূর্ব মহিমামণ্ডিত ধারায় দেখা যায়, কার্সিয়ঙ শহর থেকে তার প্রায় কিছুই দেখা যায় না, মাঝে ঘুম পাহাড়ের কাঁধের পিছনে সব আটকা পড়ে যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াটুকু কেবল ঘুম আর সিঞ্চল পাহাড়ের মাঝে যেটুকু ফাঁক আছে তার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। কিন্তু যেই কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ায় উঠবেন তখনই ঘুম পাহাড়ের কাঁধ সরে যাবে। মেঘমুক্ত পরিষ্কার দিন থাকলে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্রাটের মত ঐশ্বর্যময়, শুভ্রবেশী বিপুল দেহ। কিন্তু অন্য কিছু দেখা যায় না, যা দার্জিলিং বা টাইগার হিল থেকে যায়, যথা কাঞ্চনজঙ্ঘার ডানদিক অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পুবদিকে একে একে কাব্রু, তারপর জানু, তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা, তারপর পাণ্ডিম, তারপর নরসিং। তারও পরে পূর্বদিক ধরে একে একে আসে সিম্‌ভো, সিনিয়লচু, চুমিয়োমো, কাঞ্চনঝাউ (কাঞ্চনঝাউয়ের মাথাটা চ্যাপটা, কিছুটা ধবলাগিরির মত), তারপর পাউহুনড়ি। তারপর অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়, তারও পরে একেবারে পূর্বপ্রান্তে চুমলহরির মহিমাময় গম্বুজ। দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশপথে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। পরিষ্কার চাঁদনি রাতে দার্জিলিং আর কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্যের হাওয়া জ্যোৎস্নার প্লাবনে এত দ্যুতিমান আর স্বপ্নে ঢাকা, মনে হয়, যেন আপনি হাত বাড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার গা ছুঁতে পারবেন। মধ্যের সমস্ত দূরত্ব যেন গলে পড়ে যায়। কার্সিয়ঙে কিন্তু সেই স্বপ্নময় অনুভূতিটি আপনি পাবেন না।

কিন্তু দার্জিলিঙের মত কাঞ্চনজঙ্ঘার রহস্য বা সারা পূর্ব-হিমালয় পর্বতমালার

ঐশ্বর্য না পেলেও, সে অভাব পূরণ করার মত আরেকটি পুরস্কার পাবেন, যা দার্জিলিং দিতে পারে না। পরিষ্কার দিনে বেলা তিনটে নাগাদ সূর্য নাগ্‌রি পাহাড়ের পিছনে নেমে যাবার আগে, ঝলমলে রোদ নিচে সারা তরাই অঞ্চল উদ্ভাসিত করে দেয়। কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া থেকে দক্ষিণে প্রায় একশ' মাইল পর্যন্ত যে দৃশ্য ঝলকিয়ে ওঠে তা দেখে আপনার নিঃশ্বাস পড়বে না। সমুখে আপনার পায়ের নিচে পাহাড়গুলি হঠাৎ হুড়োহুড়ি করে সাড়ে চার হাজার ফুট নেমে গিয়ে সমতল ভূমিতে ঠেকেছে। তার দক্ষিণে একটি বিরাট সমতল ছাড়া আর কিছুই নেই, ওদিকে আপনার পশ্চাদ্‌পট হিসাবে একের পর এক গাঢ় সবুজ পাহাড়ের মাথা দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘায় গিয়ে ঠেকেছে, দূরে পুবে পশ্চিমে, দুপাশে বন্ধুর পাহাড়ের সারি নিচে নেমে গেছে। দক্ষিণপূর্ব কোণের দিগন্তে দেখবেন মোটা হীরের ছড়ার মত তিস্তা নদী ঝিকমিক করছে, তার পাড়ে জলপাইগুড়ি শহর। তিস্তার পশ্চিম দিকে আপনার আরো কাছে আছে মহানদীর সরু রুপোর হার, কার্সিয়ঙের ডাউহিল থেকে নেমে শিলিগুড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে। ১৯৪৪ সালেও শিলিগুড়ি শহর গাছে প্রায় ঢাকা ছিল, এখন আর গাছপালার চিহ্ন নেই বললেই হয়। চারদিক বিস্তৃত, এলোমেলো খাপছাড়া শহর। আরো পশ্চিমে কার্সিয়ঙের ঠিক তলায়, বালাসন নদী পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। এর দুটি শাখা পরপর শিলিগুড়ির পশ্চিমে মহানদীতে মিশে, গঙ্গাভিমুখে গেছে। আরো পশ্চিমে দেখবেন পানিঘাটা আর লোহারগড়। তারও পশ্চিমে, আপনার ডানদিকে, নিচে, পাবেন মেচি নদী, মোটা রুপোর শিকলের মত, দার্জিলিং জেলা আর নেপালের মধ্যে সীমারেখার কাজ করছে। মেচি নদীতে দৃষ্টি আটকে না রেখে তারও পশ্চিমে দেখবেন দ্রুত বিলীয়মান মোরাং বনের অবশিষ্ট। তারও পরে বহুদূরে অন্যান্য ছোট নদী নেপালের পাহাড়গুলি থেকে একে একে বেরোচ্ছে।

এই মনপ্রাণভরা দৃশ্যের আর জুড়ি মিলবে না। শুধু তাই নয়। ১৮৩৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিকিমের রাজা একটি দানপত্রে বিনাশর্তে দার্জিলিং পাহাড় বৃটিশদের দান করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিরা অস্বাস্থ্যকর সমতলভূমিতে রোগভোগের পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় দার্জিলিঙে এসে ছুটি কাটাবে বলে। ১৮৩৬ সালে জেনরল লয়েড ও ডাঃ চ্যাপমানকে পাঠানো হয়, ঘুরে ঘুরে এই জেলার আবহাওয়া ও সুখসুবিধা পর্যবেক্ষণের জন্যে। পাংখাবাড়ি থেকে পুরনো মিলিটারি রোডে অবস্থিত মহাল্‌দীরামের পথের মাঝামাঝি স্থানে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া বাড়িটি তৈরি হয় বিশ্রামের 'চটি' হিসাবে। তখন থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া

মুখ্যত ব্যবহার হয় ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস হিসাবে। ঐ সালে, অর্থাৎ ১৮৭৯-তে অ্যাশ্‌লি ইডেন বাড়িটিতে ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ১৮৮০ সালে তাকে ডাউহিলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেই বছরই কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া আবার ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস হয়। ঠিক কোন সালে এটি এস-ডি-ওর বাড়ি হয় আমি বার করতে পারিনি। মুন্সীগঞ্জে আমি থাকতুম ইদ্রাকপুর দুর্গে, সেটি ছিল মুসলমান যুগের ঐতিহাসিক স্থান। কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া হল দার্জিলিঙে আধুনিক যুগের সবথেকে প্রাচীন নিদর্শন। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের আকর্ষণের পর এই যুক্তিটি হল আমার কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ায় থাকার দ্বিতীয় কারণ।

বড়, ছোট কয়েকটি বাড়ি নিয়ে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়া আবাস তৈরি হয়। সবগুলিই কাঠ আর কাঁচ দিয়ে তৈরি, যাতে চতুর্দিক ভাল করে দেখা যায়। আসল বাড়িটিতে ছোটবড় মিলিয়ে উনিশটি ঘর ছিল। তারমধ্যে দুটি বড় শোবার ঘর ছিল, প্রতিটিতে ছিল বড় কাপড় পরার ও স্নানের ঘর এবং কাচে-ঢাকা বারান্দা। একটি বড় চিড়িতন আকারের বসার ঘর ছিল। আরেকটি সুন্দর বড় খোলামেলা খাবার ঘর। বাবুর্চিখানা ছিল একটি আলাদা বাড়িতে, আসল বাড়ির সঙ্গে ছিল ঢাকা গলির সংযোগ। আরেকটি সুন্দর ছোট একানে ঘর ছিল, সেটি ছিল সারা বছরের মত আগুন-পোহানো কাঠ রাখার গুদাম। প্রতিটি ঘরে ছিল আগুন জ্বালার ফায়ারপ্লেস আর চিম্‌নি। তাছাড়া ছিল গ্যারাজ (আগে আস্তাবল হিসাবে তৈরি হয়েছিল), আর সার সার পরিচারকদের থাকার ঘরবাড়ি।

এসব আমরা নিজের পয়সার কিনে জীবনে কখনও ভোগ করতে পারব না; অতএব পি-ডব্লিউ-ডি'র চীফ এঞ্জিনিয়ারকে ধরাধরি করব ঠিক করলুম। তিনি আমাদের মনোবাঞ্ছার কারণ তারিফ করলেন। যতশীঘ্র সম্ভব ছাতটি মেরামত করে দেওয়ায় আমরা পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যে নতুন বাড়িতে গেলুম। তারপর সারা বাড়ির দেয়াল ও দরজা জানলা নতুন করে রং করা হল। বাড়ির ভিতরের দেয়ালে হাল্‌কা বাসন্তী রঙের ডিস্‌টেম্পার হল যাতে সবথেকে বেশী আলো খেলে। আমরা ইন্‌স্পেকশন বাংলা থেকে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ায় ঢোকার পরের দিন আমি ডি-এইচ রেলওয়ের অফিসারদের সঙ্গে টুরে গেলুম। মাঝরাত্রে ফিরে এসে শুনি সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টির সময়ে বাড়ির হাতার পশ্চিমদিকের তিনটি জাপানী ক্রিপ্‌টো-মেরিয়া গাছে বাজ পড়েছিল, সারা বাড়িতে সে সময়ে জয়তীকে নিয়ে আভা একা ছিল।

অতবড় বাড়িতে পর্দা ইত্যাদি লাগানো ও শীতের দেশের উপযুক্ত আসবাব

করা একটি সমস্যা হল। সাংবাদিক ও সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের তিন ভাগিনেয়ী ছিলেন। তাঁদের একজনের সঙ্গে স্থানীয় হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্সের প্রতিনিধি শচীন সিংহের বিবাহ হয়। হিলকার্ট রোডের উপর কোম্পানির বাড়ি পেলিকানে তাঁরা থাকতেন। পেলিকানের এক অংশ কোম্পানির শৈলাবাস হিসাবে আলাদা করা ছিল। সেই অংশ থেকে কয়েকটি বাড়তি নেয়ারের খাট, তার সঙ্গে কিছু কিছু আসবাব, শচীনবাবু অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহার করতে দিলেন। যে চোদ্দমাস আমরা কার্সিয়ঙে ছিলুম তারমধ্যে, আভার হিসাবে তেরো দিন বাদে বাকি সব সময়েই আমাদের সংসারে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়ায় কিছু না কিছু অতিথি ছিলেন। ফলে শচীনবাবুর দেয়া আসবাব খুব কাজে লেগেছিল।

নিজেদের জন্যে গরম জামাকাপড়, অতিথিদের জন্যে চাদর কম্বল, ঠাণ্ডা মেঝের জন্য আটপৌরে কার্পেট, শীতের দেশের জন্যে গদি আঁটা চেয়ারের প্রয়োজন। চাদর, কম্বল ইত্যাদি কার্সিয়ঙের হনুতরামের দোকানের মত দার্জিলিঙের ব্রিজমোহন ব্রাদার্সের দোকান থেকে মাসিক কিস্তিতে দাম দেবার বন্দোবস্ত করে কিনলুম। মেঝেয় পাতার জন্যে কয়েকটি সাদাসিধে পশমের কার্পেট পরে আমরা দোকান থেকেই মাসিক কিস্তিতে কিনি। গোয়েথাল স্কুলের ফাদার ওয়েরি বসার ঘরের জন্যে গদি আঁটা সুন্দর সেটি ও তার সঙ্গে দুটি গদি আঁটা চেয়ার সাড়ে তিনশ' টাকায় করে দেবেন বললেন। এর দামও মাসিক কিস্তিতে শোধ করলে চলবে। কার্পেট ইত্যাদি কেনার জন্যে এক হাজার টাকা চেয়ে বাবার কাছে লিখলুম। বাবা লিখলেন তিনি রোজকারের বেশী খরচ করা পছন্দ করেন না। তাছাড়া মেঝের কার্পেট বা সোফা বিনাও সংসার চলা উচিত।

এই প্রসঙ্গে, নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করে বাবা সেই টাকা দিয়ে কী করতেন যদি না বলি তাহলে আমার অপরাধ হবে। বাবা নিজেকে ভিক্টোরিয়ান আদর্শে মানুষ করেছিলেন। স্যামুয়েল স্মাইল্‌সের সেল্‌ফ-হেল্প ছিল তাঁর জীবনযাত্রার বাইব্‌ল্‌। আত্মসংযম, আত্মনিয়োগ ছিল জীবনের ব্রত। আমার স্মৃতিকথার প্রথম ভাগে লিখেছি কীভাবে তিনি তাঁর দুই স্বর্গত দাদার সংসারে সাহায্য করে তাঁদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছিলেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর অন্ধ-দিদির ভরণপোষণ আজীবন চালিয়ে গেছেন। বিধবা আত্মীয়াদের প্রত্যেককে তিনি অম্বুবাচীর সময়ে কিছু অর্থ পাঠাতে কখনও ভুলতেন না। বহু বছর পরে ১৯৮৭ সালে এক বিবাহ বাসরে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের ছেলে ডাক্তার করুণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ডঃ কুমুদশঙ্কর রায় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

করেন। করুণশঙ্কর বললেন চল্লিশের দশকে তিনি তাঁর বাবার হাসপাতালে রেসিডেণ্ট সার্জন ছিলেন। বেশ কষ্ট করে তখন হাসপাতাল চালাতে হত। মাসের পয়লা তারিখে তাঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন কখন বাবা এসে তাঁর মাসিক চেকটি তাঁদের হাতে দেবেন। সেই টাকায় হাসপাতালের ভৃত্যদের মাইনে দেয়া হত। এই ধরনের মাসিক সাহায্য তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত করতেন। ১৯৬৯ সালের মধ্যে বাবা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় নানা প্রতিষ্ঠানে ও ত্রাণভাণ্ডারে দান করেন। কোথায়, কাকে, কত দেন তার তালিকা তাঁর ডায়েরিতে নিয়মিত লেখা থাকলেও গল্পচ্ছলেও কারোকে বলতেন না, আত্মবিজ্ঞাপনের জন্য তো নয়ই। ১৯৬৯ সালেও তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল; বোধহয় ভেবেছিলেন বাকি যা সঞ্চয় থাকবে তার সঙ্গে তাঁর মাসিক পেনশন মিলিয়ে তাঁর বাকি জীবন চলে যাবে। তখন তাঁর বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ ১৯৬৯-৭০ সালে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক বাড়ায়, তাঁর যথা আয় তথা ব্যয় অবস্থা হল, সঞ্চয়ের সূত্র কিছু থাকল না। এই সময়ে অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে ১৯৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাকি জীবন কাটান। তাঁর শুশ্রূষার জন্যে আমরা ভাগ্যক্রমে একজন ভাল সেবিকা পাই। আজকালের তুলনায় তিনি সামান্যই পারিশ্রমিক নিতেন। বাবার স্বাস্থ্য চিরকাল এত ভাল ছিল যে সেবিকার কোনদিন প্রয়োজন হতে পারে এ-কথা বোধহয় তিনি কোনদিন ভাবেননি, তার জন্যে ব্যবস্থাও করেননি। আমার ছোটদিদি, ভাই অজিত ও আমি তিনজনে মিলে সেবিকার মাইনে বাবদ এই সামান্য টাকা মাসে মাসে দিতুম বলে বাবার কুণ্ঠার সীমা ছিল না। আমাদের খুব তৃপ্তি ও আনন্দ হয় যখন গ্রোভ লেনের দান করা জমি, বাড়ি বিক্রি করে, ঠাকুরপুকুরের ক্যান্‌সার কেন্দ্র সেই টাকায় ১৯৮৮ সালে সেণ্টারের লাইব্রেরি ঘর প্রতিষ্ঠা করে সেটি আমাদের বাবা, মা যোগেশচন্দ্র ও ঊষাবতীর নামে উৎসর্গ করেন।

তখনকার দিনে বারো মাইলের বেশী একদিনে টুর করলে দৈনিক খরচ বাবদ সরকার থেকে বারো টাকা ভাতা পাওয়া যেত। সমতল জেলায় এই ভাতা ছিল ছ'টাকা। কার্সিয়ঙে এই টাকা রোজগার হত পায়ে হেঁটে। পাহাড়ে সাইকেল চলত না। হাঁটতে হাঁটতে দু'এক মাসের মধ্যেই চোদ্দ পনেরো মাইলের দৈর্ঘ্যে আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত চড়াই ওঠানামা অভ্যাস হয়ে গেল। চোদ্দ পনেরো মাইল হাঁটা আর তার ফাঁকে জেলা বোর্ড, বা দার্জিলিং ইম্‌প্রুভমেণ্ট ফাণ্ডের

রাস্তাঘাট, অথবা গ্রামে গ্রামে স্কুল, ডিস্‌পেন্‌সারি, হাসপাতাল ও স্যানিটারি ব্যবস্থা পরিদর্শন করে বেড়াতে দিনে প্রায় দশ ঘণ্টা লাগত। ঘোরাফেরার সময়ে নেপালী ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করতুম। যেটুকু শিখেছিলুম এখনও কাজে লাগে। এখনও ফৌজের কোন অফিসার বা জোয়ান, অফিসের দরোয়ান বা ড্রাইভার যদি নেপালী দেখি, বলি 'কস্ত ছ, যাতি ছ'? ('কেমন আছেন, ভাল সব?') তখনই তাঁদের মুখ খুশিতে ভরে যায়, আমিও খুব আনন্দ পাই, নিজেকে অন্তরঙ্গ মনে হয়। নেপালী ভাষা শেখা খুব সহজ, ভাষাও খুব মিষ্টি, মৈথিলীর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে।

কার্সিয়ঙ ও বিক্রমপুরের জনজীবন ধারা

কার্সিয়ঙের গুর্খা পরিবার এবং প্রাক্‌দুর্ভিক্ষ মুন্সীগঞ্জের একই সামাজিক শ্রেণীর বাঙালি পরিবারের জীবনযাত্রার মধ্যে অনেক তফাৎ লক্ষ্য করি। কার্সিয়ঙে গুর্খা পরিবারে পুষ্টি ও লেখাপড়ার জন্যে যে খরচ হত আমার মনে হত বিক্রমপুরের সমপর্যায়ের পরিবারে এই দুই খাতে অনেক বেশী খরচ হত। অন্যদিকে, বিক্রম-পুরের যে-কোন বাড়িতে ঢুকলে সবকিছু যেমন বিশ্রস্ত, এলোমেলো, অপরিচ্ছন্ন দেখতুম, কার্সিয়ঙে যে-কোন গুর্খা পরিবারের বাড়িতে সবকিছু হত ফিটফাট, পরিচ্ছন্ন। কার্সিয়ঙের গৃহস্থরা নিজেদের দৈন্য ঢাকার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, বিক্রমপুরের গৃহস্থরা, মনে হত, নিজেদের দুঃখদৈন্য জাহির করার জন্যে ব্যস্ত, বিশেষত তাঁদের বাড়ি ও নিজেদের সাজসজ্জায়। বাড়ির বাইরে যাবার সময়ে গুর্খারা যথাসম্ভব পোশাকের ছেঁড়াখোঁড়া ঢেকে, সেজেগুজে বার হত, বাঙালিরা যেন ছেঁড়াখোঁড়া দেখাতে ভালবাসতেন। দুই দেশেই রান্না ও খাবার বাসন পালিশকরা সোনা-রুপোর মত ঝকঝক করত। উপরন্তু কার্সিয়ঙের বাড়িতে সব-সময়ে বারান্দার বা বাড়ির সমুখে ফাঁকা জায়গায় পুরনো টিনের পাত্রে জিরেনিয়াম বা দোপাটির ফুল-ফোটা চারা দেখা যেত। মুন্সীগঞ্জে সে ধরনের সৌন্দর্য বা রঙের প্রতি অনুরাগ দেখিনি। দুই স্থানেই অতিথিসেবা যথেষ্ট ছিল, বাড়িতে কেউ এলে তার আপ্যায়ন নিশ্চিত।

সংসার খরচে কোনটা আগে কোনটা পরে সে বিষয়েও বিচারের তফাৎ ছিল। নেপালী বাড়িতে জামাকাপড় এবং ফ্যাশনে অনেক বেশী খরচ হত। অবশ্য শীতের দেশে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল পুষ্টিকর আহারের

উপর কার্সিয়ংবাসী মুন্সীগঞ্জবাসীদের থেকে অনেক খরচ কম করে। ১৯৪৪ সালে কার্সিয়ঙে সাজসজ্জায়, প্রসাধনে, বিশেষত মেয়েদের, চোখে পড়ার মত খরচ করার যে রেয়াজ ছিল বর্তমানে কলকাতায় সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা তার থেকেও অল্পবিত্ত সংসারে একই ধরনের রীতি এসেছে, তা লক্ষ্য করি। পরিবারের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ বা অল্পবয়স্ক-বেশীবয়স্কদের আহারের পরিমাণে কার্সিয়ঙের পরিবারে মুন্সীগঞ্জের তুলনায় বৈষম্য ছিল অনেক কম। কার্সিয়ঙে শিশু ও ছেলেমেয়েরা অনেক বেশী আদরযত্নে থাকত, এবং মারধোর কম জুটত। রোগ হলে মেয়েদের ডাক্তার দেখাতে অবহেলা হত না, যেটা মুন্সীগঞ্জে হত। অন্যদিকে, মুন্সীগঞ্জের তুলনায় কার্সিয়ঙ-পরিবারে পুরুষকর্তার ভাগ্যে পুষ্টি বোধহয় কম হত। মেয়েদের থেকে নেপালী পুরুষদের খাড়া পাহাড়ে অনেক বেশী চড়াই-উৎরাই করে ঘুরতে হত, ফলে অনেক বেশী শক্তিক্ষয় হত। পরিশ্রমের ফলে রক্ত থেকে যে নুন ক্ষয় হত, সেটি পূরণ করতে এবং পাহাড়ে চড়ার শক্তি ফিরিয়ে দিতে নুন দেয়া চা—পাহাড়ে বলত নিমকী চায়—বেশী সাহায্য করত। কিন্তু দুধ-চিনি দিয়ে চা খাওয়ায় শরীরে ও পেশীতে যে পুষ্টি আসে তা হত না। উপরন্তু নিমকী চায়ের দাম অনেক কম হত। বছরের পর বছর খালিপেটে নিমকী চা খেয়ে, তার সঙ্গে কোন খাবার না খেয়ে, পেটের ভিতর ঘা হত। সেই সঙ্গে শীতের সময়ে বদ্ধ ঘরে কাঠের বা কয়লার ধোঁয়া বুকের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হওয়ায় যক্ষ্মার সম্ভাবনা বাড়ত। চা-বাগানে (নেপালীতে চা-বাগানকে চিয়া-কামান বলে) মাথাপিছু গড় আয় এত কম ছিল যে তাতে আহারের উন্নতি সম্ভব হত না। বাড়তি সব্জি বা ফলচাষ করার মত জমি থাকত না। কিছু কিছু বাড়িতে অবশ্য টিনের পাত্রে স্কোয়াশ বা বিলিতি বেগুন ফলত, কিন্তু সেও যৎসামান্য, মাছ পাওয়া যেত না বললেই হয়, ফলে লোকে মাছ খুব কম খেত। মাংসও কম পাওয়া যেত, দামও বেশী পড়ত। আটার থেকে ভাতেই লোকে বেশী অভ্যস্ত ছিল। পাঁউরুটির প্রচলন ছিল কম। তরকারির মধ্যে পাওয়া যেত আলু, তাও যুদ্ধের কল্যাণে যথেষ্ট পরিমাণে বা সস্তা দামে নয়। উপরন্তু, ১৯৪৪ সালে কার্সিয়ঙেও চালের আকাল দেখা দিল, যদিও গুর্খাদের দেশ বলে সরকার চাল সরবরাহ চালু রাখার বিশেষ প্রয়াস করতেন। পশ্চিম, পুব, দুই গোলার্ধেই গুর্খাদের অবদান ছিল বেশী, সুতরাং যতদুর সম্ভব তাদের সন্তুষ্ট রাখা ছিল জরুরী।

যুদ্ধক্ষেত্রে গুর্খাদের অবদানের উল্লেখ করতে গিয়ে কার্সিয়ঙে আরেকটি শিক্ষার কথা মনে পড়ল। স্বামী বিদেশে যুদ্ধ করতে গেলে সব বধূই যাবতীয় প্রণয়ভিক্ষা পায়ে ঠেলে অডিসিয়ুসের পরিণীতা পেনেলোপির মত স্বামীগতপ্রাণা হয়ে দিন

গোনেন না। তা ছাড়া গ্রামবাসীরা রণক্ষেত্রেগত যোদ্ধার বাড়িতে কত কি রঙ্গ হচ্ছে সে-বিষয়ে বানিয়ে বা রং চড়িয়ে লিখতেও পারে। কোন সমাজেই শুভাকাঙ্ক্ষীর তো অভাব নেই! এইসব ক্ষেত্রে ধরমশালা বা ডালহৌজির গুর্খা রেজিমেন্টাল দপ্তর থেকে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেয়া হত। দপ্তরের একজন অল্পবয়স্ক অফিসার ছুটে আসতেন। গ্রাম খুঁজে বার করে বৃদ্ধ কোন অবসরপ্রাপ্ত গুর্খা সৈনিককে নিয়ে বধূর শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ি গিয়ে, সবাইকে ডেকে-ডুকে সন্তোষজনক ফয়সালা করে, বধূকে নিরাপদ হাতে সঁপে, স্থানীয় সেনাবোর্ডের কর্তাদের ও এস-ডি-ওকে সববিষয়ে অবহিত করে, ফিরে যেতেন, রেজিমেণ্ট থেকে আশ্বাসের চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্তমনে সৈন্যটি যাতে মনপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারে। নিজের কার্যোদ্ধারের স্বার্থে পরের স্বার্থ রক্ষা করা যে কত বাঞ্ছনীয় বুঝতে পারলুম।

১৯৪৪ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত, ইম্ফল-কোহিমায় যে বিপর্যয় চলে সে বিষয়ে আগেই বলেছি। ১৯৪৪-এর ১ এপ্রিল তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে লাট কেসি ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব রুখতে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হলেন। পরে শুনলুম তারই একটু আগে চার্চিল ভারতবর্ষে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, ১৯৪৪ সালে যেন কোনমতেই ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাহলে বৃটেন নির্ঘাত ভারতবর্ষ হারাবে। উখরুল আর মৈরাঙে নেতাজির অবস্থিতিতে বৃটিশরা সত্যিই বেশ ঘাবড়িয়ে যায়, কারণ যথেষ্ট ছিল। ফলে, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাস থেকেই চাল, আটা ময়দা, গম, বাজরা, চিনি, কেরোসিন মোটামুটি কাজচলা পরিমাণে আসতে শুরু করল। সমস্যা হল যা আসছে তার সুষ্ঠু ও সমান বণ্টন। ইতিমধ্যে কার্সিয়ঙ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান জুরীমল গোয়েঙ্কা, তাঁর জ্যেঠতুতো ভাই এন-সি গোয়েঙ্কা, ডাউহিলের শশিভূষণ দে, যক্ষ্মা সানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ ডাঃ অমিয়ভূষণ গুহ, কার্সিয়ঙের সিভিল অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন ডাঃ নলিনীরঞ্জন কোনার, ও অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রলোক, যথা আর-এস প্রসাদ, জর্জ মাবার্ট, তেনজিং ওয়াংদি, গোয়েথাল স্কুলের সমাজব্রতী ফাদার ওয়েরি, হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্সের শচীন সিংহ, গোর্খা লীগের এস-বি রাই, কম্যুনিস্ট পার্টির রতনলাল ব্রাহ্মণ ও কার্সিয়ঙের চা-বাগান ম্যানজারদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার নিজের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করি। চা-বাগানের ম্যানেজারদের মধ্যে মহানদী বাগানের মিঃ ও'ব্রায়েন ছিলেন সবথেকে প্রাচীন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্থানীয় চা-বাগান ম্যানেজারদের স্ত্রীদের নেত্রী এবং ছুটিতে আসা বৃটিশ সৈন্যদের সবকিছু ব্যবস্থার

ভারপ্রাপ্তা নেত্রী। তাছাড়া ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ডি-বি ছেত্রীর স্ত্রী মায়াদেবী ছেত্রিনী, যেমন রূপসী তেমন মধুর, শান্ত স্বভাব।

অভাবের সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় আহারদ্রব্য বিলির কাজে ক্ষমতার খিদে বাড়ে। যাঁরা একবার এই ক্ষমতা ভোগ করেছেন তাঁরা তা ছাড়তে চান না, উপরন্তু তাঁদের ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দাপট বাড়ে। কিন্তু জুরীমল গোয়েঙ্কার মনের গড়ন এমনই ছিল যে এ ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁর মোটেই স্পৃহা ছিল না। ফলে, পারিবারিক রেশন কার্ডের ভিত্তিতে সরকারি সূত্রে পাওয়া খাদ্যদ্রব্য বিলির প্রস্তাব যখন তাঁর কাছে করলুম, তখন জুরীমল এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। চা-বাগানের ম্যানেজাররা কিন্তু গাঁইগুঁই করতে শুরু করলেন; তাঁরা চাইলেন আগের মত বাগানের প্রাপ্য সরবরাহ তাঁরা নিজেরা যেমন খুশি বিলি করবেন, বিশেষত চিনি ও ময়দা। ছুতো হিসাবে বললেন, চা-মজুররা তো নিমকী চা খায়, সুতরাং তাদের চিনি বা ময়দার প্রয়োজন নেই। আসল কারণ, তাঁরা চিনি-ময়দা নিজেদের হাতে রেখে ইচ্ছামত নিজেদের বাড়িতে কেক মিষ্টি তৈরি করে খেতে পারবেন। মহকুমার সাধারণ পরিবারে ছোট ছেলেমেয়েদের চিনির প্রয়োজনের কথা মনে থাকত না। এ ব্যাপারে মিসেস ও'ব্রায়েন বিশেষ সাহায্য করলেন। ইংলণ্ডের রেশনিং প্রথার উল্লেখ করে তিনি নীতির আশ্রয় নিলেন। উপরন্তু নিমকী চায়ের বদলে চা-মজুরদের চিনি-দুধ দিয়ে চা খাবার সম্ভাবনাকে সাগ্রহে বরণ করলেন। দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনার জর্জকে আমার প্রস্তাব জানালে তিনি বললেন, তিনি শীঘ্রই চলে যাচ্ছেন, আমার এলাকায় আমার যা ভাল মনে হয় করতে পারি। তাঁর স্থলে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আর-এস-টি জন—এঁর কথা আগে বলেছি—এসে বললেন কার্সিয়ঙ সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি নেই, যদিও দার্জিলিঙে বা কালিমপঙে তিনি পারিবারিক রেশনিং চালু করলেন না। রেশনিং-এ চাল বিলি যখন শুরু হল তখন যুদ্ধের আগে যে দাম ছিল, তার প্রায় তিনগুণ সাড়ে তিনগুণ হল।

যখন যেমন আমদানি সেইমত মাসিক প্রাপ্তি হিসাবে পারিবারিক রেশনের পরিমাণ বদলাত। সারা মাসে যা পাওয়া গেল তার হিসাবে প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক ও বারো বছরের কম ব্যক্তি হারাহারি ভাবে কত পেতে পারে তার অঙ্ক কষা হত। বারো বছরের কমকে অর্ধেক মাপে ধরা হত। পরিবারে ক'জন প্রাপ্তবয়স্ক আর ক'জন বারো বছরের কম সেই হিসাবে, সেই মাসের মত রেশনের পরিমাণ ঠিক করে রেশন বিলি হত। প্রতি গ্রামে ও চা-বাগানে খাদ্য কমিটি গঠিত হল। তাঁরা

নিজ নিজ এলাকার পরিবারের নাম ঠিকানা রেশন ইউনিট সংখ্যার রেজিস্টার রাখতেন এবং দোকানেও রেজিস্টার থাকত। খুবই সুখের বিষয়, মিথ্যা করে পরিবারের লোকসংখ্যা ফাঁপিয়ে দেখানোর ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। আবাসিক স্কুল, আশ্রম, হস্টেল, মঠে, মোট লোকসংখ্যার উপর, হঠাৎ অতিথি আগন্তুকসমাগমের নিমিত্ত, বরাদ্দ ইউনিটের উপর পাঁচ-শতাংশ ইউনিট বেশী দেয়া হত। সব-ডিভিশনাল রেশনিং পরিচালনা কমিটির হাতে ভার পড়ল সব গ্রাম, বস্তি, চা-বাগান আর তাদের লোকসংখ্যার হিসাব রাখা, রেশনবিলির ব্যবস্থা করা, পাইকারি ও খুচরা বিক্রির দর ঠিক করা, কত অপচয় ন্যায্যত হতে পারে তার পরিমাণ ঠিক করা, রেশন পরিবহনের দর বেঁধে দেয়া ইত্যাদি। এই ব্যবস্থা একবছর চালু থাকার পর আমি যখন পরের বছর মে মাসে বিদায় হলুম তখন মনে একটি বিষয়ে তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে গেলুম; গ্রামে ও শহরের অনেক চায়ের দোকানে নিমকী চায়ের সঙ্গে চিনি-দুধ দিয়ে চা'ও বিক্রি হচ্ছে, এবং চিনি-দুধের চা-পানের অভ্যাস বাড়ছে।

রাজনীতির কথা

পরিবারভিত্তিক রেশন কার্ড কার্যকরী করার ফলে, যদিও ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত নানা হাঙ্গামা প্রায়ই হত, তবুও দৈনন্দিন হাঙ্গামা অনেকাংশে ঘুচে গেল। খাদ্যশস্যের অবস্থা তখনও কত সঙ্কটময় তা কেন্দ্রীয় বিধানসভার ১৯৪৪-এর ৮ ও ৯ নভেম্বর ও কাউন্সিল অভ স্টেটের ১৪ নভেম্বরের বিতর্ক পড়লেই বোঝা যাবে। কাউন্সিল অভ স্টেটের পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং কেন্দ্রীয়সভার ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী খুবই স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কে-সি নিয়োগী একসময়ে বলেন :

> "খাদ্যমন্ত্রীর উত্তরটি সম্ভবত ইণ্ডিয়া অফিসে প্রেরণার্থে তৈরি হয়েছিল, যাতে তার উপর ভিত্তি করে মিঃ এমেরি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আরেকটি আত্মগরিমাময় বক্তৃতায় পৃথিবীকে নিশ্চিন্ত করতে পারেন যে ভারতে সব ঠিকঠাক আছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, কার্যকরী সমিতির ফুড কমিটি অতি উচ্চস্তরে খাদ্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন বিচার করছেন। সম্ভবত স্তরটি এত উঁচু যে সে শিখর থেকে মাননীয় মন্ত্রী দীনদের অবস্থা আদৌ ঠাহর করতে পারছেন না।"

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সালে চালগমের অবস্থা যে আরো খারাপ বলে তাঁরা

মন্তব্য করেন তা মোটেই অত্যুক্তি হয়নি। কার্সিয়ঙে যে সিদ্ধ চাল রেশনে দিত তাতে থাকত পচা গোবরের গন্ধ, এবং অর্ধেক কাঁকড়। জয়ন্তীকে সে চালের ভাত খাওয়াতে হলে বার বার বলতে হত সে যত পাথর চিবোবে ততই তার গায়ে জোর হবে। মনে হত অধিকাংশ চালই বোধহয় ১৯৪১ সালের শেষে প্রবর্তিত ডিনায়াল নীতির বলে সংগৃহীত চাল, এতকাল অতি খারাপ অবস্থায় গুদামজাত করা ছিল। এখন ইস্পাহানি কোম্পানি ও রণদাপ্রসাদ সাহা বাজারে ছাড়ছেন। এঁরা দুজন বেঙ্গল মুসলিম লীগের চালসংগ্রহের মুখ্য এজেন্ট ছিলেন। কে-সি নিয়োগী তাঁর বক্তৃতায় বলেন ১৯৪৩ সালে প্রায় ৮৩ লক্ষ লোক বুভুক্ষায় প্রাণ হারায়। ১৯৪৪ সালে শতকরা চল্লিশজন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। বোধ-হয় শেষ উক্তির যথার্থতা প্রমাণের জন্যেই ১৯৪৪-এর অগাস্টে কার্সিয়ঙে আমার হঠাৎ ম্যালেরিয়া হয়, জ্বর খুব বেশী ওঠে। তার আগে আমার শেষ ম্যালেরিয়া হয় সাড়ে চার বছর আগে. ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ডে থাকতে।

কার্সিয়ঙের স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ায়, রেশনিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায়, মুন্সীগঞ্জের তুলনায় কাজ অত্যন্ত কম থাকায়, কার্সিয়ঙ পাহাড়ের অন্যধরনের লোকজন ও তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আগ্রহ থাকায়, উপরন্তু সারাক্ষণ বাড়িতে অতিথি-সমাগম ও অবস্থানের ফলে, দেশের ও আন্তর্জাতিক সংকট ব্যাপারে আমার ঔৎসুক্য বোধহয় একটু কমে গেছল। ১৯৪৪-এর ৯ এপ্রিল গয়ায় পাকিস্তানের নামে আহূত কনফারেন্সে বাংলার প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন বললেন, ভারতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেবার ফলে বৃটেন মুসলিম দাবিকে বাস্তবরূপ দিতে বাধ্য। উক্তিতে আমার মত লোকও চমকে উঠল। ইতিমধ্যে পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। ১ মে ডাঃ বি-সি রায় গান্ধীজিকে পরীক্ষা করেন। ৩ মে বম্বে সরকার একটি বিবৃতিতে স্বীকার করেন তাঁর শরীরে রক্তাল্পতা বেড়েছে, রক্তচাপ আরো কমেছে। ৪ মে নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, নলিনীরঞ্জন সরকার ও ঘনশ্যামদাস বিড়লা ভাইসরয়ের নিজস্ব সচিবের কাছে গান্ধীজির স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ও তাঁর মুক্তি দাবি করে একটি তার পাঠান। এঁরা শুধু কলকাতার নয়, ভারতের শিল্প বাণিজ্যে, বিশেষত নাগরিক জীবনের জনমত ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। ৬ মে বিনাশর্তে মহাত্মা গান্ধী মুক্তি পান। এমেরি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না: বিবৃতি দিলেন স্বাস্থ্যের কারণে গান্ধীজিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

মৈরাঙে নেতাজি, কোহিমায় জাপানীরা, পুণায় মৃত্যুপথে গান্ধীজি, ভারতের জনমতনেতাদের গান্ধীজির জীবন নিয়ে উদ্বেগ, দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা, সব মিলিয়ে বৃটিশ সরকার নিশ্চয় বিচলিত বোধ করেছিলেন। তার উপরে ২৯ জুন পুণা থেকে সাতাশ জন সর্ববিদিত ভারতবাসী বৃটিশ জনসাধারণের উদ্দেশে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি ও হোয়াইট হলের একান্ত ঔদাসীন্য বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিলেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, এন-আর সরকার, বি-সি রায়।

১৫ মে খাকসার নেতা আল্লামা মাশরিকিকে গান্ধীজি তার করে জানালেন তিনি হিন্দুমুসলিম বোঝাপড়া সম্বন্ধে কায়েদ-এ-আজম জিন্নার সঙ্গে আলাপ করার উদ্দেশে যত তাড়াতাড়ি পারেন সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন।

বন্ধুদের যাতায়াত

আগেই বলেছি কার্সিয়ঙে অতিথি ও বন্ধুদের যাতায়াত নিত্য লেগে ছিল। প্রথমেই এলেন জজ জ্ঞানাঙ্কুর দে ও তাঁর ছেলে। জ্ঞানাঙ্কুর দে ঢাকায় ষোলঘরের সাহাদের আনা আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আপসে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে থাকতেই আমি দেওয়ানি মামলা বিষয়ে শিক্ষার জন্যে আভা আর জয়ন্তীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি গিয়ে জজ করুণাকুমার হাজরার কাছে শিক্ষানবিশী করি। জ্ঞানাঙ্কুর দে দিন পনেরো থাকার পর আমরা ফিরে এলেই গণনাট্য সঙ্ঘের সুজাতা মুখার্জি তাঁর স্বামী গ্ল্যান ডেভিসকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে একমাসের উপর থাকেন। ডেভিস মুন্সীগঞ্জে দুর্ভিক্ষের সময়ে ফ্রেণ্ড্‌স্ অ্যামবুলেন্স ইউনিটে কাজ করতেন এবং দুর্ভিক্ষ ও রোগত্রাণের ওষুধপত্র পাঠিয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন সে বিষয়ে আগে লিখেছি। তারপর এলেন শ্রীনগরের ডাক্তার মন্মথনাথ নন্দী ও তাঁর স্ত্রী। তাঁরাও দিন দশেক ছিলেন। ইতিমধ্যে আমার বাবা ও ভাই গুলু এসে রইলেন। এইভাবে একের পর এক অতিথিসমাগম চলল। সকলের কথা একে একে না লিখে বন্ধু চঞ্চল ও তাঁর স্ত্রী অমিতার কথা বলি। তার কিছুদিন আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। অমিতা আর আভা স্কটিশ চার্চে সহপাঠিনী ছিলেন। আমাদের মদ্যপান অমিতা বিশেষ অপছন্দ করতেন। ইতিমধ্যে আভা কোনমতে আমাদের এই বিশ্রী স্বভাব কিছুটা মেনে নিয়েছে, যদিও সে নিজে খেতে শুরু করে আরো অনেক

বছর পরে। সোরাবজিতে এক বোতল পুরনো মারাশিনো পেলুম, তখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। মারাশিনোর বিপদ হচ্ছে, ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় বোতল খুললেই গন্ধে মাছি এসে জোটে। একদিন রোদধোয়া সকালে বাড়ির হাতার পশ্চিম-দক্ষিণদিকে যেখানে একধারে কন্স্ট্যান্শিয়ার গায়ে হঠাৎ খাদ নেমে বেমালুম বহু নিচে চলে গেছে, তার পাড়ে চঞ্চল আর আমি মারাশিনো খুলে বসেছি, এমন সময়ে কোথা থেকে এক মাছি এসে ঝুপ করে চঞ্চলের পাত্রে পড়তে না পড়তেই চঞ্চল ছোঁ মেরে আঙুল ডুবিয়ে সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দ্বিতীয় একটি মাছি আর সামলাতে পারল না, মারাশিনোয় পড়ে তলিয়ে গেল। মাছিটি আবার তাড়াতাড়ি তুলে, গেলাসের মধ্যে তার থেকে মারাশিনোর ফোঁটা ঝেড়ে সে মাছিটিকে ছুঁড়ে দিল। তাই দেখে অমিতার বিবমিষা এল। চঞ্চলের এরকম বাহাদুরি করার কি প্রয়োজন ছিল, যে নাকি আমার মত বরাবরই স্ত্রীর সামনে মূষিক হয়ে থাকে? বীরত্বের ঝোঁক আচমকা কখন কীভাবে আসে বলা শক্ত।

কার্সিয়ঙে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন অমিয়দা (গুহ) ও তাঁর স্ত্রী বীণাদি। অমিয়দা ছিলেন আমার ছোটজামাইবাবু রবীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বন্ধু, তাঁরই মত আমাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। বীণাদি ছিলেন আমার বড়দিদির মত, যেমন মধুর, স্নেহশীল শান্ত স্বভাব তেমনি অত্যন্ত ভাল রাঁধুনি ও গৃহিণী। অমিয়দা বৌদির জন্যে নানা রান্নার সরঞ্জাম করিয়ে দিয়েছিলেন, লঘুপাক অথচ অপূর্ব হত প্রত্যেকটির স্বাদ। এঁদের ছাড়া ছিলেন নলিনীরঞ্জন কোনার ও জুরীমল গোয়েঙ্কা। সকলেই এখন গত। মুন্সীগঞ্জে আমার জীবনে আর্নল্ড ম্যাকার্টিচ যে স্থান অধিকার করেছিলেন, কার্সিয়ঙে সে স্থান অধিকার করেন জুরীমল গোয়েঙ্কা। দুজনেই ছিলেন প্রায় একবয়সী, অর্থাৎ আমার বয়সের প্রায় দু'গুণ। জুরীমলের শরীর ছিল একটি পর্বতের মত, মুখটা ছিল প্রকাণ্ড এবং কিছুটা লাল, ঠোঁটের উপর সযত্নে লালিত একজোড়া জমকালো সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত গোঁফ। বাঁ চোখের সাদার মধ্যে ছিল বড় তিলের মত একটি জন্মচিহ্ন। জলচিকিৎসার আসরে তিনটি বড় হুইস্কি পেটে পড়লেই সেটি কেমন যেন আরো বড় হয়ে জলজল করে উঠত। মদ পেলেই হল, সে যেমনই হোক, স্কচ না হলে খাব না সে সব ন্যাকামি বা নাকসেঁটকানো ছিল না। তাকেই বলে সার্থক মদের পূজারী, আজকালকার প্যানপেনে ইয়াপিদের মত নয়, যারা স্কচ আর ব্যাঙের মুত্রর তফাৎ বোঝে না, অথচ স্কচ স্কচ করে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল অনেক বছর পরে দিল্লীতে থাকতে একটি মাতব্বরের কথা। তিনি বলতেন তিনি চা-

টেস্টারের মত স্কচ মুখে দিয়ে বলতে পারেন কোন কোম্পানির আর কোন সালের। বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে ধরে খাওয়াচ্ছে আর উনি বলে যাচ্ছেন, অমুক কোম্পানি, অত সাল। একটা নমুনা মুখে দিয়ে মুখ সিঁটকিয়ে বললেন, মানুষের মূত্র! বলে থুতু ফেললেন। বন্ধুরা উন্মুখ হয়ে মোরারজি দেশাইয়ের যোগ্য অফিসার বলে তারিফ করে বললেন, ঠিকই বলেছো, তবে কার মূত্র, আর কবেকার? সে যাই হোক। জুরীমলের বাড়িতে কোদো বা ছাঙ খাবার জন্য একসার সুন্দর তুম্বা ছিল। মন দরাজ ছিল, কিছুটা আর্নল্ডের মত। বড় জন্তু মারা, অর্থাৎ যাকে বলে শিকার, তাতে ছিল শখ। কিন্তু তাঁর একান্ত নিজস্ব শিকারের ধারাটি আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। জংপাড়া বলে তাঁর একটি চা-বাগান ছিল। তাঁর বাগানে আমাকে একদিন শিকার খেলতে নিয়ে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা সেখানে পৌঁছে দেখি একটা খাঁচায় মস্ত এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার, লম্বায় আট ফুট হবে, সামনে মরা এক মোষের বাচ্চার উপর থাবা রেখে বসে আছে। কোথায় বাগানের জঙ্গলে বাঘ ঘুরে বেড়াবে, দূর থেকে দেখব, না খাঁচার মধ্যে বন্দী বাঘ দেখে আমি তো বাকশক্তিরহিত, যদিও আমি কোনদিন বাঘ শিকার করিনি। বন্দুকে হাত দেয়া দূরের কথা, নিজেকে খুব নিচু মনে হয়ে লজ্জা হল। জুরীমল খাঁচার কাছে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, মনে হল যেন ভয়ে লাফিয়ে পিছু হঠল, জোর গলায় ডবল হুইস্কি চেয়ে হাঁক দিল। সেটি শেষ করে, গুটি গুটি এগিয়ে আবার পিছনে হঠে পুনরায় ডবল হুইস্কি। তারপর হাতে ম্যাণ্টন রাইফ্‌ল্ নিয়ে খাঁচার গায়ে লাগিয়ে গুড়ুম, গুড়ুম। বাঘ মরল। জুরীমল অবশ্য দৌড়ে-পালানো চিত্রি-হরিণ শিকারে পটু ছিলেন।

মুন্সীগঞ্জে সাইকেলই ছিল আমার প্রায় একমাত্র বাহন, যা কার্সিয়ঙের পাহাড়ে অচল। গাড়িকেনার প্রশ্নই আসে না। যুদ্ধের কৃপায় গাড়ির আমদানি বন্ধ। মরিস গাড়ির আদলে হিন্দুস্থান গাড়ি তৈরির কথা বিড়লারা তখন সবে ভাবছেন। ১৯৩৬ সালে যে বেবী অষ্টিনের নতুন অবস্থায় দাম ছিল ছ-শ' টাকা, ১৯৪৪ সালে দু-তিন হাত বদলের পর তারই দাম হল বিয়াল্লিশ শ' টাকা। এন-সি গোয়েঙ্কার একটি বিগতআয়ু বেবী অষ্টিন ছিল। মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় সেটি নিলুম। পেট্রোল রেশনিং-এর দরুণ সেটি পড়ে ছিল। একজন চালক পেলুম, নাম ঋসঙ্গ লামা। তার হাতের গুণ এমন, চার-চাকাওলা একটা কিছু দিলে হল, ঠিক খাড়া করে চালিয়ে দেবে। হঠাৎ একদিন জয়তীর ১০৪° জ্বর উঠল। অষ্টিনটা করে ঋসঙ্গকে দিয়ে ডাঃ কোনারকে আনালুম। উনি জয়তীর টনসিলে দুটি সাদা ছোপ

দেখে ডিপথিরিয়া আশঙ্কা করে তুলো বুলিয়ে নমুনাটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ গাড়ি করে রওনা হলেন। কনস্ট্যান্‌শিয়া থেকে একশ' গজ যেতে-না-যেতেই গাড়ির অ্যাক্সেল ভেঙে, পিছনের চাকা গড়িয়ে পালালো। আমার মন যে এত কুসংস্কারে ভরা, আগে কোনদিন ভাবিনি। ভাগ্যক্রমে অণুবীক্ষণে ডিপথিরিয়া পাওয়া গেল না, স্ট্রেপ্টোকক্কাস পাওয়া গেল। তখন সবে ধন্বন্তরী ওষুধ, এম-বি ৬৯৩, বেরিয়েছে। তাতেই সেরে গেল। গাড়িটা ছেড়ে দিলুম। মাস-দুয়েক পরে জুরীমল একটি নতুন গাড়ি কিনলেন, আমি তাঁর পুরনো ৩৬ সালের ভক্সল ১০ গাড়ি মাসিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া নিলুম। এটি ছিল একটি বুড়ি; অর্ধেক দিন ঝসঙ্গ তার তলায় কচ্ছপের গতিতে ঘুরে ঘুরে মেরামত করত। একদিন তার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ভক্সলের সমুখের চাকার শক-অ্যাবজর্বারের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে আর বার করতে পারি না। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, আঙুলটি বুঝি কাটতে হয়! ঝসঙ্গ আঙুলে একটু মোবিল ঢেলে আমার হাতটি নিয়ে হঠাৎ এক হেঁচকা টান দিয়ে আঙুলটি বার করে দিল। সেদিন ভক্সলটি বিদায় করলুম।

পা দিয়ে শুরু করেছিলুম ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে, আবার পায়ের উপরেই ফিরে গেলুম। কোন কিছুতে যদি গোঁ ধরেন, তবে আগে যা কখনও সম্ভব ভাবেননি, দেখবেন, তার অনেক কিছু করতে পারছেন। শীঘ্রই আমি স্বচ্ছন্দে দিনে আঠারো মাইল পর্যন্ত হাঁটা শুরু করলুম, তারমধ্যে গড়ে প্রায় ২৫০০ ফুট চড়াই উঠতুম। কুড়ি মাইলের বেশী হেঁটে সফর করলে দেড়গুণ দৈনিক ভাতা পেতুম। তার কম হলে অর্থাৎ বারো থেকে কুড়ি মাইলের মধ্যে হলে একদিনের ভাতা হত বারো টাকা। এরই কল্যাণে আমরা বাড়িতে সারা বছর অতিথিসেবা করতে পেরেছি এবং তারই সঙ্গে সাড়ে-সাত টাকা দামে হোয়াইট লেবেল স্কচ হুইস্কির বোতল কিনেছি। আমার সবথেকে লম্বা ও শক্ত হাঁটা হয় যেদিন আমি কনস্ট্যান্‌শিয়া থেকে দিলারাম, দিলারাম থেকে বাগোড়া, সেখান থেকে পুরনো মিলিটারি রোড ধরে ভিক্টোরিয়া স্কুল, ডাউহিল স্কুল দিয়ে নেমে কনস্ট্যান্‌শিয়ায় ফিরি। আমার একদিনে সবথেকে বেশী হাঁটা হয় দার্জিলিঙের চৌরাস্তা থেকে জলাপাহাড় হয়ে কাটাপাহাড়, সেখান থেকে টাইগার হিল পেরিয়ে মিলিটারি রোড ধরে ডাউহিল, শেষে কনস্ট্যান্‌শিয়া। তবে সেটি মোটামুটি সমতল রাস্তা বলা যায়।

আগেই বলেছি, এস-ডি-ও হিসাবে আমার একটি কাজ ছিল খাসমহল ও দার্জিলিং ইমপ্রুভমেন্ট ফাণ্ডের রাস্তা পরিদর্শন করা। ঢাকার বারদি গ্রামের

প্রসিদ্ধ নাগপরিবারের মিঃ এস-কে নাগ ছিলেন দার্জিলিং জেলা বোর্ডের এঞ্জিনিয়ার। তাঁর সাকরেদ হলুম। তিনি আমাকে রাস্তা তৈরির খুঁটিনাটি অনেক শেখালেন। কী করে নিচের ও উপরের সোলিং দিতে হয়, রাস্তার ধারগুলি কী-ভাবে বাঁধাতে হয়, নর্দমা খুলে দিতে হয়, রাস্তার দুপাশে ঢালু রেখে রাস্তার মধ্যি-খানটি সেই পরিমাণে কত উঁচু রাখতে হয় (ইংরেজিতে বলে ক্যাম্বার), ইত্যাদি। রাস্তায় খোয়া ও পাথরকুচি কীভাবে মাপতে হয়, কী ধরনের ব্যবহারের রাস্তায় কত হারে মালমশলা ঢালতে হয়, মজুরি কীভাবে হিসাব করতে হয়। তাঁর সিনিয়র ওভারসিয়ার মোতিরাম ছিলেন একটি রত্ন। পশ্চিম পাঞ্জাবে জন্ম, যতরকম শক্ত কাজের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আমার প্রায় দু'গুণ বয়স ছিল কিন্তু তাঁর উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমি পেরে উঠতুম না। ১৯৪৪ সালে জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে মোতিরামের সঙ্গে তিনবার হাঁটাপথে সন্দকফু আর ফালুট যাই। এখনকার রাস্তার সঙ্গে ১৯৪৪-এর রাস্তার তুলনাই হয় না। সন্দকফু আর ফালুট দুটি স্থানই ছিল বারো হাজার ফুট উঁচুতে। দার্জিলিঙের ছোট ছেলেরা একটি গান গাইত :

দার্জিলিংকা চিস্‌সো পানি
ফালুলংকা হাওয়া
হাতো মে বন্দুক, কান্ধোমে ঝোলা,
হিমালকো ধাওয়া

'হিমশীতল জলের জন্য দার্জিলিং, হিমশীতল হাওয়ার জন্য ফালুট। হাতে বন্দুক, কাঁধে ঝোলা, ছোটো হিমালয়ে।' এত যে ঘোরাফেরা, পরিশ্রম, কাগজে-কলমে পড়লে কষ্টকর মনে হলেও, আসলে আনন্দ-উল্লাসই হত বেশী।

সন্দকফু আর ফালুটের কথা মনে হলে এখনও প্রাণ নেচে ওঠে। সিকিমের নাথুলা সঙ্কটে যদিও চার-পাঁচবার গেছি তবু নাথুলা আমার মনকে অতটা টানে না। সন্দকফু আর ফালুটে আমরা প্রথম ও তৃতীয়বার যাই, সুখিয়া পোখরি ও মানিভঞ্জন হয়ে। প্রথম রাত্রে থাকতে হত টংলুতে (দশ হাজার ফুট)। দ্বিতীয় দিনে যেতে হয় টংলু থেকে সন্দকফুতে, রাস্তার শেষের পৌণে এক মাইলে খাড়া দেড় হাজার ফুট চড়তে হত। তৃতীয় দিনে শেষ বারো মাইল ছিল সন্দকফু থেকে ফালুট। এই রাস্তার প্রায় সবটাই সন্দকফু-ফালুট পাহাড়ের পিঠে শিরদাঁড়া বেয়ে। প্রায় সমতল বলা যায়। সন্দকফু থেকে ফালুটের রাস্তার কথা ভোলা যায় না। সারা রাস্তার দুধারে আকাশচুম্বী কালো পাইন বা ফার গাছের সারি (এবিস

নাইগ্রা)। মনে হয় যে মানুষের হাতে পোঁতা গাছের মহাপ্রস্থানের এভিনিউ। প্রায় সব গাছের উপরেই বাজ পড়ার চিহ্ন। সারা রাস্তা ধরে কেবল মিশ-কালো বড় দাঁড়কাক, থেকে থেকে কর্কশ কা-কা শব্দ করছে আর নিঃশব্দে এ-ডাল থেকে ও-ডালে উড়ে বসছে, আমরা বলি 'জ্যাকৃড', ইংরেজিতে বলে রুক বা রেভেন। সারাদিন ধরে, বিশেষত নভেম্বর মাসে দেখতে পাবেন সারা হিমালয় পর্বতশিখরের মালা। সুদূর পশ্চিমে ধবলাগিরি, মাউন্ট এভারেস্ট থেকে শুরু করে . কামেট বা নন্দাদেবী দেখিনি) একেবারে পুবে চুমলহরির ত্রিকোণ গম্বুজ। সন্দকৃফু আর ফালুট, দু'জায়গাতেই সূর্যোদয় হয় আশ্চর্য মহিমায়। সে দৃশ্যের একমাত্র তুলনা আমার মনে যা জাগে তা হচ্ছে মণিপুর রাজবাটির নট্টশালায় হোলির দিনে পিচকিরির খেলা। ব্রাহ্মমুহূর্তের আগে সারা আকাশে আপনি দেখবেন, বড় বড় টেনিস বলের মত, হীরের থেকেও দ্যুতিমান ঝাঁকে ঝাঁকে তারা, যেন এখনই আপনার মাথার উপরে ঝুপ ঝুপ করে পড়বে। তারপর আস্তে আস্তে সে তারাগুলির দ্যুতি কমতে শুরু করে, উত্তর দিগ্‌গগনে দেখবেন স্নিগ্ধ দুধের মত সাদা চাদর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিছানো। তারপর হঠাৎ বাঁদিকে চোখ ফিরিয়ে, পরে ডানদিকে ঈষৎ চোখ ফিরিয়ে দেখবেন, এভারেস্ট আর কাঞ্চন-জঙ্ঘার চূড়ায় সামান্য ফিকে গোলাপী ছোপ পড়েছে। আস্তে আস্তে সেই ছোপ সারা পর্বতমালায় ফিকে থেকে গাঢ় গোলাপী হয়ে যাবে, ঠিক মণিপুরের কীর্তনিয়াদের সাদা কাপড়ের উপর গোলাপী আবিরের রঙের পিচকারির জল পড়ার মত। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ অত গাঢ় গোলাপী রঙ মিলিয়ে গিয়ে হবে অসম্ভব উজ্জ্বল তীব্র সাদা, চোখ রাখা যাবে না। সারা হিমালয়ের চূড়াগুলি যেন কোনারকের মন্দিরের উপরের সুরসুন্দরীদের মত মৃদঙ্গ, করতাল, মুরজ, মুরলী, বীণা প্রভৃতি নামা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, হঠাৎ নেচে সৃষ্টির পূজায় গান গেয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় দফায় আমরা গেছি রমম রিম্বিকের পথে। ফিরতি পথে টংলুর রাস্তায়। ফালুট থেকে টংলু পর্যন্ত ইচ্ছা করলে একদিনে নামা যায়। রমম রিম্বিকের পথ দিয়ে নামলে রিম্বিক নদী পর্যন্ত থেমে, হ্যাপিভ্যালি চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে দার্জিলিঙে ফেরা যায়। শীতের তিনমাস, আমরা প্রায়ই নেমে যেতুম, শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে মাটিগড়া হাটের (যেখানে এখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে) কাছে পাংখাবাড়িতে। সেখানে যেতে গেলে প্রথমে মকাইবাড়ি চা-বাগান, পরে লংভিউ চা-বাগান হয়ে যেতে হত। কনস্ট্যানৃশিয়ার অন্যদিকের গায়ে আমভুটিয়া বাগান দিয়ে নেমে আমরা আবার বালাসন নদী যেখানে প্রায় সমতলভূমিতে পৌঁছেছে

সেখানে যেতুম, বালাসন ডাকবাংলায়। জনমজুরদের পিঠে থাকত আমাদের মোট-পুঁটুলি, রান্নার জিনিসপত্র। জয়তীকে কাঁধে নিয়ে আমাদের বেঁয়ারা বাহাদুর বা ভৃত্য রাখাল পাহাড়ী ছাগলের মত লাফাতে লাফাতে নেমে যেত। আভা চড়ত টাট্টু ঘোড়ার পিঠে, আমি যেতুম হেঁটে। দর্জি বাজে আগে চলে গিয়ে ডাকবাংলা পরিষ্কার করা ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করত। ডাকবাংলার পাশেই কুল-কুল শব্দে বালাসন নদী বয়ে যেত। মাঝে মধ্যে সন্ধ্যার ঝোঁকে নদীর পাড়ে বুনো মুরগি শিকার করতুম।

আবার রাজনীতি

ইতিমধ্যে চতুর্দিক থেকে রাজনৈতিক ঘটনাবলী আস্তে আস্তে ১৯৪৭ সালের মর্মান্তিক যবনিকার পথে এগোচ্ছিল। আমার নিজের ধারণা হল চার্চিল ভারত-বর্ষের ব্যাপারে ১৯৪৪-এর এপ্রিল-মে মাসে সবথেকে দমে গিয়েছিলেন। সে সময়ে নেতাজিকে সহায় পেয়ে জাপান বিক্ষুব্ধ ভারত আক্রমণের জন্য রীতিমত উঠে পড়ে লেগেছে। তবে মে মাসে জাপানীরা যখন কোহিমায় উৎখাত হল, ৩ জুলাই বৃটিশরা উখরুল ফিরে পেল, পরিশেষে ৩ অগাস্ট চীনা ও আমেরিকান সৈন্য মিচিনা অধিকার করল, চার্চিল নিশ্চয় তখন নতুন করে শপথ নিলেন তিনি যতদিন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, ততদিন ভারতসাম্রাজ্যের মৃত্যুতে পৌরোহিত্য করবেন না। যুদ্ধ ভালর দিকে মোড় নেবার ফলে, ইতিমধ্যে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে আমেরিকায় যে জনমত দ্রুত গড়ে উঠছিল তাকেও চার্চিল উপেক্ষা করার সাহস পেলেন। বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন তাঁর লেখায় বা সাংবাদিকতায় সততাকে যে সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান দিতেন তা আমি বলি না, তবুও তিনি খবর খুঁড়ে বার করায় ছিলেন ওস্তাদ। 'নিউইয়র্ক ডেলী মিরর' পত্রিকার ১৯৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে তাঁর 'নিউইয়র্ক মেরি-গো-রাউণ্ড' (নিউইয়র্কের নাগরদোলা) কলমে পিয়ার্সন ইওরোপের অ্যাংলো-আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ডার-জেনরল আইজেনহাওয়ারের বিশেষ রাজনৈতিক উপদেষ্টা উইলিয়াম ফিলিপ্সের অপসারণের গূঢ় কারণগুলি ফাঁস করে দেন। পিয়ার্সন লিখলেন ভারত বিষয়ে বৃটেনের নীতির সমালোচনা করার ফলে বৃটিশ সরকারী মহল ফিলিপ্সের উপর খেপে যায়। ১৯৪২ সালের অগাস্ট আন্দোলন নির্মমভাবে নির্মূল করার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে ফিলিপ্স্ প্রেসিডেন্ট রুজেভেল্টকে একটি

চিঠি লেখেন। ফিলিপ্‌স্‌ তখন নতুন দিল্লীতে প্রেসিডেণ্ট রুজেভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কলমে পিয়ার্সন সেই চিঠির উল্লেখ করেন। চিঠিটি লেখার তারিখ ছিল এক বছরের আগেকার ; ১৪ মে ১৯৪৩। সে সময়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য আমেরিকা ইংরাজ-আমেরিকান-চীন যুক্তসেনার ব্যবহারের অভিপ্রায়ে ভারতের মাটিতে বিরাটভাবে অস্ত্রশস্ত্র মজুত ও অস্ত্র তৈরি ব্যবস্থা ও কাজ শুরু করেছে। বহু সৈন্যসামন্তও এনে জড়ো করা হয়। সংকল্প ছিল ভারতই হবে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। সেই হিসাবে ভারতে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে আমেরিকান স্বার্থ বিশেষ গুরুত্বলাভ করে বলা যায়। ফিলিপ্‌স্‌ ছিলেন আমেরিকার বিদেশী দপ্তরের চাকরিকরা রাজদূত। তিনি ভারতের সর্বস্তরের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ রাখতেন। তাছাড়া তিনি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সাংবাদিক, শিল্পপতি, পুঁজিপতি, সেনাধ্যক্ষ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি, এমন-কি করদ রাজ্যের রাজাদের জানতেন। ৬ জুলাই ১৯৪৪-এ পিয়ার্সনের কলম প্রকাশের পর ২৫ জুলাই নিউইয়র্কের জার্নাল 'আমেরিকান' পত্রিকায় ফিলিপ্‌সের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। সে চিঠিতে, প্রথমত, চার্চিল ভারতের প্রতি আটলান্টিক চার্টার প্রয়োগ করতে সরাসরি অস্বীকার করায় এবং সেই অস্বীকারের ফলে ভারতে কতখানি অসন্তোষের সৃষ্টি হয় সে-বিষয়ে ফিলিপ্‌স্‌ তীব্রভাবে বিরূপ মন্তব্য করেন। দ্বিতীয়ত, সে-চিঠিতে তিনি ভারতের মাইনে দিয়ে ভাড়া করা সৈন্যদের অনাগ্রহ ও নিস্পৃহার বিষয়ে জেনরল স্টিলওয়েলের মন্তব্যের উল্লেখ করেন। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মুখ্যত কন্‌স্ক্রিপ্‌শন্‌ করা সৈন্যদের সাহায্যে লড়া হয়, আগে থেকে মাইনে-করা পেশাদারি সৈন্য দিয়ে ততটা নয় ; ফলে, কন্‌স্ক্রিপ্ট সৈন্যরা যথাসম্ভব যুদ্ধ শেষ করে নিজ নিজ জীবনে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে দেশপ্রেমের আগ্রহে আপ্রাণ লড়ে)। তৃতীয় কারণ হিসাবে ফিলিপ্‌স্‌ বলেন দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী ও আহার্যের মহার্ঘতা, রাজনৈতিক অশান্তি ও অচল অবস্থায় ভারতের জনসাধারণ উত্ত্যক্ত হয়ে বৃটিশ শাসনের প্রতি কী পরিমাণ বিরূপ হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে কিছু রেখে-ঢেকে বলা প্রয়োজন মনে করেননি।

ড্রু পিয়ার্সন ৬ জুলাই লিখেছিলেন :

"লণ্ডনে মিঃ চার্চিল ও (বিদেশমন্ত্রী) মিঃ ইডেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত মিঃ জন উইনান্টের উপর খুব চাপ দেন, ও তাঁকে দিয়ে ফিলিপ্‌স্‌কে প্রশ্ন করান, মিঃ ফিলিপ্‌স্‌ তখনও তাঁর পূর্বমত পোষণ করেন কিনা। উত্তরে ফিলিপ্‌স্‌ বলেন,

'আগের থেকে অনেক বেশী', তবে তিনি দুঃখিত যে তাঁর চিঠি প্রকাশ পেয়েছে। আরো বলেন, 'আশা করি আমার অন্য রিপোর্টগুলি, যা নাকি আরো কড়া ভাষায় লেখা, সেগুলি প্রকাশ পাবে না।' মিঃ ইডেন ওয়াশিংটনে তাঁর দূতাগারে ফোন করে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেণ্টকে জানাতে বলেন যে মিঃ ফিলিপ্‌স্ লণ্ডনে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি, এবং আরো জানাতে যে ভারতবর্ষ হাজারটি ফিলিপ্‌সের থেকেও বেশী মূল্যবান।"

অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদের শুরুতে আমি যা লিখেছি যে যে সময়ে (১৪ মে ১৯৪৩) ফিলিপ্‌স্ ভারত থেকে তাঁর চিঠি রুজেভেল্টকে লেখেন, সে সময়ে, এবং তারপর আরো এক বছর পর্যন্ত, পূর্ব-গোলার্ধে যুদ্ধের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘাঁটি হিসাবে বৃটেনের কাছে ভারতের মূল্য হয় অপরিমেয়। তখন যদি চার্চিল ফিলিপ্‌সের এই চিঠি সম্বন্ধে জেনে থাকতেন তিনি সেটি হজম করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে চার্চিলের কাছে যুদ্ধ বাবদে ভারতের মূল্য অনেক হ্রাস পেয়েছে, কি পশ্চিমার্ধে অথবা পূর্বার্ধে; সুতরাং তখন তাঁর প্রতিশোধ তোলার সুযোগ পেলেন। ইতিমধ্যে ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধেও তাঁর মনোভাব আরো শক্ত হয়েছে। ১৯৪৪-এর ১৭ জুন সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গান্ধীজি ওয়েভেলকে একটি চিঠি লেখেন। যে ওয়েভেল ১৯৪৩ সালের শেষ চতুর্থাংশে ভারতের প্রতি অত সমবেদনা ও অনুরাগ দেখিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, তিনি তাঁর ২২ জুনে লেখা চিঠিতে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন।

১৯৪৪-এর ১১ জুলাই লণ্ডনের 'নিউজ্ ক্রনিক্‌ল্' তাদের বম্বেস্থিত নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতা স্টুয়ার্ট জেল্ডারের গান্ধীজির সঙ্গে পাঁচগণিতে ৪ জুলাইয়ের তিনঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ প্রকাশ করে। তার আগে পুণাতে দুজনের যে সাক্ষাৎকার হয়, তারই সূত্র ধরে পাঁচগণিতে কথা হয়। সেই রিপোর্টে জেল্ডার এই ভনিতা দিয়ে শুরু করেন যে পুণাতে ও পাঁচগণিতে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয় তার সবিশদ বিবরণ তিনি আগে থেকেই ভাইস্‌রয়ের কাছে পেশ করেছিলেন। জেল্ডার বলেন, গান্ধীজির প্রতিক্রিয়া হয় (গান্ধীজির ভাষায়):

"আমাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস যে ভাইসরয়ের নিজের মনে যা ইচ্ছাই থাক, রাজনীতির ক্ষেত্রে সে ইচ্ছার কোন স্থান নেই। মিঃ চার্চিল কোন মিটমাট চান না। কাগজে যা বেরিয়েছে তাতে যদি তাঁর উক্তি যথাযথভাবে

রিপোর্ট করা হয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে তিনি আমাকে পিষে মারতে চান। সে রিপোর্টটি তিনি আদৌ অস্বীকার করেননি। আমার পক্ষে মজার ব্যাপার এই—অথচ তাঁর পক্ষে বিশেষ খেদের—যে যে সত্যাগ্রহী তার দেহ বলি দিতে সদাই প্রস্তুত এবং যে সদা-প্রস্তুতির ফলে তার আত্মা অজেয়—তাকে কেউ পিষে মারতে পারে না।"

জেন্ডারের রিপোর্টে আরো প্রকাশ পেল তিনি রাজাগোপালাচারির সঙ্গে দেখা করেন। রাজাগোপালাচারী তাঁকে বলেন, "বৃটিশ সরকার ভবিষ্যতে সম্ভবত গান্ধীজির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখবেন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এখন হয়তো বন্ধুত্ব রাখার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারত-বৃটিশ সম্বন্ধের স্বার্থে তা প্রয়োজন।" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'নিউজ্ ক্রনিক্‌ল্' জেল্‌ডার-রিপোর্টটিকে বহুবিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করে মন্তব্য করে: "এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির পক্ষে মিঃ গান্ধীর অধুনাতম মনোভাব সম্ভাবনার পথ দেখায়।"

১৩ জুলাই পাঁচগণিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গান্ধীজি জেন্ডারের সঙ্গে প্রকাশিত আলোচনার সূত্র ধরে বলেন:

"আমি কুইট ইণ্ডিয়া (ভারত ছাড়ো) প্রস্তাবকে একান্ত নিরীহ বলে মনে করি। এতে কোন ক্ষতি হতে পারে না। ভারত ছাড়ো প্রস্তাবকে আমি যেভাবে উপস্থাপিত করেছি—আমার জীবন একটি বিশেষ আরাধ্যব্রতে উৎসর্গিত, যদি মরি তবে সেই সাধনাতেই মরব—আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ জিন্না আমার পথ আটকে নেই। পথ আটকে আছে বৃটিশ সরকার, যে ভারতের স্বাধীনতা দাবির উচিত সমাধান চায় না, অথচ যে সমাধান অনেক-দিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। তারাই ভারতের স্বাধীনতার পথরোধের জন্যে মিঃ জিন্নাকে ব্যবহার করছে। মিঃ স্টুয়ার্ট জেন্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি এই সতর্কবাণীর উপর জোর দিয়েছি।"

১৫ জুলাই 'নিউজ ক্রনিক্‌লে' ১১ জুলাই প্রকাশিত জেন্ডার রিপোর্টটির উল্লেখ করে গান্ধীজি ওয়েভেলকে আবার চিঠি লেখেন। ২২ জুলাই তারিখের উত্তরে ওয়েভেল গান্ধীজিকে লেখেন তিনি 'স্পষ্টভাবে উচ্চারিত গঠনমূলক প্রস্তাব' চান। ২৭ জুলাই পুনরায় গান্ধীজি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার চান। ১৫ অগাস্টে তার উত্তরে ওয়েভেল লিখলেন: 'যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহামান্য সম্রাটের সরকার ও গভর্নর জেনরল তাঁদের সর্বব্যাপী দায়িত্ব অবশ্যই নিজেদের হাতে রাখবেন।' ১৮ অগাস্ট আমেরিকার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গান্ধীজি এই সিদ্ধান্তে আসেন:

"এই কথাটি আজ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ যে বৃটিশ সরকার (ভারতের) চল্লিশ কোটি লোকের জীবনের উপর তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও ক্ষমতা ছাড়তে চান না, যদি তারা (ভারতীয়রা) নিজের ক্ষমতায় তা আদায় করে। ভারত যে একান্ত তার নৈতিক জোরে সে অধিকার আদায় করবে সে বিষয়ে আমার আশা কখনও যাবে না।"

পাঠকের মনে আছে সি-আর ফরমুলা সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত হয় ১৯৪২-এর ২ মে। প্রস্তাবের ফলে ১৯৪৩-এর মার্চে রাজাগোপালাচারি ও গান্ধীজির মধ্যে যে আলোচনা হয় তার পুরো বিবরণ সি-আর ১৯৪৪-এর ৮ এপ্রিল জিন্নাকে পাঠান। অতঃপর এই ফরমুলাটি সাধারণভাবে প্রকাশের ফলে সর্বত্র ভীষণভাবে নিন্দিত হয়। সবথেকে কঠোর সমালোচনা করেন ১৯৪৪-এর ১৩ অগাস্ট মাদ্রাজের রাণাডে হলে ভি-এস শ্রীনিবাস শাস্ত্রী।

১৯৪৪ সালের অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যে-সব ঘটনাবলী ঘটে সেগুলি আমার মনে নতুন করে কোন গভীর দাগ কাটেনি। ক্রিপ্‌স্‌ আগে থেকেই, অর্থাৎ ১৯৪২ সালেই, তার পথ নির্ধারণ করে গেছলেন। গত দু'বছর ধরে আমার ধারণা হয়েছিল সরকার যথাসম্ভব সব রাজনৈতিক নায়ককেই বিবাদের পথে উত্তেজিত করেছিলেন। তখন মনে হত ভারতীয়, বিশেষত কংগ্রেসের নেতাদের বোধহয় দোষ বা আড়বুঝপনা কম, পুতুলনাচের বেশীরকম শিকার ছিলেন জিন্না। কিন্তু স্বাধীন ভারতে ক্রমশ যে-সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে, বিশেষত গত কয়েক বছরে যা কিছু ঘটেছে, তাতে আগের থেকে বর্ণহিন্দু নেতাদের সম্বন্ধে মনে মনে আমার অভিযোগ কম পুঞ্জীভূত হয়নি। এখন সব ঘটনাই ভিন্ন মূল্যমানে বিচার করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে বিচার আমার স্মৃতিকথার মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধে যাবে। আমার মনে ও বুদ্ধিতে যা কিছু দোষ ত্রুটি অন্ধতা বা স্বচ্ছতা তখন ছিল তাই যথাযথভাবে লিখতে আমি বদ্ধপরিকর। তখন বৃটিশদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের কাছে আমার দেশবাসীর সাফাই গাইবার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল, একথা আমার এখন যত মনে হয়, তখন তত মনে হত না। এটা বোধহয় স্বাভাবিক : ভৃত্যরাই সাধারণত মনে মনে প্রভুর সবথেকে কঠোর, এমন-কি অন্যায় সমালোচক হয়। তখন যে আমি বৃটিশ সরকারের ভৃত্য ছিলুম।

১৯৪৪-এর ৯ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রত্যহ গান্ধীজি কায়েদ-এ-আজম জিন্নার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে যেতেন। প্রতিদিনের প্রতিটি আলোচনার বিশদ বৃত্তান্ত গান্ধীজি ও জিন্না নিজের হাতে তৈরি করে পরস্পরকে পাঠাতেন।

সে সমস্ত এখন আমাদের গভীর বেদনাপূর্ণ উত্তরাধিকার হয়ে আছে। কার্সিয়ঙের শান্ত, স্তব্ধ, ঠাণ্ডা পরিবেশে সে ঘটনাবলীর কথা গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের কোরাসের আর্তধ্বনির মত আমার স্মৃতিতে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। বৃটেন ও আমেরিকার প্রতিটি ভারতপ্রেমীর মনে গান্ধী-জিন্নার আলোচনার ব্যর্থতা তখন গভীর শোকের ছায়া ফেলে।

২১ এপ্রিল ১৯৪৪-এ পার্লামেণ্টের লেবার সদস্য ইমানুয়েল শিনওয়েল যে মত ব্যক্ত করেন তার জবাবে ৩০ জুলাই পাঁচগণিতে গান্ধীজি ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে তাঁর যে প্রত্যুত্তর দেন তা আমার মনে এখনও খুব নাড়া দেয় ও পীড়িত করে। ভারতবন্ধু বলে খ্যাত শিনওয়েল বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, যে সমস্যাটি ভারতের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আঘাত করেছে সেটি মূলত যত না রাজনৈতিক তার থেকে বেশী অর্থনৈতিক।" তার উত্তরে গান্ধীজি বলেন :

"আমার মনে কষ্ট যেমন হয় তেমন আশ্চর্যও লাগে যে বৃটিশ জাতির প্রতিনিধিরা যাঁরা নাকি দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতার জন্যে বীরের মত যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন তাঁরা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দুটিকে আলাদা করে দেখবেন, এবং প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির উপরে স্থান দেবেন। আমার মতে সমস্যাটিকে এভাবে দেখলে ঘোড়ার সমুখে গাড়ি জোতার মত হবে। আমার জীবনে আমি এমন যাদুবিদ্যা দেখিনি যার ফলে ঘোড়া নাক দিয়ে গাড়ি ঠেলে ছুটেছে। বিশিষ্ট শিল্পবীর মিঃ জে-আর-ডি টাটা ও সার হোমি মোদী দুজনেই যে মতটি হাউস অভ কমন্সে ব্যক্ত হয়েছিল সেটি সরাসরি খণ্ডন করেছেন। এই দুজন তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে পরখ করে যখন বললেন, যে রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান করে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেই তবে সত্যিকারের আর্থিক ও অর্থনৈতিক প্রসার ও উন্নতি সম্ভব, তখন আমি বিশেষ আনন্দিত বোধ করি। আমার ধারণা তাঁদের উক্তিতে তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিককালে বৃটিশ একচেটিয়া শিল্পপতিরা কী পর্বতপ্রমাণ সুযোগ-সুবিধা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের কীভাবে কণ্ঠ ও শ্বাসরোধ করা হয়েছে সেকথাও তাঁদের মনে ছিল। অতএব এ কথাটি খুবই স্পষ্ট যতদিন না আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন ভারতের আর্থিক উন্নতি তো সম্ভবই নয়, বরং উত্তরোত্তর তার শোষণ ও ক্ষয় হবে। ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে হাউস অভ কমন্সের সভ্যরা, এই

মুহূর্তে আমাদের বর্তমান অবস্থায় আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের অনেক তত্ত্বকথা ও বাণী দিতে পারেন। আমার শুধু মনে হয়, আজ ভারতে সর্বত্র কী ঘটছে তা যদি তাঁরা একটু দেখতে পেতেন! আমার নিজের মনে সন্দেহের ছায়া পড়ে যে বাংলার আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যত্র যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে তা ঈশ্বরকৃত হয়নি, মনুষ্যকৃত হয়েছে। তবে বৃটেন থেকে ভারতে এ যাবৎ যে-সব শাসকদের পাঠানো হয়েছে তাঁদের সততার উপরে আমি কটাক্ষ করতে চাই না।"

কেন যে তিনি ভারতীয় শিল্প ও পুঁজিপতিদের পক্ষ নিয়ে লড়তেন, সে বিষয়ে গান্ধীজির এই উক্তি আমার মনে সম্যক প্রত্যয় আনে। তাঁর এ উক্তির আগে, একই সালে, অর্থাৎ ১৯৪৪-এর ১২ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত বেজওয়াদায় সর্বভারতীয় কিষাণ সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার তুলনায় গান্ধীজির এই উক্তি আমার মনে বিশেষ উল্লাসের সৃষ্টি করে। বেজওয়াদা সম্মেলনে জাতীয় নেতাদের মুক্তি, কর লাঘব ইত্যাদি বিষয়ে দাবি করা হয়। ১৫ মার্চ সাংস্কৃতিক অধিবেশন উদ্বোধন করে পি-সি যোশী হালকা চালে বললেন, নিছক রাজনীতির থেকে সংস্কৃতি অনেক বেশী জরুরী ও আবশ্যক। সেই সঙ্গে তিনি সকলকে একজোট হয়ে ভারতের জনগণের জন্য খাদ্য, জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার দাবির জন্য কাজ করতে আহ্বান করলেন। ঠিক বলতে পারি না কি, তবে আমি আরো কিছু প্রত্যাশা করেছিলুম। একটু যেন ভিক্ষার সুর ছিল, আরেকটু দৃঢ়তা ও স্বাধীনচিত্ততা দেখালে ক্ষতি হত না। বেজওয়াদা কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন মোজাফ্‌ফর আহমদ, পি সুন্দরায়া, জগজিৎ সিং, ই-এম-এস নাম্বুদ্রিপাদ, সহজানন্দ ও বঙ্কিম মুখার্জি।

বেজওয়াদা সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক একটি বিবৃতি আমার মনে অত্যন্ত উল্লাস আনে। রয়াল এয়ারফোর্সের একচল্লিশ জন বৈমানিকের সই করা একটি আবেদন ১৯৪৪-এর ২ অগাস্ট তারিখে বিলাতের 'ডেলী ওয়ার্কার' পত্রিকায় চিঠির আকারে প্রকাশিত হয়:

"মিঃ গান্ধী সম্প্রতি ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন সে দাবি মেনে নিলে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ভারতের কোটি কোটি নাগরিক আপ্রাণ সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। ভারতের ক্লিষ্ট জনগণের সামনে দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়ে তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। এইসব কারণে সশস্ত্র বাহিনীর আমরা মনে করি ভারতে প্রতিনিধি-

মূলক সরকার গঠনে এই ব্যর্থতা জাপানী ফাশিজ্‌ম-বিনাশের পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করেছে।"

১৯৪৪-এর পর যে-সব ঘটনা একে একে ঘটল তাতে আমি বিশেষ আশ্চর্য বোধ করিনি। বেটোফেনের পঞ্চম সিম্ফনির স্বরলিপিতে বেটোফেন এক জায়গায় —যেখানে দুন্দুভির আওয়াজ প্রথম স্পষ্টভাবে শোনা যায়—লিখেছিলেন 'নিয়তি দুয়ারে আঘাত করছে'; সেই ধ্বনি যেন কাণে বাজল। তখনই আমার মনে হয় দেশের বিধাতা পুরুষ হিসাবে গান্ধী যেন আর বিরাজ করবেন না, সম্মুখপট থেকে এখন আস্তে আস্তে পিছনে চলে যাবেন। ১৯৪২ সালের মার্চে ক্রিপ্‌স্‌ মিশন আর ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে যা ঘটল তাতে মাউন্টব্যাটেন মীমাংসার পথ প্রশস্ত হল। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের পর বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে বিসংবাদের ক্ষেত্র-গুলি নানা উপায়ে প্রশস্ত করা এবং বিদ্বেষের মূলে ইন্ধন যুগিয়ে প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করা সহজ হল। ১৯৪৬ সালের ১৬ অগাস্টে কলকাতার ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড, পরের বছর দুই পাঞ্জাবে যা ঘটল তার স্টেজ-মহড়া হিসাবে, ইতিহাসের পাতায় গাঁথা হয়ে রইল। ১৯৪৫ থেকে আমার প্রায়ই মনে হত আমরা যেন পুতুল-নাচিয়ের হাতের সুতোবাঁধা পুতুল! তবে তখন যে প্রশ্নটি আমার মনে উদয় হত না, এখন ঘন ঘন হয়, সেটি হচ্ছে কেন আমরা বারবার নিজেদের পুতুল হতে দিই। ১৯৪৪ সাল থেকেই বৃটিশ সহকর্মীরা নিজেদের দূরে সরিয়ে নিলেন মনে হল। কিন্তু ১৯৪৫ থেকে মুসলমান সহকর্মীরা যেন আস্তে আস্তে আমার মত ব্যাকুল হতে শুরু করলেন, যেন আরেকটু কাছে এলেন। তাঁদেরও মুখে চোখে থেকে থেকে উদ্বেগ ফুটে উঠত।

তুষারপাত

আনন্দের বার্তা দিয়ে কার্সিয়ঙের কথা শেষ করি। কার্সিয়ঙে বাস শুরু করার পর থেকেই আমরা শীতের প্রস্তুতি হিসাবে কাঠের গুদামঘরটি মোটা মোটা গাছের কাটা ডাল দিয়ে ভর্তি করে রাখি। নভেম্বরে যখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ল তখন একদিন বসার ঘরে আগুন জালার প্রস্তাব করলুম। আভা আমলই দিল না, বলল শীতের অনেক বাকি, তখন কাঠ ফুরিয়ে গেলে কী হবে! অথচ যা কাঠ জমা ছিল তিন বছরে তিনটি শীতে ছ'টি ফায়ারপ্লেসে রোজ সন্ধ্যাবেলা পোড়ালেও তা শেষ হবার নয়। উৎসবের নামে, বড়দিনের আগের আর বড়দিনের দিন, বছরের শেষ দিন,

আর নতুন বছরের প্রথম দিনে আগুন জ্বালানো হল, ব্যস। জানুয়ারি মাস এল, ঘরগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা! আভা সংকল্পে অটল; শুনলুম আরো ঠাণ্ডা পড়বে, তখন কাঠ ফুরিয়ে গেলে কি হবে?

কেউ জীবদ্দশায় কার্সিয়ঙে তুষারপাত দেখেনি। ১৯৪৫-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যায় আকাশ ধূসর হয়ে নেমে এল। তার পরদিন সকাল থেকে রোদের দেখা নেই, সারা আকাশ ইস্পাতের মত ধূসর হয়ে রইল। হঠাৎ মনে হল রাত্রে বরফ পড়তে পারে, আভাকে বললুমও। পরের দিন সকাল সাতটার সময়ে উঠে মনে আশা নিয়ে বড় জানলার পর্দা সরিয়ে ডাউহিলের দিকে চেয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। সারা ডাউহিলের চূড়া থেকে নিচে হিলকার্ট রোড পর্যন্ত এবং দূরে ঘুমের ফাঁক পর্যন্ত সারা উত্তরদিক গভীর বরফের তলায়। তখনও বরফ পড়ে চলেছে। পড়িমরি করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঋসঙ্গকে ডেকে পাঠিয়ে ভক্সলটি বার করালুম। ডাউহিলের রাস্তায় উঠে গাড়িটি চালাতে গিয়ে বরফের উপর চাকা পিছলাতে শুরু করল। রাস্তার একপাশে গাড়িটি ঠেলে রেখে আমরা পাড়ার ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে বরফের বল তৈরি করে ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলা শুরু করলুম। জয়ন্তী বল ছোঁড়া দেখে ভয় পেয়ে গেল। আমরা তখন পায়ে হেঁটে এস-বি-দে স্যানাটোরিয়ামে অমিয়দার বাড়িতে গরম গরম খিচুড়ি আর নানা ভাজাভুজি দিয়ে ভুরিভোজন করলুম। অমিয়দার ভোজনবিলাস ও রান্নাঘরের নানা সরঞ্জামের কথা আগে বলেছি। ঠিক যেন জাপানী রেস্তরাঁ। বীণাদি একদিকে রাঁধছেন আর তাঁকে ঘিরে আমরা থালা পেতে খাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরলুম, শরীরে মনে ফুর্তি উপছিয়ে পড়ছে। পরের দিন সকালে দেখি বরফ আরেকটু শক্ত হচ্ছে। আবার ভক্সল গাড়িটি বার করে গেলুম টুং, সোনাদা, ঘুম। ঘুম স্টেশনের পরে দেখি এত নরম বরফ জমেছে যে দার্জিলিঙে যাওয়া অসম্ভব, তা না হলে ইচ্ছা ছিল কেভেণ্টারের রেস্তোরাঁয় বা প্লিভা হোটেলে দুপুরে খেয়ে বাড়ি ফিরবো। ঘুম স্টেশনে দেখি চা-বাগানের মেম-সাহেবরা সৈন্যদের জন্যে ঘুম স্টেশনে একটি ক্যান্টিন খুলেছেন। স্টেশনে সৈন্যদের আর বস্তির ছেলেদের সঙ্গে আবার বরফের বল নিয়ে খেললুম। বিকালে ফিরতি-পথে সোনাদার এক পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে গরম গরম সিঙারা আর চা খেলুম।

হৈ হৈ

এই দু'দিন ধরে হল আনন্দের মাতামাতি। এখন হৈ হৈ করা একটি দিনের কথা বলি। সেটি এল ১৯৪৫ সালে ৮ মে'র পর। ৮ মে হল ভি-ই দিবস, অর্থাৎ ইওরোপের যুদ্ধবিজয়ের দিন। সেদিন বার্লিনের উপকণ্ঠে মার্শাল জুকভের কাছে উইলহেল্‌ম্‌ ফন কাইটেল আত্মসমর্পণ করেন। ইওরোপীয় যুদ্ধের শেষ হয়। তার আগে ২৮ এপ্রিল বিদ্রোহীদের হাতে বেনিটো মুসোলিনি প্রাণ হারান। হিটলার মারা যান ৩০ এপ্রিল। ৯ মে যখন খবর এল তখন সারাদিন গেল হৈ হৈ করে, আর যে সমুখে আসে তাকেই জড়িয়ে ধরে। ঠিক হল পরের রবিবার উৎসব পালন করতে হবে। সরকার থেকে নামমাত্র টাকা মঞ্জুর হল, জুরীমল বললেন মিউনিসিপালিটি টাকা দেবে। স্থানীয় বড়-ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ীরা জুরীমলের হাতে তাদের চাঁদা তুলে দিল। উৎসবের আকর্ষণ হবে কার্সিয়ঙ বাজারের ময়দানে সকলকে পংক্তিভোজন করাতে হবে। সেদিন হাটবার, বিস্তর লোক হবে আশা করা গেল।

জুরীমল, আমি, সঙ্গে আরো জন তিন-চার ভদ্রলোক মিলে সকাল ৯টার সময়ে স্টেশনে সোরাবজির দোকানে এক বোতল হোয়াইট লেবেল হুইস্কির বোতল খুলে বসলুম। এক ঘণ্টার মধ্যে দেড় বোতল উড়ে গেল। বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমরা পাঁচজন চারটি বোতল শেষ করলুম। তখন বাজারে গিয়ে সকলের সঙ্গে জয়ধ্বনি করে ভোজ শুরু করার সময় এল। ঠিক কি হয়েছিল আমার খুব আবছা-ভাবে মনে আছে। এটুকু মনে আছে, এক পা করে এগোই আর সমুখে পংক্তিতে বসে যে খাচ্ছে তাকে চেঁচিয়ে বলি, 'খতম ভয়ো', অর্থাৎ লড়াই শেষ। গুর্খারা, আগেই বলেছি, জলচিকিৎসার পরম ভক্ত, ফলে, কারোকে মাতাল দেখলে পরম আত্মীয়ের চোখে দেখে। পরে শুনেছিলুম সেদিন আমার জনপ্রিয়তা শতকরা একশ' দশে উঠে গেছল। বাজারে তারপর আর কী ঘটে, কী করে বাড়ি ফিরি মনে নেই।

জুরীমল ও অন্য ভদ্রলোকরা আমাকে কয়েকদিন পরে জুরীমলের বাড়িতে বলেন, যে ঐদিন বেলা তিনটে নাগাদ তাঁরা জুরীমলের গাড়িতে আমাকে কন্‌-স্ট্যান্‌শিয়ায় নিয়ে যান। নিজের বাড়িতে ঢুকে আমার হুঁস ফিরে আসে এবং বন্ধুদের ফিরত রাস্তার সম্মানার্থে ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে আরেকটি হুইস্কির বোতল খুলে গেলাসে করে একে একে তাঁদের দিই এবং নিজের জন্যে কিছুটা নিই। তারপর গেলাস মুখে ঠেকাতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে নাকি হঠাৎ হেঁচকি আর

ওয়াকের মাঝামাঝি একটা শব্দ বেরুলো। শব্দ শোনামাত্র জুরীমল আর বন্ধুরা চিরাভ্যস্ত আওয়াজে সচকিত হয়ে একদিকে দরজা দিয়ে যেমন ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন, তেমনি ছোটার সময়ে পিছন ফিরে দেখেছিলেন আমি শোবার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দিকে এগোচ্ছি। বাথরুমে ঢোকার আগেই নাকি অত আগ্রহে পেটে ঢোকানো অত দামী জল পেট থেকে হুড়হুড় করে বেরিয়ে গিয়ে আমার অত সাধের হ্যারিস টুইডের জ্যাকেটটি বমিতে বমিময় করে দিয়েছিল। পরিপূরক বিবরণ হিসাবে আভার কাছে শুনি, আমাদের নেপালী বেহারা বাহাদুর আর ভৃত্য রাখাল (তাকে, তার স্ত্রী সুশীলা আর মেয়ে রেণুকে আমরা মুন্সীগঞ্জে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসি) খুব বোঝদারির সঙ্গে আমার ভার নেয়। ছোটছেলের মত আমার মোজা, জুতো, জামাকাপড় ছাড়িয়ে, শোবার জামাকাপড় পরিয়ে বিছানায় ভাল করে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুইয়ে দেয়।

পরের দু'দিন আমি যেন কাঠকয়লার মত শুকনো হয়ে পড়ে রইলুম। দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ সোমবার সন্ধ্যার দিকে, যখন বুঝলুম আস্তে আস্তে খোঁয়াড়ি চলে যাচ্ছে তখন, মনে আছে, আমি ক্লান্তপ্রাণে গুণগুণ করে একটি পুরনো ইংরাজি খোঁয়াড়ির ছড়া আওড়াচ্ছি :

আর কোন কষ্ট নেই মা জননী,
সারা শরীর শুকিয়ে শুনসান।
পায়ে পড়ি, মা, পাঠাও শুঁড়িখানায়,
সেখানেই হোক জীবনাবসান।

মুন্সীগঞ্জে ও কার্সিয়ঙে থাকার দরুণ ১৯৪৩-৪৪ সালের কলকাতার নতুন সাংস্কৃতিক জোয়ারের স্বাদ আমি ভাল করে পাইনি। পুরোভাগে ছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি, ফ্যাশিবিরোধী প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, আই-পি-টি-এর শাখা, নিখিলবঙ্গ গণনাট্য সঙ্ঘ। তবে, মার্চ ১৯৪৫-এ আমি খুচরো ছুটি নিয়ে কলকাতায় যখন কয়েকদিন থাকি তখন ৩ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত মহম্মদ আলী পার্কে আয়োজিত উৎসবে যোগ দিই। উৎসবটি এক হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। এই উৎসবেই প্রথম শহুরে উচ্চসংস্কৃতির শিল্পীদের সঙ্গে গ্রামীণ লোকশিল্পীদের সমান পর্যায়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য হয় 'নবান্ন' ও 'ভারতের আত্মা'—দুটি নাটক মঞ্চস্থ করা। ৫ মার্চ মুর্শিদাবাদের শেখ গোমানি আর চট্টগ্রামের স্বভাবকবি রমেশ শীলের কবির লড়াই আমাদের মুগ্ধ করে।

এই দফায় ডেকার্স লেনের কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তরে আমি ভবানী সেন ও মোজাফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। বিষ্ণুবাবু একদিন আমাকে সকালে নিয়ে গেলেন, বললেন, মোজাফ্‌ফর সাহেব আমাকে দেখতে চেয়েছেন। একটি বেশ বড় চৌকো ঘরে দু'জনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছি। ঘরের চারকোণে চারটি ছোট টেবিল পাতা। অতবড় ঘরে ঠিক মাঝবরাবর অত উঁচু ছাত থেকে একটি মাত্র ৩৬ ইঞ্চি পাখা আস্তে আস্তে ঘুরছে, সুষম বণ্টনের প্রতীক হিসাবে। দূরের আড়াআড়ি কোণে জ্যোতিবাবু চুপচাপ বসে আছেন, ভাবখানা, বেচারা পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছতার তিনি উর্ধ্বে। মোজাফ্‌ফর সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে ভবানী সেন সৌজন্যভরে আমাদের দুজনকে ডেকে তাঁর টেবিলের সমুখে বসালেন। ভদ্র, নিচু গলায় কথা বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যে মোজাফ্‌ফর সাহেবের ছোট্ট ঘরে ডাক পড়ল। সরোজ মুখার্জি কাগজ বগলে বেরিয়ে এলেন, আমরা ঢুকলুম। মোজাফ্‌ফর সাহেবের ভারি কোমল, শান্ত, সস্নেহ, মজলিশি গলা। মিনিট দশেক পরে চা দিয়ে গেল। নানা কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় পড়াশোনা করেছি। উত্তর শুনে মনে হল খুশি হয়েছেন, বললেন তাঁর পার্টির ভালভাল সভ্যদের অধিকাংশই, হয় অক্সফোর্ড নয় কেম্ব্রিজে পড়েছেন। পরবর্তীকালে আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে, এর কী ফল হয়েছে? এটা নিশ্চিত, এর ফলে পার্টিতে বরাবরই উচ্চমধ্যবিত্ত একটি ধারা প্রাধান্য পেয়েছে, যার সুস্পষ্ট ছাপ বরাবর পড়েছে এবং এখনও পড়ছে তার নীতিতে ও চালচলনে।

মৈমনসিং ১৯৪৫

মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ভি-ই দিবসের কিছু পরে আমি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদ পেয়ে এখনকার বাংলাদেশের মৈমনসিংহে বদলি হই। তখনকার মৈমনসিং জেলা এখনকার বাংলাদেশের মৈমনসিং, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোণা মিলিয়ে একটি জেলা ছিল। মে মাসের শেষ সপ্তাহে কার্সিয়ঙ ত্যাগ করে কলকাতায় প্রায় এক সপ্তাহ কাটালুম। গ্রোভ লেনে আভা আর জয়ন্তীকে রেখে ৮ জুন মৈমনসিং পৌঁছে পরের দিন অর্থাৎ ৯ই দ্বিতীয় এ-ডি-এম হিসাবে কাজে যোগ দিলুম। আমি পৌঁছবার আগেই আমার আগের ভদ্রলোক চলে গেছলেন। দ্বিতীয় এ-ডি-এমের জন্যে সরকারী বাড়ি ছিল না। আগের এ-ডি-এম যে বাড়িতে

ছিলেন সেটি ভাড়া নিলুম। বাড়িটি ছিল শহরের ভিতরে। পাড়াতে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও ছোট জমিদারদের বাস। বাড়ির গড়নটি সাধারণ ডাকবাংলার মত, এক লাইনে চারটি ঘর। পিছনে লম্বা বারান্দা। আগে যিনি ছিলেন তিনি বিপত্নীক বলে একা থাকতেন। ফলে চারটি ঘরের দুটি ঘরে দুটি গরু রেখেছিলেন। আলাদা রান্নাবাড়ি ছিল না। আমি গিয়ে দরমার দেয়াল ও টালির ছাদ দিয়ে একটি রান্নাবাড়ি করিয়ে নিই। তার সঙ্গে লোকজন থাকার আরো দুটি ঘর।

সারা বাড়িময় গোবরের গন্ধ, সর্বদাই মাছি আর গুবরে পোকা ভনভন করছে। রাত্রে আরো খারাপ। সন্ধ্যা হতে না হতেই দলে দলে মশা আর ছোট পোকা একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দিত না, বিশেষত রাত্রে আলো জ্বাললে। পোকাগুলো এত চালাক, মশারির ফুটো দিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়ত। রাত্রে মশারির ভিতরে ঢুকে বসে শান্তিতে খাব তারও উপায় ছিল না, অসভ্য পোকাগুলো নাকে, কাণে, খাবারের সঙ্গে মুখে পর্যন্ত ঢুকে পড়ত। মশারির মধ্যে একবার পোকা ঢুকলে বার হবার তো উপায় নেই, অতএব রাত্রে ঘুমের দফা রফা।

১৯২১ সালের আই-সি-এস টি-আই-এম নুরন্নবী চৌধুরী ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৮ সালের জি-এস কাহলোন ছিলেন প্রথম এ-ডি-এম। টি-বি জেমসন ছিলেন জেলা জজ। জেমসনের উপর একদিন 'কল' করতে গেলুম, আদর করে বসালেন। চীনে পোর্সিলেন সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। তবে এরকম রক্তপিপাসু জজ আমি জীবনে দেখিনি। বাখরগঞ্জে থাকতে এক খুনের মামলার বিচারের কথা বললেন। চারজন খুনের আসামী, জুরী চারজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তবে সামান্য কম-বেশী। চারজনকেই ফাঁসির হুকুম দেবেন কিনা, সেই চিন্তায় দু'দিন রাত্রে তাঁর ঘুম হয়নি। শেষ পর্যন্ত চারজনকেই ফাঁসিকাঠে লটকানোর হুকুম দিলেন। শুনতে শুনতে আমার অজান্তেই আমি ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিলুম। দ্বিতীয় বার আর দেখা করতে যাইনি। অথচ এমনিতে কি শান্ত, অমায়িক ভদ্রলোক।

এলা রীডের প্রথম স্বামী, ছোটকু সেন, তাঁর দাদা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জ্যোৎস্না (ডাকনাম বড়কু) সেনের কাছে আমার পরিচয় হিসাবে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। যেদিন কাজে যোগ দিলুম, সেদিন যোগাযোগ করলুম। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। গিয়ে দেখি তাসের আড্ডা বসেছে। আশ্চর্য, বাড়িতে একটিও পোকামাকড় নেই। মন্ত্রটি কি জিজ্ঞেস করাতে স্থানীয়

হয়েছে। বড়্‌কুদা তাঁর ভাবী দ্বিতীয়া স্ত্রী সন্ধ্যাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি তখন বিদ্যাময়ী স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

মামুদের বাদামি রঙের বিরাট বড় ও সুন্দর একটি ঘোড়া ছিল। চড়তে পারত খুব ভাল। পরের দিন ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে ব্রেকফাস্ট খেতে এসে সারা বাড়িটি ভাল করে দেখে তার একটি ডি-ডি-টি পার্টিকে হুকুম দিল। পরের দিন ডি-ডি-টি পার্টি এসে হাজির। বাড়ি ফিরে দেখি ডি-ডি-টি মেশানো কেরোসিন দিয়ে সারা বাড়ির ভিতরের ছাত, দেয়াল, মেঝে, সবকিছু আদ্যোপান্ত ধুয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বহুদূর পর্যন্ত কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। কার্সিয়ঙ থেকে আনা গুর্খা বেয়ারা গঞ্জু ডি-ডি-টির গন্ধে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিছুক্ষণের জন্যে। দিন পনেরো অন্তর তিন চার দফা এভাবে ধোবার পর বাড়িতে মশা, মাছি, পোকা, মাকড়, মায় টিকিটিকিও একটি রইল না।

স্থানীয় জমিদাররা

১৯৪৫ সালেও মুসলমান বাসিন্দারা মৈমনসিং শহরকে নাজিমাবাদ বলতেন। শহরটি ছিল একটি রেলওয়ে জংশন। পাশ দিয়ে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ব'য়ে যেত। আমার সময়ে তার একটি সরু ধারা মাত্র ছিল। বর্ষাকালে অবশ্য বড় বড় নৌকা যেত, শীত ও গ্রীষ্মকালে একমাইলের উপর চওড়া বালুচরের মধ্যে দিয়ে শীর্ণ স্রোত বইত। কাছারিপাড়াটি ছিল প্রশস্ত উঁচু জমির উপর, জায়গাটির নাম ছিল তালুক বেয়ার্ড। বহু আগে সেটি একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল, মাঠের পরিক্রমা ছিল প্রায় দু'মাইল, কাছারিপাড়ার অধিকাংশ বাড়িই স্থানীয় আলাপ সিং জমিদার বংশের মালিকরা তৈরি করেন। সেইসব বাড়িতে বড় বড় অফিসাররা ভাড়া থাকতেন। বাড়িগুলি সবই রেসকোর্সের হাতার মধ্যে তৈরি, বাড়ি ছাড়াও একটি গোরস্থান আর গির্জা ছিল।

অল্প যে কয় মাস ছিলুম তারমধ্যে সবকিছু নিজের চোখে দেখার বা জানার সুযোগ পাইনি, সুতরাং যাঁরা তদানীন্তন মৈমনসিং ভাল করে জানেন তাঁরা আমার লেখায় যদি কিছু ভুলচুক থাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন, এবং আমাকে জানালে বাধিত হব। আমার পক্ষে মৈমনসিং শহরের জমিদার বংশগুলির শরিকদের আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তিক্রমে অংশের হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। তবে কলকাতাতে মৈমনসিং-এর বড় জমিদার বংশের শরিকরা যাঁরা থাকেন তাঁদের আজও মৌখিক

পরিচয় জমিদারি অংশের নামে হয়। যেমন অমুক জমিদারির অত আনি বা অত আনি অত গণ্ডার জমিদার। যে-কোন জমিদারির সম্যক পরিমাণকে বলা হত এক টাকা। সেই এক টাকার অংশ যথাক্রমে হত যোল আনায়। তার নিচে, কুড়ি গণ্ডায় হত এক আনা, চার কড়ায় এক গণ্ডা, তিন ক্রান্তিতে এক কড়া।

মৈমনসিং-এর মহারাজা বলে যিনি খ্যাত ছিলেন—অর্থাৎ সূর্যকান্ত আচার্য-চৌধুরী—তাঁর প্রধান সম্পত্তির নাম ছিল টপ্পা কুমারিয়া। এটি ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে ফুলবেড়িয়া, মুক্তাগাছা ও মৈমনসিং থানার প্রায় সবটা জুড়ে। তাঁর পালিত পুত্র, শশিকান্ত, আমার সময়ে তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁর ছোট ছেলে স্নেহাংশুকান্ত ছিলেন আমাদের সঙ্গে একই বছরে বি-এ পাস, কিন্তু স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে। মুক্তাগাছা ছিল আলাপসিং বা আলাপশাহী পরগণার জমিদারির ভিটা। এই পরগণার সবথেকে নামজাদা ও ধনী শরীক ছিলেন মহারাজা সূর্যকান্ত। মুক্তাগাছা নামের একটি ইতিহাস আছে। জমিদারির একজন কাংস্যকার, নাম মুক্তারাম, জমিদার রামরামকে পিতলের একটি বিরাট সেজ তৈরি করে দেন। সেটি গাছের গুঁড়ির মত উঠে ছড়ানো বড় ঝাড়বাতিদানের আকারে ছিল। বাতিদানটি গাছের মত দেখাত বলে কারিকরের নামে নাম হল মুক্তাগাছা।

রামরামের অংশের নাম ছিল সাবেক চারি আনি (অর্থাৎ আদি চার আনি)। এটির আবার তিন অংশ হয়: বড় হিস্‌সা, মাঝারি ও ছোট হিস্‌সা। মুক্তাগাছার আদি এজমালি বাড়ির নাম ছিল আট-আনি বাড়ি। মৈমনসিং শহরের কলের জলের ব্যবস্থা মহারাজা সূর্যকান্তের বদান্যতায়। মৈমনসিং ওয়াটার ওয়ার্ক্‌স্‌টি তিনি তাঁর স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করেন। শহরের টাউন হলটিও তাঁর কীর্তি। তাছাড়া সুতিয়া নদীর উপর লোহার পুলটি। মুক্তাগাছার সব শরিকদের বাড়ির ভিতরে তথা চারদিকে অনেক পানাপুকুর ও বস্তি ছিল। এফ-এ স্যাক্‌সির 'মৈমনসিং গেজেটিয়ারে' (১৯১৭) এই জহরতটি খুঁজে পাব: "মৈমনসিং জমিদারদের বিশেষত্ব এই যে বেশ্যাপাড়াটি শহরের ঠিক মধ্যিখানে অবস্থিত, আর প্রত্যেকটি বাড়ির অন্দরমহলের প্রতি জানলা থেকে বেশ্যাপাড়ার সবকিছু ভালভাবে দেখা যায়।" এর থেকে আপনি যা মানে করতে ইচ্ছা করেন, করতে পারেন! কলকাতার সোনাগাছির মত।

মামুদ আর আমি তার জীপে মৈমনসিং শহর থেকে কিছু মাইল দূরে একদিন মুক্তাগাছায় গেলুম এজমালি বাড়িটি দেখতে। প্রকাণ্ড ফটক। ফটকের সামনে রাস্তার ওপারে একটি অযত্নে রাখা খড়ের চালের, মাটির দেয়ালের ঘর দেখলুম,

ভিতটা শান-বাঁধানো। এর নাম মণ্ডা ঘর। এখানে মুক্তাগাছার বিখ্যাত মণ্ডা তৈরি হত। মণ্ডা হত মুখ্যত খোয়া ক্ষির দিয়ে। তার বিশেষত্ব ছিল তার আকার আর ওজন, আর মিষ্টিতে পোড়ামুড়ির গন্ধ। কিছুটা স্মোক্‌ড্‌ ইলিশ, স্মোক্‌ড্‌ সামন মাছ বা স্মোক্‌ড্‌ হ্যামের মত। মণ্ডা তৈরি হলে একটি মাটির তৈরি বিরাট তিজেলের অথবা তন্দুরের মত উনুনে মুড়ি পোড়ানো হত; তার উপর পাতলা চাদরের মত কাপড় ছড়িয়ে বেঁধে মণ্ডা ঝুলিয়ে ধোঁয়া গন্ধ করা হত। ভারি সুন্দর সূক্ষ্ম ধোঁয়া গন্ধ হত। একটি মণ্ডা একটি বড় হ্যামবার্গারের আকার ও সাইজ হত, অর্থাৎ গোল দুটি বড় ক্ষিরের চন্দ্রপুলি থেবড়ে একটি করলে যা হয়। ভেতরে অবশ্য অন্য কোন পুর থাকত না। ওজন হত অন্তত দেড়শ' থেকে দু'শ' গ্রাম।

মুক্তাগাছা বংশের সকলে মিষ্টি খাবার যম। মুক্তাগাছার এজমালি বাড়িতে তখন যিনি সবথেকে বয়স্ক ছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি সবে পর পর দু'বার খুব হজমের গোলমাল থেকে উঠেছেন। প্রথমবার গণ্ডগোলের পর ডাক্তার মিষ্টি খাওয়া একেবারে নিষেধ করেছিলেন, ভদ্রলোক শোনেননি। ফলে আবার একদিন রাত্রে পেটে প্রচণ্ড ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। ডাক্তারের জেরায় স্বীকার করেন, তিনি সামান্য একটু মণ্ডা দাঁতে ভেঙে খেয়েছেন আর ছোট্ট এক চামচ ক্ষির খেয়েছিলেন। কতটুকু দাঁতে ভেঙে খেয়েছেন উপর্যুপরি জেরার ফলে প্রকাশ পেল তিনি বড় সাইজের চারটি মণ্ডা খেয়েছেন। 'ছোট্ট এক চামচ', জেরার ফলে প্রমাণ হল আট ইঞ্চি ব্যাসের, চার ইঞ্চি গভীর, এক জামবাটি ভর্তি ক্ষির।

মৈমনসিং-এ যাবার কয়েকদিন পরেই কলকাতা থেকে স্নেহাংশু (-কান্ত আচার্য) এসে তার স্থানীয় বন্ধুবান্ধব ও পারিবারিক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা কম্যুনিস্ট হাজঙ্গ আন্দোলনের বিজয়ী নেতা মণি সিং। ডাক্তার ভদ্রলোক আমাদের পাড়ায় থাকতেন। ভাগ্যক্রমে তখনও আভা আর জয়তী কলকাতা থেকে আসেনি। ভাগ্যক্রমে বলছি, তার কারণ আগেই বলেছি সুজাতা আর গ্যান ডেভিস কার্সিয়ঙে আমাদের বাড়িতে মাসখানেকের উপর থাকে। সেই সময়ে সুজাতার বোন সুপ্রিয়া আর তার স্বামী স্নেহাংশু একদিন কার্সিয়ঙে প্রায় সারাদিন আমাদের বাড়িতে কাটায়। বুঝতে পারিনি যে-ক'ঘণ্টা স্নেহাংশু আমাদের বাড়িতে ছিল তার মধ্যে সে চুপি চুপি জয়তীকে অনেক সুশিক্ষা ও সদালাপ শিখিয়ে গেছল। স্নেহাংশুরা চলে যাবার পরদিনই শুনি জয়তী কোথায় এক পোকা দেখে তাকে বকছে 'শালা, বাঞ্চত।' তার তখন দেড় বছরের কম বয়স।



আভা বা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি কি বলছে। তারপর যেভাবে গালাগালির সুরে বলছে বুঝলুম স্নেহাংশু বাঙালির চিরাচরিত 'চ'-বর্গ 'ব'-বর্গ কথা দুটি বেশ ভাল করে জয়তীর মগজে ঢুকিয়ে গেছে। আভা পাল্টা মগজ ধোলাই করার প্রয়াসে (আজকাল বোধহয় ডি-ব্রিফিং বলে) তাকে শেখাতে লাগল, 'হাঁ, ভারি দুষ্টু, বল থালা বাটি, থালা বাটি, কিছু খেতে পাবে না।' ক'দিন পরে জয়তীর মাথা থেকে কথাগুলি খসলো।

ডাক্তার ভদ্রলোকের কথা বলি। উনি মৈমনসিং-এর জলহাওয়ার প্রশংসা করে বললেন, তবে দুটি জিনিস সম্বন্ধে সাবধান থাকা ভাল : একটি টাইফয়েড, অন্যটি রক্তামাশয়। রাস্তায় ছেলেমেয়েদের দেখে মনে হল রোগ দুটি যদিই-বা হয় তবে ক্বচিৎ। কিশোর বয়সের ছেলেরা দেখতে বেশ শক্ত-সবল, হাতে সর্বদা ভাঁজকরা লম্বা ফলার চাকু, ছোরা বললেই হয়। ঘুরছে, ফিরছে, নানাভাবে কব্জি, কোমর ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে কলাগাছের গায়ে জোরে ছুরি মারা অভ্যাস করছে। মনে পড়ল মৈমনসিং অনুশীলন পার্টির ঘাঁটি ছিল।

আভা আর জয়তী জুলাইয়ের মাঝামাঝি এল আর সত্যিই পনেরো দিন যেতে না যেতে জয়তীর রক্ত-আমাশয় হল। ডাক্তারবাবু এসে বললেন, চিন্তার কিছু নেই, রক্ত-আমাশয় ছাড়া আর কিছু নয়! বিধান দিলেন ম্যাগ সাল্ফ্ আর বার্লির জল। ম্যাগ সাল্ফ্ খেয়ে খেয়ে তার পায়খানা আর থামে না। বেচারী জোলাপ আর শুধু বার্লির জল খেয়ে এত অস্থিচর্মসার হয়ে গেল অথচ এত বাধ্য ছিল যে আমরা খাবার সময়ে সে একদিন তার মাকে করুণ স্বরে আমাদের খাবার দেখিয়ে বলল : 'মা, আমি খাব না, গন্ধটা শুধু শুঁকব।' যেদিন এই কথা বলল, আমি আর অপেক্ষা করলুম না, তখনই সবিস্তারে ডাঃ নন্দীকে লিখলুম, বিধান চেয়ে। সেদিনই আমি সাক্ষী দেবার জন্যে কার্সিয়ঙ রওনা হলুম। পরের দিন সেখানে পৌঁছে ডাঃ কোনারকে জিজ্ঞেস করে ওষুধ আর পথ্য আভাকে তার করে জানালুম। কোনার ও নন্দী দুজনেই তখনকার আবিষ্কৃত সাল্ফাগুয়ানিডিন বিধান দিয়েছিলেন। ক'দিনের মধ্যেই জয়তী সুস্থ হয়ে উঠল।

ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে বহু কিছু ঘটে গেছে। ১৯৪৬-এর ৫ থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে সেখানে সাধারণ নির্বাচনের ফলে চার্চিল হেরে গেলেন। অ্যাট্লির ভার নিতে দেরি হল, কারণ সে সময়ে পট্স্ড্যাম কন্ফারেন্স চলছে। পট্স্ড্যামে ছিলেন স্টালিন, ট্রুমান (১২ এপ্রিল রুজেভেল্ট মারা যান), চার্চিল ও অ্যাটলি। সাধারণ নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ হবার আগেই বেশ বোঝা গেছল যে

চার্চিল যাচ্ছেন, ফলে অ্যাট্‌লিকে ওয়াকিবহাল করার জন্যে সঙ্গে নিয়ে যান। ইংলণ্ডে ফিরে অ্যাট্‌লি প্রধানমন্ত্রীপদে বসলেন। ক্যাবিনেটে বিদেশমন্ত্রী হলেন আর্নেস্ট বেভান, চ্যান্সেলর অভ এক্সচেকার হলেন হিউ ডলটন।

হিরোশিমা ও নাগাসাকি

১৯৪৫-এর ৭ অগাস্ট ঘুম থেকে উঠে শুনলুম আমেরিকা জগতের ইতিহাসে প্রথম অ্যাটম বোমা ৬ অগাস্ট হিরোশিমার উপর ফেলেছে এবং সেইদিনই (অর্থাৎ ৬ই) সোভিয়েট ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছে। অ্যাটম বোমা কী বস্তু, তার ধ্বংস করার শক্তি কতখানি, তখন একেবারে কোন ধারণা ছিল না। তবে এটুকু বুঝলুম যে আমেরিকা নিশ্চয় এমন এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুঁড়েছে, যার ফলে সোভিয়েট রাশিয়া জাপান দখল করার আগেই, জাপান আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ আমেরিকা চায় না জুকভকে বার্লিনে বিজয়ীবেশে ঢুকতে দিয়ে যে ভুলটি করেছে, সেই ভুলটির পুনরাবৃত্তি টোকিওতে হয়। হিরোশিমার উপর বোমার ফলাফল ভাল করে জানার আগেই আমেরিকা ৯ অগাস্ট নাগাসাকিতে দ্বিতীয় অ্যাটম বোমা ফেলে। ১৪-১৫ অগাস্ট জাপান হার মানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়। ২৮ অগাস্ট মিত্রশক্তির সর্বপ্রধান সেনানায়ক হিসাবে জেনরল জর্জ মার্শাল আমেরিকার সৈন্য নিয়ে জাপানে পা দেন। ২ সেপ্টেম্বর জাপানী নেতারা ইউ-এস-এস মিজুরি নৌজাহাজে এসে আমেরিকানদের কাছে পরাজয়পত্রে সই করেন। একই দিনে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোরিয়াকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগাভাগি করে। বলা হয় এই দখল চলবে যতদিন না কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বহির্মঙ্গোলীয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃত্বাধীন থাকবে বলে স্বীকার হল। অন্যদিকে চীন অন্তর্মঙ্গোলীয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, ফরমোজায় ও হাইনানে সার্বভৌমত্ব পায়।

অক্টোবরে পূজার ছুটির পর বাবা আমাদের সঙ্গে মৈমনসিং-এ এলেন। তার আগের বছর ১৯৪৪ সালে বাবার সঙ্গে ছোটভাই গুলু কার্সিয়ঙে গিয়েছিল। কার্সিয়ঙে বাবার খুব ভাল লেগেছিল। গুলু তখন বড় হয়েছে, কার্সিয়ঙের লোকে গুলু আর আমার মধ্যে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলত। অক্টোবরে মৈমনসিঙের জলবায়ু হত চমৎকার। মণি সিং-এর কথা একটু আগে লিখেছি। সুষঙ্গ জমিদারিতে নানা অবৈধ খাজনা (আবওয়াব) আদায় করার ফলে সুষঙ্গের প্রজারা মরীয়া হয়ে ওঠে।

এই ধরনের অবৈধ আবওয়াবের স্থানীয় নাম ছিল 'টঙ্ক'। প্রজাদের নেতা হিসাবে সুষঙ্গ রাজবংশের ছেলে মণি সিং টঙ্ক-আন্দোলন পরিচালনা করেন, ও টঙ্ক আদায় করার রীতি বন্ধ করতে সমর্থ হন। আসামের গারো হিল্‌স্‌ জেলার প্রধান শহর টুরা যাবার পথে আমরা নেত্রকোণার সুষঙ্গ দিয়ে গেলুম। টুরা শহরটি ছোট্ট, কিছুটা কার্সিয়ঙের মিরিক গ্রামের মত। পথে মণি সিং-এর সঙ্গে দেখা করি। পরে ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মণি সিং-এর সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়, তখন তিনি বাংলাদেশ পার্লামেণ্টের সভ্য। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে আমি পক্ষকালের জন্যে ঢাকায় যাই, তখন মণি সিং বিশেষ অসুস্থ। আমার সঙ্গে তিনি দেখা করার সম্মতি জানানো সত্ত্বেও তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা শুনে লোভ সংবরণ করি। তার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। পঞ্চাশের দশকের শেষে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রমোদ দাশগুপ্ত ও আর-সি-পি-আই-এর পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে যখন আলাপ হয় তখন তাঁদের জীবনযাত্রা, কথাবার্তা, বেশভূষা দেখে আমার মণি সিং-এর কথা মনে হত।

মৈমনসিং থাকতে উল্লেখযোগ্য সরকারি কাজের মধ্যে আমার মনে পড়ে আমি সরকারি কুইনিন কালোবাজার করার অপরাধে একটি ফৌজদারি মামলার বিচার করি। প্রধান আসামী ছিল দু'জন, এক সাবডেপুটি নাম কানাইলাল মুখার্জি (পরে ফার্মা কে-এল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করে বিখ্যাত হ'ন); অন্যজন ছিল আর্মি মেডিকাল কোরের একজন অফিসার, ক্যাপ্টেন জলি। সরকারি দাম থেকে কালোবাজারে কুইনিনের দাম ছিল প্রায় পঁচিশ গুণ বেশী।

মৈমনসিং-এ বেশী ঘোরাঘুরির কাজ ছিল না। তা সত্ত্বেও আমার অধীন যে দপ্তরগুলি ছিল তাদের মফস্বলের অফিস পরিদর্শন করার ছুতো করে আমি জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও টাঙ্গাইল শহরে ও তাদের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে দেখেছিলুম। আমার মনে সবথেকে দাগ কাটে মধুপুরের লালমাটির জঙ্গল আর কিশোরগঞ্জের বিরাট বিরাট হাওর ('সাগর' কথার অপভ্রংশ)। হাওরগুলিতে বর্ষার শুরুতে বোরো ধান হত। বর্ষায় এত জল হত যে সাগরের মত বড় বড় বদ্ধ হ্রদে সামান্যতম ঝড় উঠলেই বিরাট বিরাট ঢেউ উঠে হাওর ফুঁসে সমুদ্রের রুদ্ররূপ ধারণ করত। হাওরে খুব মাছ হত। তবে আরিয়ল বিলের মত কৈ মাছ হত না।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারির প্রথমে বদলির হুকুম এল, কলকাতা রেশনিং দপ্তরে কেরোসিন রেশনিং-এর স্পেশাল অফিসার পদ হল। বাবা আনন্দপ্রকাশ করে চিঠি লিখলেন, আমি যেন গ্রোভ লেনে উঠি, উনি আমাদের জন্যে বাড়ির দোতলাটি

তৈরি করে দেবেন। ২২ জানুয়ারি ১৯৪৬-এ আমি কলকাতার টাউন হলে নতুন কাজে যোগ দিলুম।

পিছনে চাওয়া

মৈমনসিং-এর সঙ্গে আমার শিক্ষানবিশী আর এস-ডি-ও গিরি শেষ হল। আমার জীবনে এই কয়বছরে যা দেখি, শিখি, শুনি, কাজের ক্ষেত্রে, দেশের ও সারা বিশ্বের ঘটনাচক্রে যেভাবে বেড়ে উঠি আর অভিজ্ঞতা হয়, পরবর্তী জীবনে তাই আমার হয় অমূল্য মূলধন। আগেই বলেছি, আরেকবার বলি, এ যেন বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, মা-বাবার স্নেহাশ্রিত এক কলেজে-পড়ুয়া যুবককে গহন নদীর মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে শুধু আপন শক্তির উপর আশ্রয় করে মানুষ হবে এই আদেশ করা। শুধু তাই নয়, যে এলাকায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে সেখানকার জনসাধারণের ভালমন্দর চূড়ান্ত দায়িত্ব নিতে হবে, কী করে তাদের সঙ্গে আত্মীয়-তার সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের আনুগত্য ও ভালবাসা আদায় করতে হবে, তার সঙ্গে নিজের নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেবার মনোবৃত্তি যত গভীর হবে—সে দপ্তরেই হোক বা নিতান্ত সাধারণ লোকের মধ্যেই হোক—ততই কর্তব্য-পালনে তৃপ্তি ও আগ্রহ আসবে। সেই সঙ্গে মনের এটুকু স্বাতন্ত্র্যবোধ ও নিজের অকিঞ্চিৎকরতামূলক দৃষ্টির স্বচ্ছতা রাখতে হবে যাতে সর্বদা মনে থাকে যে যাদের নিয়ে এবং যাদের মধ্যে কাজ তাদের সকলকে খুশি করতে পারা যাবে না। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে এটুকু কৌতুকবোধ ও হুঁস থাকা একান্ত প্রয়োজন যে দশজন পরি-চিতের মধ্যে অন্তত পাঁচজন নিশ্চয় থাকবে যারা আমি যদি পরমুহূর্তে মুখ থুবড়ে মরি তবে খুশি হবে ; ওরই মধ্যে যদি তিন বা চারজন সে ঘটনায় মনে কিছু ব্যথা পায় তাই হবে যথেষ্ট পুরস্কার। যে ভাববে সে সকলেরই ভালবাসা পাবে সে হবে হয় আহাম্মক, নয় অপদার্থ ভালমানুষ, কর্তব্যপালনে অনিচ্ছুক। কাজ করার মধ্যে দিয়ে দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে, রাজনীতি সম্বন্ধে, শুধু সংবাদ আহরণ নয়, জ্ঞান ও বিচারের পরিসর ও প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। কষ্টস্বীকার করে কাজ শেখার মাধ্যমে দেশকে জানার স্পৃহাও বাড়ে। আমি যে সময়ে কাজে ভর্তি হই সে সময়ে ইংরেজ অফিসাররা ধরেই নিয়েছিলেন যে তাঁদের শীঘ্রই পাততাড়ি গোটাতে হবে। তা সত্ত্বেও আমি সুশীল দে, ও-এম মার্টিন, রাদারফোর্ডের মত অগ্রজ যে পেয়েছিলুম তা আমার ভাগ্য বলে মনে করি। আইনস্টাইনের কথাগুলি স্মরণ করুন : অল্পই

তাঁদের সংখ্যা যাঁরা নিজের চোখ দিয়ে দেখেন এবং নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। মনে মনে কল্পনা করতুম নিশ্চয় যত অল্পই হোক এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা আইনস্টাইনের উল্লিখিত গোষ্ঠীর মধ্যে পড়তেন। নিজেকে তাঁদের একজন মনে করার ধৃষ্টতা আমি রাখি না, তবে চেষ্টা করেছি ভাবতে, মনে এই তৃপ্তিই যথেষ্ট।

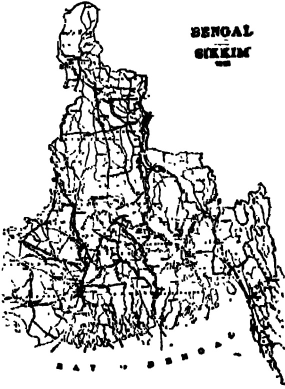
প্রশাসনে তখন কী ধরনের সুবিধা ও সমস্যা ছিল, এখন কতখানি কীভাবে বদলেছে তার কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। আমার জীবনে দু'একটি ঘটনার কথা আবার বলি। ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনে আমি যে-ভাবে চলি তাতে, পাঠকের মনে আছে, সরকার আমার উপর হস্তক্ষেপ না করলেও আমার এস-ডি-পি-ওর উপর চাপ দেন। এই পথ গ্রহণ করে সরকার আমার আত্মসম্মান রক্ষায় সাহায্য করেন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে আমার বিরুদ্ধে সরকার কোন বিরূপ সিদ্ধান্ত নেননি, যদিও আমি একজন উঁচুদরের মন্ত্রীকে প্রকাশ্যে অসম্মানজনক অবস্থায় ফেলি, সে যারই দোষ থাক। উল্টে সরকার ও মন্ত্রী উভয়ে কত যত্নে সুবিচার করে আমাকে শেষ পর্যন্ত সম্মান দেখান তাও লিখেছি। ১৯৪৪ সালে আমিই প্রথম বাংলা প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠান-বহির্ভূত পারিবারিক রেশনিং প্রথা চালু করি, সরকার তাতেও আপত্তি করেননি। অথচ যখনই কোন বিশেষ গোলমাল বা অন্যায় বা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি, যেমন করেছিলুম গৌরনদী ডাকবাংলা নিয়ে, বা মুন্সীগঞ্জের বসন্ত মণ্ডলের ব্যাপারে, অথবা ষোলঘরের সাহাদের মামলায়, তখন সরকার সর্বসমক্ষে আমাকে হেয় না করে নীরবে শুধরিয়ে দিয়েছেন। সরকার নৈর্ব্যক্তিক, কর্তব্য নৈর্ব্যক্তিক, আইন নৈর্বক্তিক, নীতি নৈর্ব্যক্তিক, এ-ধারণা অল্পে অল্পে ক্ষয় পেতে শুরু করে ১৯৪৭-এর পর। এই অবক্ষয়ের জন্যে আই-সি-এস অফিসাররাই দায়ী, কারণ ১৯৪৭-এর পর তাঁরা সমষ্টিগতভাবে এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, আপ্রাণ ছেড়ে দিন, মোটামুটিভাবেও রুখে দাঁড়াননি। এর ফলে ক্রমে ক্রমে এলেন ১৯৭০ সালে নতুন যুগের পয়গম্বর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিজস্ব সচিব পি-এন হাক্‌সার, যিনি জিগির তুললেন 'উৎসর্গীকৃত আমলার', অর্থাৎ যিনি যখন প্রধান-মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হবেন তাঁর পদসেবায় আত্মনিয়োজিত। চুলোর পথে গেল যাব-তীয় আদর্শের নৈর্ব্যক্তিকতা, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য।

১৯৫০-এর পর অনেক কিছুই দ্রুত বদলালো। সুশীল দে'র কাছে আমার শিক্ষানবিশীর কথা লিখেছি। ১৯৫৬ সালে বীরভূমে টুরে গিয়ে যা দেখি হতভম্ব হয়ে যাই। সিউড়ির সার্কিট হাউসের বারান্দায় বসে বিকালে চা খাচ্ছি, দেখি

একটি যুবক পাশের ঘরে তালা খুলে ঘরে ঢুকছে। মনে হল হয়তো অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবে। ঠিক ধরেছিলুম। তাকে ডেকে বসিয়ে চা খাওয়াবার সময়ে জানলুম সিউড়িতে দশমাস আছে, তারমধ্যে সে একদিন মাত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর অফিসে কিছুক্ষণ কথা বলেছে। কোনদিন একসঙ্গে টুরে যায়নি, তাঁর বাড়িতে খেতে যায়নি, সামাজিক বা সরকারি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যায়নি, কোন বিষয়ে আলোচনা করেনি। ভাবলুম এ অবহেলার শোধ সে দেশবাসীর কাছ থেকে কীভাবে তুলবে? কীভাবে সে শোধ তোলা বন্ধ করা যায়? নিজের মনে কোন সদুত্তর পেলুম না।

অন্তর্বেদনার দিনগুলি

সূচনা



আমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে ('তিন কুড়ি দশ : প্রথম চব্বিশ বছর') লিখেছি আমাদের কলেজ জীবনে পৃথিবীতে যে-কোন স্থানে যা কিছু বিরোধ বা বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটত কলকাতায় সে বিষয়ে বিশেষ আলোড়ন উঠত। তাতে কলকাতার দৈনন্দিন জীবনে সাময়িক যত বিঘ্নই ঘটুক বা ক্ষতিই হোক। এইরকম একটি তোলপাড় হয় আই-এন-এ বিচারের সময়ে ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে। সেই উপলক্ষ্যে ওয়েভেল ও গান্ধী উভয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় তাঁদের ও কেসি'র মধ্যে আলোচনার কথা আগেই লিখেছি। এর অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে আবদুল রসিদ আলি দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কলকাতার নাগরিক ও পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘাত ঘটে। সেই আন্দোলনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আই-এন-এ বন্দীদের মুক্তি দাবী। পুরো ছয়দিন ধরে সংঘাত চলে এবং ১১-১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলিতে

অনেক নাগরিক প্রাণ হারায়। কলকাতার রাস্তায় শোভাযাত্রা বা একত্র সমাগম আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। এই বছরের অর্থাৎ ১৯৪৬-এর শেষে কলকাতা শহর প্রথমে ইন্দোনেশিয়া, পরে ভিয়েটনাম নিয়ে মেতে ওঠে। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারির হাঙ্গামার ফলে আমার পক্ষে বাড়ি ভাড়ার খোঁজে বেরনো সম্ভব হয় না। তারপর আসে ১৯৪৬-এর জুলাইতে সর্বভারতীয় পোস্টাল কর্মিদের, এবং অল্পবেতনভুক কর্মি ইউনিয়নগুলির ধর্মঘট।

ক. কলকাতা ও হুগলী ১৯৪৬-১৯৪৭

রেশনিং ও বাড়িখোঁজা

১৯৪৩-এর মাঝামাঝি থেকে বাংলা সরকার অনেক দক্ষ ও কুশলী আই-সি-এস অফিসারকে বেসামরিক সরবরাহ ও রেশনিং বিভাগে বদলি করেন। তারই অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভারত সরকার বি-আর সেনকে ভারতের খাদ্যবিভাগে ডিরেক্টর জেনরল পদে নিয়োগ করেন। জনসাধারণের বিশ্বাস হয় সরকার খাদ্যের উপর সত্যিই গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই বছরের মাঝামাঝি জে-আর ব্লেয়ার (আই-সি-এস) চাকরিতে যখন ইস্তফা দিলেন তখন আমার মনে সন্দেহ হয় যে-সব বিভাগে যুদ্ধ এবং বৃটিশ সরকারের ভারতশাসন বিষয়ে কাগজপত্র আসে, ও গূঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সে-সব বিভাগে বাংলা সরকার দক্ষ উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসার যাতে না রাখতে হয় তারই ব্যবস্থা করছেন।

চাকরিতে যোগ দিতে মৈমনসিং থেকে ট্রেনে আমরা অপরাহ্ণে কলকাতায় পৌঁছলুম। মনে হল বাবা আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন। পরের দু'দিন দোতলায় ক'টি ঘর তুললে, কেমনভাবে তুললে, আমাদের মোটামুটি চলে যাবে সে বিষয়ে বাবা আলোচনা করলেন। কত খরচ পড়বে সে বিষয়ে এক ভদ্রলোককে ও রাঙামামাকে (মা'র খুড়তুতো দাদা) হিসাব করতে বললেন। বাবার বন্ধু, নেপালচন্দ্র সেন, কলকাতা শিল্পাঞ্চলের কণ্ট্রোলার অভ রেশনিং জেনে আমার ভাল লাগল। দপ্তর ছিল টাউন হলে। বাড়ি থেকে টাউন হল ও বাড়ি করতুম সাধারণ বাসে। অফিসের কাজে কলকাতায় ঘুরতে হলে ফৌজ-থেকে-খালাস-করা অফিসের ট্রাকে ঘুরতুম।

কয়েকদিনের মধ্যে মৈমনসিং থেকে বড় বড় কাঠের খাঁচায় প্যাক করা আসবাব, তার সঙ্গে চটমোড়া বাক্স এল। সেগুলির প্যাকিং না খুলে বারান্দায়,

খালি গ্যারাজে রাখা হল। জিনিসপত্র দেখে বাবা যেন একটু বিরূপ হয়ে গেলেন। পরের দিন সকালে গম্ভীর মুখে বললেন, তিনি দোতলা করার চিন্তা ত্যাগ করেছেন। দোতলা করার মত টাকা তাঁর নেই। যদি বর্তমান অবস্থায় থাকার অসুবিধা হয়, আমরা অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে পারি, জিনিসপত্র খোলার প্রয়োজন নেই। এ কথা শুনে আমরা একটু দমে গেলুম বললে, বলা বাহুল্য, সব বলা হয় না। গাড়ির অভাবে, সারাদিন কাজের পরে কলকাতায় বাড়ির খোঁজে ঘোরা সহজ নয়। সব কিছুই তো নিজেকে করতে হবে। কাগজে বাড়ির জন্য বিজ্ঞাপন দেব, বা ট্যাক্সি করে খুঁজে বেড়াব এমন পয়সাও হাতে নেই।

কলকাতা তখন ফেটে পড়ছে। যাঁরা পূর্বে জাপানী আক্রমণের ভয়ে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা ফিরে এসে হয় তাঁদের পুরনো বাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন, না হয় হাল ছেড়ে নতুন বাড়ি কেনার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন। উপরন্তু, কলকাতায় রেশনিং-এর কৃপায়, মফস্বল থেকে বহু পরিবার এসে কলকাতায় বসবাসের চেষ্টা করছেন। যুদ্ধের সরবরাহে ব্যবসা বা ঠিকাদারি করে বেশ কিছু লোক বিস্তর পয়সা করেছেন, তাঁরাও বাড়ির বাজার গরম করার জন্যে ছোটাছুটি করছেন। শুধু যে বেকারী নেই তা নয়, লোকে এখন ইচ্ছামত পুরনো চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি পেতে পারে। এর ফলে শুধু যে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে তা নয়, নিম্ন-মধ্যবর্তী পল্লী এবং বস্তিগুলিতে বাসস্থানের চাহিদা বেড়ে গেল। বাড়ির দামের সঙ্গে ভাড়াও বেড়ে গেল। বাড়ির থেকে ফ্ল্যাট পাওয়া আরো শক্ত হল। নতুন কেরোসিন রেশনিং-এর দোকান পরিদর্শন করার নামে আমি সরকারি ট্রাকে ঘোরার সময়ে যখনই বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখতুম তখনই ছুটতুম দেখতে ও কথা বলতে। কিন্তু অফিসের সময়ে যেহেতু বাড়ির মালিকরাও অফিসে, সেহেতু বাধ্য হয়ে বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরে, হয় হেঁটে, না হয় বাসে করে দূর দূর স্থানে, যেমন লোয়ার সার্কুলার রোড, টালিগঞ্জ বা নিউ আলিপুরে ভাড়ার আশায় বাড়ি দেখতে যেতে হত। ইতিমধ্যে ১ মার্চ থেকে আমার পদ স্পেশাল অফিসার থেকে হল ডেপুটি কণ্ট্রোলার অভ রেশনিং।

অবশেষে ৩৬-টি টালিগঞ্জ রোডের দোতলায় একটি সুন্দর ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা হল, ১ এপ্রিল থেকে পাওয়া যাবে। খবর শুনে বাবা খুশি হলেন মনে হল, বললেন চোখের ছানি অপারেশনের পর আমার নতুন বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না, আবার বলা শুরু করলেন। মনের ফুর্তিতে আবার উৎসাহ করে কাজ করছি হঠাৎ ১৯ মার্চ বিকেলে ফিরে

বেশ দুর্বল আর অসুস্থ লাগল। পরের দিন সকালে উঠে মনে হল আজ আর অফিসে যাব না। আটটা নাগাদ শরীরে একটা অনির্দেশ্য অস্বস্তি আর অস্থিরতা হতে লাগল, আভাকে বললুম ডাক্তারকে ডেকে পাঠাতে। ভাগ্যক্রমে গুলু বাড়ি ছিল এবং পারিবারিক ডাক্তার এইচ-কে দত্তকে ডেকে নিয়ে এল। তিনি আমাকে একটি কোরামিন ইঞ্জেক্শন দিয়ে বড় ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তকে নিয়ে এলেন। তিনি আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন তখনকার দিনের অতিকায় ই-সি-জি মেশিন নিয়ে। তখনকার দিনে মেশিনটি মেন সুইচে লাগাতে হত। একটি ভাল্ভ ব্লক ধরা পড়ল। ননিলীবাবু আমাকে আরো ইঞ্জেক্শন ও ঘুমের ওষুধ দিলেন।

বাবার চিন্তা হল পাছে গুলুর কলেজ কামাই হয়।" এদিকে জামাইবাবুকে দেখলে তবে মনে জোর আসে, জামাইবাবুকে ফোনে খবর দিতে বললুম। ফোনে গুলু খবর দিল। অন্য ডাক্তার দেখেছেন বলে হয়তো জামাইবাবু প্রথমে একটু ইতস্তত করছিলেন, পরে অফিসের পর সন্ধ্যাবেলা এসে খুব ভাল করে আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, বিপদ কেটে গেছে, আমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠব। ওষুধ কমিয়ে দিলেন, ভাল করে স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন। ইতিমধ্যে গুলু বেলা চারটের সময়ে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফিরে গেছে। প্রথম দিন বাড়ি ফিরে যাবার সময়ে জামাইবাবু বললেন আমাদের পাড়ায় বিলাত থেকে এম-আর-সি-পি পাস করে ডাঃ শিশির মুখার্জি সদ্য এসেছেন, প্রয়োজন হলে তাঁকে ডাকতে পারি। জামাইবাবু অবশ্য নিজে প্রায়ই সন্ধ্যায় অফিস ফেরত এসে আমাকে দেখে তবে উজানপথে ডাফ স্ট্রীটে ফেরত যেতেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আমাকে হাঁটাচলা করিয়ে দিলেন এবং পনেরো দিন কাটার আগেই রোজ একবার করে দোতলায় সিঁড়ি ওঠানামা করতে বললেন। জামাইবাবু বললেন, আমার গলার স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস ইন্‌ফেকশন থেকে হৃৎপিণ্ড ব্লক হয়, ডাঃ নলিনী সেনগুপ্তও যে ওষুধ দিয়েছেন তাতে স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস সেরে গেছে। মৈমনসিং-এর খোলা হাওয়া থেকে দূষিত হাওয়ায় এত ঘোরাঘুরির ফলে গলা খারাপ হয়। সিঁড়ি ওঠানামা করতে দেখে ডাঃ এইচ-কে দত্ত আমায় ভয় ধরিয়ে দিলেন, বললেন আমার রিউম্যাটিক হার্ট, ওঠানামা একদম উচিৎ নয়। আমার মনের ভয় কাটাবার জন্য জামাইবাবু আমাকে আর আভাকে ট্যাক্সি করে ডাফ স্ট্রীটে গিয়ে রাত্রিতে খেতে বলে গেলেন। নির্ধারিত দিনে ২০নং ডাফ স্ট্রীটে গিয়ে তেতালায় উঠে জামাইবাবুর কাছে যাব কিনা ইতস্তত করছি, এমন সময়ে জামাইবাবু উপর

থেকে আমাকে সোজা উঠে আসতে বললেন। সাহস পেয়ে আমি দিব্যি উঠে গেলুম, কিছুই হল না। এদিকে আমার অসুখে বাবার চোখের ছানির অস্ত্রোপচারে দেরি হয়ে যাচ্ছে এই চিন্তায় বাবা উদ্বিগ্ন হলেন। আমি বাড়ির মধ্যে চলাফেরা শুরু করায় বাবা হাসপাতাল চলে গেলেন। ইতিমধ্যে মুন্সীগঞ্জ থেকে আমাদের সেখানকার পাখা-টানা ছেলেটি, সোহরাব, চাকরির খোঁজে গ্রোভ লেনের বাড়িতে এসে হাজির। সুবিধা হল। সে বাবার কাপড়জামা, খাবার নিয়ে বারবার হাসপাতাল যাওয়া আসা, ঘরদোর, জিনিসপত্র, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা, এসব কাজ খুব যত্ন নিয়ে করত। বাবারও কিছু শুশ্রূষা করেছিল।

ইতিমধ্যে ১৯ মার্চ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত আমি ছুটি নিয়েছিলুম। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি বদলি চাইতে পারছিলুম না। ইতিমধ্যে ৩৬-টি টালিগঞ্জ রোডের বাড়িটি হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেইজন্যে বদলি নিতান্ত প্রয়োজন। বাবা এপ্রিলের মাঝামাঝি বাড়ি ফিরে আসার পর আমি টাউন হলে গিয়ে নেপালচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করে আমার বদলি চাইবার কারণ সংক্ষেপে বলে দরখাস্তের জন্যে অনুমতি চাইলুম। তিনি আমার প্রয়োজন বুঝলেন। বরাতক্রমে তিনি নিজেই কয়েকদিনের মধ্যে অবসর নেবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুপারিশ করলেন আমার অগ্রজ, উপেন্দ্রলাল গোস্বামী, যিনি হুগলীর জয়েন্ট কণ্ট্রোলার অভ রেশনিং ছিলেন তিনি তাঁর স্থলে কণ্ট্রোলার পদে আসুন, আর আমাকে হুগলীর জয়েন্ট কণ্ট্রোলার পদে বসানো হোক। সরকার সে সুপারিশ মঞ্জুর করলেন। ২৮ এপ্রিল ১৯৪৬-এ আমি মানকুণ্ডু অফিসে জয়েন্ট কণ্ট্রোলার পদে যোগ দিলুম। সেইসঙ্গে আমি চন্দননগরের ফরাসী পল্লীতে গোস্বামীর পরিত্যক্ত বাড়িটিও ভাড়ায় পেলুম। হুগলীর জয়েন্ট কণ্ট্রোলারের কার্যোপলক্ষে ব্যবহারের জন্যে একটি পুরনো অস্টিন-১০ গাড়ি ছিল, তার সঙ্গে সরকারি ড্রাইভার যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল। হুগলীর রেশনিং কাজটি আমার মনের মত হল। আরো ভাল হল, পদের সঙ্গে দু'শ' টাকা অতিরিক্ত ভাতা ছিল।

হুগলী ও চন্দননগর

রাজ্যের অন্যান্য মফস্বল শহর থেকে চন্দননগরের গড়ন একেবারে অন্যরকম। কলকাতা থেকে এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চন্দননগরের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ-উত্তর বরাবর হুগলীর দিকে চলে গেছে। রাস্তার পূর্বদিকে ফরাসীদের সাদা শহর,

ইংরেজিতে থাকে বলে সিভিল লাইন্‌স্‌, পশ্চিমদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের কালো শহর। কলকাতার দিক থেকে এলে শহরের মুখে দক্ষিণপ্রান্তে একটি গেট পড়ে। গেটের দু'ধারে দু'টি থাম। প্রতিটির গায়ে ফরাসী পতাকা আঁকা, তার সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রাণমাতানো তিনটি শব্দ: লিবার্তে, ঈগালিতে, ফ্রেতার্নিতে। ১৯৪ -এপ্রিলের নতুন ক্যাবিনেট মিশন প্রসঙ্গে কথা তিনটি আমার কানে নতুন বাণী বয়ে আনল।

আরো দক্ষিণে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর আরেকটি ছোট শহরতলি ছিল। গৌরহাটি বা গিরেটি। এতে একটি চমৎকার ফরাসী মদ ও তৈজসপত্রের দোকান ছিল। যদিও ১৯৪৬ সালে বহুদিন আমদানি বন্ধের ফলে মজুত মাল বিস্তর কমে গেছল, তবুও আমি বই মিলিয়ে বেশ কিছু কোনিয়াক ও আর্মানিয়াক ব্র্যাণ্ডি কিনে অনেকদিনের অতৃপ্ত শখ মিটিয়েছিলুম। তাছাড়া ফরাসী মদের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত কিছু মেডক, গ্রাভ, সোটার্ন, শাব্‌লী আর বার্গাণ্ডিও ছিল। সবথেকে আনন্দের কথা, আমদানি বন্ধ সত্ত্বেও সাবেক ১৯৩৯-৪০-এর দাম একটুও বাড়েনি। আরো একটি সুখের বিষয়, মাটির তলায় স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরে তাকের উপর হেলান দিয়ে বোতলগুলি শুইয়ে রাখার ফলে বোতলের মদ খুবই ভাল অবস্থায় ছিল। এই সরবরাহের কৃপায় চন্দননগরের দেড়বছর খুব সুখে কেটেছে। আমাদের বাড়িটি দোতলা ছিল। উপরে তিনটি খোলামেলা আলোবাতাসময় ঘর, একটি খোলা ছাত, মধ্যে বারান্দা, একদিকে স্নান-পায়খানা ঘর। নিচে লোকজন থাকার মত দুটি শোবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ও বসার ঘর। সেপ্টিক ল্যাট্রিন। তা ছাড়া গোলা উঠোন। গেটের মধ্যে গাড়ি রাখার জায়গা ও গ্যারাজ। পুব-দিকের বাড়ি থেকে আলাদা করা পাঁচিল ও সরু গলি। সমুখে উঁচু সরু শান-বাঁধানো বারান্দা। বসার ঘরের দেয়ালগুলি আমরা বুক অবধি শীতলপাটি দিয়ে মুড়ে নিয়েছিলুম। চন্দননগর তখন আসবাব তৈরির জন্যে বিখ্যাত ছিল। যোধপুর পার্কের বাড়িতে যে-সব আসবাব আছে তার কিছু কিছু আমরা এখানে তৈরি করাই।

সাদা শহরটি ছিল খোলামেলা। গঙ্গার পশ্চিমপাড় বরাবর প্রায় এক মাইল লম্বা প্রশস্ত বাঁধানো স্ট্র্যাণ্ড, যেমন চওড়া গাড়ি চলার রাস্তা, তেমনি চওড়া নদীর পারে পায়ে হেঁটে হাওয়া খাবার জন্যে রেলিং-দেয়া প্রায় দশফুট চওড়া ফুটপাথ। গঙ্গার পার থেকে সোজা উঠেছে সার সার প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, শিশু, মেহগনি গাছ। দক্ষিণদিকে, যেখানে স্ট্র্যাণ্ড শুরু হয়েছে, তার আগে স্ট্র্যাণ্ডের গা ঘেঁষে

ছিল বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাপী রংকরা বাড়ি, যার থেকে সিঁড়ি নেমে গঙ্গার জলের ভিতরে গেছে। এ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ছিলেন। স্ট্র্যাণ্ড ধরে উত্তরদিকে এগোলে বাঁদিকে পাবেন প্যালাডিয়ান স্থাপত্যের আদর্শে তৈরি, সমুখে থাম ও ঢাকাওলা বারান্দা-দেয়া ফরাসী গভর্নরের একতলা বড় বাড়ি। আমার সময়ে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল মঁসিয়ে বার্জ্যাঁ। বয়স ছিল অল্প, স্ত্রী ছিলেন সুন্দরী, যত্ন করে অতিথি আপ্যায়ন করতেন। তারপর উত্তরদিকে এগোলে পাবেন, গভর্নরের নিজস্ব দপ্তর, ছোট জেল, ফরাসী নর্মাল স্কুল, গির্জা, পল্টনখানা, পুলিসের বড়সাহেবের বাড়ি, ইত্যাদি। স্ট্র্যাণ্ডের উত্তর প্রান্তে ছিল প্রকাণ্ড ফরাসী দপ্তর, এখন সেখানে কলেজ। এইসব বাড়ির মধ্যে নিয়মিত দূরত্বে ছিল কয়েকটি চৌকো চৌকো পার্করূপী চত্বর। তাদের গা দিয়ে পুব-পশ্চিমে সমান্তরাল কয়েকটি রাস্তা, স্ট্র্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মিশেছে। এইভাবে সাদা, কালো, সারা চন্দননগর শহরটি চৌকো চৌকো পাড়ায় বা ভাগে ভাগ হয়েছে, গ্রাফ পেপারের ছকের মত। ফরাসীতে গলিগুলিকে বলত শেম্যাঁ। কালো শহরের চৌকো চৌকো পাড়াগুলি অত কাটা কাটা নয়, গলিগুলি ঘুরপাক খাওয়া। মিউনিসিপালিটির আইন অনুসারে গলি ও রাস্তার জমিগুলি গৃহস্থকে পরিষ্কার রাখতে হত, অর্থাৎ যেখানে সেখানে কোন জঞ্জাল ফেলা বারণ ছিল। ফলে রাস্তাগুলি প্রশস্ত দেখাত। খালি জায়গা যথেষ্ট ছিল। ১৯৮৬ সালে আমি যখন চন্দননগরের কয়েকটি রাস্তায় ঘুরি, তখনও দেখি অন্যান্য জেলার শহরের তুলনায় চন্দননগর অনেক ফাঁকা দেখাচ্ছে, যদিও ১৯৫১-র তুলনায় ১৯৮১ সালে চন্দননগরের লোকসংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

দক্ষিণ থেকে এসে জি-টি রোড দিয়ে উত্তরে যেতে বড়বাজারের কাছে যেখানে জি-টি রোড ডানদিকে ঘুরে আবার সোজা হয়ে উত্তরে গেছে সেখান পর্যন্ত বিভিন্ন সৌধের মালায় শহরটির, যাকে বলা যায়, একটি পরিচয় তৈরি হয়েছে : সাধারণ পাঠাগার, টাউন হল, মার্গ্যাঁ হাসপাতাল, হরিহর শেঠের বাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দারা আপনাকে সগৌরবে আশেপাশের রাস্তায় ১৯০৫-৭ সালের বিপ্লবীদের বাড়িগুলি দেখাবে। চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজার জাঁকজমকের জন্যে সুবিখ্যাত। আজকাল পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, পূজা-পরবে, মেলায়. খুব 'চলমান' আলোর সজ্জা দেখা যায়। সেগুলি একচেটিয়াভাবে করেন চন্দননগরের শিল্পীরা।

আমার রেশনিং দপ্তরে কয়েকজন দক্ষ, কুশলী, আগ্রহী সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের শীর্ষে ছিলেন আমার সহকারী কন্ট্রোলার নুর মহম্মদ খাঁ। একে কাজে

খুব ভাল ও পরিপাটি, উপরন্তু আমার কাজ লাঘব করার জন্যে সদাই ব্যস্ত। নতুন কাজে যোগ দেবার কিছুদিন পরে তিন সপ্তাহের জন্যে ইউ-এল গোস্বামী ছুটি নেন; তাঁর কাজ চালিয়ে নেবার জন্যে রোজ আমাকে কলকাতার টাউন হলে যেতে হত। সে সময়ে এন-এম খান আমার প্রায় সব কাজই করতেন।

এদিকে জয়তীর বয়স সাড়ে তিন হল। আমাদের বাড়ির পিছনে এক রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় রাস্তায় স্থানীয় কনভেন্ট স্কুলে শিশুদের ক্লাসে ভর্তি করার কথা আমরা ভাবলুম। আভা তাকে একদিন মাদার স্থপিরিয়রের কাছে নিয়ে গেল। জয়তীকে দেখেশুনে তিনি নার্সারি শ্রেণীর সিস্টারকে ডেকে তাঁর হাতে সঁপে দিলেন। আভা অবাক হয়ে গেল, জয়তী খুশি হয়ে, সিস্টারের হাত ধরে সোজা হেঁটে কনভেন্টের ভিতরে চলে গেল, পিছনে একবার ফিরেও তাকাল না। রোজ সকাল ন'টায় স্কুলে গিয়ে তিনঘণ্টা ধরে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা, খেলা, গান করা (মুখ্যত স্তব আর ছড়া গাওয়া)। তারপর আধঘণ্টা সকলে মিলে মাটিতে পাতা বিছানায় ঘুম। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ রাখাল, অথবা পিওন লতিফ, স্কুলে গিয়ে তাকে নিয়ে আসত।

রেশনিং অফিসের নিয়ম ছিল অফিসের গাড়িতে ব্যক্তিগত কাজে ঘোরা যেত, তবে মাইলপিছু নির্দিষ্ট একটি ভাড়া দিতে হত। এই আইনের কল্যাণে আমরা প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা হয় শ্রীরামপুর, নয় চুঁচুড়া বা হুগলী যেতুম। আমার কাজের এলাকা ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে দক্ষিণে উত্তরপাড়া থেকে শুরু করে উত্তরে ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত সব মিউনিসিপালিটিগুলি।

বন্ধুবান্ধব

হুগলী-চুঁচুড়ার প্রায় সব অফিসারই আগে থেকে জানাশোনা ছিলেন। ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে, অর্থাৎ, আমার যাবার আগে, বিজয় আচার্য হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। বীরেন মিত্র জজ হয়ে এলেন ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে। বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার ছিলেন সত্যেন্দ্রমোহন ব্যানার্জি। তাঁর সরকারি বাড়ি ছিল চুঁচুড়ায়। বীরেন মিত্রের সরকারি বাড়িও চুঁচুড়ায়, বিজয়ের বাড়ি হুগলীর মহসীন কলেজের সমুখে, গঙ্গার উপরে। এস-এম ব্যানার্জি ঠিক আমাদের দলের ছিলেন বলা যায় না, তবে খুব ভদ্রতা করতেন। আগেই বলেছি সুরাবর্দীর সঙ্গে আমার যখন গোলমাল হয় তখন তিনি ভেবেছিলেন, আমি মারা পড়ব। যখন পড়লুম না,

তখন তিনি হয়তো ভাবলেন আমার সম্ভবত কোন খুঁটি বা ইষ্টদেবতার জোর আছে, ফলে আমাকে একটু যেন বেশী স্নেহ করতেন। দক্ষিণে শ্রীরামপুরে এস-ডি-ও ছিলেন নির্মল সেনগুপ্ত, আই-সি-এস। তিনি পরে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হন। রণজিৎ গুপ্ত, আই-পি, ছিলেন তাঁর এস-ডি-পি-ও। নির্মলের স্ত্রীর নাম ছিল দীপালি। অল্পদিনের মধ্যে নির্মলের ভগিনীপতি ফণিভূষণ সেনগুপ্তের সঙ্গে পুনরায় আলাপ হল, স্ত্রীর নাম কণা। ফণিদা আর আমি ১৯৪০ সালের শেষে একই জাহাজে ইংলণ্ড থেকে ফিরি আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। এত মজলিশি লোক খুব কম হয়। ফণিদা ছিলেন ডানলপ কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউণ্টাট।

এতজোড়া লোকের মধ্যে নির্মল আর তার স্ত্রী, জয়পুর রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেনের নাতনি, ছিল সবথেকে আমুদে আর মজার। নিজের সম্বন্ধে মজার মজার গল্প বলে তারপর সেই গল্পের জের ধরে সোডার মত ভস-ভসিয়ে গর্‌রা তুলে হাসার ব্যাপারে নির্মল ছিল অদ্বিতীয়। পেট থেকে হাসি ভস্‌ভসিয়ে যেই গলা পর্যন্ত উঠত তখনই তার আওয়াজ স্বরগ্রামের বর্ণালিবিভঙ্গে তুবড়ির মত হাওয়ায় উঠে ছড়িয়ে যেত। একদিন বলল সাইকেলে করে শ্রীরামপুর থেকে দশমাইল দূরে ইন্‌স্পেকশনে যাচ্ছে, মাঝরাস্তায় সাইকেলের চাকা ফুটো হয়ে বসে গেল। কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে দেখে উল্টোদিক থেকে একজন লোক বাইসিক্‌ল্‌ চড়ে আসছে। তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে।" "শ্রীরামপুর ? সেখানে বাড়ি ? বেশ, বেশ। দেখো, আমি হচ্ছি, শ্রীরামপুরের এস-ডি-ও। হাঁ, হাঁ, এস-ডি-ও। এস-ডি-ও জানো তো ? আমার সাইকেলের পিছনের চাকা ফুটো হয়ে গেছে, দেখছ তো ? তুমি একটা কাজ কর। আমার সাইকেলটা তুমি নাও আর তোমার সাইকেলটা আমাকে দাও। আমার সাইকেলটা নিয়ে গিয়ে ফুটোটা সারিয়ে সুবিধামত তুমি এস-ডি-ওর বাড়িতে গিয়ে, গেটে যে চাপ-রাশি থাকে, তাকে বাইকটি দিয়ে বলবে, 'এই নাও এস-ডি-ও সাহেবের সাইকেল, আর আমার সাইকেলটি দাও আমাকে।' তোমার সাইকেলটি ঠিক ফেরৎ দেবে। তোমার কোন ভয় নেই ; দেখছ না আমার সাইকেলটা নতুন আর দামী, আর তোমার সাইকেলটা কত পুরনো। তাছাড়া, এই সুযোগে এস-ডি-ওর সাইকেল চড়তে পাবে। বাঃ, বেশ ভাল ছেলে তুমি। আর, এই নাও একটি টাকা, ফুটো সারাবার খরচ।" গল্পটি শেষ হতে না-হতে সারা শরীর আগেকার দিনের খাবার

পাতে দেয়া মোল্লারচকের দৈ-এর মত থর-থর করে কেঁপে উঠত। সমবেতদের মধ্যে পরের পর হাসির ঢেউ উঠত।

জজসাহেব বীরেন মিত্র আর ইলাদিকে ১৯৪১ সালে যেমন দেখেছি হুবহু তেমনি দেখলাম। বরং এই পাঁচ বছরে তাঁরা যেন আরো অতিথিবৎসল আর স্নেহশীল হয়েছেন। যতদিন চুঁচুড়ায় ছিলেন বোধহয় এমন কোন সপ্তাহ যায়নি যার কোন-না-কোনদিন তাঁদের বাড়িতে রাত্রে খাইনি। প্রতিবারেই খাবারের ভারে টেবিল ভেঙে পড়ার দাখিল হত। ছেলে-মেয়ে, আর্য আর উমা আরো যেন বাবামার মত দেখতে হয়েছিল। দু'জনে, তারসঙ্গে আর্যর স্ত্রী, মিলে তারা এখন সাদার্ন অ্যাভিনিউতে আর অন্যত্র নবনালন্দা স্কুল ও তার শাখা-প্রশাখা চালিয়ে নাম করেছে। চুঁচুড়াতে উমার জণ্ডিসের মত হল। ডাক্তারবাবু সমস্ত গুরুপাক রান্না বন্ধ করে দিয়ে পথ্য দিলেন সেদ্ধ-কাঁচকলা। ইলাদি ডাক্তারের কথা অমান্য করার লোক নয়। উমা শুদ্ধ সকলে ভরপেট গুরুপাক খাবার পর মুখ ধুয়ে বসার-ঘরে বসতে যাব, এমন সময়ে ইলাদি উমাকে ডেকে নিয়ে শোবার আগে কাঁচকলা-সেদ্ধ খাইয়ে শুতে পাঠালেন। মনের মত খাবারই যদি না খেতে পাই, তবে ডাক্তারি করার কী লাভ? উমা সেরে গেল।

হৈ হল্লা করে চন্দননগরে আমাদের জীবন কাটছে, এমন সময়ে বর্ধমানে আভার বাবা মস্তিস্কের দৌর্বল্য বা অবসাদে ক্লিষ্ট হয়ে তাঁর নিজের পেশা, ওকালতিতে, ও দৈনন্দিন কাজে হঠাৎ যেন স্পৃহা হারিয়ে ফেললেন। উনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, দেশের বাড়িতে তথাকথিত জাগ্রতা চণ্ডীঠাকুরের নিত্য পূজা হত। আমার বিয়েতে তিনি, আমার বিশ্বাস, অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হ'ন, যদিও কোনদিন ক্ষোভের চিহ্ন তাঁর ব্যবহারে তো পাইইনি, বরং বরাবর অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন পেয়েছি। ১৯৪২ সালে আমার ছোট শ্যালক বিশু ফুসফুসের যক্ষায় আক্রান্ত হয়। যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে কয়েকমাস থেকে বিশু যদিও একেবারে সেরে গেল তবু, যেহেতু শ্বশুরমশায় বিশুকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাই আমার নিজের ধারণা, তিনি একটি অপরাধবোধে বোধহয় কষ্ট পেতেন। এটিও অবশ্য নিতান্ত আমার অনুমান। এই অপরাধবোধ নিশ্চয় অহেতুক, কিন্তু এটি সব ধর্মে আছে, সব মানুষের মধ্যেই আছে। আমি নিজে নিরীশ্বরবাদী, প্রয়োজনে নাস্তিক বলেও নিজেকে জাহির করি। মানুষের জীবনে কোন্ সময়ে কোথা থেকে কিভাবে অপরাধবোধ আসে, তারমধ্যে কোন কার্য-কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত, যুক্তিতর্কের বাইরে মনে হয়। নিজের কথাই বলি, ১৯৮১-৮২ সালে দেড় বছর ক্যান্সার রোগে

ভুগে, ওয়াশিংটনে, আমার প্রথম দৌহিত্র অর্জুন, মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় মারা গেল। তখন আমার বয়স পঁয়ষট্টি। তার অসুখের সময়ে আমার কেবল মনে হত আমি কী পাপ করেছি, যার জন্যে আমার এই শাস্তি হল? নেপালচন্দ্র সেন, যাঁর কথা আগে বলেছি, তিনি আমার শৈশবে আমার ঠিকুজি করেন। আমি মুখে বলি আমি ঠিকুজি মানি না, কখনও সে ঠিকুজি কারোকে দেখাইনি, হাতও কখনও গোনাইনি। কিন্তু তিনি আমার সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন, সবই মিলে গেছে, কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া। উনি বলেছিলেন আমার শরীর কোনদিন খুব ভাল যাবে না, তা সত্ত্বেও আমি ৬৪/৬৫ বছর পর্যন্ত বাঁচব। অর্জুনের মৃত্যুর পর একটি অপরাধবোধ আমাকে প্রায়ই মনে মনে বিপর্যস্ত করেছে, সে কি নিজের জীবন দিয়ে আমার আয়ু বাড়িয়ে গেল? নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ নিরর্থক ও অহেতুক চিন্তা। তবু পুরনো টেস্টামেণ্টের জোবের কাহিনী ও প্রশ্ন সব দেশের, সব যুগের, সব সভ্যতার আত্মায় এমনভাবে গেঁথে গেছে যা নির্মূল করা অসম্ভব। সি-জি-ইয়ুঙ এ-বিষয়ে যা লিখেছেন আমি তার সঙ্গে অনেকাংশে একমত। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই আমি আস্তিক, তবুও আমার মনে সর্বদা একটি প্রশ্ন জাগে যার সদুত্তর খুঁজে পাই না। যিনি অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন, যিনি মাত্র একটি গ্রহেই যুগে যুগে সহস্র সহস্র কোটি জীবন পরিচালনা করেছেন, করছেন ও করবেন, যিনি অনন্ত ক্ষমাশীল, তাঁর মন এমন সংকীর্ণ হবে কেন, যে আমার মত কীটানুকীটের পাপপুণ্য পর্যন্ত বিচার করে তাঁর সাজা দেবার প্রবৃত্তি হবে? তাঁর মন যদি এত অকিঞ্চিৎ হিসাবনিকাশে ব্যাপৃত থাকে তবে এই অনন্ত সৃষ্টি চালানোর অপার শক্তি তিনি পাবেন কি করে? টি-এইচ হাক্সলি থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত সকলেই বলে গেছেন, সৃষ্টির প্রতিটি খুঁটিনাটি এত বিচিত্র ও অনির্বচনীয় নিয়মে চলে, যে মন স্বতঃই এক ঐশী শক্তির কল্পনায় নত হয়, যদিও কোন ঐশী শক্তি আছে কিনা তাঁরা জানেন না।

সে-সব কথা থাক। শ্বশুরমশায়ের মানসিক অবসাদ, উপার্জনহ্রাস, যুদ্ধের পর বর্ধমানে রেশনিং চালু না হবার ফলে সংসারের দৈনন্দিন আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের আহরণ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। চন্দননগর থাকতে আমরা বাড়িতে যা রেশন বাঁচাতে পারতুম, তার উপরে বর্ধমানের বাজারে দুষ্প্রাপ্য অথচ চন্দননগরে বা কলকাতায় পাওয়া যায় এমন প্রয়োজনীয় যা সামান্য কিছু জোগাড় করতে পারতুম সেগুলি নিয়ে আমরা সাধারণত মাসের প্রথম রবিবার বর্ধমানে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে আসতুম। যখনই যেতুম, অত মানসিক কষ্টের মধ্যেও আভার মা কী করে যে মুখে

সারাক্ষণ হাসি নিয়ে ঠাট্টা গল্প করে স্বাভাবিকভাবে সব কাজ, আদর, আপ্যায়ন, রান্না, পরিবেশন করা, সবই ঠিক আছে এবং থাকবে, যেন কিছুই হয়নি, এমন-ভাব নিয়ে দিনের শেষে হাসিমুখে আমাদের বিদায় দিতেন, আমি প্রতিবারই আশ্চর্য হয়ে যেতুম। সেই থেকে, এবং যতই বয়স হল ততই জীবনে মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের শক্তির প্রকাশ দেখে আমার প্রতীতি ক্রমেই দৃঢ় হয়েছে যে ভারতের যদি কিছু শক্তি আর ভবিষ্যৎ থাকে তা জোগাবে ভারতের নারী। এই প্রতীতি আজ ১৯৯৩-এর দুঃসময়ে আমার আরো বেড়েছে।

এখন অন্য একটি কথা পাড়ি। নতুন কাজে এসে আমার একটি বিষয়ে জ্ঞান বাড়ল, একাজে না এলে যা সম্ভব হত না। দৈনন্দিন জীবনে খুচরো কেনাবেচার কী মূল্য এবং তার থেকে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে কত পরিবর্তন আসে তাই দেখে। কেরোসিন রেশনিং-এর সময়ে আমার রেশন দোকানদাররা ছিল প্রধানত বিহারী বা যুক্ত-প্রদেশী; প্রায় সবাই ছিল দুটি কি তিনটি জাতের লোকের মধ্যে আবদ্ধ। চালডালের রেশনিং শুরু হবার সময়েও অধিকাংশ দোকান ছিল তাদেরই হাতে। কিন্তু যত দিন গেল সুরাবর্দী বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের রেশন দোকান দেবার পক্ষপাতী হলেন। হিন্দুদের মধ্যে উঁচু বা মাঝারি জাতের লোকরা রেশন দোকানদারিতে তত আকৃষ্ট হল না, কিন্তু কিছু কিছু বাঙালী মুসলমান এই পেশায় নামল। এর আগে সুরাবর্দী যখন ইস্পাহানি ও রণদাপ্রসাদ সাহাকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন, তখন হিন্দু মহলে ঘোর আপত্তি ওঠে তিনি এই উপায়ে মুসলিম লীগ তহবিলে চাঁদা সংগ্রহ করছেন। অবশ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কংগ্রেস যে অঙ্কের চাঁদা পেত, তার তুলনায় মুসলীম লীগের তহবিলের তুলনাই হয় না। সুরাবর্দীর আগ্রহ সত্ত্বেও কলকাতা শিল্পাঞ্চলের বাঙালী মুসলমানরা রেশন দোকান নিতে তেমন সংখ্যায় এগিয়ে এল না। আমার ধারণা হল, তার কারণ মুসলমানদের হাতে পুঁজি ছিল নিতান্তই অল্প। ব্যাঙ্ক থেকে ধার দেবার ব্যবস্থা তখন মোটেই চালু হয়নি।

ওরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বাঙালী বর্ণহিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু রেশনের দোকান দেখা দিল, অর্থাৎ যাঁদের বংশে কোনদিন কেউ একাজ করেনি। তাদের প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানা। কত তাড়াতাড়ি যে তারা নতুন পেশায় অভ্যস্ত হল ভাবতে অবাক লাগে। সঙ্গে সঙ্গে লগ্নি, পুঁজি ও ব্যবসায়ে লাভ সম্পর্কেও তাদের হিসাব ও ধ্যানধারণা বাড়ল। মাল আনা নেয়া, খদ্দেরকে খুশি

রাখা, লাভ করা, সঞ্চিত অর্থ ব্যবসাবৃদ্ধি বা নতুন লগ্নিতে লাগানো, কিছুদিনের মধ্যে এ-সব কথা আর শুধু নাক সিঁটকিয়ে উল্লেখ করার যোগ্য বলে গণ্য হত না। এরই মধ্যে অবশ্য অনেক বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানই দোকান কার্যত বিহারীদের হাতে তুলে দিয়ে শুধু লাভের অংশ নিয়েই খুশি থাকতে শিখলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ঘুমিয়ে-থাকা অংশীদার'। দোকানদারি করতে করতে তাদের কথাবার্তার চালও পালটে গেল। কথা হল চটপটে, বাস্তবঘেঁষা, কোন জিনিস কত কিম্মতের, সে সম্বন্ধে বোধ। বাজে গল্প বা কুঁড়েমি করার অভ্যাস কমে গেল। জীবনে সব জিনিসই যে হয়-সাদা, নয়-কালো নয়, এ-দুয়ের মাঝামাঝি ধূসর রঙের অনেক কিছু আছে, সে বোধ এল। বুঝতে শিখল কথা দিলে তা রাখতে হয়। দুঃখের বিষয় তা সত্ত্বেও এত কম বাঙালী এল, এবং তারই মধ্যে অনেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, যে আমাদের জীবনভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন কিছু এল না। আশুতোষ মুখার্জি রোড, রসা রোড, গড়িয়াহাট, রাসবিহারী এভেনিউ যেদিকেই চাই, দেখি, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যে-সব বাঙালী দোকানে খুব রমরমা অবস্থা ছিল তাদের অধিকাংশই এখন হয় আয়তনে অনেক মলিন ও ছোট হয়েছে, না হয় উঠে গেছে। এমন-কি বাঙালীর সাধের বইয়ের দোকানও।

১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি থেকে একের পর এক অনেক কিছু ঘটতে শুরু করল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুকের দুরু দুরু ভাব যেন বেড়েই চলল। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪৬ অগাস্টের ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় এবং তারপরে আমার আত্মীয়-স্বজন বা হিন্দু-মুসলমান বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কারোরই প্রাণহানি বা ক্ষতি হয়নি। ফলে, সারাবছর আমরা নিজেরা মোটামুটি শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে কাটিয়েছি; রোজই সন্ধ্যায় দেখা-সাক্ষাৎ হত, প্রতি সপ্তাহে কোন না কোন বাড়িতে একসঙ্গে খেতুম। ইতিমধ্যে আমার অফিস মানকুণ্ড থেকে চুঁচুড়ায় গঙ্গার পাড়ে, পর্তুগীজ বা ডাচদের তৈরি বলতে পারি না, ভূদেব ভবনে উঠে গেছে, তাতে মেলামেশার আরো সুবিধা হয়েছে। ভূদেব ভবনের অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে ছিল তার প্রকাণ্ড, চওড়া সিঁড়ি, সোজা গঙ্গার জলে নেমে গেছে। আর দোতলায় গঙ্গার উপর প্রকাণ্ড বড় ছাত। বাড়িটি আগে স্বনামধন্য লেখক ও শিক্ষাব্রতী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি ছিল।

(খ) ১৬ অগাস্ট ১৯৪৬ : সূচনা

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এই শ্লোকটি প্রায়ই উচ্চারণ করতেন : জানামি ধর্মম্ ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্মম্ ন চ মে নিবৃত্তিং। ধর্ম কী তা জানি, তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, অধর্ম কী তা জানি, তাতে আমার নিবৃত্তি নেই। আমরা সকলেই বলতে অভ্যস্ত ইতিহাসই আমাদের শিক্ষক, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোধহয় সকলেই স্বীকার করব, ইতিহাসের শিক্ষায় আমাদের প্রবৃত্তি নেই, অমান্য করাতেও নিবৃত্তি নেই। তার বোধহয় কারণও আছে। ১৯৪৭ সালের আগে গণতন্ত্র বা যে-কোন প্রশাসনের অভিজ্ঞতা আমাদের কমই ছিল। ক্ষমতার ব্যবহারে কতখানি সংযম, সংবেদনা, চেতনা, একাত্মবোধ, দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম এবং তার সঙ্গে কঠোরতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়, আত্মম্ভরিতা বাদ দিয়ে কতখানি লোকমতানুসারে চলতে হয়, লোকমত কী করে গড়তে হয়, নিজের স্বভাবে ও ব্যবহারে অনুশাসন ও কর্তব্যপরায়ণতা আনতে হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান মুষ্টিমেয় নেতার ছিল। তাঁদের পরে যাঁরা এলেন তাঁদের প্রায় নেই বললেই হয়। উল্টে অনায়াসলব্ধ, অকস্মাৎপ্রাপ্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যে স্ফীত হয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রশস্ত হল। বহু যত্ন ও চিন্তার ফলে ১৯৫০ সালে আমাদের সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়। নির্দ্বিধায় বলা যায়, সে সংবিধান বহুদেশের ইতিহাস থেকে আহৃত শিক্ষার নির্যাস। জাতিধর্মবয়সলিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতি নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্বীকার, দেশের গতি সংকেত সূত্রাবলী, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একুশ বছরের বা তার বেশী মানবমাত্রেরই দেশের সর্বত্র সরকার নির্বাচনে অধিকার, নৈর্ব্যক্তিক, আদর্শবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ আপামরনির্বিশেষে সর্বজনপ্রযোজ্য আইন ও বিধি, বিশেষত অমূল্য মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, এইসব নীতিতে ১৯৫০ সাল থেকে আমরা এত অভ্যস্ত, যে মনেও পড়ে না যে সে-সব অধিকার ও স্বাধীনতা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে খুব কম দেশেই আছে, এমন-কি বহু তথাকথিত উন্নত দেশেও নেই। এইসব অধিকারের মূল্য আমরা ক্ষণিকের জন্য উপলব্ধি করার সুযোগ পাই ১৯৭৫-৭৭ সালে যখন আমরা হঠাৎ সেগুলি থেকে বঞ্চিত হই। কিন্তু তিলে তিলে নিঃশব্দে এইসব অমূল্য অধিকার কীভাবে হরণ হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের চেতনা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক হিসাবে যে-সব অধিকার আমাদের স্বভাবতই প্রাপ্য, সরকারের বা সাংগঠনিক প্রতাপের কোপে আজ প্রায় সবই অবলুপ্ত। কী কেন্দ্রে, কী রাজ্যে আমাদের শাসকবর্গের ইতিহাসের অমূল্য দান রক্ষণে মতি নেই। শুধু যে মতি নেই তা নয়, সেগুলি অস্বীকারের দুর্মতির প্রতি, আগুনের দিকে পতঙ্গের মত, তাঁরা ধাবিত।

এবং আমরাও এত মতিহীন যে সজোরে প্রতিবাদ করার ইচ্ছাও আজ লুপ্ত ; বড়-জোর গোপন ভোটে আমরা একটি ক্ষীণ 'না' বলার আশ্বাসেই আবদ্ধ। এই পরি-স্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারতের সর্বত্র যে দাবদাহ সর্বগ্রাসী রূপ নিচ্ছে তার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। উল্টে, ইতিহাসের শিক্ষা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তার সম্বন্ধে আমরা যেন সর্বত্র বিশেষ আগ্রহশীল। ইতিহাসের একটি অভিজ্ঞতা, যা অধুনা ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে আমাকে আতঙ্কিত করে, তার সামান্য অবতারণাই এই রচনার উদ্দেশ্য।

বারোজ: সুরাবর্দী সরকার

১৯৪৬ সালের ২ এপ্রিল প্রদেশময় সাধারণ নির্বাচনের পর গভর্নর বারোজ শহীদ সুরাবর্দীকে নতুন মন্ত্রিসভা গড়তে বলেন। বারোজের আগে রিচার্ড কেসি গভর্নর ছিলেন। কার্যসূত্রে দু'জনকেই আমি কয়েকবার দেখেছি ও কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আমার ধারণা হয় যে জাতিতে অস্ট্রেলিয়ান কেসি ভারতনীতিবিষয়ে বৃটিশ সরকারের চিন্তা ও কর্মধারায় বিরক্ত হয়ে দায়মুক্তি চান। ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বারোজ গভর্নর হন। তার কিছুদিন পরেই আমি তাঁকে ছোট একটি সরকারি মিটিং-এ দেখি। বারোজের মুখাবয়ব ছিল কিছুটা বিলেতী বরাহের মত, ভাববিকারহীন। দেখেশুনে মনে হয়েছিল তাঁর নিজস্ব অভিমত কম ছিল, কেসি-কে ঠিক উল্টো মনে হত। ফলে বারোজ যখন নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে সুরাবর্দীকে ডাকলেন, তখন আমার ধারণা হয় তিনি উপরের নির্দেশে কাজ করছেন। নাজি-মুদ্দিন ছিলেন ঢাকার নবাববংশের লোক; খানদানি, ভদ্র, মৃদুস্বভাব ও বাচন, এমন-কি লাজুক বলা যায়। অন্যপক্ষে, সুরাবর্দী, ব্যক্তিগত বন্ধু হিসাবে ভাল হলেও, সরকারি ও রাজনৈতিক কাজে ছিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে রাফ., টাফ., বুলি। আমার ধারণা হয় বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্ত করেন এই প্রদেশে সেই সময়ে এই ধরনের একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন। নাজিমুদ্দিনকে দিয়ে এদেশকে পুরো-পুরি গোঁড়া মুসলিম লীগপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয় এই উপলব্ধিতে বৃটিশ সরকার সুরাবর্দীকে গদিতে বসালেন, তাঁদের চোখে সুরাবর্দী হলেন বাহাদুর ছেলে। এ ধারণা হবার আরো কারণ আছে: কলকাতার উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্ম-চারিরা সুরাবর্দীকে তাঁর রূঢ় ব্যবহারের জন্য অপছন্দ করতেন, অতএব সুরাবর্দী তাঁদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন না।

আহূত হবার প্রায় একবছর আগে, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ৭ এপ্রিল, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লির মুসলিম লীগ সভ্যদের সম্মেলনে সুরাবর্দী যে ভাষণ দেন, তার কতগুলি কথা আমার এখনও খুব মনে পড়ে। বক্তৃতার একটি অংশ এইরকম :

"পাকিস্তান কি আমাদের শেষ দাবী? আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব না। শুধু বলব এটি আমাদের অধুনাতম দাবী। কংগ্রেসকে এই কথা স্মরণ করতে আমি অনুরোধ করি যে, আগে আমরা অনেক কম চেয়েছি। আমরা তখন গণতান্ত্রিক সংবিধানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাও মেনে নিতে রাজি ছিলুম। কিন্তু এখন বিচ্ছেদ দাবী ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

গত কয়েকবছর ধরে, অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে পাঞ্জাব, আসাম, পরে দার্জিলিং এবং সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড উপলক্ষ্যে এই কথাগুলি যখনই মনে পড়েছে তখনই এক অব্যক্ত, অনিশ্চিত আশঙ্কায় আমার মন ব্যাকুল হয়েছে। দুঃখের বিষয় কোন-ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার সময়মত ইতিহাস বা সমাজবোধ এবং সুমতি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেননি বা দিচ্ছেন না। সময় যখন ছিল তখন রাজা ক্যানিউটের মত মিথ্যা আস্ফালন করেছেন, পরে অন্তিমকালে গালে চড় খেয়ে লেজ গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ করে সমস্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। গোর্খাল্যাণ্ড মনে করুন।

১৯৪৬ সালের ১৬-২১ অগাস্ট কয়দিন যে মহা-হত্যাযজ্ঞ চলে তা এখনও আমাদের স্মৃতি বা ইতিহাসকে এত আচ্ছন্ন করে আছে যে আমরা ভুলে যাই এই কয়টি ভয়ঙ্কর দিনের পরেও কলকাতায়, বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকে, বিশেষত ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৪৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত। তবে আমার মনে কলকাতার ১৬ অগাস্টের দাঙ্গা বরাবরই ভারতবিভাগ নাটকের প্রধান পটভূমি হয়ে থাকবে।

১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল দুটি প্রস্তাব পাস করে। প্রথমটিতে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগুলি নাকচ করা হয়। পাঠকের মনে পড়বে, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ অ্যাট্‌লি পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং এ-ভি আলেক্‌জাণ্ডার এই তিন সদস্যের একটি ক্যাবিনেট মিশন ঘোষণা করেন। এর মধ্যে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ পূর্বে ১৯৪২ সালের প্রথমভাগে একা আসেন। ভারতবন্ধু হিসাবে তাঁর এদেশে খুব সুনাম ও সমাদর ছিল। অনেকের এখনও ধারণা, ভারতসমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪২ সালে একক মিশনে তিনি সরল মনে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই বইয়ে আগেই লিখেছি গান্ধীজি তাঁর

প্রথম ঘোষণা থেকেই তাঁর কূট অভিসন্ধি বুঝতে পেরে বলেন, "ভারতবন্ধু ক্রিপ্‌স্‌ যদি শুধু এই প্রস্তাবই নিয়ে এসে থাকেন, তবে তিনি সরাসরি প্লেনে করে দেশে ফিরে গেলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।" ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে সেটি ধর্মভিত্তিক ভারতবিভাগের সূত্রপাত, এবং এই মিশনে তিনি মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীস্থলে দৃঢ়ভাবে অভিষিক্ত করে যান। শুধু তাই নয়, হায়দ্রাবাদ ডেলিগেশন ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি যে-কথা বলেন, তাতে বোঝা যায় তাঁর প্রস্তাব ছিল ভারতকে আরো খণ্ডিত করা এবং বড় বড় করদ রাজ্যগুলিকেও পৃথক হবার সুযোগ দেয়া। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়ে ক্রিপ্‌স্‌ পার্লামেণ্টে যে-সব বক্তৃতা ও সাফাই দেন, এবং অব্যবহিত পরে আমেরিকায় গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যে-সব প্রচার করেন ও সাফাই গাইতে শুরু করেন, তাতে গর্ডন ম্যাকডোনাল্ড এম-পি, ২৮ এপ্রিল ১৯৪২-এ পার্লামেণ্টে যে-সব কথা বলতে বাধ্য হন তারও উল্লেখ করেছি।

মুসলিম লীগ কাউন্সিলের দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, পাকিস্তান সাধনকল্পে একটি ডিরেক্ট অ্যাকশন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ধার্য ও পালিত হবে। ৩০ জুলাইয়ের অধিবেশনে লীগ কার্যকরী সমিতি ঘোষণা করেন, ১৬ অগাস্ট শুক্রবার সারাভারত-ময় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হবে। ৩০ জুলাই তারিখে লণ্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংকল্পকে অত্যন্ত গর্হিত বলে নিন্দা করা হয়। ঐ দিনই, অর্থাৎ ৩০ জুলাই, আমেরিকায় ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি সর্দার জে-জে সিং ইউনাইটেড নেশন্‌সে প্রকাশ্য আবেদন জানান, বিশ্বজাতিসংঘ যেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, "যাতে এই সঙ্কটাকুল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা সারা ভারতকে পর্যুদস্ত না করতে পারে।" ৮ অগাস্ট ভাইস-রয় ওয়েভেল মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হুমকির বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ ও বঙ্গপ্রদেশের গভর্নরদের সঙ্গে তিনঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করেন। ১২ অগাস্ট ভাইসরয় নেহরুকে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গড়তে আহ্বান করেন। একই দিনে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলির কংগ্রেস পার্টি বিধানসভায় 'একটি বিশেষ পার্টির দলীয় সিদ্ধান্তকে' সরকার বিধানসভায় বিনা আলোচনায় সরকারী সিদ্ধান্ত হিসাবে মেনে নিয়ে ১৬ অগাস্টকে সরকারি ছুটি' হিসাবে ঘোষণা করার প্রতিবাদে সভাগৃহ ত্যাগ করে। ১৩ অগাস্ট নেহরু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন বিষয়ে সহযোগিতা চেয়ে জিন্নাকে চিঠি লেখেন। ১৫ অগাস্ট

নেহরু জিন্নার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আশি মিনিট ধরে কথাবার্তা বলেন। ঐ দিনই, অর্থাৎ ১৫ অগাস্ট বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল একটি মুলতুবি প্রস্তাব নাকচ করে, যার বিষয় ছিল ১৬ অগাস্টকে সরকারি আম-ছুটি হিসাবে ঘোষণার আলোচনা।

১৬ অগাস্টের কয়েকদিন আগে থেকেই কয়েকটি কথা আমার মনে বারবার ওঠে। প্রথমত, লণ্ডনের 'টাইমস্' যদি ৩০ জুলাই, অর্থাৎ ধার্যদিনের ষোলদিন আগে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এত তীব্রভাবে লিখে থাকে; যদি একই সময়ে সর্দার জে-জে সিং বিশ্বজাতিসংঘের হস্তক্ষেপ প্রার্থনায় ব্যাকুলভাবে আবেদন জানান, তাহলে ওয়েভেল, বারোজ এবং অন্যান্য গভর্নররা নিশ্চয় তাঁদের গোয়েন্দা বিভাগ ও রাজনৈতিক দপ্তরগুলি থেকে সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন: অর্থাৎ মুসলিম লীগ কী করতে চায়, কীভাবে করতে চায়, তার ফলাফল কী হতে পারে, কতদূর গড়াতে পারে ইত্যাদি। ৮ অগাস্টের আগে পর্যন্ত তাঁদের এ-বিষয়ে পুরোপুরি অবগতির মধ্যে যদি কিছু ফাঁক থেকে থাকে, তাহলে সেটুকু নিশ্চয় সেইদিন গভর্নরদের তিনঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে তার পূরণ হয়। এখনকার মন্ত্রীদের মত 'কৈ আমি তো কিছু জানি না, আমাকে তো কেউ জানায়নি' বলে রেহাই খোঁজার লোক তাঁরা ছিলেন না। তখনকার দিনে, এবং এখনও, সারাদেশব্যাপী সরকারি ছুটির ঘোষণা নেগোশিয়েবল্ ইন্‌স্ট্রুমেন্টস্ অ্যাক্টে হত। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করতেন কোন প্রদেশে সেই ছুটি আরোপ করলে সরকারি অথবা জনসাধারণের কাজের ক্ষতি হবে, তবে সে ছুটি তাঁরা রদ করতে পারতেন এবং এখনও পারেন। আমার নিজের ধারণা হয়েছিল বারোজ লোক হিসাবে শঠ ছিলেন না, কিন্তু সুরাবর্দীর সঙ্গে তাঁর দহরমমহরম ছিল, এবং আগের গভর্নর হার্বার্টের মত কিসে ভারতের ক্ষতি হয় সে বিষয়ে তৎপর ছিলেন। তবে হার্বার্ট তাঁর অভিসন্ধিপূরণের জন্য নির্ভর করতেন বৃটিশ কর্মচারিদের ওপর এবং বারোজ নির্ভর করতেন সুরাবর্দীর ওপর। বৃটিশ কর্মচারিরা সুরাবর্দীকে জিন্নার একান্ত অনুচর মনে করতেন বলে মনে হয়। অবশ্য বৃটিশ কর্মচারিরা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে বৃটিশ সরকার জিন্নাকে আপনজন ভাবতেন। বৃটিশ সরকার যদিও ইতিমধ্যে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝির মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, তবুও আমার নিজের মনে হত তাঁরা ঠিক করেননি ঠিক কী উপায়ে, কী পরম্পরায়, কী কালসূচিতে সবকিছু হবে। উপরন্তু পরিণাম কী হবে, অন্তিমে কী দাঁড়াবে, বা ঠিক কোন সময়সীমার মধ্যে, সে সম্বন্ধেও

তাঁরা সঠিক কিছু ঠিক করেননি। এটা ছিল নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত অনুমান। একটি বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না, বিশেষত নাজিমুদ্দিন চলে গিয়ে সুরাবর্দী যখন এলেন। তা হচ্ছে বৃটিশ সরকার নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল যে বঙ্গপ্রদেশ জিন্নার ভাগে যাবে এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে যোগ্য যন্ত্র হবেন সুরাবর্দী ও বারোজ। তার কারণ বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে ভারত, অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও, মোটামুটি সম্পূর্ণ, সতেজ ও বলিষ্ঠ থাকবে। তাছাড়া কলকাতা তখনও বৃটিশ শিল্প, বাণিজ্য ও লগ্নির ঘাঁটি। তবে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি ১৬ অগাস্টে এরকম নারকীয় দক্ষযজ্ঞ হবে।

১৯৪৬ সালে আমি হুগলী রেশনিং বিভাগের দায়িত্বে ছিলুম এবং চন্দননগরে একটি বাসাবাড়িতে থাকতুম। ১৬ অগাস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চন্দননগরে কলকাতার কোন খবর পাইনি। ঐ দিনেও কলকাতায় কিছু কিছু বিদেশী সদাগরী অফিস খোলা ছিল; তাদের দপ্তরে চন্দননগর থেকে যাঁরা কাজে যেতেন তাঁরা যখন গুটিগুটি ট্রেনে ফিরলেন তখন আস্তে আস্তে খবর ছড়ালো। পরের দুদিনে অফিস থেকে কলকাতার টাউন হলের রেশনিং অফিসে ফোন করে যা শুনলুম তাতে ১৬, ১৭ এবং ১৮ অগাস্ট, অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবার কলকাতায় যাবার কথা চিন্তা করাও বাতুলতা বলে মনে হল। এই তিনদিন কলকাতায় অপ্রতিহতভাবে দাঙ্গা ও খুনোখুনি চলে, তারসঙ্গে চলে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড।

এই স্মৃতিকথা যখন আমি লিখছি তখন, অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে, দূরদর্শনে গোবিন্দ নিহালনির 'তামস' ছবিটি দেখান হচ্ছিল। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে 'তামসে'র বিষয় ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম খণ্ডে দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমানদের যে দেশ বদলাবদলি হয়, এবং সংশ্লিষ্ট যেসব নারকীয় কাণ্ড ঘটে, তার-বিবরণ। ১৯৪৭ সালে যাঁরা নিতান্ত শিশু ছিলেন বা জন্মাননি, তাঁদের মনে 'তামস' গভীর রেখাপাত করে। 'তামস' উৎকৃষ্ট ছবি। তবুও আমার মতে এর অন্তর্নিহিত দর্শন একটু সরলীকৃত এবং স্তোকপূর্ণ; আধুনিক তথাকথিত মার্ক্সিস্টদের সরলীকৃত উটপাখিসুলভ ভাষ্য। যথা, এইসব নারকীয় উন্মত্ততার উৎসে অনেক-খানিই বাইরে থেকে একদল শয়তান এসে আগুন ছড়ায় এবং ধ্বংসলীলাগুলি মূলত তাদের দ্বারাই সংঘটিত। অর্থাৎ হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ডের শিকাররা আসলে শান্তিপ্রিয় স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান, যারা পুরুষানুক্রমে পরস্পরের প্রীতিসম্বন্ধে আবদ্ধ এবং মূলত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। যাঁদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, অথবা যাঁরা এই তাণ্ডবমত্ততা রোধকল্পে নিজেরা সময় থাকতে চেষ্টা করেননি বা নেতৃত্ব নেননি, কিংবা যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতা-বাদের দোহাই দিয়ে আসল অবস্থা স্বীকার করতে নারাজ (আমার জীবনে সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী হিন্দু বা মুসলমান আমি খুব কমই দেখেছি, বিশেষত রাজনৈতিক নেতা বা কর্মিদের মধ্যে, এমন-কি স্বঘোষিত নাস্তিকদের মধ্যেও নয়), তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মের দোহাই দেয়া নৃশংসতাকে স্বীকার করতে চান না। ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ফাণ্ডামেণ্টালিজ্‌মের স্বরূপ যে কতখানি ভয়ানক হতে পারে তা খুব সম্প্রতিও রামশিলাযজ্ঞের আন্দোলনে অনেক নেতা বা রাজনৈতিক দল স্বীকার করতে চাননি। আমরা ভুলে যাই, সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্মের প্রথম দেড়দশকের ওপর সেখানকার মধ্য-এশীয় ইসলামীয় সোভিয়েট রিপাব্‌লিকগুলিতে হাজার হাজার বাছাই করা সেরা কম্যুনিস্ট ক্যাডাররা গোঁড়া মোল্লাদের চক্রান্তের নৃশংস বলি হয়। মোল্লারা সোভিয়েট ধর্মবিমুখনীতি নষ্ট করার জন্যে চেষ্টার কসুর করেনি। গত আট-নয় বছরে, অর্থাৎ ঈরাণে খোমেনির ক্ষমতা গ্রহণের পর, সোভিয়েট ইউনিয়ন আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণ করার যে সিদ্ধান্ত নেয়, তার একটি প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, আফগানিস্তান, যা নাকি সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ার দুর্বল ও ভেদ্য নরম তলপেটের ঠিক নিচে, এবং যার মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট দেশে ইসলামীয় গোঁড়ামির শনির প্রবেশ সহজ, তাকে করায়ত্ত রাখা। অন্যপক্ষে এ-কথা কখনই ভুললে চলবে না যে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে গভীর ও স্বাভাবিক মানবতাবোধ বর্তমান, এবং তারই বলে তারা নিজেদের পশু-প্রবৃত্তিকে শমে রাখে। এ সত্য ভুললে অপরাধ হবে। তবে এটাও ঠিক ধর্মানু-প্রেরিত নৃশংসতাও দুর্মর, এবং সামান্য উত্তেজনাতেই ভীষণ আকার ধারণ করতে পারে।

কলকাতার হত্যাকাণ্ড বিষয়ে সে-সময়ে আমার যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা হয়, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে মুসলিম লীগ খুব সযত্নে বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি ছক সম্পূর্ণ করেছিলেন। এ বিশ্বাসও হয় পুলিশ প্রশাসনের ও উচ্চ কর্মচারিরা, এবং তাদের সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগও কী ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে তার বিশদ খবর রাখতেন। আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপারটি শুধুমাত্র মোল্লাদের উস্কানির ফলে হয়নি; এটি ছিল মুখ্যত প্রশাসনিক, রাজনৈতিক কাজ। সুতরাং এই কয়দিনের ঘটনার পিছনে অনেক চিন্তা ও প্রস্তুতি ছিল যা, মামুলি, নিতান্ত স্থানীয়, ছোট-

খাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিরবিদিত ধাঁচের নয়। পরে ১৯৬০ বা ৭০-এর দশকে গুজরাটে বা উত্তরপ্রদেশে যে-সব বড় দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রথম আক্রমণ শুরু করে তাদের পিছনেও ভালরকম প্রস্তুতি ও পরোক্ষ প্রশাসনিক উস্কানি ছিল প্রমাণ হয়। এটা অবশ্য ঠিক যে বড় দাঙ্গাও ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ থেকে দাউ দাউ করে বেড়ে ওঠে। তবে এই ধরনের বিরাট উন্মত্ত কাণ্ডকারখানা অকস্মাৎ ঘটা সম্ভব নয়, তা সে যত কম সময়ই লাগুক না কেন।

১৬ অগাস্ট

১৫ অগাস্ট রাত্রে সারা কলকাতা শহর যখন শুতে গেল তখন বোধ করি কোন নাগরিকের আশঙ্কা হয়নি পরের কয়দিন কিরকম বেপরোয়া আতঙ্ক ও মর্মান্তিক পরিস্থিতি চলবে। এও সম্ভব যাঁরা এই হাঙ্গামার বিশদ ব্যবস্থা করেছিলেন, তার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, নিজেরাই কল্পনা করতে পারেননি। 'বাবু বৃত্তান্তে' সমর সেন লিখেছেন তিনি ১২ কি ১৩ অগাস্ট সন্ধ্যাবেলা নিজামী হোটেলে খেতে যান। ওয়েটারদের সঙ্গে বেশ ঠাট্টামস্‌করা করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে সফল করা চাই এই বলে পরের দিন সকালের ট্রেনে দিল্লী রওনা হন।

১৬ অগাস্ট কিছু যে ঘটতে পারে এবং তা কী ধরনের রূপ নেবে, তার আগে একটি ঘটনা ঘটে—যার থেকে আন্দাজ করা যেত। সৈয়দ নৌশের আলির একটি বিবৃতিতে প্রকাশ পায় যে ১৬ অগাস্টের চার-পাঁচ দিন আগে থেকে প্রত্যহ ভোর সাড়ে তিনটার সময়ে দলে দলে লোক তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চিৎকার করে 'মুসলমানের শত্রু নৌশের আলি ধ্বংস হোক' জিগির দিতে দিতে কুচকাওয়াজ করে যেত। ১৬ অগাস্ট নৌশের আলিকে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যেতে হয়। যখন ২৪ অগাস্ট তাঁকে নিজের বাড়িতে ফেরত দেয়া হল তখন দেখেন বাড়ির বাইরে ও ভিতরে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে, বাড়ির উপর মুসলিম লীগ পতাকা উড্ডীন, আর গেটে নোটিস সাঁটা: 'মুসলিম লীগ অফিস'।

১৬ অগাস্টের সকালে ময়দানে মুসলিম লীগ আহূত শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশ দিয়ে শুরু হল। মিটিং বেশ কিছুকাল শান্তিতে চলল। হঠাৎ সমাবেশের শেষপ্রান্তে, চৌরঙ্গীর ধারে, একটি ছোটখাট বচসা ও হাতাহাতি শোনা গেল। দেখতে দেখতে হাতাহাতি পরিণত হল বড় রকমের মারামারিতে। যেই মারামারি শুরু হল দেখা

গেল ময়দান সমাবেশের বহু লোক আগে থেকেই নানারকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে। বেলা দশটা নাগাদ ধর্মতলার মোড়ে, চৌরঙ্গীর ওপর, একটি বন্দুকের দোকান অবাধে লুঠ হল। কোথাও পুলিশের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। এর পরেই শুরু হল অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব নরককাণ্ড।

একই সঙ্গে কলকাতার নানা জায়গায় তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। প্রথম তাণ্ডব আরম্ভ হল অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটে, মানিকতলা, বেলেঘাটা অঞ্চলগুলিতে। দলে দলে গুণ্ডারা, মুসলিম লীগ পতাকা উড়িয়ে রাস্তায় বার হল, হাতে বন্দুক, বড় বড় ছোরা, পুরনো তলোয়ার, লাঠি, মুগুর, ভারি ভারি পাথর, লোহা ইত্যাদি। যেখানেই, হাতাহাতি শুরু হয় লুঠেরারা গগনভেদী চিৎকার শুরু করে, 'পাকিস্তান কি তা শিক্ষা দিতে হবে,' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'আল্লা হো আকবর', তারপরই শুরু হত লুঠপাঠ।

কেবলমাত্র উত্তর-অ্যামহার্স্ট স্ট্রিট অঞ্চলে, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের বাড়ির ঐতিহাসিক অঞ্চলে, কিছু পরিমাণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরকে রক্ষার চেষ্টা ও সুস্থমনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া, অন্য সর্বত্র লুঠতরাজ, ধ্বংসলীলা, অগ্নিসংযোগ এবং খুঁজে খুঁজে, ধীরে সুস্থে হত্যা চলে। এমন-কি কলেজে-পড়া সুশিক্ষিত, আদর্শস্বভাবের সুসভ্য মুসলমান যুবকরাও এই ধরনের কার্যকলাপে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে একটি দল শিয়ালদা স্টেশন আর আপার সার্কুলার রোডের মোড়ে ট্রেন-থেকে-নামা সদ্য-আগত একটি বাঙালি হিন্দু-পরিবারকে ধরে, তাদের পনেরো-ষোল বছরের মেয়েকে বিবস্ত্র করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখে, যতক্ষণ না মতিস্থির ব্যক্তিদের আরেকটি দল তাকে উদ্ধার করে।

পুলিশের উপর 'কাজ করার কোন নির্দেশই' ছিল না মনে হয়। দক্ষিণ-অ্যামহার্স্ট স্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, বড়তলার সারা অঞ্চলে দাউ দাউ করে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। অবিশ্বাস্যরকম কম সময়ের মধ্যে উত্তর কলকাতার প্রায় সর্বত্র তুমুল মুখোমুখি যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল আগুন লাগিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও সম্পত্তি ধ্বংস করা, এবং আগুনের ফলে, যারাই ঘর থেকে বার হচ্ছে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা। শ্রীমতী উমা সেহানবীশের মুখে শুনেছি, ১৬ অগাস্ট রাত্রে উত্তর কলকাতায় তাঁর শ্বশুরবাড়ির গোটা অঞ্চলে সারারাত ধরে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখায় আকাশ কেমন লাল হয়ে

ছিল। তার সঙ্গে আকাশভেদী সারারাত চিৎকার : 'আল্লাহো আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'।

দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ ১৭ অগাস্টে, কতগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে : যেমন, পার্ক স্ট্রীট থানা অঞ্চলে একজন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জজকে তাঁর বাড়িতে ঢুকে হত্যা করা হয়, তাঁর বাড়ি তছনছ করে লুঠ করা হয়। একটি ছোট ছেলে গুণ্ডাদের হাত থেকে পালাবার সময়ে আলিপুর কোর্টের একজন অতিরিক্ত জজ তাকে রক্ষা করতে যখন গেছেন, তাঁকে খুন করা হয়, জোড়াসাঁকোতে এক ফলওলা প্রতিবেশীর স্ত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলে, গঙ্গার বুকে স্টীমলঞ্চের মুসলমান সারেংরা লঞ্চের আক্রমণে অনেক দেশী নৌকার হিন্দু মাঝিমাল্লাদের ডুবিয়ে মারে।

শনিবার ১৭ অগাস্টের মাঝসকালের আগে সরকার কোন ব্যবস্থাই নেননি বলে মনে হয়। ঐদিন সকালে সারা শহর আর্মির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ১৪৪ ধারা জারি করে যে-কোন স্থানে পাঁচজনের বেশী একত্র জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়। ১৬ অগাস্ট রাত্রে, যখন হত্যাকাণ্ড চূড়ান্তে ওঠে, তখন সুরাবর্দী বেতারে আশ্বাসবাণী দেন, অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ১৬ অগাস্ট একদিনে, কলকাতা ফায়ার ব্রিগেড পুরোদমে কাজ করে ৯০০টি বড় বড় অগ্নিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। তারমধ্যে আবার বহুস্থানে হুমকি-দেয়া জনতা ফায়ার ব্রিগেডকে হয় অগ্নিস্থানে যেতে বাধা দিয়েছে, না হয় আগুন মেটাতে বাধা দিয়েছে।

১৬ অগাস্টে যা নাকি জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সবথেকে বেশী বিক্ষুব্ধ করে তা হচ্ছে পুলিশের তাজ্জব ব্যবহার ও একান্ত উপেক্ষা আর ঔদাসীন্য। শুধু তাই নয়, পুলিশ এমন ভাব দেখায় যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাদের ওপর নির্দেশই ছিল যেখানে সম্ভব সেখানেই সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে ইন্ধন দেয়া। আইনশৃঙ্খলা প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্ব, সংবিধানের এই আইনের দোহাই দিয়ে ওয়েভেল বা বারোজ নিজেদের সাফাই গাইবার পথ নিশ্চয় রাখেননি।

১৮ অগাস্ট রবিবারে অবস্থার বিশেষ উন্নতি তো দেখাই গেল না, বরং অবনতি হল। সৈন্যবাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, অথবা যেখানেই গেছে সেখানে যথেষ্ট ভিতরে ঢুকতে পারেনি। উপরন্তু এইদিন হল হিন্দুদের পাণ্টা আক্রমণের পালা। নেতৃত্ব নেয় কলকাতায় সর্বত্র ছড়ানো হিন্দু কালোয়াররা। বন্দুক না থাকলেও তাদেরও হাতে বড় বড় লোহার ডাণ্ডা, ছোরা, পুরনো তরোয়াল, মুগুর, ভারী লোহা ও অন্যান্য হাতিয়ার। সঙ্গে যোগ দেয় দলে দলে হিন্দু বাঙালীরা। কৃপাণহাতে কিছু শিখরাও যোগ দেয়। বহুস্থানে তাদের

নৃংশংসতা আগের দু'দিনের মুসলমানদের হিংস্রতার তুলনায় কোন অংশে কম যায়নি। বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালিঘাট, টালিগঞ্জ, আলিপুর, কড়েয়া, কস্‌বা, যাদবপুর, গড়িয়া অঞ্চল শুধু নয়, মধ্য কলকাতা, বিশেষ করে ঠনঠনে কালীবাড়ি অঞ্চলে, হিন্দুরা চারিদিকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, সারা শহরে কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা আসার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। হাটবাজার সব বন্ধ, দুধ পাওয়া অসম্ভব. দোকানপাট সব রুদ্ধ, টেলিফোন অচল। ট্রেন, ট্রাম, অন্যান্য যানবাহন সব বন্ধ। সর্বত্র থমথমে ভাব, কোথায় কখন কী ফেটে পড়বে ঠিক নেই। ঐ-দিন সৈন্যবাহিনী আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৮ তারিখ রাত্রে প্রায় সর্বত্র শহরের ভিতরে নানা জায়গায় ঘাঁটি করে, ফলে ১৯শে সকাল থেকে অবস্থার উন্নতি হয়। তবে ঐ-দিন, অর্থাৎ ১৮ই, হিন্দুরা তাদের আক্রমণে ও নৃশংসতায় আগের দু'দিনের ধ্বংসের শোধ নেয়। অগ্নিকাণ্ড সমানে চলে। বিকেলের দিকে, কিছুটা শান্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে, স্থানে স্থানে অসহায় পরিত্যক্ত পরিবারদের বিপদ-সঙ্কুল অঞ্চল থেকে নিরাপদ পরিবেশে তাদের সম্প্রদায়ের বসতিতে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। সোমবার ১৯ অগাস্ট, সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতিতে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়, তবে হিন্দুদের আক্রমণ চলতেই থাকে। অবশেষে ১৯ তারিখের বিকেলে মুহুর্মুহু মিলিটারি টহলের কল্যাণে শহরের পরিস্থিতি কিছুটা শমে আসে।

২০ অগাস্ট, মঙ্গলবার, আরো অনেক দোকানপাট খোলা শুরু হয়। বাস ও ট্যাক্সি রাস্তায় বার হয়। তবে ট্রাম চলেনি। ঐ-দিনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শহরের নানাস্থানে 'শান্তিমিছিলে'র যাত্রা। মিছিলে ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, এম-এ ইস্পাহানি, নিরঞ্জন সিং তালিব, সামসুদ্দিন আহমেদ, এবং জ্ঞানী মেহেরা সিং। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পতাকা একত্রে উড়িয়ে তাঁরা এণ্টালি, পার্ক সার্কাস, খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, বালিগঞ্জ, কালিঘাট, শ্যাম-বাজার, চিৎপুর, মানিকতলা, হাওড়া, হাওড়া ব্রিজ অঞ্চল পরিক্রমা করেন, বিশেষ করে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে। ঐ-দিনেও অনেক বস্তি অগ্নিসংযোগের ফলে ধ্বংস হয়।

কত লোক মারা যায়, কত লোককে টুকরো করে কাটা হয়, কত লোকের অঙ্গহানি হয়, কত লোক গুরুতর জখম হয়, কতগুলি গৃহ ধ্বংস বা অগ্নিসাৎ হয়, কত টাকার সম্পত্তি নষ্ট বা লুঠ হয়, তার হিসাব কোনদিন করার চেষ্টা হয়নি, প্রকাশও হয়নি।

ওয়েভেলের নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে পরে আসছি। এটা ঠিক যে তিনি ২৫-২৬

অগাস্ট আগে থেকে জানান-না-দিয়ে হঠাৎ দিল্লী থেকে উড়ে এসে আড়াই ঘণ্টা ধরে কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চলগুলি নিজের চোখে দেখেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, গান্ধীজি ও নেহরুর সঙ্গে দিল্লীতে ২৭ অগাস্ট তাঁর যে বৈঠক হয়, সেখানে তিনি প্রাদেশিক সরকার ও মিলিটারি বিষয়ে প্রশংসাপত্র দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসে-ছিলেন। ওয়েভেলের উপেক্ষার থেকে আমি আরো বিস্মিত হয়েছিলুম, না গান্ধীজি, না নেহরু, না কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সভ্যদের মধ্যে কেউ, এই হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে, কলকাতায় আসেননি। গ্রাহ্য কৈফিয়তের মধ্যে আমি যা ভাবতে পারি তা হচ্ছে তাঁরা হয়তো স্থির করেছিলেন যে ত্বরিঘড়ি তাঁরা যদি কলকাতায় আসতেন তাহলে হয়তো মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের বিরুদ্ধে মুসলমানবিদ্বেষী বলে প্রচার চালাত, কারণ এটা ঠিক যে ১৬ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত যে অবস্থা কলকাতা ও চারপাশে হয় তাতে মুসলমানদের অপরাধের পরিমাণ হিন্দুদের ঐ দুদিনের বা তারপরেরও অপরাধের পরিমাণের থেকে বেশী হয়।

আরো আমি ভাবতুম, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস সারা ভারতময় অনেক আগে থেকে জারি হলেও কলকাতার উপর তার প্রকোপ সবথেকে বেশী কেন পড়ল? আমার নিজের অনুমান মুসলিম লীগ হয়তো স্থির করে কলকাতায় তাদের অভিযান যদি জয়ী হয় তবে পাকিস্তানে সারা বঙ্গকে অন্তর্ভুক্তির দাবী নিরঙ্কুশ হবে। হিন্দুদের তুলনায় কলকাতায় মুসলমানরা সংখ্যায় কম এবং কলকাতায় আন্দোলন সফল হলে দাবীর জোর হবে। কলকাতার পরে মুসলিম লীগ ঐ বছর অক্টোবরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপর আক্রমণ চালায়, তার সরল যুক্তি ছিল এ জেলাদুটি মুসলমান গরিষ্ঠতার কেন্দ্রবিন্দু এবং সেখানে অবাধে আগুন লাগানো ও তরোয়াল চালানো যেতে পারে।

১৮ অগাস্ট রবিবার থেকে ২০ অগাস্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত হিন্দুরা তাদের প্রতি-আক্রমণে মুসলমানদের থেকেও বেশী আক্রোশ দেখায়। তারজন্য সুরাবর্দী বোধ-হয় প্রস্তুত ছিলেন না। আমার এ ধারণার একটি কারণ আছে। ঘটনার কিছুদিন পরে আমি একজন উচ্চপদস্থ আই-পি অফিসার, যিনি ১৮ তারিখ রাত্রে লালবাজার কণ্ট্রোলরুমে ডিউটিতে ছিলেন, তাঁর কাছে শুনি সেদিন রাত্রে সুরাবর্দী কণ্ট্রোল-রুমে এসে টেবিলের উপর বিষণ্ণভাবে মুখ রেখে নিজের মনেই কয়েকবার বিড়বিড় করে বলেন, 'আমার নির্দোষ মুসলিম বেচারিরা!'

কলকাতায় আসা

হুগলি রেশনিং অফিসে নুর মহম্মদ খান বলে একজন অফিসার আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁরও বাসবাড়ি চন্দননগরে ছিল। তাঁর স্ত্রী বহুকাল অজীর্ণরোগ ভোগের ফলে আন্ত্রিক ক্ষতে ভুগছিলেন। স্কুল অভ ট্রপিকাল মেডিসিনের অধ্যক্ষ ডাঃ আর-এন চৌধুরী ভদ্রমহিলাকে জুলাইয়ের শেষে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি করেন। এন-এম খান স্বভাবতই এ-সময়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন; মুখে কিছু না বললেও চোখে মুখে সবসময়ে থমথমে ভাব। ১৬ থেকে ২০ অগাস্ট পর্যন্ত কলকাতায় যাবার কোন প্রশ্নই ওঠেনি, অথচ ট্রপিকাল স্কুলের ফোন পাওয়া যায় না। শেষকালে আমরা বেপরোয়া হয়ে ঠিক করলুম, ২১ অগাস্ট বুধবার কলকাতায় গিয়ে মিসেস খানের খবর, এবং সুবিধা হলে তাঁকে ফেরৎ আনতে, যেতেই হবে। অফিসের গাড়ির ড্রাইভার আগের দিন রাত্রে এই শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ২১ তারিখ সকালে এলই না। আমি ১৯৩৯ সালের পর থেকে নিজে গাড়ি চালাইনি। সরকারি অস্টিন গাড়িটি পুরনো, নির্ভরযোগ্য নয়; তবু সকাল ন'টার সময়ে বেরোলুম। গাড়িতে আমরা তিনজন: খান, আমার স্ত্রী, আমি। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বিবেকানন্দ ব্রিজ পেরিয়ে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক, টালা-ব্রিজ, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা, পরে সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে ট্রপিকাল স্কুল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ডানলপ ব্রিজ থেকে ট্রপিকাল পর্যন্ত সারা রাস্তা ধরে দুপাশে প্রচুর ধ্বংসের দৃশ্য, মুখোমুখি অসংখ্য লড়াইয়ের চিহ্ন, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের অবশেষ, সর্বত্র কাটাছেঁড়া গলিত-প্রায় মানুষের শব, ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দুর্গন্ধ। লুঠপাট করা, ভাঙাচোরা দোকান ও ব্যবসার গদি। সারা রাস্তা ধরে, একশ গজ অন্তর সশস্ত্র পুলিশ ও আর্মির যুক্ত পিকেট। ট্রপিকালে মিসেস খানকে নীরোগ ও সুস্থ দেখে আমরা সকলে খুশি। ডাঃ চৌধুরী বললেন, ওঁকে আমরা বিকেলে চন্দননগরে ফেরত নিয়ে যেতে পারি।

আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল হাজরা রোডের গ্রোভ লেনে। ট্রপিকাল থেকে বেলা সাড়ে-বারোটায় বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছলুম একটায়। খানকে দেখেই বাবা আমাকে ঘরে ডেকে বললেন, কী ভুলই আমি করেছি, ওঁকে এনে। এখন বাড়ির সকলের জীবন তো বটেই, সারা গ্রোভ লেনের অবস্থাও বিপন্ন হয়েছে। বিদ্বেষ যে এত তুঙ্গে উঠবে তা আগে আমার কল্পনাতেও আসেনি। যদি এ ধরনের আশঙ্কা আদৌ হত তাহলে কখনই খানকে নিয়ে বাড়ি আসতুম না। অফিসপাড়ায় খাওয়া সেরে, তাঁকে রেশনিং অফিস টাউন হলে বসিয়ে আসতুম। ফেরার পথে ওঁকে, ওঁর স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে ফিরতুম। বাবা আমাকে ভিতরে ডেকে এ-কথা বলতে না

বলতেই, খিড়কির দরজায় পাড়ার তিন-চারজন বড় বড় ছেলে এসে হাজির, আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি কে, কী নাম ইত্যাদি। ভড়কে গেলে যা হয়, আমি একটি ব্রাহ্মণ পদবী বললুম, খেয়াল ছিল না যে পৈতে দেখতে চাওয়া স্বাভাবিক। নেহাৎ এ-পাড়ায় মানুষ হয়েছি এবং অর্ধেক ছেলেদের আমি জন্মাতে দেখেছি, সেজন্য ছেলেরা একটু গাঁইগুই করে আস্তে আস্তে অন্য কথা বলতে বলতে দেড়টা নাগাদ চলে গেল। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী অবস্থা বুঝে, বুদ্ধি করে ভিতরের একটি ঘরে খানকে বসিয়ে খেতে দিলেন। খান আর আমার দুজনেরই তখন জিভ শুকিয়ে গেছে, গলা দিয়ে কিছু নামছে না। আমরা তখনই পড়িমরি করে বেরিয়ে পড়লুম। মধ্যে, ঘুরে হাওড়া ব্রিজ দিয়ে হাওড়া কণ্ট্রোলরুমে আই-পি রাঘবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে আমার ভাইকে যাকে আমি সঙ্গে এনেছিলুম, তাঁর হাতে দিয়ে বললুম শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিরাপদে পৌঁছে দিতে। হাওড়া ময়দান ও কাছারি এলাকা জনমানবহীন, ঠিক উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের মত। শুধু পুলিশ আর আর্মি পিকেট। হাওড়া থেকে ফিরে ট্রপিকাল থেকে মিসেস খানকে তুলে নিয়ে আমরা সন্ধ্যার আগে চন্দননগর পৌঁছলুম।

নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার

১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর থেকে ২১শে পর্যন্ত নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় যে হত্যাকাণ্ড চলে তা কলকাতার থেকেও মর্মান্তিক। সমস্ত কথা খুলে লিখলে পাছে যা ঘটেছিল তার থেকে আরো ভয়ানক প্রতিক্রিয়া অন্যত্র ঘটে এই আশঙ্কায় কোন স্বচক্ষদর্শীই বিস্তৃত বিবরণ দেননি। অনেক কমিয়ে লেখেন। এ-কথা অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, যাঁর ধর্ম-নিরপেক্ষতার উপর আমার গভীর আস্থা ছিল, আমাকে পরে বলেন। কলকাতার দাঙ্গা শেষ হবার ঠিক সাত সপ্তাহের মাথায় ঐ দুই জেলায় কাটাকাটি শুরু হয়। দুই জেলায় ঘটনাগুলি যে পরম্পরায় ঘটে তাতে বেশ বোঝা যায় যে জেলাদুটিতেও সবরকম প্রস্তুতি অতি সঙ্গোপনে ও নিষ্ঠুরভাবে আগে থেকে করা হয়, এবং কর্তৃপক্ষের তরফে ইচ্ছাকৃত অবহেলার অনেক দৃষ্টান্ত ঘটে। যে-সব ঘটনা ঘটে তাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে প্রতিটি আক্রমণই আগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্ল্যান করা হয়: সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মেরে

ফেলা, নারীদের ধর্মান্তরকরণ ও পুনর্বিবাহ ব্যবস্থা, সম্পত্তি ধ্বংস, হিন্দুদের গরু-ছাগল বিনাশ করা।

১০ অক্টোবর সশস্ত্র দাঙ্গাবাজ জনতার দল সংগঠিত হয়ে একসঙ্গে একজোটে একই সময়ে প্রায় ২০০ বর্গমাইল পরিধির এলাকায় হামলা চালায়। সবই নোয়াখালির সদর ও ফেণী মহকুমায়। সেই এলাকার রামগঞ্জ থানা, বেগমগঞ্জ থানার অংশ, রায়পুর, সেনবাগ, ফেণী, ছাগলনাইয়া ও সন্দ্বীপ আক্রান্ত হয়। ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত অবাধে সবকিছু হত্যা ও অত্যাচার চলে। ১৬ অক্টোবর বাংলার প্রেস অ্যাডভাইজারি কমিটির এক বিবৃতিতে স্বীকার করা হয় যে নির্মম খুনোখুনি হয়েছে এবং 'দাঙ্গাবাজরা অবাধে অনাচার চালায়'। সব দোষ চাপানো হয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অবহেলার উপর, বলা হয় তিনি সারাদেশ জুড়ে জীবননাশ, সম্পত্তি ধ্বংসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে অপারগ হন, এবং বিধ্বস্ত এলাকায় বাইরে থেকে দাঙ্গকারীদের আগমনও বন্ধ করতে পারেননি। এর পরের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বীকার করা হয় যে নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও লখিমপুর থানায় ও ত্রিপুরা জেলার নাজিরগঞ্জ থানায় ঘোরতররকম আইনভঙ্গ হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করেন যে নোয়াখালির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং উপদ্রুত এলাকাগুলিতে খালবিলের উপর পুলগুলি এবং রাস্তাঘাট দুর্বৃত্তরা নষ্ট করার ফলে ফৌজপল্টনের যাতায়াত বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। উপরন্তু বহুসংখ্যায় খুন, ধর্মান্তরকরণ আর লুণ্ঠন হয়েছে।

১৭ অক্টোবর ভারত সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নোয়াখালি থেকে এগিয়ে ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর ও লাকসাম থানায় ছড়িয়েছে। ১৮ অক্টোবর দিল্লীর প্রার্থনাসভায় গান্ধীজি নোয়াখালিতে নৃশংস ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন। বিশেষত নারীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, 'যদি ভারতের অর্ধেক মানব সমাজ (মানে নারীরা) পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়, তবে ভারত কি করে স্বাধীন ও মুক্ত বোধ করতে পারে?' ১০ অক্টোবর বাংলার গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনরল ফেণীতে সফর করেন এবং প্লেনে করে ত্রিপুরা ও নোয়াখালির উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিক্রমা করেন। ২১ অক্টোবর বিলেতে বৃটিশ সরকারের আণ্ডারসেক্রেটারি অভ স্টেট, আর্থার হেণ্ডারসন, একটি নিতান্ত প্রবঞ্চনাপূর্ণ ও জঘন্য বিবৃতি দেন। ঐ-দিন, অর্থাৎ ২১ অক্টোবর, কলকাতার 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা লেখে, 'এইসব কার্যের পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক লুঠপাট ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ।' ২৬ অক্টোবর ইস্টার্ন

কম্যাণ্ডের জি-ও-সি, লেফটেনাণ্ট জেনরল এফ-আর-আর বুশার, কলকাতার একটি সংবাদপত্র বৈঠকে বলেন 'উপদ্রুত এলাকায় সম্পূর্ণ শান্তি ফিরিয়ে আনতে কতদিন লাগবে বলা অসম্ভব।'

কয়েক সপ্তাহ পরে নোয়াখালির একটি ত্রাণকেন্দ্র থেকে শ্রীমতী মিউরিয়েল লেস্টার এই মন্তব্য করেন :

"সবথেকে শোচনীয় অবস্থা হয় নারীদের…সারা বাংলায় যত গুণ্ডাই থাকুক না কেন তাদের পক্ষে শুধুমাত্র নিজেদের চেষ্টায় এই ধরনের পাষণ্ড আন্দোলন শুরু করা ও চালানো সম্ভব হত না। বাংলার এই অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় অঞ্চলে গুণ্ডারা মনে করে তারাই যেন একচ্ছত্র রাজত্ব করছে। তাদের ধ্বংস-লীলা যারা দেখেছে তাদের মনে হবে গুণ্ডাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন নেই। যেন তাদের কখনও মনে হয় না যে এই ধরনের অত্যাচার ও আক্রমণের প্রতিফলস্বরূপ ভবিষ্যতে তাদের কোনরকম শাস্তি হতে পারে।"

বিহারে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় তা কলকাতার ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল-স্বরূপ আসেনি, এসেছিল নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ১০-২১ অক্টোবরের বীভৎস তাণ্ডবলীলার প্রতিশোধ হিসাবে। বিহারে দাঙ্গা শুরু হয় ১৯৪৬-এর ২৪ অক্টোবর এবং চলে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। বিহারের চীফ সেক্রেটারি ১২ নভেম্বর যে বিবৃতি দেন তাতে তাঁর প্রদেশের সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে নোয়াখালির ঘটনাবলীর প্রতিবাদ হিসাবে অভিহিত করেন। অন্যপক্ষে বিহার দাঙ্গা-হাঙ্গামার শুরু থেকেই প্রত্যেক নেতা—নেহরু, আবদুর রব নিস্তার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জে-বি কৃপালানি—আপ্রাণ চেষ্টা করে যতশীঘ্র সম্ভব সে দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস করেন। শুরুতেই গান্ধীজি বলেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি বিহার-দাঙ্গা বন্ধ না হয় তাহলে তিনি আমরণ অনশনব্রতে নামবেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে ৩১ অক্টোবরের আগে ভাইসরয় ওয়েভেল একবারও কলকাতা পরিদর্শন করলেন না, যদিও তার অনেক আগে, অর্থাৎ ২৭ অগাস্ট কলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে ওয়েভেল এবং গান্ধীজি ও নেহরুর মধ্যে একঘণ্টা ধরে বিশদভাবে আলোচনা হয়, এবং সেই দাঙ্গার অন্যত্র কি ফলাফল হতে পারে তাও নিশ্চয় আলোচনা হয়েছিল। অথচ ভেবে দেখুন, কি তৎপরতার সঙ্গে ১৯৪৩-এর অক্টোবরে গভর্নর জেনরল পদে আসীন হবার এক সপ্তাহের মধ্যে ওয়েভেল কলকাতায় উড়ে এসে দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে সকলের সঙ্গে ফলাও আলোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি বিশদভাবে নিজহাতে ছকে দেন। আরো মনে রাখতে হবে যে ১৯৪৬-এর ২০ অগাস্ট তারিখে লণ্ডনের 'টাইম্স্'

পত্রিকা কলকাতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের জন্যে বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের বিলম্ব ও শম্বুকগতিকে মুখ্যত দায়ী করে, বলে সে-সরকার সময়মত আগে থেকে যথাযথ প্রস্তুতি দেখাননি। স্বতঃই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ওয়েভেল, নিজে সম্পূর্ণ বিরত থেকে, এমেরি বা তার পূর্ববর্তী লিন্‌লিথগোর নিতান্ত উপেক্ষাসূচক বিরুদ্ধ ভাবই প্রকাশ করেন মাত্র।

আমি নোয়াখালিতে কখনও যাইনি, সুতরাং বলতে পারি না কী-ধরনের অমানুষিক মনোভাব ও বিদ্বেষের ফলে সেখানে ও ত্রিপুরায় ঐ-ধরনের ঘটনাবলী ঘটে। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গান্ধীজির পরিক্রমা সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ আমি পড়েছি, তার সবগুলিই আসলে যে-ধরনের নৃশংসতা ঘটেছিল তার অনেকখানি কমিয়ে বলে। যদিও সে কমিয়ে বলার মধ্যেও নৃশংসতার বীভৎসরূপ আন্দাজ করা শক্ত নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতামত ধারণা হয়, যে এ-সবই সম্ভব হয় মুসলমানদের মনে কোন ভয় ছিল না যে দুর্বৃত্তদের অপরাধের কোন শাস্তি হতে পারে। বরং দুর্বৃত্ততার সপক্ষে তারা কর্তৃপক্ষ থেকে সম্ভবত যথেষ্ট উস্কানি পায়। সেই সঙ্গে হিন্দুদের তরফে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি না থাকায় চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে তারা উৎসাহ পায়। আমার ধারণা নোয়াখালি বা ত্রিপুরায় হিন্দু-মুসলমানদের যদি আরো সংখ্যা-সমতা থাকত, যেমন নাকি কলকাতায় ছিল, তাহলে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটি এতদিন ধরে এত চরমে উঠত না।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় যে-ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল, বিহারে তা ছিল না, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে হঠাৎ বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ে, এবং দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তার ভয়ঙ্করতা কলকাতা বা নোয়াখালি-ত্রিপুরার থেকে কোন অংশে কম যায়নি। বিহারী হিন্দুরা এমন নৃশংসতার পরিচয় দেয় যে মহাত্মা গান্ধী, তড়িৎগতিতে দাঙ্গা না থামলে, আমরণ অনশনের সংকল্প প্রকাশ করেন। কলকাতা ও নোয়াখালি-ত্রিপুরায় প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার যে ঔদাসীন্য এবং গাফিলতির প্রমাণ দেন, তার তুলনায় বিহার-দাঙ্গা দমন ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বিশেষ তৎপরতা দেখান।

আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। একদিকে বিহার ও অন্যদিকে কলকাতা, এমন-কি নোয়াখালি-ত্রিপুরার দাঙ্গার তফাৎ এই, যে বিহারে জনসাধারণ দাঙ্গা থামাবার বিশেষ চেষ্টা করেনি, দাঙ্গা থেমেছে সরকারের তৎপরতায়; অন্যদিকে কলকাতায়, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় সরকারের গাফিলতি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে-

সব স্থানে দাঙ্গা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি থামে জনসাধারণের এবং উভয় সম্প্রদায়ের তৎপরতায়।

১৯৫০ সালে হাওড়ার হত্যাকাণ্ড দমনের ভার আমার উপরে পড়ে। সেখানেও হিন্দুদের নৃশংসতার চিহ্ন কিছু কম দেখিনি। পরবর্তীকালে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে দাঙ্গার পরে যেখানেই দিল্লী থেকে গেছি, সেখানেই দেখেছি স্থানীয় সরকারের কিছুটা ঔদাসীন্য বা কর্তব্যচ্যুতি প্রথমে হয়েছিল। কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ মানুষকে একেবারে অমানুষ পশুর অধম করে, তা স্থিরমনে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি ধর্মের কোনটিরই এ-বিষয়ে মানবিকতা নিয়ে বড়াই করার বিশেষ কিছু নেই। আমাদের চরিত্রে বেশ বড় রকম কাপুরুষতার ভাগ আছে। সংখ্যাধিক্যের সুযোগে অত্যাচার করতে পারলে জাতিশ্রেণীনির্বিশেষে নিরীহদের হত্যা করতে আমাদের বাধে না। এ পাপে শুধু ভারতবাসীই একমাত্র অভিশপ্ত জাতি অবশ্য নয়। আমেরিকার কু-ক্লুক্স-ক্লানের মত কাপুরুষ সংগঠন পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই।

১৬ অগাস্ট তারিখে উত্তর-অ্যামহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে দুই সম্প্রদায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরস্পরকে কিভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেন, আগেই সামান্য বলেছি। তার থেকে হয়তো পাঠকের মনে হতে পারে অন্যত্র এই ধরনের প্রকৃতিস্থতা ছিল না। তা মোটেই নয়। এই পাঁচদিনের নরককাণ্ড কোন অনমনীয় বিদ্বেষ বা স্মৃতি রেখে যায়নি। অবশ্য এটাও ঠিক যে বাঙালির স্বভাব নয় আমরণ প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ পুষে রাখা, আমাদের চরিত্রে সে দুর্মরতাও নেই। ক্ষুদ্রতা আর দুর্মর-বিদ্বেষ দুটি ভিন্ন জিনিস। সেটাই বোধহয় প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের অন্য জায়গার মত কলকাতাতেও এই শতকে অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু ধর্মনির্বিশেষে কলকাতাবাসী বাঙালি যত শীঘ্র দাঙ্গা থামাবার জন্যে নৈতিক ও মনোবল দিয়ে পরস্পরকে উদ্ধার ও রক্ষা করেছে, বিশ্বাস, ভালবাসা ও সম্মান দিয়েছে, তা অন্যত্র খুব কমই হয়েছে।

১৬ অগাস্ট হত্যাকাণ্ডের ভয়ঙ্করতার মধ্যেও এই মানবিক গুণগুলির প্রকাশের কোন ব্যত্যয় হয়নি। পশুসুলভ নৃশংসতার যেমন অভাব হয়নি, তেমনি পরস্পরকে ত্রাণ, আশ্রয়দান ও রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টান্তও কম ছিল না। নিজের বা আপন পরিবারের নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে অন্য সম্প্রদায়ের বন্ধু বা প্রতিবেশীর উদ্ধার ও প্রাণরক্ষার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি মনে আসে। সবথেকে সাহস ও প্রাণভয় বিসর্জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন মহিলারা। অন্য সম্প্রদায়ের পরিবারকে অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়ে

বাড়ির কর্ত্রী সদর দরজা আগলে রণরঙ্গিনীমূর্তিতে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে হামলাকারীদের দরজার চৌকাট থেকে হার মেনে চলে যেতে বাধ্য করেছেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এর উপর মনে পড়ে, একক সম্প্রদায়ের বড় পাড়ার মধ্যস্থলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পরিবারকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়ে প্রাণ বিপন্ন করে রক্ষার দৃষ্টান্ত। তাছাড়া ছিল, অন্য সম্প্রদায়ের নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েদের এবং মহিলাদের একত্র করে, তাদের রক্ষা করে, দাঙ্গা স্তিমিত হবামাত্র রক্ষাবাহিনীর সাহায্যে তাদের নিরাপদ স্থানে, অথবা সেই সম্প্রদায়ের নেতাদের হাতে সমর্পণ করার অজস্র উদাহরণ। যা আমাকে এসব থেকেও বেশী মোহিত করে তা হচ্ছে, প্রথম পাঁচ দিনে যখন কার্ফিউ জারি ছিল, যখন খাদ্যদ্রব্য, দুধ ইত্যাদি প্রায় কিছুই পাওয়া যেত না (২১ অগাস্ট গ্রোভ লেনে আমাদের বাড়িতে যা দেখেছি), তখন দুটি সম্প্রদায়ের মিশ্র পাড়ায়, অথবা আশ্রয়দাতার বাড়িতে যা সামান্য খাবার-দাবার ছিল, তা সুন্দরভাবে সমান ভাগ করে রান্না ও খাওয়ার রীতি। প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রি-প্রোফেসর কুদ্রৎ-ই-খুদার পরিবারের কথা এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁরা থাকতেন ভবানীপুরের টার্ফ রোডে প্রাক্তন মেয়র বিজয় বসুর বাড়ির কাছে একটি বাড়িতে। দাঙ্গার সময়ে কয়েকদিন ধরে অষ্টপ্রহর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাড়ার ছেলেরা একজোটে তাঁর বাড়ির চারিদিকে ব্যূহ রচনা করে পাহারা দেয়। শেষে অবস্থা শান্ত হলে, পার্ক সার্কাসের একটি খালি বাড়িতে তাঁর সারা সংসার গুছিয়ে তুলে দিয়ে আসে।

এ-সব সত্ত্বেও কলকাতা থেকে আমরা যখন ২১ অগাস্ট সন্ধ্যাবেলা চন্দননগরে ফিরলুম, তখন অব্যক্ত, অজানা একটি আশঙ্কা আমার মনে বাসা বাঁধল ; মনে হল, এই ভয়ঙ্কর ঘটনা আমাদের জাতীয় মন ও ভবিষ্যতের অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। এর আঘাত কাটিয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব হবে না। আজ ১৯৮৯-র নভেম্বরেও আমার বুকের ভিতরটা মাঝে মাঝেই দুরু দুরু করে ওঠে।

১৩ অগাস্ট নেহরু জিন্নাকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে চিঠি লেখেন এবং তাঁর সঙ্গে এই কল্পে ১৫ই তাঁর বাড়িতে গিয়ে আশি মিনিট ধরে কথা বলেন। মুসলিম লীগ তখন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু ২৪ অক্টোবর বিহারে দাঙ্গা শুরু হবার দুদিন পরে, ২৬ অক্টোবর, মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়, এবং দায়িত্বের পুনর্বণ্টন হয়। লিয়াকৎ আলি খান রাজস্বভার নেন, আবদুর রব নিস্তার যানবাহন, নেহরু নেন বিদেশ ও কমনওয়েলথ মন্ত্রিত্ব, প্যাটেল নেন গৃহ, সূচনা ও প্রসারণ বিভাগের। বিহারে দাঙ্গা

রোধের উদ্দেশ্যে নেহরু, নিস্তার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও কৃপালানী আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বিহারে দাঙ্গা বাধার ফলে মুসলিম লীগ যে পত্রপাঠ মন্ত্রিত্বে যোগ দেয়, তাতে আমার মনে স্বতঃই মনে হয় কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই ক্ষমতার রথে চড়ার জন্যে সমান ব্যস্ত, ফলে দেশবিভাগের আর বেশীদিন বাকি নেই। তারপরে যে ঘটনা-পরম্পরা ঘটল সেগুলি আমার মনে ভবিতব্য হিসাবে দেখা দিয়ে আগেকার কয়েক-বছরের মত অত গভীর রেখাপাত করেনি। ঐ সময়ের কথা এখন যখন ভাবি তখন আশ্চর্য লাগে, দেশবিভাগের ফলে, বঙ্গপ্রদেশ যদি পাকিস্তানে যায় তবে আমি হয় উদ্বাস্তু বা পরদেশী হয়ে যাব, এ দুর্ভাবনা আমার মনে আদৌ জাগেনি। উদ্বাস্তু অবস্থা কি মর্মান্তিক হতে পারে সে সম্বন্ধে কারো কোন ধারণাই তখন ছিল না, এই বোধহয় কারণ হবে।

দেশভাগ যে আসছে, ১৯৪২-এ ক্রিপ্‌স্‌ মিশনের কিছুকাল পর থেকে মনের গভীরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। বিশেষত ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে যখন সরকারের ঔদাসীন্য ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকট হয়, তখনই মনে হয় ভারতসামাজ্যও রক্ষার আশা তারা ত্যাগ করেছে। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন ঐ বছরই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে পার্লামেণ্টে বিল আনা হবে। এতদিন পর্যন্ত ধার্য ছিল ১৯৪৮। ৪ জুলাই ১৯৪৭-এ ভারত-স্বাধীনতা বিল পার্লামেণ্টে পেশ হয়।

ওয়েভেল : মাউণ্টব্যাটেন

ওয়েভেলের শেষদিককার কার্যকলাপে আমি ক্ষুব্ধ হই। ১৯৪৩-এর ৩ অক্টোবর তিনি যখন গভর্নর জেনরল হন তখন দুর্ভিক্ষরোধে তাঁর যে-রকম তৎপরতা দেখি তার তুলনায়—১৬ অগাস্টের হত্যাকাণ্ডে এবং তার পরে তাঁর শৈথিল্য, ঔদাসীন্য, অবহেলা, মানবিকতার অভাব আমার কাছে সাম্রাজ্যবাদী চাতুরি বলে মনে হয়।

পাঠকের মনে থাকতে পারে ১১ জুলাই ১৯৪৪-এ লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌' পত্রিকায় তাদের বম্বেস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি স্টুয়ার্ট জেল্ডারের পাঁচগণিতে গান্ধীজির সঙ্গে ৪ জুলাইয়ে তিনঘণ্টাব্যাপী একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ হয়। তার একস্থানে এই কথাগুলি জেল্ডার গান্ধীজির নিজের উক্তি বলে লেখেন :

"আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করি যে ভাইসরয়ের নিজের মতামত যাই হোক না কেন, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। মিঃ চার্চিল সমাধান

চান না। যদি সংবাদপত্রের রিপোর্ট সত্যি হয়, তাহলে তিনি বলেছেন আমাকে পিষে মারতে চান। এ রিপোর্টের অবশ্য তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। আমার ক্ষেত্রে মজার ব্যাপারটি এই—এবং তাঁর ক্ষেত্রে দুঃখের—যে পৃথিবীতে কেউই একজন সত্যাগ্রহীকে পিষে মারতে পারে না—বিশেষ করে যে সত্যাগ্রহী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের দেহকে বলির জন্যে উৎসর্গ করে নিজের আত্মাকে মুক্তি দিয়েছে।"

১৩ জুলাই ১৯৪৪-এ জেল্ডারের রিপোর্ট সম্বন্ধে গান্ধীজি পাঁচগণিতে এই কথা বলেন :

"আমি একটি আদর্শের উদ্দেশে জীবন পণ করেছি। আমি যদি ধ্বংস হই সেই আদর্শের জন্যেই বলি হব। আমার একান্ত বিশ্বাস, মিঃ জিন্না পথ আটকে নেই। কিন্তু বৃটিশ সরকারই ভারতের স্বাধীনতাদাবীর ন্যায্য ন্যায়সঙ্গত সমাধান চান না। সে দাবী বহুদিন আগেই মেনে নেয়া উচিত ছিল। ভারতের দাবী অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা মিঃ জিন্নাকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করছেন। স্টুয়ার্ট জেল্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এই কথাই বলেছি।"

জেল্ডার-সাক্ষাৎকারের আগে ১৭ জুন ১৯৪৪-এ গান্ধীজি ওয়েভেলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার চেয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন। ২২ জুন তাঁর চিঠিতে ওয়েভেল সে ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৫ জুলাই 'নিউজ ক্রনিক্‌লে' জেল্ডার-সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে গান্ধীজি আবার সাক্ষাৎকার চেয়ে ওয়েভেলকে চিঠি লেখেন। প্রত্যুত্তরে ২২ জুলাই ওয়েভেল গান্ধীজিকে প্রথমে 'একটি স্পষ্ট, গঠনমূলক, ইতিবাচক পথনির্দেশ' প্রস্তাব করতে বলেন। ২৭ জুলাই পুনরায় সাক্ষাৎকার চেয়ে ওয়েভেলকে গান্ধীজি চিঠি লেখেন। ১৪ অগাস্ট ১৯৪৪-এ ওয়েভেল উত্তর দেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ সরকার ও গভর্নর জেনরল দেশশাসনের সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের হাতে রাখবেন।'

যদিও গান্ধীজির প্রতি ওয়েভেলের এহেন আচরণে তাঁর প্রতি আমার অনুরাগে চিড় খায়, এবং যদিও ১৯৪৬ সালে তাঁর কার্যকলাপে আমার বিশ্বাস হয় যে তিনি তখন চার্চিল, এমেরির আজ্ঞাবহে পর্যবসিত হয়েছেন, তবুও তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে গোপন শ্রদ্ধা এখনও আছে। তিনি যদি ১৯৪৩-এর নভেম্বরে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় না আসতেন তাহলে আমার মহকুমায় আরো অনেক প্রাণনাশ হত। চেহারা ছিল বলিষ্ঠ বটগাছের গুঁড়ির মত। সারা মুখময় গভীর কুঞ্চিত রেখা, তার উপর বাঁ চোখটি কাণা হবার দরুণ তাঁকে আরো বটগাছের গুঁড়ির মত

দেখাত। তাঁর কাব্য-সংকলন ও অনুবাদ *Other Men's Flowers* তাঁর কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেয়। অনেক বছর পরে দিল্লীর বিখ্যাত দাঁতের ডাক্তার ডাঃ এম-এল সোনির কাছে ওয়েভেলের বিষয়ে অনেক গল্প শুনি। ডাঃ সোনির ততোধিক বিখ্যাত শিশু-চিকিৎসক বোন, শান্তি ঘোষ, আমার সহপাঠী, গান্ধীজির ব্যক্তিগত দূত, সুধীর ঘোষকে বিবাহ করেন। ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশনের সময়ে সুধীর গান্ধীজির পক্ষে দৌত্যকার্য করেন। ডাঃ সোনির কাছে শুনি ওয়েভেল ব্যক্তিগত জীবনে কত নিরভিমানী, সাদাসিধে ও বিনয়ী ছিলেন। তার তুলনায় আজ যে-কোন প্রদেশের ক্ষুদ্রতম মন্ত্রীকেও আকাশস্ফীত ভেক বলে মনে হয়। ডাঃ সোনির কাছে শুনি তাঁর যুদ্ধে-আহত পঙ্গু ছেলে কীরকম সাইকেল করে দিল্লীর নিদারুণ গ্রীষ্মে, ভাইসরিগাল লজ থেকে পুরনো দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত রোজ যাতায়াত করত। পেট্রোল রেশনিং ছিল বলে লেডী ওয়েভেল পরিবারের নিজস্ব একটিমাত্র ছোট গাড়িতে ব্যক্তিগত কাজে ঘোরাফেরা করতেন। ১৯৮২ সালে আমার দাঁত চিকিৎসা করতে করতে যখন ডাঃ সোনি এই গল্পগুলি করতেন তখন দিল্লীর আরেকটি বাড়িতে ভারতের আরেকজন ভাগ্যবিধাতা তাঁর মায়ের বাড়িতে রাজসম্মানভূষিত হয়ে শিক্ষানবিশী করছেন। ১৯৮৩ সালে কলকাতায় এসে যা দেখলুম তাতে আরো তাজ্জব বনে গেলুম, ক্ষুদে কর্মচারীদের স্ত্রীরা তো বটেই, তাদের ছোট ছেলেমেয়েরাও অবাধে সরকারী গাড়িতে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, ঘরে ফিরছে।

ওয়েভেলের পর মাউন্টব্যাটেন যখন এলেন তখন সংবাদপত্রে তাঁর ছবি দেখে আমার মনে প্রথম থেকেই বিরূপতা এল। আমার মনে হল বৃটিশ সরকার তাঁকে পাঠিয়েছেন ১৯৪২-এ ক্রিপ্‌স্ যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, তার যেটি মন্দের ভাল অঙ্গ সেটি কারে-প্রকারে ভারতকে মানিয়ে নিতে। একটি অঙ্গ ছিল জিন্নার পাকিস্তান। দ্বিতীয় যে প্রস্তাব ছিল তা ছিল ভারতকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করার, যায় নাকি ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ ক্রিপ্‌স্ চেম্বার অভ প্রিন্সেস, হায়দ্রাবাদ ডেলি-গেশন এবং কয়েকজন গণমান্য ব্যক্তির কাছে উপস্থাপিত করেন। মাউন্টব্যাটেনের ছবি দেখে আমার বিরূপতা ও সন্দেহের আরো একটি কারণ ছিল, সেটি রুচিগত। বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে একবার অ্যালিস্টেয়ার কুক সোজাসুজি জিগ্যেস করেন, অ্যান্টনি ইডেনকে তাঁর কীরকম লাগে। কুক লিখেছেন : 'তিনি (রাসেল) আমার দিকে কটমট করে তাকালেন, স্মৃতি থেকে যেন ইডেনের ছবিটি বার করলেন, সেটি ভাল করে দেখলেন। তারপর একটু চিড়বিড়িয়ে উঠে ঘাড় নেড়ে বললেন, "বড্ড বেশী

সাজগোজ করে, ভদ্রলোক নয়"।' সত্যি বলতে ম্যাউণ্টব্যাটেনের সাজগোজ দেখে মনে হত যেন ম্যাডাম টুসোর শো-কেস থেকে সদ্যগড়া তাঁর মোমের মড্‌ল্ তুলে এনেছে। কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর বর্ণনা করতে গিয়ে (ছেলেবেলায় রাসেলদের বাড়িতে রবার্ট ব্রাউনিং আসতেন) কুককে রাসেল বলেন: 'যেন লাফাচ্ছে, একটি চালিয়াত চন্দর। মূর্ত একটি হেলেন হোকিনসন কার্টুন।' এতসব স্বপ্নের রাজপুত্তুরের সাজপোশাক সত্ত্বেও, অতি সযত্নে কথার ফাঁকে ফাঁকে আলগোছে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও, মাউণ্টব্যাটেনের ছবি, এবং পরে সশরীরে, দেখে আমার গভর্নর জন হার্বার্টের কথা মনে পড়ল। হার্বার্টের ক্ষণিক সংস্পর্শে আসি ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগরে। হার্বার্টের চেহারা দেখে আমার অডেনের লাইনের কথা মনে হয়, 'And proud bridge and indignant nostril. Nothing to do but look noble'. মাউণ্টব্যাটেনের ভাগ্যে অনেক কিছু ছিল যা মোটেই নোব্‌ল নয়। ব্রিজের প্রসঙ্গে মনে পড়ল তিনি ভারতে এসেছিলেন সম্রাটের তিন-তিনটি অজেয় ব্যাট্‌লশিপ জাপানীদের হাতে খুইয়ে। পরে আমি ক্লেমেণ্ট অ্যাটলির একটি মন্তব্য পড়ি, সেটি আমার মোটে পছন্দ হয়নি। বলেছিলেন, 'তাছাড়া, ওঁর (ম্যাউণ্টব্যাটেনের) আরেকটি মহৎ সম্পদ ছিল, তাঁর অসাধারণ স্ত্রী।' যাঁদের সঙ্গে কূটকৌশল করতে হয়, তেমন লোকেদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা কি এবং কি করে সে-দুর্বলতার সুবিধা নিতে হয়, সে খবরও তাহলে জগদ্বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী-দের না রাখলে চলে না, তার কথাও তাঁদের ভাবতে হয়। মাউণ্টব্যাটেনকে আমি চাক্ষুষ দেখি অনেক পরে, ১৯৭৪ সালে। তিনি তখন বৃটেনের প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ প্রিন্স চার্ল্‌সের সঙ্গে রাষ্ট্রপতিভবনে রাষ্ট্রপতির অতিথি হিসাবে এসেছিলেন। আমি তখন রাষ্ট্রপতির সচিব ছিলুম। আমি যতটুকু ভেবেছিলুম মাউণ্টব্যাটেন যেন তার থেকেও বেশী লাফাচ্ছিলেন, বোধহয় চার্ল্‌সের পাশে বয়স গোপন করার আগ্রহে। প্রিন্স চার্লসের স্বভাবগত বিনয় ও নম্রতার পাশে মাউণ্টব্যাটেনের জাহির করা চালচলন বেমানান লাগছিল; সাজপোশাক তো বটেই। প্রিন্স চার্ল্‌স্ সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা কথাবার্তা বলছিলেন, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের হাবেভাবে মনে হল তিনি যেন দেখাচ্ছেন তিনি কত "উচ্চস্তরের ভদ্রলোক"। বাইরে থেকে মনে হয় কি ভদ্র ও নম্র, কিন্তু যারা সে ভদ্রতার মুখোসের সঙ্গে পরিচিত তারাই জানে এই ধরনের মুখোসপরা বিনয়ের ভিতরে কি ঔদ্ধত্য লুকিয়ে

আছে। গান্ধীজি এই ঔদ্ধত্য চিনতেন। কিন্তু আমার সময়ে সময়ে মনে হয় নেহরুও এই ঔদ্ধত্য, যা আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের নামান্তর, চিনতেন কিনা, বা চেনার চেষ্টা করতেন কিনা।

গান্ধীজির প্রার্থনা সভা

২৯ অক্টোবর ১৯৪৬-এ নোয়াখালির পথে গান্ধীজি কলকাতায় আসেন। ৭ নভেম্বর কলকাতা থেকে রওনা হয়ে চাঁদপুর পৌঁছন। ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সোদপুরে প্রত্যহ বিকেলবেলা তিনি প্রার্থনা সভা করতেন। এরই মধ্যে একদিন আমরা গঙ্গা পার হয়ে চন্দননগর থেকে সোদপুরে তাঁর প্রার্থনা সভায় গেছলুম। এই প্রার্থনা সভায় তিনি বলেন তিনি নোয়াখালি-ত্রিপুরায় ছয়দিন কাটাবেন। শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেন চারমাস। আমি তখন ভাবতুম এই যে উনি চারমাস থাকলেন তার পিছনে প্রতিটি দুঃখীর চোখের জল মুছিয়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর বেশী প্রবল ছিল, না তার থেকে অন্তর্বর্তী সরকারে লিপ্ত কংগ্রেস শরিকদের কাজে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকার সংকল্প ছিল বেশী। ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে গান্ধীজি আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন। এর কয়েকমাস পরে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অফিসে আমি তাঁর সহকারী শ্রীসরোজ চক্রবর্তীর কাছে শুনি, হত্যার দশদিন আগে, ২০ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ ইওরোপ থেকে ফেরার পথে বিধানবাবু গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য বম্বেতে নামেন এবং তাঁর কাছে যান। সরোজবাবু যা বললেন তাতে আমার চোখে জল আসে। ডাঃ রায়কে গান্ধীজি নিজের ঘরে ডেকে, পাশে বসিয়ে, তাঁর কাঁধে হাত রেখে, ছোট শিশুর মত কেঁদে ফেলেন। বলেন, "বিধান, গত পঞ্চাশ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্যে যে সংগ্রাম করেছি, সে কী খণ্ডিত ভারত লাভের আশায়? আমি লড়েছি অখণ্ড ভারতের আশায়।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সংযুক্ত ভারতের স্টার্লিং তহবিল জমে ওঠে, পাকিস্তানকে তার ন্যায্য অংশ দিতে হবে এ-বিষয়ে গান্ধীজি জোর করেন। এই জোর করা অনেকের পছন্দ হয়নি। ১২ জানুয়ারি তিনি অনশন শুরু করেন এই ঘোষণা করে যে ভারতস্থিত মুসলমানদের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষা করতেই হবে। এতেই বোঝা যায় ভারতীয় উপমহাদেশকে অখণ্ড ভাবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় গান। সে গান আমি যখন সোদপুরে, নোয়াখালি রওনা হবার

আগে তাঁর প্রার্থনা সভায় শুনি, তখন মন আমার ভারাক্রান্ত হয়, গানের মধ্যে যেন আরো গভীর কোন তাৎপর্য ছিল। তিনি ফিরে আসার পর সোদপুরে পুনরায় ৪ মার্চ ১৯৪৭-এ তাঁর প্রার্থনা সভায় আমরা যাই। ঐ গান আবার শুনি। তখন তাঁকে আরো নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছিল। প্রার্থনা সভায় গান যখন হচ্ছিল হঠাৎ আমার মনে হল আমি যেন অপার্থিব এক মহত্বের সমুখে বসে আছি, যা আমার বোধশক্তির অতীত। হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেইদিনের কথা মনে হলেই আমার সেই অনুভূতি হয়, যদিও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁর বাণীর কিছু কিছু সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল, এবং আমি এখনও বিভ্রান্ত। যেমন বর্ণাশ্রমের প্রতি তাঁর অনুরাগ। তা সত্ত্বেও আমার স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা নেই যে তিনি এমন একজন মানুষ, তাঁর মন ও চেতনা এত বিচিত্রভাবে ভারতের সর্বসত্তাব্যাপী এবং অখণ্ড ছিল, যা নাকি নেহরুরও ছিল না। তিনি যেন অজর, অমর, অথচ নিতান্ত মাটির মানুষের রক্তমাংসে গড়া একাকী বিরাজমান একটি বিরাট গ্রানিট।

১৯৪৭ : চন্দননগর

সকলে মিলে বেড়াতে যাবার ব্যাপারে যাবতীয় প্রস্তাব করতেন নির্মল সেনগুপ্ত আর আয়োজন এবং ব্যবস্থা করতেন রণজিৎ গুপ্ত আই-পি। গান্ধীজি যখন সোদপুরে এলেন তখন খাজা কাইজার ছিলেন ব্যারাকপুরের এস-ডি-পি-ও। উত্তর-জীবনে কাইজার চীনে পাকিস্তানের-রাজদূত হিসাবে নাম করেন, তারপর বাংলা-দেশে প্রেসিডেণ্ট মুজিবুর রহমানের নিজস্ব দূত ও উপদেষ্টা হন। তাঁরই বন্দোবস্তের কল্যাণে আমরা প্রতিবার গান্ধীজির প্রার্থনা সভায় বসার জায়গা পেতুম।

ফেব্রুয়ারি-মার্চে সাধারণত শিবরাত্রির তিথি পড়ে। ১৯৪৭ সালের শিবরাত্রি তিথিটি আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। কালীঘাটের কালীমন্দির আর গৌহাটির উপকণ্ঠে কামাক্ষী মন্দিরের পরে পূর্বভারতে তারকেশ্বর শিবমন্দির সব-থেকে প্রসিদ্ধ বলা যায়, যদিও তারকেশ্বর মোটেই প্রাচীন তীর্থস্থান বলে খ্যাত নয়। তারকেশ্বরের শিব আরো জাগ্রত বলে প্রবাদ। এমন-কি বিহারের দেওঘরের শিব থেকেও তিনি ভক্তের ডাকে ও আরাধনায় যেন বেশী সাড়া দেন। শিবরাত্রি ও চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উৎসবের সময়ে দূর দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তের সমাগম সবথেকে বেশী হয়।

নির্মলের কথায় ও রণজিতের আদেশে স্থানীয় অফিসাররা সব বন্দোবস্ত করলেন। তারকেশ্বর শ্রীরামপুর মহকুমায় অবস্থিত। বোকাচ্চিও-র 'ডেকামেরন' গ্রন্থে যে-ধরনের রোমাঞ্চকর ও লাম্পট্যময় প্রেমকাহিনী আমরা পড়ি, তারকেশ্বরের একের পর এক মোহন্তর জীবনে তার থেকে অনেক বেশী উত্তেজক বিবরণ আমরা পাই। ১৮৭০-এ এলোকেশী মামলার বিবরণ পড়ে যদিও তারকেশ্বর সম্বন্ধে আমার বেশ বিতৃষ্ণা হয়েছিল, তবু তারকেশ্বরে তথাকথিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল। জজসাহেবের স্ত্রী ইলাদি বা নির্মলের স্ত্রী দীপালির তবু যা কিছু বিশ্বাসভক্তি ছিল, আমাদের বা বিজয়দের কোন কিছু ছিল না।

রাত্রি ১১টার সময়ে সদলবলে যখন মন্দিরের উপকণ্ঠে পৌঁছলুম, তখন দেখি সারা চত্বরটি বিজলির আলোয় উদ্ভাসিত। সারা মন্দির ও চতুর্দিকের প্রাঙ্গণ ঘিরে লোকে লোকারণ্য। মন্দিরের চারদিকে প্রায় সিকি মাইল জুড়ে জমি কাদায় কাদা। দূর থেকে ঘড়া করে গঙ্গাজল আনতে গিয়ে জল চলকে পড়ে এই কাণ্ড হয়। রণজিতের পুলিশদের ও মোহন্তের দরোয়ানদের 'এস-ডি-ও সাহেবের পার্টি'র প্রতি ভক্তি উথলে না পড়লে আমাদের পক্ষে মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকা দূরের কথা, ত্রিসীমানায় পৌঁছনও অসম্ভব হত। শেষ পর্যন্ত যখন গর্ভগৃহে ঢুকলুম তখন ঘড়া ঘড়া জল ঢালার হুম হুম শব্দে আর ভক্তদের মুহুর্মুহু 'ব্যোম মহাদেব' হুঙ্কারে মন্দির যেন ভেঙে পড়বে মনে হল। প্রদীপের ক্ষীণ স্পন্দমান আলোয় ভাল দেখা যায় না। শিবলিঙ্গের যেটুকু দেখলুম তাতে মনে হল সামান্য ওঠা একটি এবড়ো খেবড়ো প্রকাণ্ড পাথরের চটান বা শিলা। তার চতুর্দিক ঘিরে অতিকায়-দেহ পুরুষরা—প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ কুস্তিগীরের মত দেখতে—চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেকেই একে একে দু'তিন সেকেণ্ড অন্তর নিচু হয়ে ঝুঁকে লিঙ্গের উপর একটি প্রকাণ্ড চাঁটি মারছে, আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'পায়ে নেচে এগোচ্ছে। ভক্তিহীন দর্শকের কাছে মনে হল যেন এইভাবে নেচে নেচে তারা ইচ্ছা করে নিজেদের শরীরে নেশার ঘোর আনার চেষ্টা করছে।

রাত দেড়টা-দুটোয় শ্রীরামপুরে ফেরার পথে সবাইকে একটি গল্প বলে হাসালুম। আমার বরাবর ধারণা ছেলেদের থেকে মেয়েরা রসালো গল্প বেশী উপভোগ করেন, হলও তাই। শুধু জলে ঠেলে একটু সইয়ে নিতে হয়. উপরন্তু রসালো গল্প-বলিয়ে হিসাবে কথকের দুর্নাম থাকার অপেক্ষা। গল্পটি এই। তারকেশ্বরের একটি যুবক ট্রেনে ট্রেনে মণিহারি জিনিস ফিরি করে। নতুন বৌকে একদিন বলল, আজ

ফিরি করতে বর্ধমান পর্যন্ত যাবে, রাত্রে ফিরতে পারবে না। ছেলেটি চলে গেলে মেয়েটি তার প্রেমিককে খবর পাঠাল। প্রেমিকও যথাসময়ে এল। মাঝরাত্রে স্বামী হঠাৎ এসে হাজির, বল্‌ল ট্রেনের গণ্ডগোলে আজ আর দূরে যাওয়া হয়নি, তাই বাড়ি ফিরে এসেছে। স্ত্রীর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বলল, 'তুমি যাবার পরই পিশিমা এসে হাজির, অনেকদিন ধরে রোগে ভুগছেন, কাল তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাবেন। কোথায় আর শোয়াবো, তাই আমাদের বিছানায় শুইয়েছি, তুমি বারান্দায় একটু বোসো, আমি অন্যঘরে মাদুর পেতে পিশিমাকে শুইয়ে দিচ্ছি।' স্বামী হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, 'তা কি হয়, পিশিমা যেমন শুয়েছেন তেমনি শুয়ে থাকুন, আমিই বরং রাতটা এখানে কাটিয়ে দিচ্ছি, কাল ওঁকে আমি তারকেশ্বরে পৌঁছে দেব।' সকালবেলা পিশিমা তৈরি হয়ে বুক অবধি ঘোমটা টেনে তারকেশ্বর যাবার জন্যে বেরিয়ে এলেন। ছেলেটি সঙ্গে গেল। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, তারকেশ্বরের রাস্তাটি ডুবে গেছে, বড় বড় গর্তে বৃষ্টির জল আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে আছে। তারকেশ্বরে পিশিমাকে পৌঁছে দিয়ে এসে একটু ভ্যাবাচাকা মুখে ছেলেটি বৌকে বলল, 'হ্যাঁ গা, তুমি বললে তোমার পিশিমা, অথচ রাস্তার জলে যে ছায়া পড়ল, তাতে...'। (পাঠকের জানা থাকতে পারে স্কটল্যাণ্ডে যখনই কোন হাইল্যাণ্ডারি বড়দিন বা নতুন বছরের উৎসব হত এবং ছেলেরা হাইল্যাণ্ডারি কিল্ট পরে যেত, তখন উৎসবগৃহের দরজার চৌকাঠে একটি বড় আয়নার মত পালিশকরা প্লেট পাতা থাকত; পাশে একটি পরিচারক দাঁড়িয়ে থাকত দেখার জন্যে। অত ভীষণ শীতেও কিল্টের তলায় পরণে অন্য কোন বস্ত্র যাতে না থাকে)। বৌটি স্বামীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠ্‌ল, 'তোমাকে বুঝি আগে বলিনি, ঐটেই তো পিশিমার রোগ! জন্ম থেকে ভুগছেন, আর পারছেন না, মরিয়া হয়ে শেষে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গেলেন!' তারকেশ্বরের মহিমাকীর্তন শুনে সকলের ভক্তি বেড়ে গেল।

রোগভোগ ও স্বাধীনতা

১৯৪৭ সালের মে মাসের শেষে আমার আবার গলার অসুখ করল। ১৯ মে কলকাতায় আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল, মাসের শেষ পর্যন্ত চলল। তার আগেই কাগজে বেরিয়েছে দেশভাগ বিষয়ে বৃটিশ সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ২ জুন ঘোষণা করবেন। আমার মনে হল দাঙ্গাটি বোধহয়

তার আবহসঙ্গীত, সে-সময়ে কার্যোপলক্ষে প্রায়ই কলকাতায় ছুটোছুটি করতে হত। ধোঁয়া, ধুলা, গরমে টনসিল খারাপ, সাইনাস, আর তার সঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর জেঁকে বসল। প্রায় মাসখানেক ঐ-ভাবে চলার পর জুন মাসের প্রথমভাগে একদিন সকালে ঘুম ভেঙে মনে হল আবার বোধহয় হার্টের আরেকটি ভাল্‌ভ ব্লক আসন্ন। সমূহ বিপদের কথা ভাবছি আর শুনছি নিচে বাড়ির পুবদিকের গলিতে জয়ন্তী আর আমার ছোট শালী তাজু, শিশুগলায় কথা বলে যাচ্ছে, কানে তাদের গলা অমৃতের মত শোনাচ্ছে। আভাকে ডেকে বললুম, গণ্ডগোল আসন্ন, এন-এম খানকে খবর পাঠিয়ে অফিসের গাড়ি করে চুঁচুড়ার সহকারী সিভিল-সার্জন ডাঃ গোলাম কিব্রিয়াকে ধরে নিয়ে আসতে হবে, আমাকে চুঁচুড়ার হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। ডাঃ কিব্রিয়া খুব যত্ন নিয়ে এন-এম খাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন, সেই থেকে ওঁর প্রতি আমার বিশ্বাস হয়। তখন মাউণ্টব্যাটেন-ঘোষণা হয়ে গেছে। কিব্রিয়ার বদলে দেখি সিভিল-সার্জন এসে হাজির। তিনি বাঙালি হিন্দু। আমাকে একটি ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে গুঁইগাঁই করে বললেন, হাসপাতাল বড় নোংরা, আমাকে রাখার উপযুক্ত জায়গা নেই। আমি বললুম, আমাকে মাটিতে শুইয়ে রাখবেন তবু ভাল, আমি তাঁর আর ডাঃ কিব্রিয়ার চিকিৎসায় তাঁদের চোখের সামনে থাকতে চাই। ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখবেন বলে চলে গেলেন। গাড়ি শীঘ্রই ফিরে এল, সঙ্গে এন-এম খাঁ আর ডাঃ কিব্রিয়া। তিনি আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালের একটি ঘরে তুললেন। সেটি ছোঁয়াচে-রোগের আলাদা একঘরের ছোট্ট বাড়ি। আসার আগে ডাঃ কিব্রিয়া সে-বাড়ির আগাগোড়া ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। তখন সবে পেনিসিলিন বেরিয়েছে, তার ইঞ্জেক্‌শন দিলেন। তার সঙ্গে আরো ওষুধ দিলেন। ওষুধের ঝোঁকে আমার শরীরে কাঁপুনি আসাতে, সারা শরীর কম্বলমুড়ি দিয়ে ইলেক্‌ট্রিকে চালানো গরম রাখার তাঁবুর মধ্যে আমাকে রাখলেন। আগেই ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন। বেলা চারটের সময়ে যখন ঘুম ভাঙল, তন্দ্রার ঘোরে প্রথমেই চিন্তা হল, বেঁচে আছি কিনা। চোখ খুলে দেখি, পাশে আভা, আভার পাশে ইলাদি আর জজসাহেব। হাসপাতালে থাকার সময়ে আভা, জয়ন্তী আর তাজুকে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেয়। আভার মা তাঁর সংসারের অতি কর্মিষ্ঠ লোককে পাঠিয়ে দেন। তার নাম ফেলা। সে আর রাখাল সংসারের সমস্ত ভার নেয়। আমার খুব ভাগ্য ভাল যে অসুখটি ১৫ অগাস্টের দু'-মাস আগে হয়েছিল। দেরিতে হলে ডাঃ কিব্রিয়ার চিকিৎসা আর তার সঙ্গে আমার সহকর্মী এন-এম খানের যত্ন-অনুরাগ মিলত না, খুব অসুবিধা হত। এঁরা

দুজনে ঢাকায় গেলেন ১০ অগাস্ট নাগাদ : আমি তখন ভাল হয়ে গেছি, তবু আমার বুকে একটা মস্ত ফাঁক রেখে গেলেন। ১৯৭৪ সালে যখন ঢাকায় যাই ডাঃ কিব্রিয়াকে দেখে খুব আনন্দ হল। সবে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর ছেলের তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত আর মৈমনসিং লোকসঙ্গীতে গায়ক হিসাবে নাম হয়েছে। এন-এম খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলুম না, শুনলুম তিনি নোয়াখালিতে বাস করছেন।

১৫ অগাস্টের আগে, বিজয় রেজিস্ট্রার অভ কোঅপারেটিভ্ সোসাইটিজ পদে বদলি হল, তবে তার আগে তাকে দু'দিনের জন্যে পশ্চিম দিনাজপুরে ১৫ অগাস্টের পতাকা তুলে নতুন জেলার ভার নিতে যেতে হল। মিঃ মিত্র হলেন কলকাতার ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কালেক্টর। নির্মল তার আগে অন্য একটি সাবডিভিশনে বদলি হয়েছে। দলের মধ্যে আমিই এক পুরনো লোক হুগলী জেলায় রইলুম। চুঁচুড়ায় আমার অফিসে ১৫ অগাস্ট ভারতের নতুন পতাকা তুললুম। এ-বিষয়ে পরে আরো বলছি। সৌভাগ্যক্রমে জনসাধারণ যা ভয় করেছিল, অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা-রক্তারক্তি তার কিছুই হল না। উল্টে সর্বত্র সারাদিন ধরে হৈ হল্লা, ফুর্তি হল। অপরাহ্ণে কলকাতা গেলুম। কলকাতা সর্বত্র আনন্দে ও উল্লাসে ডগমগ। যতদুর মনে আছে পশ্চিমবঙ্গে তথা পূর্ব-পাকিস্তানে কোন অঘটন ঘটেনি। এমন-কি 'বাগে' সিদ্ধান্তের ফলে যখন খুলনা পূর্ব-পাকিস্তানে গেল, এবং মালদা জেলার দুই-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে এল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের ছোট ছোট অংশ পরস্পর হাতবদল হল, তখনও কিছু হল না। সবই নির্বিঘ্নে কেটে গেল। কিন্তু উত্তর ভারতে দিল্লী থেকে পশ্চিমে সারা দেশে ও বর্তমান পাকিস্তানে তখন আগুন লাগতে শুরু করেছে।

টনসিল

ত্রিশ বছরের জীবনে হৃৎপিণ্ডে তৃতীয়বার ভাল্ভ্ ব্লকের পর—তার মধ্যে শেষ দু'বার ষোল মাসের মধ্যে হওয়ায়—জামাইবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নাক, কান, গলার বিশেষজ্ঞ ডাঃ খগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সত্যবান রায়ের সঙ্গে কথা বললেন। দুজনেই দেখে-শুনে বললেন আমার সেপ্‌টিক টনসিল দুটি কেটে বাদ দিতে হবে, তা না হলে রিউম্যাটিক হার্ট হতে পারে। অতএব ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের গোড়ায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে ডাঃ সত্যবান রায় আমার

টনসিল দুটি কেটে বাদ দিলেন। মিসেস সাইলাস বলে এক ইহুদী ভদ্রমহিলা আমার নার্স ছিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন বিদায় নিলেন, বললেন তাঁর স্বামীর মনিব, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইওরোপ থেকে ফিরছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা চায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হোন। পাঠকের মনে আছে নিশ্চয়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী (তখনও 'মুখ্য' নামকরণ হয়নি) তখন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। অস্ত্রোপচারের তিন সপ্তাহ পরে ডাঃ সত্যবান রায় আমাকে পুনরায় ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, আমি সম্পূর্ণ সেরে গেছি। পুজোর ছুটিতে আসানসোলে গিয়ে, সেখান থেকে পরেশনাথ পাহাড়ে পায়ে হেঁটে উঠে নিশ্চিন্ত হলুম, আমার শরীরে কোন দোষ বা ক্লান্তি অনুভব করিনি। নভেম্বরে আমরা দিন-দশেকের জন্য দিল্লী গিয়ে সমর সেনের বাড়ি থেকে আসি।

১৯৮৭ সালে কলকাতায় আমার শরীরের উপর চতুর্থবার অপারেশনের সময়ে অ্যানেস্থেটিস্ট ডাঃ সরঙ্গী বললেন, 'সত্তর বছর বয়স হয়েছে, অপারেশনের জন্যে অজ্ঞান করার আগে আপনার একটি ই-সি-জি করিয়ে নিতে চাই। হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ, ডাঃ সুহৃদকুমার বোস, ই-সি-জির নল-টল গায়ে লাগিয়ে সুইচ টিপে, হৃৎপিণ্ডের উপর স্টেথোস্কোপ বসিয়েই উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন আগে আমার ভাল্‌ভ্‌ ব্লক হয়েছিল। আমি প্রশ্নটিতে বিস্ময় প্রকাশ করায়, তিনি চেপে ধরলেন। তখন আমি তাঁকে জীবনে তিনবার ব্লকের কথা বললুম। উনি বললেন, 'আই-সি-এস মেডিক্যাল বোর্ডে পাস করালো? কিছু বলেনি?' আমি বললুম, 'বলবে কেন, তারপরে কত মেডিক্যাল বোর্ডে গেছি, কেউ কিছু বলেনি।' উনি বললেন, 'বোর্ডে আমি থাকলে পাস করাতুম না।' আগের সব বোর্ড ঠকে গেছে শুনে মজা লাগল। উপরন্তু সারাজীবন এত শারীরিক ও মানসিক খাটা-খাটুনি, নিত্য অসুখ-বিসুখ ও আধকপালে, দুশ্চিন্তা ও ব্যক্তিগত শোক গেছে। হেসে বললুম, 'ভাগ্যে ছিলেন না, আর ভাগ্যে আমি আমার বুকে একটি দাগা আছে কোনদিন জানিনি এবং জানার চেষ্টাও করিনি। অজ্ঞতা আমার জীবনে অনেক শক্তি ও আনন্দ এনেছে, তা না হলে রোগের দুশ্চিন্তায় আমি চিরকাল ঠুটো হয়ে বসে থাকতুম। তবে এখন আমার ভাল লাগছে, আমার শরীরে তাহলে একটা কিছু পাওয়া গেছে।' বলে, আমি ডাঃ বোসকে সেই রোগবাতিক-গ্রস্ত লোকটির কথা বললুম যে সারাজীবন উদ্বিগ্ন হয়ে এ-ডাক্তার ও-ডাক্তার দেখিয়ে একদিন লাফাতে লাফাতে বন্ধুদের কাছে এসে একগাল হেসে বলল, 'এতদিনে পরীক্ষায় একটা কিছু তবু পজিটিভ্‌ পাওয়া গেল—ভাসারম্যান টেস্টে

আমার পজিটিভ্ হয়েছে। ভদ্রলোক অবশ্য জানতেন না, তার কি মানে হয়, পজিটিভ্ হয়েছে, তাতেই আনন্দ। দুজনেই আমরা একচোট হাসলুম। তা সত্ত্বেও, ডাঃ বোস বললেন, তাঁর রিপোর্টের একটি জেরক্স কপি সর্বদা পকেট বইতে রাখবেন। পকেট বইয়ে আজ চারবছর থেকে কাগজটি হলদে হয়ে গেল। আবার একটি নতুন কপি করাতে হবে মনে হচ্ছে। তবে এবার ১৯৯১ সালের জুন মাসে নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিয়োরেন্স কোম্পানি আমার আমেরিকা ভ্রমণের পলিসিতে লিখে দিয়েছে আমেরিকায় যদি হৃদ্‌রোগ হয় তবে তার চিকিৎসার জন্য পয়সা দেবে না। এই কথাটি আমি ওয়াশিংটন ডি-সিতে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১-এ লিখেছি।

দিন বদলের পালা

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথমে মনে হল স্বাধীনোত্তর বদলির চড়কে আমিই যেন একমাত্র বাদ পড়লুম। চীফ সেক্রেটারি সুকুমার সেনের সঙ্গে একদিন বুক ঠুকে দেখা করে জেলায় যেতে চাইলুম, হুগলীর কাজে বড় নিঃসঙ্গ লাগছিল। তাছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান। উনি বললেন, উত্তম কথা। ক'দিন পড়ে আমাকে তলব করে বললেন, আমাকে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে। খুশী হয়ে বদলির হুকুম পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে দুজনে মনের আনন্দে জিনিসপত্র প্যাক করে মুর্শিদাবাদের লেবেল লাগিয়ে মালগাড়িতে পাঠাব ভাবছি এমন সময়ে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির প্রথমেই হুকুম এল, মুর্শিদাবাদের বদলে আমাকে মালদায় বদলি করা হয়েছে। হাত বদলের ফলে মালদায় গোলমাল হয়। প্রথমে মালদার সবটাই পূর্ব-পাকিস্তানে পড়ে। সুতরাং ১৪ অগাস্ট মালদার ইংলিশবাজার শহরে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ে। কিন্তু তার পরক্ষণেই মালদা জেলার পশ্চিম অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে, তার ফলে ১৮ অগাস্ট মালদায় পাকিস্তান ফ্ল্যাগ নামিয়ে ভারতীয় পতাকা ওঠানো হয়। যিনি সে-সময়ে ভার নিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করেন তিনি অস্থায়ী, শীঘ্রই পূর্ণ অবসর নেবেন, তাঁর পক্ষে মালদার কাজ কষ্টকর হয়ে উঠছে। ওদিকে অজিয়তি ধারার একজন অগ্রজ আই-সি-এস অফিসার কালেক্টর হতে আগ্রহী, তাঁকে মুর্শিদাবাদ দেয়া হচ্ছে।

মালদা সীমান্ত জেলা, গণ্ডগোল হয়েছে, তবে পরিবার নিয়ে যাবার নিষেধ হয়নি। আভা বলল, আমার সঙ্গে যাবে, মেয়েও যাবে। সে-সময়ে মালদায়

আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার বড় হাঙ্গামা। পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে মাল পাঠানো সমীচীন নয়। ওদিকে সাহেবগঞ্জ-কাটিহার রেললাইন তখন বিপর্যস্ত। মাথায় যেন কিছু ঠিকমত খেলল না। মূর্খের মত ক্রেট করা মাল ও আসবাবপত্র লরী করে আবার চন্দননগর থেকে গ্রোভ লেনে নিয়ে যাবার কথা ভাবছি। এমন সময়ে ভাগ্যক্রমে শুভ নববর্ষ করতে কলকাতা থেকে স্নেহাংশু আচার্য ও স্ত্রী সুপ্রিয়া চন্দননগরে হাজির। আমার সমস্যা বলা মাত্রই স্নেহাংশু বললেন, 'আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি রেখে দেব।' এই আশ্বাস পেয়ে বুদ্ধি খেলে গেল। সোজা গেলুম লরী-বোঝাই মালপত্র নিয়ে ২৭ নম্বর বেকার স্ট্রীটে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ি। আচমকা বড় তিন লরী মাল দেখে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে স্নেহাংশু গ্যারাজ থেকে নিজের গাড়ি বার করে বাইরে রেখে, গ্যারাজে মাল ঢোকাতে বলল। সব মাল গ্যারাজে ঢুকল না। বাকি যা রইল, সেগুলি বাড়ির পিছনের চওড়া ঢাকা বারান্দায় পাক-থাক করে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখালো। এত ভদ্র ও সহৃদয়, আমাকে সব কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতেও হল না। সে একজন কম্যুনিস্ট আর আমি চাকুরে। পাছে সরকার থেকে আমাকে গঞ্জনা দেয় কম্যুনিস্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকার জন্যে, স্নেহাংশু এক কথায় আমার প্রস্তাবে মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া নিয়ে মাসে মাসে রসিদ লিখে দিতে রাজি হল। আমি মালদার নতুন কাজে ১৯৪৮-এর ১৬ জানুয়ারি সকালে যোগ দিলুম।

ঠিক মনে নেই, ১৯৪৭-এর অগ্রহায়ণেই নিশ্চয় হবে, তদানীন্তন একজন ডিভিশনাল কমিশনারের মেয়ের বিবাহে আমরা কলকাতায় বিবাহবাসরে গিয়ে চমকে গিয়েছিলুম। আয়োজনে স্পষ্ট বোঝা গেল অতিথি অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন, ভোজনের যাবতীয় ব্যবস্থা ও খরচ নিশ্চয় কমিশনার নিজে করেননি, তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থীরা করেছিলেন। অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন এড়াবার জন্যে প্রায় দশটি বিভিন্ন ঠিকানায় নিমন্ত্রিতদের ছোট ছোট দলে খেতে ডাকা হল। যে-বাড়িতে বিবাহ হল সে-বাড়ির দুটি বড় বড় ঘরে থরে থরে সাজানো বহুমূল্য উপহার, বস্ত্র, গয়না, রুপোর, কাঁচের, চিনেমাটির, বহুমূল্য বসনবাসন। যে-সব জায়গা থেকে এসেছে তাদের নাম দেয়ালে সাঁটা: কাশিমবাজার রাজবাটি, লালগোলা, নাড়াজোল, মহিষাদল ইত্যাদি। সব মনে নেই। আগে বোধহয় কোথাও লিখেছি সরকারি নির্দেশমতে কোন আই-সি-এস অফিসার কুড়ি টাকা বেশী মূল্যের কোন উপহার নিজে বা কোন আত্মীয়-আত্মীয়ার পক্ষে নিতে পারতেন না। পায়ের তলায় মাটি যেন হঠাৎ টলে উঠল। ভবিষ্যতের ছায়া?

১৯৪৮-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তখনও মালদায় যাবার আদেশ আসেনি। ভাবলুম যে-সব অগ্রজদের কাছে স্নেহ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে যাঁরা কলকাতায় আছেন, এক-আধজনের সঙ্গে দেখা করি। একদিন সকাল সকাল চন্দননগর থেকে বেরিয়ে এক বাড়িতে গেলুম। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, আগেই বলেছি, তখন প্রধান-মন্ত্রী। যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, লোকের ধারণা তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র, এক বিভাগীয় সেক্রেটারী। সেইজন্য মনে কিছু দ্বিধা ছিল। আভা বলল, 'তুমি তো কিছু চাইতে যাচ্ছো না। স্নেহ করতেন, যাও।' একটু নিরাশ হলুম বাড়ির বিস্রস্ত ও ধুলোভরা অবস্থা দেখে। মাত্র কয়েকবছর আগেও কোন জেলায় তাঁর বাড়িতে সমস্ত কিছু ঝক্‌ঝক্-তক্‌তক্ করত। অল্পক্ষণের মধ্যে গৃহকর্ত্রী এসে সাদরে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, চা খাব কি-না। না, বললে অভদ্রতা হবে ভেবে বললুম, হাঁ। কিছুক্ষণ পরে একটি চাকর বসন্ত কেবিনের মত চায়ের পিরিচ পেয়ালায় এক-কাপ চিনি-দুধ দিয়ে চা তৈরি করে নিয়ে এসে সমুখে ধরল। আনার সময়ে দোলা লেগে পেয়ালা থেকে চা গড়িয়ে পিরিচে পড়েছে। লোকটির পরণে ময়লা ধুতি, গায়ে ফতুয়া, অবস্থা দেখে মনে হল কত রাত ঐ কাপড়জামা পরে শুয়েছে ঠিক নেই। কোথায় গেল সুন্দর রুপোর ট্রে, লেসের ট্রে-ক্লথ, ঝক্‌মকে টি-পট, পেয়ালা-পিরিচ, কাঁটা চামচ। আর বেয়ারার ধোপদুরস্ত উর্দি, কোমরের পেটি, সাহেবের চাকরির মনোগ্রাম! ঠাট পরিবর্তনে একটু মুষড়ে গেলুম। ভাবলুম, সাহেবি না হয় না হল, বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে এমন কিছু রীতিনীতি, সাজসজ্জা, নিশ্চয় ছিল যার নিচে নামা সম্ভব হত না! ক্রমে ক্রমে আমার এখন বিশ্বাস হয়েছে আমাদের নিজস্ব ঠাট বলে বোধহয় কিছু তেমন নেই, যার নিচে আমরা নামতে পারি না। মুসলমান আমলে মুসলমানী আদবকায়দা, পোশাক, ঠাট, ভদ্রতা। ইংরেজি আমলে ইংরেজি। সুতরাং ইংরেজি আমলে ১৯৪৭ সালের আগে যে ইংরেজি কেতার প্রয়োজন ছিল, আজ আর নেই। যদি কোনদিন শ্বেতচর্ম বাড়িতে আসে, তখন অবশ্য আলাদা ব্যবস্থা দেখি, তবে তখনও অনভ্যাসের ফোঁটার নানা চিহ্ন চোখে পড়ে। এ তো গেল সরকারি কর্মচারিদের কথা। কলকাতায় এমন খুব কম বক্সওয়ালা সাহেব এখন আছেন যাঁরা অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবিয়ানা ত্যাগ করেন না। একমাত্র সুন্দর, সুষ্ঠুভাবে সাজানো সবকিছু দেখি অবাঙালিদের বাড়িতে। সেখানে ভারতীয় ও বিদেশী সজ্জার সুন্দর সংমিশ্রণ ও ব্যবহারের রীতি-নীতি, বিনয়, ভদ্রতা দেখে চোখের ও মনের আরাম হয়, যা এখন কলকাতাবাসী খুব কম বাঙালি বাড়িতেই আছে; মনে পড়ল, ১৯৪২ সালে মুন্সীগঞ্জের সোনারং,

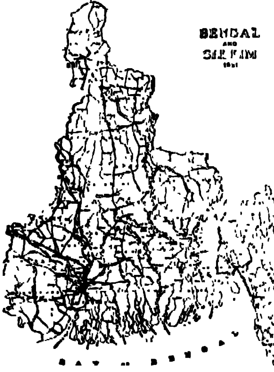
টঙ্গিবাড়িতে দেখেছি, বড় বড় অফিসার, ব্যারিস্টারবাড়িতে পুজোর সময়ে। কার্যক্ষেত্রে তাঁরা পুরোদস্তুর সাহেবী কেতায় সাহেবী ধরনের বাড়িতে থাকতেন, কিন্তু দেশের বাড়িতে সে-সব কোন বালাই থাকত না, এমন-কি একটি সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিনও নয়। খালের উপর টঙ্গবাঁধা বাঁশের মাচার পায়খানায় গিয়ে প্রাতঃ-কৃত্য সারতেন, খালের জলে প্রকাশ্যে টপ্‌ টপ্‌ করে ময়লা পড়ত।

যখন বিদায় নিয়ে উঠছি, সেক্রেটারী সাহেবের স্ত্রী বললেন, তাঁর দপ্তরে (তাঁর 'স্বামীর দপ্তরে' হবে) একজন ডেপুটি সেক্রেটারী দরকার, আমি কোন নাম বলতে পারি কিনা। জানি না আশা করেছিলেন কিনা, আমি বলব, আমিই তো আছি, আমাকে নিন না! আমি নাম করলুম। পরে শুনে খুশি হলুম যাঁর নাম করেছিলুম, তাকেই, অর্থাৎ আমার একজন সতীর্থকে নিয়েছেন।

মালদায় যাবার আগে ভাবতে বসলুম, এগুলি কি সত্যিই দিন বদলের পালার চিহ্ন!

উপসংহার

বিচ্ছেদ



অখণ্ড বঙ্গে কর্মজীবন শুরুর স্মৃতিকে অর্ঘ্য না-জানিয়ে স্মৃতিকথার এই ভাগ শেষ করলে আমার অপরাধ হবে।

১৯৪০ সালে ইংলণ্ডে থাকার সময়ে ডানকার্ক ও লণ্ডন ব্লিৎস্-এর পর আমার মনে ক্ষীণ আশা হয়, হয়তো একদিন আমি স্বাধীন ভারতের মুক্তবায়ুতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। কিন্তু যখন সে সুদিন অবশেষে এল তখন তার আগের রাত্রেও আমি ধারণা করতে পারিনি আমার প্রাণ কি উল্লাস, উন্মাদনা, কৃতজ্ঞতা-নত, আত্মোৎসর্গে আপ্লুত হতে পারে। ঠিক যে-ধরনের অহংবিলোপের আত্ম-নিবেদন আসে যখন মানুষ জীবনে প্রথম তার দেহমন অন্য একজনের দেহমনের মধ্যে নিঃশেষে কয়েক মুহূর্তের জন্য হারায়। মুক্তাফলের মত দুগ্ধাভ লাবণ্যময় ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের প্রশান্ত প্রত্যূষে হ্বাইনগার্টনারের পরিচালনায় আমার ই-এম-জি গ্রামোফোনের হর্ন থেকে নবম সিম্ফনির আনন্দস্তব কোরালের প্রথম বারগুলি ও তার সঙ্গে কোরাসের আনন্দকণ্ঠসঙ্গীত যখন বেরিয়ে এল, প্রায় সে-মুহূর্তে রক্তিম সূর্য সৃষ্টির আশীর্বাদ বহন করে পূর্বদিগন্তে যেন লাফ দিয়ে ভেসে উঠল। নবম সিম্ফনি শেষ হবার পর চিত্তশুদ্ধির প্রার্থনা হিসাবে বেটোফেনের এ-মাইনর কোয়ার্টেটের লিডিয়ান মোডে রচিত রোগমুক্তির কৃতজ্ঞতায় সৃষ্টিকর্তাকে অর্ঘ্যনিবেদন-সঙ্গীত বাজিয়ে দেহমন পবিত্র হল।

তারপর আমরা গেলুম চুঁচুড়ার ভূদেব ভবনের ধ্বজাস্তম্ভে ভারতের নতুন পতাকা তুলতে। পর্তুগিজ গৃহস্থাপত্যের সৌম্য নিদর্শন, গঙ্গার পাড়ে বিখ্যাত ব্যাণ্ডেল চার্চের প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে, ভূদেব ভবন আমার কাছে ছিল ইওরোপীয় যোগাযোগের ঐতিহাসিক প্রতীক, যা অতীতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের নতুন সম্পর্কের বার্তা হিসাবে নবযুগের পতাকা তুলে ধরল। একান্ত বন্ধুর মত দুই বাংলা আগের রাত্রে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়সম্ভাষণ শেষ করেছে।

পতাকা তোলার পর আমরা যখন ভূদেব ভবনের দোতলায় গঙ্গার উপরে বিরাট খোলা রেলিংঘেরা ছাতে চা খেতে সমবেত হলুম, তখন হঠাৎ আমার বুক কে যেন বিষাদের সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরল। এতদিনকার যে-সব আত্মীয়প্রতিম সহকর্মিরা পূর্ববঙ্গে বা পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে গেছেন, তাঁদের বিচ্ছেদে মন বিষাদে ভরে গেল। আরো কষ্ট হল এই উপলব্ধিতে পূর্ববঙ্গের জেলায়-জেলায় বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, শাণিতপ্রত্যুৎপন্নমতি আপামর সকলের মাঝে কাজ করার সুযোগ হয়তো আর পাব না। তার থেকে কষ্ট হল এই ভেবে যে পূর্ববঙ্গের দিগন্তব্যাপী বিরাট বিরাট নদীর বুকে নিজের একেস্থারে ঘোরাফেরার সুযোগ আর হবে না। পদ্মা, মেঘনা বা ব্রহ্মপুত্রই হোক, অথবা অথৈ সাগরের মত আড়িয়ল খাঁয়ে, অথবা প্রকৃতির সেই তাণ্ডবলীলা আর দেখতে পাব না; যেমন দেখেছি ১৯৪২-এর ১৭ অক্টোবর, যখন মেদিনীপুর সাইক্লোন নিজেকে আস্তে আস্তে পদ্মা-মেঘনার সঙ্গম-স্থলে নিঃশেষ করে, যেখানে আমার জাহাজ 'অস্ট্রিচ' একটি গোটা রাত্রি উত্তাল সমুদ্রের উপর মোচার খোলার মত ভেসেছিল।

আর কখনও প্রশান্ত বিস্ময়ে দেখব না, মহান পদ্মার চরে ভোরের প্রাক্কালে ঘুম ভেঙে উঠে পাখি শিকারের আশায় ম্যালার্ড হাঁসের শরের বাঁশির মত আওয়াজ, অথবা দূর আকাশে পিনটেল হাঁসের সার, শিস্ দিতে দিতে তারা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে গভীর রাত্রে মেঘের ফাঁকে চাঁদ বেরিয়ে কাকজ্যোৎস্নায় স্বচ্ছ সাদা চাদর ছড়িয়ে দিয়েছে। শুনব না আর চাঁদনি রাতে দূর নদীর বুক বেয়ে ভেসে-আসা মাঝিদের সারি, জারি, ভাটিয়ালি গান; গাইতে গাইতে তারা দূরে ভল্‌গার নৌকামাঝিদের মত দূরে, আরো দূরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখে দেখব না নদীর ধারে ধারে টলটলে পান্নার মত সবুজ গাছপালার ফাঁকে কুটীর থেকে কুটীরে জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের পেলব চলন। চোখে দেখব না, কানে শুনব না, ঋত্বিক ঘটকের মহাকাব্যরূপী তিতাস নদীর প্রাণস্পন্দন, অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহসা দম-আটকে যাবার মত পদ্মানদীর মাঝিদের বলিষ্ঠ, সুরেলা কথোপকথন।

এ ক্ষতি জীবনে পূরণ হবার নয়।

নির্দেশিকা